আধুনিক

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শাসনব্যবস্থা

(Written in accordance with the Three-year B. A. Political Science Syllabus,—First Paper and Second Paper.)

নীরোদ কুমার ভট্টাচার্য্য এম্. এ.,

আশুতোষ কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল, এবং অর্থবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শাসনব্যবস্থার উপাধ্যায় ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট এবং একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য।

ও

সুব্রত গুপ্ত এম্. এ.,

অধ্যাপক, যোগমায়া দেবী কলেজ এবং আশুতোষ কলেজ, কলিকাতা।

এস্ গুপ্ত ব্রাদার্স (প্রাইভেট) লিমিটেডের পক্ষে
যোগব্রত গুপ্ত কর্তৃক
৫৮, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬, হইতে প্রকাশিত।

প্রথম প্রকাশ জুলাই, ১৯৬২

মূল্য—নয় টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান

এস্ গুপ্ত ব্রাদার্স (প্রাইভেট) লিঃ
৫৮, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

মৌলিক লাইব্রেরী
১৮/২ শ্যামাচরণ দে
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর

শ্রীমন্মথনাথ পান
কে. এম্. প্রেস
১/১. দীনবন্ধু লেন. কলিকাতা-৬

শ্রীবঙ্কিম বিহারী রায়
অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৭, বলাই সিংহ লেন, কলিকাতা-৯

বাঁধাই

ইউনিভার্সাল বুক বাইণ্ডার্স (প্রাইভেট) লিমিটেড
১১৭, লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা

কলিকাতা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন বৎসর ডিগ্রী কোর্স অনুযায়ী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যে নূতন পাঠ্যসূচী প্রণীত হইয়াছে, তদনুযায়ী এই বইটি আমরা প্রণয়ন করিয়াছি। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বগুলি এবং বিভিন্ন দেশের শাসনব্যবস্থার অনুশীলন যাহাতে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে বিশেষ আগ্রহের সঞ্চার করে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমরা যথা সম্ভব সহজ ভাষায় বইটি প্রণয়ন করিয়াছি। বিদেশী ভাষায় লিখিত রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং শাসনব্যবস্থার প্রায় সমুদয় বিখ্যাত বই হইতেই আমরা সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। অধ্যাপক—অধ্যাপিকাগণের এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রথম দুইটি পত্রের পাঠ্যসূচী এই বইয়ে সংযোজিত করা হইল। বইটির বিভিন্ন অধ্যায়ের শেষে সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হইয়াছে এবং ১৯৬২ সালের যে বি. এ. (প্রথম পর্ব) পরীক্ষা হইয়াছে তাহার প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর-সংকেতও দেওয়া হইয়াছে। ভবিষ্যতে বইটি যাহাতে আরও উন্নত ধরণের হয় সেই জন্য যে কোন পরামর্শ সানন্দে গৃহীত হইবে।

আশুতোষ কলেজ
কলিকাতা ২৬
১৮ই জুলাই, ১৯৬০

বিনীত
নীরোদ কুমার ভট্টাচার্য্য

THREE-YEAR DEGREE COURSE

Syllabus in Political Science

Political Theory

Paper—I

Definition and scope of Political Science—Relation of political Science to other sciences—Methods of Political Science Definition of State—Differences between State, Government and other Associations.

Leading Theories of the origin and nature of the State—Theory of Divine Origin—Theory of force—Theory of social contract—Views of Hobbes, Locke and Rousseau—Evolutionary theory of the origin of the State—Organic Theory about the nature of the state—The Idealist Theory—Marxist concept of the State.

Nature and characteristics of Sovereignty—Legal and Political Sovereignty—Dejure and De facto Sovereignty, Doctrine of popular sovereignty—Austinian Theory of Sovereignty—its critical estimate—Theory of limited Sovereignty—Attacks on the Monistic Theory of Sovereignty.

Definition and Nature of Law—Different kinds of law—Sources of Law—Distinction and relation between law and morality—Relation between law and liberty—The concept of liberty—Safeguards of liberty in a modern state—concept of Natural law and Natural Right.

Meaning of Nationality—Nation and Nationalism—Essential clements of Nationality—Right of self-determination—Mono-national state Vs. Poly—national State—Dangers of Nationalism—Nationalism and Internationalism.

Citizens and Aliens—Modes of acquiring citizenship—Rights and duties of citizens—Hindrances to good citizenship—Relation between Rights and duties. Unions of States and Forms of Governments—Personal and Real Union—Confederation and Federal Union—Nature and types of Federation—

Chief features and conditions of Federation—Merits and defects of Federation—Alliance—Distinction between unitary and Federal Governments.

Forms of Governments—Monarchy. Aristocracy, Oligarchy and Democracy—Types of Democracy—Strength and weakness of Democracy—Comparison of strength—Democracy and Dictatorship—conditions essential to the success of Democracy—Parliamentary and Presidential Governments—Their Strength and Weakness.

Structure of Government—Organisation and functions of Legislature—Executive and Judiciary—Bi-cameralism—its merits and defects—Separation of powers. Functions of Government—Individualism and socialism—their comparative merits and defects—Types of socialism. Constitution—Different kinds of constitutions—their strength and weakness. Party system—Its advantages and disadvantages. Two-Party system vs. Multiple Party system—one Party Rule.

Public Opinion—Its nature and importance in Popular Government—Agencies for formation of Public Opinion.

Electorate—Universal Suffrage—Methods of minority representation—Direct and Indirect election—Relation between the representative and his constituency.

———

MODERN CONSTITUTIONS

PAPER II

(a) **Great Britain**—Characteristics of the British constitution—the Rule of Law—Conventions, Position and powers of the British crown. The Privy Council—The Ministry and the Cabinet. Characteristics of the British Cabinet—its functions—the position and powers of the Prime Minister—Relation between the Cabinet and Parliament.

Constitutions and functions of the House of Lords and the House of Commons—Relationship between the two Houses—Privileges of the Houses—How Bills are passed—control of Parliament over finance.

British party system—A brief outline of the British judicial system—Local Government in Great Britain.

(b) **U. S. S. R.**—Chief features of the Constitution. Constitution and functions of the Council of Ministry. Functions of the Supreme Soviet—The Presidieum. The one-party Rule—Role of the Communist Party—The Judiciary.

(c) **U. S. A.**—Chief features of the Constitution of the U. S. A. Position and powers of the President—The Cabinet. Powers and functions of the Two Houses of Congress, Party System. The Federal Judiciary and its functions ; Process of Amendment of the constitution.

(d) **Switzerland**—Chief features of the Constitution Nature of the Federation—Distribution of Powers. The Federal Executive, The Federal Council—its peculiarities—its relation to Federal Legislature. Direct popular Legislation ; the Initiative and Referendum—Federal Judiciary.

সূচীপত্র

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান

আধুনিক শাসনব্যবস্থা

———

অবতারণা | রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু—রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত অন্যান্য বিজ্ঞানের সম্বন্ধ বিচার

(Subject-matter of Political Science—its relation to other Sciences)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি সমাজ-বিজ্ঞান (Social Science)। সমাজবদ্ধ মানুষের রাজনৈতিক জীবন রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের যে রাজনৈতিক জীবন তাহা আলোচনা করাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান বিষয়বস্তু। রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের আলোচ্য বস্তু অত্যন্ত ব্যাপক। রাষ্ট্রের সৃষ্টি, গঠন, কাঠামো, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, পররাষ্ট্রের সহিত কোন বিশেষ রাষ্ট্রের সম্পর্ক, সরকারের ক্রিয়াকলাপ, নাগরিকদের সম্পর্ক,—সবই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বস্তু। শুধু তাহাই নহে, বর্তমানকালের কোন রাষ্ট্রের কাঠামো বিশ্লেষণ করিতে হইলে অথবা রাষ্ট্রের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে আমাদিগকে মধ্যযুগের রাষ্ট্র ব্যবস্থারও আলোচনা করিতে হইবে এবং তাহা হইতে কতিপয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু এবং তাহা আলোচনার সার্থকতা

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার বিশেষ সার্থকতা আছে। সামাজিক প্রাণী মানুষের রাজনৈতিক জীবনের প্রকৃত বিশ্লেষণ করিতে হইলে আমাদের উচিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা। গণতন্ত্রের যুগে রাষ্ট্রীয় শাসনে প্রত্যেক নাগরিকেরই ব্যক্তিত্ব বিকাশের পূর্ণ সুযোগ থাকা উচিত। আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক আলোচনা করিয়া জানিতে পারি তাহা কিভাবে সম্ভবপর। শুধু তাহাই নহে, রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের সঠিক বিশ্লেষণের সাহায্যে মানুষের অনেক অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যারও সুমীমাংসা করা যায়। রাজনৈতিক জীবনের সহিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের নিবিড় সম্পর্কের কথা সুবিদিত। সামাজিক জীবনে একটি মানুষ কিভাবে আদর্শ নাগরিক হইতে পারে এবং কিভাবে দৈনন্দিন বহুবিধ সমস্যার

সমাধানে রাষ্ট্রীয় সাহায্যের সদ্ব্যবহার করিতে পারে অথবা রাষ্ট্রের সংগে কিভাবে সুন্দর সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে,—তাহা আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক্ অনুশীলন করিয়া জানিতে পারি। সুতরাং শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জন করাই নহে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার যে একটা বাস্তব উপকারিতা আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

সমাজবদ্ধ মানুষের রাজনৈতিক জীবন, রাষ্ট্রের সহিত মানুষের নিবিড় সম্পর্ক এবং রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ লইয়া যে বিজ্ঞানের সূত্রপাত তাহাকেই আমরা বলি রাষ্ট্রবিজ্ঞান। রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের সৃষ্টি ও প্রকৃতি, এবং রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপের বিভিন্ন দিক্ অনুশীলন করে। ইতিহাসের পরিবর্তনের সহিত ইহার নিবিড় সম্পর্ক। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি আলোচনা করিবার সময় আমাদের তিনটি কথা মনে রাখিতে হইবে; যথা,—(১) রাষ্ট্র-বিজ্ঞান রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিবে। (২) রাষ্ট্রবিজ্ঞান বর্তমান অবস্থার ইতিহাস পর্যালোচনা করিবে, এবং (৩) রাষ্ট্রবিজ্ঞান নীতি-শাস্ত্র অনুযায়ী রাষ্ট্রের প্রকৃতি কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা আলোচনা করিবে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি

রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রনীতির মধ্যে একটি সীমারেখা আছে। রাষ্ট্রনীতি (Politics) শব্দটির উৎপত্তি গ্রীস দেশে। গ্রীক্ শব্দ "Polis" হইতে এরিস্টটল "Politics" শব্দটি গ্রহণ করিয়াছিলেন। "Polis" শব্দটির অর্থ শহর। তখন প্রতিটি শহর একটি রাষ্ট্র ছিল। রাষ্ট্রনীতি বলিতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি রাষ্ট্রশাসনের রীতিনীতি। রাষ্ট্রনীতি আবার তত্ত্বগত (theoretical) অথবা ব্যবহারিক (practical) হইতে পারে। তত্ত্বগত রাষ্ট্রনীতি রাষ্ট্রের সৃষ্টি, মূলভিত্তি, প্রকৃতি, ক্ষমতা ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করে। ব্যবহারিক রাষ্ট্রনীতি সরকারের রাজনৈতিক জীবনের সহিত সম্পর্ক-যুক্ত। কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদ্ তত্ত্বগত রাষ্ট্রনীতিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানরূপে অভিহিত করিতে চাহেন। তাঁহারা মনে করেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ব্যবহারিক রাষ্ট্রনীতির মধ্যে পার্থক্য আছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রদর্শন (Political Philosophy) এক জিনিষ নয়। রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক আছে এই প্রকার বিভিন্ন তত্ত্ব আলোচনা করাই রাষ্ট্র-দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু, রাষ্ট্রদর্শন বলিতে আমরা নিছক রাষ্ট্রের দার্শনিক তত্ত্বগুলির আলোচনা বুঝিয়া থাকি।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের শাসননীতি সম্পর্কিত আলোচনাও করিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে তত্ত্বগত রাষ্ট্রনীতি এবং রাষ্ট্রদর্শনের মধ্যে কোন সীমারেখা টানা যায় না। রাষ্ট্রদর্শন এবং তত্ত্বগত রাষ্ট্রনীতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা-ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ব্যবহারিক রাষ্ট্রনীতি উপেক্ষিত হয় না। রাষ্ট্রের

মূল ভিত্তির বিশ্লেষণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। আবার, যেসব নীতি এই ভিত্তির মূলে থাকে সেইগুলির গবেষণা রাষ্ট্রদর্শনের অংগীভূত। তত্ত্বগত রাষ্ট্রনীতি, ব্যবহারিক রাষ্ট্রনীতি এবং রাষ্ট্রদর্শন—সব কিছুই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্র গঠন করে। রাষ্ট্রদর্শনের মধ্যে থাকে রাষ্ট্রসম্পর্কিত বিভিন্ন ধারণা; সেইধারণাগুলিই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভিত্তি গঠন করে।

ফরাসী চিন্তানায়কগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে একটি একক বিজ্ঞানরূপে অভিহিত না করিয়া অনেকগুলি বিজ্ঞানের সমষ্টি বলিয়া (Political Sciences) অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় অনেকগুলি শাস্ত্র আছে; —যেমন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক আইন (International Law) এবং শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস (Constitutional History) ইত্যাদি। ইহা এই সম্পর্কে অনেকগুলি শাস্ত্রের মধ্যে অন্যতম।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি একটি বিজ্ঞান ? (Is Political Science a Science ?)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে আমরা প্রকৃতই 'বিজ্ঞান' বলিয়া অভিহিত করিতে পারি কিনা এই বিষয়ে পূর্বে রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণের মধ্যে মতভেদ ছিল। এরিস্টটল রাষ্ট্রনীতিকে একটি বিজ্ঞান মনে করিতেন। হব্‌স্ (Hobbes), সিজ্‌উইক্ (Sidgwick), ব্রাইস্ (Bryce) প্রভৃতি চিন্তানায়কগণ এই মত পোষণ করেন। কিন্তু, কোন কোন লেখক "রাষ্ট্রবিজ্ঞান" শব্দটি গ্রহণ করিতে এবং রাষ্ট্র-সম্পর্কিত আলোচনাকে "বিজ্ঞানের" পর্যায়ভুক্ত করিতে চাহেন না। ("The term Political Science is a misnomer, because it cannot be a science and it deals with subjects other than political.")। এই সম্বন্ধে অনেক যুক্তির অবতারণা করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, আমরা দেখিতে পাই, রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নীতি, কার্যক্রম এবং সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে প্রায়ই একমত পোষণ করেন না।

দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গতি এবং প্রগতির মধ্যে প্রকৃত সামঞ্জস্যের অভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভিত্তি যেসকল উপাদানের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেইগুলির মধ্যে ধারাবাহিকতার অভাব আছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার তিনটি ধাপ আছে। প্রথমেই আমরা সুশৃংখলভাবে বিভিন্ন উপাদান পর্যবেক্ষণ করি। ঠিকভাবে যখন উপাদানগুলির পর্যবেক্ষণ করা হয়, তখন আরম্ভ হয় সেই উপাদানগুলির বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা। ইহার সাহায্যে আমাদের সুসম্বদ্ধ জ্ঞান অর্জিত হয় এবং আমরা নীতি ও নিয়ম অনুমান করিতে পারি। এই অর্জিত জ্ঞানকেই বলা হয় বিজ্ঞান। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুযায়ী অনুশীলনের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন নিরপেক্ষ মনোভাব লইয়া উপাদানগুলির পর্যবেক্ষণ,

বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা। রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদ্‌গণ ইতিহাস হইতে রাষ্ট্রের সৃষ্টি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে গবেষণা করিবার অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সব উপকরণ তাঁহারা ঠিকভাবে বিচার, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করিয়াছেন এবং তাহা হইতে রাষ্ট্রীয় জীবনের নীতি-সম্পর্কিত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। অধ্যাপক গিলক্রাইস্ট (Prof. Gilchrist) বলেন, যদিও পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নবিদ্যার গবেষণার পদ্ধতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রয়োগ করা যায় না, তবুও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নিজস্ব একটি গবেষণা পদ্ধতি আছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলির সিদ্ধান্তগুলি নির্ভুল এবং যথানির্দিষ্ট। কিন্তু, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি সর্বদা নির্ভুল এবং যথানির্দিষ্ট হয় না। কারণ, রাষ্ট্রের অধীনে মানুষের সামাজিক ক্রিয়াকলাপ পরিবর্তনশীল হইবেই। মানুষের সহিত রাষ্ট্রের সম্পর্ক, এবং সমাজকে কেন্দ্র করিয়া রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করা হয়। উপকরণ যদি পরিবর্তনশীল হয়, তবে সেই উপকরণের সাহায্যে যে সিদ্ধান্তে পৌছান যায়, তাহা পরিবর্তনশীল হইবেই। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ন্যায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সম্পূর্ণভাবে একটি বিজ্ঞান বলিয়া হয়ত অভিহিত করা যায় না। কিন্তু, এইজন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান না বলিবার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি সমাজবিজ্ঞান (social science)। অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের ন্যায় পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া এবং চিন্তধারার পরিবর্তনের সংগে সংগে রাষ্ট্রের কাঠামোর এবং বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটিতেছে। অর্থনীতির ন্যায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানও একটি প্রগতিশীল সামাজিক বিজ্ঞান।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসের সম্পর্ক (Relation between Political Science and History).

ইতিহাসের সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়। স্যর জন্ সিলি বলেন, ইতিহাস হইতেছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইতেছে ইতিহাসের পরিণতি। ("History without Political Science has no fruit while Political Science without History has no root.") মানবসমাজের বিভিন্নদিকের আলোচনা এবং ইহার ক্রমবিকাশ এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের উত্থান-পতনের কাহিনী ইতিহাসে আলোচিত হয়। রাজনৈতিক জীবনের বিকাশে কালের স্বাক্ষর থাকে এবং তাহা আমরা ইতিহাস পাঠ হইতে জানিতে পারি। বিভিন্ন সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা এবং বিভিন্ন শাসকের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা অথবা অপরিণত

রাজনৈতিক জ্ঞান, যাহা ইতিহাসের পাতায় স্থান পায় তাহা হইতেই আমরা আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিবার নীতি জানিতে পারি। শুধু রাজনীতির ইতিহাসই নহে,—রাজনৈতিক জীবনকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের যে সামাজিক, আর্থিক এবং কৃষ্টিগত জীবন তাহাও আমরা ইতিহাস হইতে জানিতে পারি। আধুনিক রাষ্ট্র গঠনে ইহার অবদান মোটেই অসামান্য নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠ করিবার সময় আমরা ইতিহাস হইতেই উপরোক্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করি এবং সেইগুলি রাষ্ট্রীয় জীবনে কার্যকরী করিবার চেষ্টা করি। সুতরাং দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্বন্ধে অনুশীলন করিবার সময় আমরা ইতিহাসের উপর নির্ভর করি। আবার রাষ্ট্রবিজ্ঞানই হইল ইতিহাসের পরিণতি ; কেননা, ইতিহাসের অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়াই আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব এবং নীতি সম্পর্কিত অনুশীলন করি।

আবার, ইতিহাসের সমগ্র বিষয়বস্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর অনুসন্ধানের ক্ষেত্র নহে। ধর্মের ইতিহাস অথবা চারুকলার ইতিহাসের সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোন যোগাযোগ নাই। সেই প্রকার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সমস্ত বিষয়বস্তুও ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় নাই। বিশেষতঃ, রাষ্ট্রের প্রকৃতি নির্ণয় অথবা রাষ্ট্রের কর্তব্য সম্বন্ধে কতকগুলি মতবাদ আছে যেগুলি প্রত্যক্ষভাবে ইতিহাসের সম্পর্ক হইতে মুক্ত। যেমন, ধরা যাক, হব্‌স্‌ সামাজিক চুক্তি (social contract) সম্বন্ধে যে মতবাদ প্রদান করিয়াছেন, তাহার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। অধ্যাপক গার্ণারের মতে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ইতিহাসের মধ্যে একটির আলোচনা অপরটির পরিপ্রেক্ষিতে হওয়া উচিত্।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক (Relation between Political Scicnce and Ethics).

প্রাচীন যুগে বিভিন্ন দার্শনিকগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং নীতিশাস্ত্রের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে করিতেন। এরিস্টটলের মতে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নীতিশাস্ত্রের উপর নির্ভরশীল। প্রাচীনকালে রাজার সহিত প্রজার সম্পর্ক এবং রাষ্ট্রের প্রতি রাজার কর্তব্য অথবা রাষ্ট্রের প্রতি প্রজার কর্তব্য কতিপয় নৈতিক আদর্শের উপর নির্ভরশীল ছিল।

ইটালীর প্রখ্যাত দার্শনিক মেকিয়াভেলি সর্বপ্রথম রাজনীতিকে নৈতিক আদর্শের উপর স্থাপন না করিয়া সুবিধাবাদ আদর্শের উপর স্থাপন করেন। সামাজিক চুক্তি মতবাদ প্রচারের সময় রাষ্ট্রের আদর্শ নীতিশাস্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইয়া নূতন আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি পৃথক শাস্ত্রের মর্যাদা লাভ করে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান জনসাধারণের বহির্জীবন নিয়ন্ত্রিত করে; কিন্তু নীতিশাস্ত্র মানুষের চিন্তাধারা এবং সমগ্র জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট। বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার জীবনের চিন্তাধারা এবং ক্রিয়াকলাপ নীতিশাস্ত্রের আওতায় পড়ে। মানুষের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ অনুশীলন করাই শুধু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাজ। রাষ্ট্রীয় আইন মানুষের বহির্জীবনকেই নিয়ন্ত্রণ করে,—তবে অনেক সময় ইহা নৈতিক নিয়মের অনুরূপ হইতে পারে। তাহা দেখা যাইবে শুধু মানুষের বাহ্যিক জীবন সম্পর্কিত নৈতিক নিয়মের ক্ষেত্রে। মানুষকে হত্যা করা নীতিশাস্ত্রের মতে ঘোরতর অপরাধ,—আবার রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ীও ইহা মারাত্মক অপরাধ। আবার, রাস্তার বাঁদিকে না যাইয়া ডান দিক দিয়া যাইলে অনেক সময় ইহা বে-আইনী হইতে পারে, কিন্তু ইহা কখনই নীতিশাস্ত্রের বিরোধী হইবে না। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত নীতিশাস্ত্র মানুষের বহির্জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত ইহার বিরোধ হয় না। কিন্তু মানুষের অন্তর্জীবনের সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিশেষ সম্পর্ক নাই। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধান করাই রাষ্ট্রীয় আইনের এবং ক্রিয়াকলাপের প্রধান লক্ষ্য এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত রাষ্ট্রীয় আইন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান নীতিশাস্ত্রের প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিতে পারে।

কিন্তু, একথা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনেক ক্ষেত্রেই নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক হইতে মুক্ত নহে। বিশেষতঃ, উদ্দেশ্যের দিক হইতে বিচার করিলে উভয় শাস্ত্রের মধ্যে পার্থক্য অল্প; কারণ, উভয় শাস্ত্রই মানুষকে আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়িয়া তুলিতে চায়। রাষ্ট্রের আদর্শ অনেক ক্ষেত্রেই নীতিশাস্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তি এবং জনসমষ্টির কল্যাণ করিতে হইলে রাষ্ট্রকে একেবারে নীতিশাস্ত্রের সংস্রব হইতে বিবর্জিত হইলে চলে না।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ধনবিজ্ঞানের সম্পর্ক (Relation between Political Science and Economics).

প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ্‌গণের যুগ পর্যন্ত একটি ধারণা ছিল যে ধনবিজ্ঞান রাষ্ট্রবিজ্ঞানেরই একটি শাখা,—অর্থাৎ, ধনবিজ্ঞানকে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলিয়া অভিহিত করা হইত। পূর্বে এই ধারণা ছিল যে ধনবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু হইতেছে রাষ্ট্রের কার্য পরিচালনা করিবার জন্য প্রভূত পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করা। ধনবিজ্ঞানের এই প্রকার সংকীর্ণ সংজ্ঞা দেওয়ার কারণ ছিল আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃংখলা এবং দেশের নিরাপত্তা বজায় রাখিবার জন্য রাষ্ট্রকে আর্থিক দিক হইতে শক্তিশালী করা।

বর্তমানকালে ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞা এবং পরিধি অনেক ব্যাপক হইতেছে। সামাজিক জীবনে মানুষের প্রতিনিয়ত অনেক অভাব এবং চাহিদা থাকে। সেই অভাব দূরীকরণের জন্য উপায় খুবই সীমাবদ্ধ। সীমাবদ্ধ উপায়ের সাহায্যে সীমাহীন অভাব দূর করিবার প্রচেষ্টাকে বর্তমানের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা বলা হয় এবং এই প্রকার কাজকে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ (economic activity) বলা হয়। এই ক্রিয়াকলাপের সাফল্য নির্ভর করে সুষ্ঠুভাবে ধনের উৎপাদন, ভোগ, বিনিময় এবং বণ্টনের উপর। সুতরাং ধনের উৎপাদন, ভোগ, বিনিময় এবং বণ্টন সম্পর্কিত মানুষের বিভিন্ন কাজ অনুশীলন করাই ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। অর্থনৈতিক জীবনে সাম্প্রতিক জটিলতার বৃদ্ধির দরুন ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর পৃথকীকরণ অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। সেইজন্য ধনবিজ্ঞানকে বর্তমানে আমরা একটি পৃথক শাস্ত্ররূপে মনে করি।

কিন্তু, একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে ধনবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। উভয় শাস্ত্রেরই উদ্দেশ্য মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ করা। দেশের দারিদ্র্য এবং বেকার সমস্যার সমাধান, কৃষি, শিল্প এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতিসাধন করিয়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মান বাড়াইয়া দেওয়া আধুনিককালের অর্থনৈতিক নীতির (economic policy) অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দেশের শান্তি ও শৃংখলা এবং সামাজিক উন্নতি অনেক পরিমাণে একটি সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক নীতির উপর নির্ভর করে। বিশেষতঃ, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক অনুসৃত অর্থনৈতিক নীতির প্রভাব খুবই বেশী। বর্তমান বিশ্বে দুইটি প্রধান রাষ্ট্রনীতি,—ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র,—শুধু দুইটি বিশেষ অর্থনৈতিক মতবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আবার কোনদেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান সেই দেশের সরকারের কার্যক্রমের উপর নির্ভর করে। বর্তমান যুগে "কল্যাণ-রাষ্ট্র" (Welfare State) বলিতে আমরা বুঝি, রাষ্ট্র কর্তৃক জনসাধারণের সর্বাধিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণের জন্য অক্লান্ত চেষ্টার সংকল্প গ্রহণ,—'কল্যাণ রাষ্ট্র' অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করিবার নিমিত্ত বহু জনহিতকর কাজ স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া থাকে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ধনবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ

রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ধনবিজ্ঞানের মধ্যে এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রধান কারণ,—জনসাধারণের ইচ্ছার উপরেই রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব নির্ভর করে এবং জন-চিত্ত জয় করিবার জন্য রাষ্ট্রের প্রধান উপায় হইতেছে জনসাধারণের জন্য সর্বাধিক অর্থনৈতিক কল্যাণের ব্যবস্থা করা। রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ না থাকিলে অর্থনৈতিক

উন্নয়ন কখনই সম্পূর্ণ হইতে পারে না। বর্তমানে আমরা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা দেখিতে পাই,—ইহার অর্থ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে পরিকল্পিত উপায়ে অর্থনৈতিক উন্নতি অর্জন করা। সুতরাং রাষ্ট্র এবং মানুষের সম্পর্কের দিক হইতে চিন্তা করিয়াও বলা যাইতে পারে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ধনবিজ্ঞানের আলোচনার সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ সম্ভবপরও নয় এবং বাঞ্ছনীয়ও নয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক (Relation between Political Science and Sociology)

সমাজবিজ্ঞান মানবীয় বিজ্ঞানগুলির মধ্যে একটি মৌলিক বিজ্ঞান। মানুষের সামাজিক জীবনের বিশ্লেষণ করা,—শুধু তাহাই নহে, পরিবার, গোষ্ঠী, জাতি, রাষ্ট্র প্রভৃতি সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং মানবজাতির জীবন-যাত্রার বিশ্লেষণ করা সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের একটি শাখা। ইহার পরিধি সমাজ-বিজ্ঞানের তুলনায় বিশেষ ব্যাপক নহে। কারণ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সামাজিক মানুষের শুধু একটা দিক আলোচনা করে। নাগরিক জীবনের কর্তব্য ও অধিকার, মানুষের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এবং রাষ্ট্রের সংগে নাগরিকের সম্পর্ক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচিত হয়। কিন্তু সমাজ-বিজ্ঞানের পরিধি আরও ব্যাপক। রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইবার পূর্বেই সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে এবং সমাজবিজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন উপাদান আমরা পাই সমাজবিজ্ঞান হইতে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে নির্ভুল সিদ্ধান্ত করিতে হইলে সমাজবিজ্ঞানী হইতে হইবে। রাজনৈতিক চেতনার পূর্বেই মানুষের সামাজিক চেতনার সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞান হইতে বিশেষ স্বতন্ত্র নয়;—ইহা সমাজবিজ্ঞানেরই একটি বিশেষ শাখা। ধনবিজ্ঞানও সমাজবিজ্ঞানের অপর একটি শাখা।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Methodology of Political Science)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একাধিক বিশ্লেষণ-পদ্ধতি আছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে অনেকেই একটি গবেষণামূলক বিজ্ঞান ("an experimental science") বলিয়া অভিহিত করেন। তাঁহাদের মতে বিভিন্ন ধরণের সরকার অথবা রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলির সৃষ্টি হয়। এই বিশ্লেষণ-পদ্ধতির কিছুটা সারবত্তা আছে সন্দেহ নাই; তবুও ইহা ভুলিলে চলিবে না শুধু গবেষণার উপর ভিত্তি করিয়াই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি আলোচিত অথবা গৃহীত হয় নাই। অনেক সময় আমরা নিজেদের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া অথবা বিভিন্ন শাসনব্যবস্থার

ক্রিয়াকলাপ পর্যালোচনা করিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বের আলোচনা অথবা বিশ্লেষণ করি। এই দৃষ্টিভংগী হইতে বিচার করিলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে একটি পর্যবেক্ষণমূলক বিজ্ঞান ("an observational science") বলিতে পারি। বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা অনুশীলন করিয়া আমরা একটি বিশেষ রাজনৈতিক তত্ত্ব অথবা আদর্শ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারি। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশের শাসনব্যবস্থা পর্যালোচনা করিয়া আমরা গণতন্ত্রের সুবিধা অথবা অসুবিধাগুলি সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারি। উপসংহারে আমরা বলিতে পারি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান কোন কোন ক্ষেত্রে গবেষণামূলক বিজ্ঞান এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণমূলক বিজ্ঞান। কারণ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আমরা একদিকে দেখিতে পাই বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং অপর দিকে দেখিতে পাই বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রাজনৈতিকব্যবস্থার সমীক্ষা হইতে শিক্ষাগ্রহণ। উপরোক্ত দুইটি পদ্ধতি ছাড়া, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আরও কয়েকটি বিশ্লেষণ-পদ্ধতি গৃহীত হয়। সেইগুলি হইতেছে, ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical Method), তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative Method), আইনমূলক পদ্ধতি (Juridical Method), জীববিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি (Biological Method), যেখানে রাষ্ট্রকে একটি জীবদেহের সহিত তুলনা করা হয়, সমাজবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি (Sociological Method), মনোবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি (Psychological Method) এবং দর্শনমূলক পদ্ধতি (Philosophical Method)। সঠিক বিশ্লেষণ-পদ্ধতি নিরূপণ করিতে হইলে কয়েকটি পদ্ধতির সমন্বয় করা উচিত।

Exercises

1. Discuss the scope of Political Science. Is Political Science, really speaking, a science ? (১-৪ পৃষ্ঠা)

2. "History without Political Science has no fruit while Political Science without History has no root"—Discuss the statement. (৪-৫ পৃষ্ঠা)

3. Discuss the relation between (a) Political Science and Ethics, (b) Political Science and Sociology, and (c) Political Science and Economics. (৫-৮ পৃষ্ঠা)

4. Examine the methodology of Political Science, (৮-৯ পৃষ্ঠা)

5, Is Political Science an "experimental science"? (৮-৯ পৃষ্ঠা)

প্রথম অধ্যায়

রাষ্ট্র, সমাজ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান (The State, the Society and other Associations)

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা (Definition of the State)

'রাষ্ট্র' কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন ইটালীর দার্শনিক মেকিয়াভেলি। গ্রীক্ এবং রোমানগণ রাষ্ট্র বুঝাইতে যথাক্রমে "পোলিস্" এবং "সিভিটাস্" এই দুইটি শব্দ ব্যবহার করিতেন। 'রাষ্ট্র' কথাটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যুগে যুগে বিভিন্ন দার্শনিক 'রাষ্ট্র' কথাটির বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়াছেন। গ্রীক্ দার্শনিক এরিস্টটলের মতে, যখন স্বাবলম্বী ও পূর্ণাংগ জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে অনেক পরিবার ও গ্রাম একত্রিত হইয়া একটি শাসন-ব্যবস্থার আওতায় আসে, তখন ইহাকে রাষ্ট্র বলা হয়। স্বাবলম্বী ও পূর্ণাংগ জীবনের জন্য এরিস্টটল মানবজীবনের নৈতিক চরিত্র সংগঠনের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন।

বিভিন্ন দার্শনিক রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়াছেন; নিম্নে কয়েকটি সংজ্ঞা দেওয়া হইল। হল্যাণ্ডের (Holland) মতে, রাষ্ট্র হইতেছে এমন একটি জনসমষ্টি যাহারা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড অধিকার করিয়া নিজেদের মধ্যে সংখ্যাধিক্যের ইচ্ছাকে বিরোধী দলের ইচ্ছার উপরে স্থান দিতে পারিবে। অধ্যাপক ফিলিমোরের (Phillimore) মতে, রাষ্ট্র হইতেছে একটি জাতি যাহার স্থায়ী ভূখণ্ড থাকিবে, যেখানে লোকেরা সাধারণ আইন, আচার-ব্যবহার এবং রীতি-নীতির সাহায্যে ঐক্যবদ্ধ হইয়া একটি সুসংগঠিত সরকারের সাহায্যে নিজেদের সার্বভৌম ক্ষমতা, নিজের আয়ত্তাধীন অপর লোকের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এবং পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সহিত যুদ্ধ এবং শান্তি চুক্তি করিবার ক্ষমতা ভোগ করিবে। ব্লুন্টশ্লির (Bluntschli) মতে, যখন একদল লোক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে একটি স্থায়ী ভূখণ্ডে ঐক্যবদ্ধ হয়, তখনই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। অধ্যাপক বার্জেসের মতে, রাষ্ট্র হইতেছে সুসংগঠিত এবং ঐক্যবদ্ধ জনসমষ্টির একটি অংশ ("The state is a particular portion of mankind viewed as an organized unity"—Burgess)। উইলসনের (Woodrow Wilson) মতে, রাষ্ট্র

হইতেছে একটি জাতি যাহা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে আইনের জন্য সুসংগঠিত হইয়াছে ("The state is a people organised for law within a definite territory."—Wilson)।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলি আলোচনা করিলে আমরা রাষ্ট্রের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই। কিন্তু, উপরের সংজ্ঞাগুলির কোনটিই ত্রুটিবিহীন নহে। অনেকের মতে ডক্টর গার্ণার (Dr. Garner) কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। তাঁহার মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং শাসনতান্ত্রিক আইনের দিক হইতে বিচার করিলে রাষ্ট্র অল্পসংখ্যক অথবা বহুসংখ্যক জনসমষ্টি যাহারা স্থায়ীভাবে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বাস করে এবং যাহারা সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন অর্থাৎ বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত এবং যাহাদের একটি সুনিয়ন্ত্রিত সরকার আছে, যে সরকারের নির্দেশ ঐ নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিবাসী প্রতিনিয়ত পালন করিতে অভ্যস্ত ("The state as a concept of Political Science and Constitutional Law, is a community of persons more or less numerous, permanently occupying a definite portion of territory, independent or nearly so, of external control and possessing an organised government to which the great body of inhabitants render habitual obedience"—Garner)।

রাষ্ট্রের উপাদান (Elements of State)

অধ্যাপক গার্ণারের সংজ্ঞা হইতে আমরা রাষ্ট্রের নিম্নোক্ত উপাদানগুলি আলোচনা করিতে পারি। রাষ্ট্রের প্রধানতঃ চারিটি উপাদান; যথা, জনসমাজ, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, শাসনপ্রতিষ্ঠান অথবা সরকার এবং সার্বভৌম ক্ষমতা। বাস্তবতার দিক হইতে রাষ্ট্রের ভিত্তি হইতেছে জনসমষ্টি ও নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, আধ্যাত্মিকতার দিক হইতে রাষ্ট্রের ভিত্তি হইতেছে শাসন প্রতিষ্ঠান ও সার্বভৌমিকতা।

(ক) **জন-সমাজ** (Population)—জনসমষ্টি না হইলে রাষ্ট্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় না। রাষ্ট্রে অনেক প্রকার লোক থাকিতে পারে, যেমন, পূর্ণ নাগরিক, অসম্পূর্ণ নাগরিক (অর্থাৎ, যাহাদের ভোটাধিকার জন্মে নাই) বিদেশী ও প্রজা। জনসমাজ রাষ্ট্রের একটি অত্যাবশ্যক উপাদান, কিন্তু, একটি রাষ্ট্রে জনসংখ্যা কত হওয়া উচিত, তাহার কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই। এরিস্টটলের মতে, একটি শহর-রাষ্ট্রে (city-state) যতজন লোক থাকা উচিত, ততটাই রাষ্ট্রের জনসমষ্টি হওয়া উচিত। কিন্তু, বর্তমানে জনসমষ্টির

কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা নাই। আমরা চীন, রাশিয়া এবং ভারতের ন্যায় জনবহুল রাষ্ট্র এবং বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড, সিরিয়া প্রভৃতি অল্পসংখ্যক জনসমষ্টি লইয়া রাষ্ট্রও দেখিতে পাই। তবে কোন রাষ্ট্রের জনসংখ্যা এমন হওয়া উচিত যাহাতে উক্ত জনসমষ্টি লইয়া রাষ্ট্রের বিবিধ ক্রিয়া-কলাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত করা যাইতে পারে।

(খ) **নির্দিষ্ট ভূখণ্ড** (Definite Territory)

রাষ্ট্রের একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমা থাকে। প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ এই ভৌগোলিক সীমার মধ্যেই পরিচালিত হয়। নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ব্যতীত রাষ্ট্র গঠন করা যায় না। ভ্রামামাণ যাযাবর জাতি রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে না। যখন একদল লোক একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে থাকিতে আরম্ভ করে, তখনই রাষ্ট্রের সূত্রপাত হয়। এই ভৌগোলিক সীমা কতবড় হইবে তাহা স্থিরীকৃত করা যায় না। রাষ্ট্রের আয়তন বড় অথবা ছোট উভয়ই হইতে পারে। আধুনিককালে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির সংগে সংগে রাষ্ট্রের আয়তনের সীমারেখা স্থির করিবার প্রয়োজনীয়তা কমিয়া গিয়াছে।

তবে সমুদ্রোপকূল হইতে সমুদ্রের অভ্যন্তরে সাত মাইল পর্যন্ত এবং উর্দ্ধেও কিছুটা দূরত্ব পর্যন্ত একটি রাজ্যের এলাকা বলিয়া স্বীকৃত হয়। বৈদেশিক রাষ্ট্র দূতাবাসও সংশ্লিষ্ট বিদেশী রাষ্ট্রের এলাকা বলিয়া বিবেচিত হয়। এমনকি, সমুদ্রে যদি কোন রাষ্ট্রের জাহাজ চলিতে থাকে, তবে সেই জাহাজটি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের এলাকা বলিয়া বিবেচিত হইবে, ইহাই রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের বিশেষ অর্থ।

(৩) **সরকার** (Government)

শুধু জনসমাজ থাকিলে এবং সেই জনসমাজ একটি নির্দিষ্ট ভূভাগে বাস করিলেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় না। রাষ্ট্রের একটি সুসংগঠিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত সরকার থাকা চাই,—এই সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। জনসমষ্টিরই কল্যাণের জন্য তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন; তাহা ছাড়া, দেশে যাহাতে শান্তি ও শৃংখলা অব্যাহত থাকে, সেইদিকেও রাষ্ট্রের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। জনসমাজের কল্যাণের জন্য দেশে শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখিবার দায়িত্ব হইতেছে সরকারের। সরকারের আবার তিনটি বিভাগ আছে, আইনসভা, (legislature) শাসন-বিভাগ (executive) এবং বিচার-বিভাগ (judiciary)। সরকার বলিতে রাষ্ট্র বুঝায় না, কিন্তু সরকার না থাকিলে রাষ্ট্রের সৃষ্টি এবং গঠন হইতে পারে না।

(৪) **সার্বভৌমিকতা** (Sovereignty)

রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান উপাদান সার্বভৌমিকতা ; সার্বভৌমিকতা না থাকিলে রাষ্ট্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় না। জনসমাজ, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড এবং সুনিয়ন্ত্রিত সরকার থাকিলেও সার্বভৌম ক্ষমতাবিহীন রাষ্ট্র প্রকৃত রাষ্ট্র হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে না। এই সার্বভৌম ক্ষমতার বলে রাষ্ট্র দেশের জনসমষ্টির নিকট হইতে একক এবং পূর্ণ আনুগত্য লাভ করে। রাষ্ট্রের মধ্যে কোন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানই রাষ্ট্রের অবাধ ক্ষমতা পরিচালিত করিতে পারে না। যিনি সার্বভৌম বলিয়া বিবেচিত হন অথবা যে প্রতিষ্ঠান সার্বভৌম বলিয়া বিবেচিত হয়, সেই ব্যক্তি এবং সেই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অবাধ ক্ষমতা পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রের ভিতরে কোন শক্তিই রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপকে অমান্য করিতে পারে না ; ইহাকে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতা (internal sovereignty) বলা হয়। আবার, বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি সার্বভৌমিকতার বাহ্যিক প্রকাশ (external sovereignty)। অধ্যাপক গার্ণারের মতে, বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত না হইলেও প্রায়-মুক্ত হইলেই (independent, or nearly so, of external control) কোন দেশ রাষ্ট্র-পদবাচ্য হইবে।

রাষ্ট্রের আরও কতিপয় বৈশিষ্ট্য আছে ; সেইগুলি হইতেছে ইহার স্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতা (permanence and continuity) এবং আন্তর্জাতিক আইনের বলে রাষ্ট্রের সমানাধিকার (equality of states)।

আমাদের দেশের হায়দ্রাবাদকে আমরা রাষ্ট্র বলিতে পারি না। কারণ, ইহার নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, জনসমাজ এবং আঞ্চলিক সরকার থাকিলেও সার্বভৌমিকতা নাই। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী না হইলে কোন সরকার অথবা সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন জনসমাজসহ কোন নির্দিষ্ট ভূভাগ রাষ্ট্রপদবাচ্য হইতে পারে না। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের একটি অংশ-রাজ্য (Component State) হিসাবে ইহাকে ভদ্রতা-সূচকভাবে রাজ্য (state) বলিয়া অভিহিত করা হয়। দেশ স্বাধীন হইবার পূর্বে যখন হায়দ্রাবাদ একটি দেশীয় রাজ্য ছিল, তখনও ইহাকে রাষ্ট্র বলা যাইত না। কারণ, তখনও ইহার সার্বভৌম ক্ষমতা ছিল না।

নিউইয়র্ক আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একটি অংশ-রাজ্য (Component State) এবং ইহাকেও আমরা রাষ্ট্র বলিতে পারি না। কারণ, ইহার সার্বভৌম ক্ষমতা নাই, যদিও সেখানে আমরা নির্দিষ্ট ভূভাগ, জনসমাজ এবং আঞ্চলিক সরকার দেখিতে পাই। যুক্তরাষ্ট্রের অংশ-রাজ্যগুলিকে কখনই রাষ্ট্র বলা যায় না।

বর্তমানকালে, বিশেষতঃ প্রথম মহাযুদ্ধের পর জাতিপুঞ্জ (League of Nations) গঠন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জাতিসংঘ (United Nations) গঠন বিভিন্ন রাষ্ট্রের বাহ্যিক সার্বভৌম ক্ষমতা কিছুটা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। জাতিপুঞ্জ অথবা জাতিসংঘ একটি রাষ্ট্র নহে। কারণ, জাতিপুঞ্জের সদস্যদের মধ্যে প্রত্যেকেরই যে কোন সময়ে জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ ছাড়িয়া দেওয়ার অধিকার থাকায় ইহার প্রকৃত সার্বভৌমিকতা নাই। তাহা ছাড়া, জাতিসংঘের জন্য নির্দিষ্ট জনসমাজ এবং স্থায়ী ভূভাগ নাই। প্রত্যেক দেশের নির্দিষ্ট ভূভাগ আছে এবং সেই দেশের আঞ্চলিক সরকার অথবা সেই দেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে জাতিপুঞ্জ অথবা জাতিসংঘের আইনগত কোন ক্ষমতা নাই। সর্বোপরি বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিকগণ যে কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ আনুগত্য জানাইবেন, তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই।

রাষ্ট্রের বাস্তব ও অবাস্তব রূপ (Idea vs Concept of the State)

রাষ্ট্রের দুইটি দিক্ আছে। একটি দিক হইতে চিন্তা করিলে রাষ্ট্রকে একটি বাস্তব ধারণা (State as an idea) বলিয়া মনে হয়, অর্থাৎ, রাষ্ট্রের একটি বাস্তব রূপ আছে। অপর দিকে, রাষ্ট্রকে আমরা অনেক সময় একটি অবাস্তব ধারণা (State as a concept) বলিয়া মনে করি। রাষ্ট্রের দুইটি বাস্তব উপাদান (নির্দিষ্ট ভূখণ্ড এবং একটি জনসমাজ) ছাড়াও আমরা রাষ্ট্রের একটি অবাস্তব রূপ কল্পনা করিতে পারি। কিন্তু রাষ্ট্র বাস্তব রূপ ধারণ করে জনসমাজ এবং নির্দিষ্ট ভূখণ্ড থাকিলে।

অনেকে আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা করেন বিশ্বরাষ্ট্র-গঠনের মধ্যে। বর্তমানে কোন কোন চিন্তানায়ক এই অভিমত পোষণ করেন যে বিশ্ব-রাষ্ট্র গঠিত হইলে বিশ্ব-শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে এবং রাষ্ট্র সেখানে আদর্শ রূপ পরিগ্রহ করিবে। কিন্তু ইহা একটি অবাস্তব ধারণা মাত্র। প্রাচীন গ্রীক্ দার্শনিকগণের আমল হইতে টমাস মূর পর্যন্ত প্রত্যেকেই আদর্শ রাষ্ট্রের রূপ কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু আদর্শ রাষ্ট্র একটি অবাস্তব ধারণা হিসাবেই রহিয়া গিয়াছে।

গ্রীক্ দার্শনিক প্লেটো এবং এরিস্টটল্ শহর-রাষ্ট্রের (City-State) ভিত্তিতে আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু, ইহা বাস্তবে আদর্শ রাষ্ট্র হইতে পারে নাই,—কারণ ইহা সম্পূর্ণ জনসমাজের (ক্রীতদাস সমেত) সুখ-সুবিধার জন্য পরিকল্পিত হয় নাই। শহর-রাষ্ট্রের পরিকল্পনার পর বিভিন্ন যুগে আমরা বিশ্ব-রাষ্ট্র গঠনের প্রয়াস দেখিয়াছি। কিন্তু সেই প্রয়াসের ভিত্তি ছিল শক্তি। গত এক শতাব্দী যাবৎ, বিশেষতঃ, বিংশ শতাব্দীতে আন্তর্জাতিকতাবোধের

প্রেরণায় বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা চলিতেছে। কিন্তু, এখনও ইহা একটি অবাস্তব ধারণা। বর্তমানে জাতিসংঘের (United Nations) মাধ্যমে একটি আদর্শ আন্তর্জাতিক পরিবার (Family of Nations) গঠন করিবার পরিকল্পনা আমরা দেখিতে পাই। এই আন্তর্জাতিক পরিবারের মাধ্যমেই বিশ্বরাষ্ট্র সংগঠনের একটি প্রয়াস আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু, ইহাও রাষ্ট্র সম্বন্ধে একটি অবাস্তব ধারণা।

রাজা কর্তৃক শাসিত রাষ্ট্র অবাস্তব ধারণা নহে। যদিও ইংলণ্ডের রাণী নিছক শাসনতান্ত্রিক প্রধান, তবুও অনেক দেশেই আমরা এখনও বংশপরম্পরায় রাজ্য শাসন দেখিতে পাই,—যেমন, ইথিওপিয়া, সৌদী আরব, নেপাল, প্রভৃতি। ইংলণ্ডের শাসন-ব্যবস্থাও বংশানুক্রমিক শাসন-ব্যবস্থার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ব্যবস্থায় যে রাষ্ট্রের সৃষ্টি, তাহা একটি বাস্তব ঘটনা, অবাস্তব ধারণা নহে। তবে পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের প্রবর্তন হইলে রাজা নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা হিসাবে রাজ্যশাসন করেন, তাহাতে তাঁহার সার্বভৌমিকতা নষ্ট হয় না। যেমন, ইংলণ্ডে আইনগত সার্বভৌম হইতেছে রাজা-সমেত পার্লামেণ্ট (King-in-Parliament)।

রাষ্ট্র ও সরকার (State and Government)

রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে আমরা বিভিন্ন পার্থক্য দেখিতে পাই। সরকার হইতেছে রাষ্ট্রগঠনের একটি উপাদান মাত্র। সুতরাং, সরকার হইতেছে রাষ্ট্রের একটি অংশ মাত্র। (১) রাষ্ট্রের অন্তর্গত সমগ্র জনসমাজ রাষ্ট্রের সভ্য; কিন্তু, সরকার গঠিত হয় অল্পসংখ্যক লোক লইয়া। অর্থাৎ, আইনসভার সদস্য, শাসনবিভাগের মন্ত্রী ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারী এবং বিচারবিভাগের বিভিন্ন বিচারক ও অন্যান্য কর্মীদিগকে লইয়া সরকার গঠিত হয়।

(২) রাষ্ট্র একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু, সরকার কখনই স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে না। দেশে সাধারণ নির্বাচনের পর যে রাজনৈতিক দল সরকার গঠনের যোগ্যতা অর্জন করে, সেই রাজনৈতিক দল কর্তৃক সরকার গঠিত হয়। আবার পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রে যদি কখনও আইনসভা সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করে তবে সরকারের পরিবর্তন হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সরকার রাষ্ট্রের মত স্থায়ী প্রতিষ্ঠান নয়।

(৩) রাষ্ট্র বলিতে প্রথমেই আমরা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড সম্বন্ধে বাস্তব ধারণা করি। কিন্তু সরকার বলিতে শুধু আইনসভা, শাসনবিভাগ এবং বিচারবিভাগের কর্মীদের একটি সমষ্টি বুঝায়।

(৪) রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু, সরকার রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা পরিচালনা করে। সরকারের নিজস্ব সার্বভৌমিকতা নাই। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ হইতে দেখিতে পাই সেদেশে শাসনতন্ত্রই সার্বভৌম এবং সরকার শাসনতন্ত্র হইতে ক্ষমতা লাভ করে।

(৫) সব রাষ্ট্রেরই আমরা প্রধানতঃ চারিটি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই; যথা,—জনসমাজ, নির্দিষ্ট ভূভাগ, সরকার এবং সার্বভৌমিকতা। কিন্তু, বিভিন্ন দেশে সরকারের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য; কোন দেশে হয়ত সরকার প্রজাতন্ত্রী, আবার কোন দেশে হয়ত দায়িত্বশীল সরকার। আবার, সরকার গণতান্ত্রিক অথবা একনায়কতান্ত্রিক, এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় অথবা এককেন্দ্রিক হইতে পারে।

(৬) নাগরিকগণের বিভিন্ন অধিকারের উৎস হইতেছে রাষ্ট্র,—সরকার নহে। সরকারের দায়িত্ব হইল সেই অধিকার রক্ষা করা। নাগরিকগণের সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকিতে পারে,—কিন্তু, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাহাদের কোন অভিযোগ থাকিতে পারে না।

(৭) রাষ্ট্র রূপহীন একটি ধারণা মাত্র। সরকার হইতেছে রাষ্ট্রের বহিঃপ্রকাশ। সরকার রাষ্ট্রকে বিশেষভাবে প্রকাশ করে।

রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘ (State and other Associations)

রাষ্ট্রের কতিপয় বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলি আমরা অন্যান্য সংঘে দেখিতে পাই না।

প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ড চাই। অন্যান্য সংঘের নির্দিষ্ট ভূভাগের দরকার নাই।

দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র একটা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান অথবা সংঘের কোন স্থায়িত্ব নাই। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান প্রচলিত মতবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সেই মতবাদের পরিবর্তন হইলেই সংঘ অথবা প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন হয়।

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রের অনেক উদ্দেশ্য থাকে। মানুষের বহির্জীবনের বিভিন্ন দিক রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাহাকে বিভিন্ন দিকে উন্নত হইতে সাহায্য করে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান অথবা সংঘগুলি দুই একটি উদ্দেশ্য অথবা কতিপয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাজ করে এবং তাহাতে মানুষের বহির্জীবনের সামগ্রিক উন্নতি হয় না।

চতুর্থতঃ রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য, ইহা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান অথবা সংঘের সার্বভৌম ক্ষমতা নাই। একটি রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়।

পঞ্চমতঃ, মানুষ একই সময়ে বিভিন্ন সংঘের সভ্য হইতে পারে অথবা কোন সংঘেরই সভ্য না হইতে পারে। কিন্তু, তাহাকে কোন না কোন রাষ্ট্রের সভ্য হইতেই হইবে এবং সে একই সময়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সভ্য হইতে পারে না।

রাষ্ট্র ও সমাজ (State and Society)

রাষ্ট্র এবং সরকারের মধ্যে আমরা যে সম্পর্ক দেখিতে পাই, রাষ্ট্র এবং সমাজের সম্পর্কের মধ্যেও তাহার একটি সাদৃশ্য আছে। রাষ্ট্র সমাজের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠানমাত্র। সমাজের পরিধি রাষ্ট্রের পরিধি অপেক্ষা অনেক ব্যাপক। রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইবার বহু পূর্বেই সমাজের সৃষ্টি হইয়াছে। রাষ্ট্রের একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড এবং সুনিয়ন্ত্রিত সরকার থাকা চাই। কিন্তু, সমাজ গঠনের জন্য নির্দিষ্ট ভূখণ্ড এবং সুনিয়ন্ত্রিত সরকার আবশ্যক নহে। আবার রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার সার্বভৌমিকতা। সমাজের সার্বভৌম ক্ষমতার কোন প্রয়োজন নাই। সর্বশেষে, যেহেতু রাষ্ট্র সমাজের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র, সেইজন্য সমাজের উদ্দেশ্য রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য অপেক্ষাও ব্যাপক। রাষ্ট্র মানুষের বহির্জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু, সমাজের উদ্দেশ্য মানুষের সর্বাংগীণ উন্নতিসাধন করা।

সমাজের মধ্যে আমরা যেসকল প্রতিষ্ঠান দেখি, সেইগুলির মধ্যে রাষ্ট্রই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান। ক্ষমতা এবং উদ্দেশ্যের দিক হইতেও ইহা অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

স্থান-নির্বিচারে ব্যক্তির উপর এবং ব্যক্তি-নির্বিচারে ভু-খণ্ডের উপর সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ—

রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার সার্বভৌম ক্ষমতা কিন্তু, প্রশ্ন হইতেছে, রাষ্ট্রের এই সার্বভৌম ক্ষমতা স্থান-নির্বিচারে ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য অথবা ব্যক্তি-নির্বিচারে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের উপর প্রযোজ্য। যদি স্থান-নির্বিচারে ব্যক্তির উপর রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়, তবে রাষ্ট্র দেশে এবং বিদেশে সমানভাবেই ইহার নাগরিকদের বহির্জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। অপরদিকে যদি রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা শুধু নির্দিষ্ট ভূভাগকে কেন্দ্র করিয়া থাকে, তবে রাষ্ট্র দেশের ভিতর নাগরিক এবং বৈদেশিকগণের উপর সমানভাবে ইহার কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে পারে এবং ইহাদের বহির্জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে যাহারা বসবাস করিবে তাহারা সকলেই এই নিয়ম অনুযায়ী রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া লইতে

বাধ্য। আধুনিককালে এই নিয়ম অনুযায়ী রাষ্ট্রের সর্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ করা হয়। অবশ্য, এই নিয়মের কয়েকটি ব্যতিক্রম আছে। কোন দেশের রাষ্ট্রদূত অথবা যুদ্ধজাহাজ যখন সাময়িকভাবে অন্য একটি রাষ্ট্রে অবস্থান করে, তখন তাহাদের উপর সেই রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে না—আন্তর্জাতিক আইনের দিক হইতে বিচার করিলে এই নিয়ম রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে বাহ্যিকভাবে কিছু পরিমাণে ক্ষুন্ন করে।

বর্তমানকালে সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যক্তিবাচক সংজ্ঞা কার্যকরী হইতে আমরা বিশেষ দেখিতে পাইনা। বিগত শতাব্দীতে কতিপয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি (যেমন, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ) অন্য দেশে তাহাদের অবাধ ক্ষমতা প্রয়োগ করিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ইংলণ্ডের আইন ইংলণ্ডের বাহিরে চীনদেশে কার্যকরী হইত। বর্তমানে সভ্যতার অগ্রগতির সংগে সংগে এবং মানুষের রাজনৈতিক চেতনা ও রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে ধারণার পরিবর্তনের সংগে সংগে রাষ্ট্রের স্থানগত অধিকার-বহির্ভূত সার্বভৌম ক্ষমতার (Extra-territorial jurisdiction) অবসান হইয়াছে। তবে একটি ক্ষেত্রে সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যক্তিবাচক প্রয়োগ এখনও কিছু পরিমাণে আমরা দেখিতে পাই। তাহা হইতেছে বিদেশের নাগরিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে। Jus Sanguinis আইনের প্রয়োগে কোন রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রে জাত তাহার নাগরিকের সন্তানকে পিতৃত্বের ভিত্তিতে নিজ নাগরিক বলিয়া দাবী করিতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার

১। রাষ্ট্রের চারিটি প্রধান বৈশিষ্ট্য; যথা, জন-সমাজ, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সরকার, সার্বভৌমিকতা। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রের আরও কতিপয় বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন, স্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতা এবং আন্তর্জাতিক আইনের বলে সমানাধিকার। রাষ্ট্র ও সরকার এবং রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘের মধ্যে পার্থক্য আছে।

২। রাষ্ট্রের দুইটি দিক্ আছে; ইহাকে একটি বাস্তব ধারণা এবং একটি অবাস্তব ধারণা, উভয় দৃষ্টিভংগী হইতেই চিন্তা করা যাইতে পারে। আবার রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যক্তিবাচক সংজ্ঞা হইবে কিনা অথবা স্থানবাচক সংজ্ঞা হইবে কিনা, সেই বিষয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। বর্তমানকালে সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যক্তিবাচক সংজ্ঞা কার্যকরী হইতে আমরা বিশেষ দেখিতে পাইনা। আবার রাজনৈতিক চেতনার পরিবর্তনের সংগে

সংগে রাষ্ট্রের স্থানগত অধিকার-বহির্ভূত সার্বভৌম ক্ষমতার অবসান

Exercises

1. Define the State. Distinguish between,

(a) the State and Government, and

(b) the State and other Associations.

Is the U. N. O. a State ? (১০-১৩ পৃষ্ঠা ; ১৫-১৬ পৃষ্ঠা)

2. What do you mean by the idea and the concept of the State ? (১৪-১৫ পৃষ্ঠা)

3. What do you mean by 'territory' in Political Science ? What do you mean by exclusive and *extra-territorial jurisdictions* of a State ? (১২ পৃষ্ঠা, ১৭-১৮ পৃষ্ঠা)

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ
(Theories of the origin and the nature of the State)

রাষ্ট্র স্থষ্টির ঐশ্বরিক মতবাদ (Theory of Divine Origin of the State) :—রাষ্ট্র ভগবান কর্তৃক স্থষ্ট—এই মতবাদটি রাষ্ট্রের উৎপত্তির সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মতবাদ বলিয়া অনেকে মনে করেন। প্রাচীনকালে ভারত, চীন এবং মিশরে এই মতবাদ প্রচলিত ছিল। খৃষ্টধর্ম প্রচারের পর হইতে অনেক গোঁড়া খৃষ্টান পোপকেই ঈশ্বরপ্রেরিত প্রতিনিধি হিসাবে মনে করিতে থাকায় এই মতবাদের বহুল প্রচার হয়। মধ্যযুগে ইংলণ্ডে স্টুয়ার্ট রাজাদের সংগে পার্লামেণ্টের যে বিবাদ হয় তাহার কারণ ছিল এই মতবাদ। স্টুয়ার্ট রাজারা মনে করিতেন যে তাঁহারা ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুযায়ী তাঁহারা রাজত্ব করিতেছেন বলিয়া তাঁহারা কোন পার্থিব শক্তির নিকট নিজেদের কাজের জন্য দায়ী নহেন এবং প্রজাদেরও বিনা দ্বিধায় ঈশ্বরের প্রতিনিধি রাজার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করা উচিত।

রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি, সুতরাং তিনি সর্বেসর্বা

রাষ্ট্রের ঐশ্বরিক স্থষ্টির সম্পর্কিত মতবাদটি নিম্নলিখিত চারিটি সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত :—(১) একমাত্র রাজতন্ত্রই হইল ঈশ্বর কর্তৃক অনুমোদিত শাসনপদ্ধতি। কারণ, রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবেই রাজকার্য করেন। (২) রাজার অবর্তমানে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া বিবেচিত হইবেন এবং যথারীতি রাজ্যশাসন করিবেন। (৩) রাজা তাঁহার কাজের জন্য জনসাধারণ অথবা তাহাদের প্রতিনিধির নিকট দায়ী নহেন। তিনি তাঁহার কাজের জন্য শুধু ঈশ্বরের নিকট দায়ী। (৪) প্রজাদের উচিত বিনা বিচারে এবং বিনা দ্বিধায় রাজার আদেশ পালন করা এবং রাজার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা।

এই মতবাদটির প্রভাব রাজতন্ত্রের উপর খুব বেশী দেখা যায়। এমনকি ১৮১৫ সালেও প্রুশিয়া, অস্ট্রিয়া এবং রাশিয়া এই তিনটি দেশের শাসকগণ মিলিতভাবে ঘোষণা করেন যে তাঁহারা তাঁহাদের প্রজাগণের মংগল সাধনের নিমিত্ত ঈশ্বরের সহিত একটি পবিত্র চুক্তিতে আবদ্ধ, অর্থাৎ, তাঁহারা ঈশ্বরের

নির্দেশেই নিজেদের রাজ্য শাসন করিতেছেন। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত তিব্বতেও এই মতবাদটি আমরা দেখিতে পাইয়াছি। বর্তমানে এই মতবাদের প্রভাব অনেক কমিয়া গিয়াছে।

সমালোচনা

এই মতবাদ অনেক কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াছে। প্রথমতঃ রাষ্ট্র একটি মানবীয় প্রতিষ্ঠান এবং মানুষের ইচ্ছাই হইল রাষ্ট্রের ভিত্তি। ভগবান নিশ্চয়ই রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে হস্তক্ষেপ করেন না।

দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদ বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র সমর্থন করে। কিন্তু বর্তমান কালে আমরা প্রকৃত ক্ষমতাশালী রাজতন্ত্র দেখিতে পাই না যদিও এখনও অনেক দেশে নামেমাত্র রাজতন্ত্র আছে। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র অথবা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রভৃতি যেখানে গৃহীত হইয়াছে সেখানে রাষ্ট্রের ঐশ্বরিক সৃষ্টির মতবাদ রাষ্ট্রের প্রকৃত সৃষ্টি সম্বন্ধে কিছুই বুঝাইতে পারে না। বিভিন্ন দেশের শাসনব্যবস্থায় আমরা নূতন নূতন রূপ দেখিতে পাই এবং সেইগুলির উৎপত্তিবিচার উপরের মতবাদে সম্ভবপর নয়।

এই মতবাদ মানুষের স্বাধীনতার পক্ষে বিপজ্জনক

তৃতীয়তঃ, মানুষের জন্মগত স্বাধীনতার পক্ষে এই মতবাদ বিশেষ বিপজ্জনক। ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে নিজেকে ঘোষণা করিয়া রাজা অনেক ক্ষেত্রেই স্বেচ্ছাচারী হইয়াছেন। বিশেষতঃ, যে রাজা মনে করেন যে তিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং প্রজাদের নিকট তাঁহার কোনই দায়িত্ব নাই এবং তিনিই প্রজাদের পূর্ণ আনুগত্য পাইবার একমাত্র অধিকারী, তিনি যে স্বেচ্ছাচারী হইবেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যদি প্রকৃতই রাজা নিজেকে আন্তরিকভাবে ঈশ্বরের প্রতিনিধি মনে করেন, তবে তাঁহার পবিত্র দায়িত্ব হইবে ঈশ্বরেরই সন্তান জনসাধারণের প্রকৃত মংগল সাধন করা এবং নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়া প্রজাদের স্বার্থকে বড় করিয়া দেখা। কিন্তু উক্ত মতবাদে বিশ্বাসী শাসকগণ কখনই এই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হন্ নাই। বরং, অসীম ক্ষমতার অধিকারী হইয়া তাঁহারা অত্যাচারী, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য এবং স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। রুশো তাঁহার "Contract Sociale" বইয়ে বলিয়াছেন, "জনসাধারণের কথাই ঈশ্বরেরই কথা" ("Voice of the people is the voice of God")। কিন্তু, এই মতবাদে জনসাধারণের কথা ঈশ্বরের কথা নহে, শাসকের কথাই ঈশ্বরের কথা—সভ্যযুগে এই মতবাদ একেবারে অচল।

তবে এই মতবাদটির একটি দিক আমাদিগকে চিন্তা করিতে হইবে। যখন মানুষের রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার মোটেই সৃষ্টি হয় নাই, তখন এই মতবাদটি রাষ্ট্র সম্বন্ধে অন্ততঃ একটি ধারণার সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহা ছাড়া, এই মতবাদের একটি অন্তর্নিহিত সত্য হইতেছে, রাষ্ট্র মানবীয় প্রতিষ্ঠান হইলেও ইহার একটি নৈতিক উদ্দেশ্য আছে। যে জনসমাজকে লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে, তাহার নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নয়নের ব্যাপারেও রাষ্ট্রের একটি দায়িত্ব আছে। আবার, শাসকগণ যদি মনে রাখেন যে যেহেতু তাঁহারা ঈশ্বরের প্রতিনিধি, সেইজন্যই ঈশ্বরের সন্তানগণের জীবনযাত্রা উন্নত করার ব্যাপারে তাঁহাদের একটি নৈতিক দায়িত্ব আছে, তবে শাসন ব্যবস্থা অনেক উন্নত হয়।

এই মতবাদের নৈতিক মূল্য

পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ (Patriarchal theory)

এই মত অনুযায়ী রাষ্ট্রকে এমন এক পরিবারের সম্প্রসারিত পরিণতি বলিয়া মনে করা হয় যেখানে পরিবারের সর্বজ্যেষ্ঠ পুরুষই (অথবা patriarch) সব কর্তৃত্বের অধিকারী। স্যার হেন্‌রী মেইন এই মতের সমর্থনে প্রাচীনকালের রোমক, হিন্দু এবং অন্যান্যদের সমাজ-ব্যবস্থার নজির দেখাইয়াছেন। এই মত অনুসারে কয়েকটি পরিবার লইয়া একটি গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। কয়েকটি গোষ্ঠী লইয়া একটি উপজাতির সৃষ্টি হয় এবং অবশেষে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। এই সব পরিবারের সর্বজ্যেষ্ঠ পুরুষই পরিবারের প্রত্যেকের উপর সর্বময় কর্তৃত্ব করিতেন। পরিবার হইতে যখন গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়, তখন গোষ্ঠীপতি হইতেন সেই গোষ্ঠীর সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ। অবশেষে যখন গোষ্ঠী হইতে উপজাতি এবং উপজাতি হইতে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়, তখন যিনি পিতৃশ্রেষ্ঠ তিনিই রাষ্ট্রনায়কের পদ গ্রহণ করিতেন। এরিষ্টটলও পরিবার হইতে যে রাষ্ট্র সৃষ্ট হইয়াছে এই মতবাদ প্রচার করেন।

এই মতবাদের সমালোচনা করিয়াছেন ম্যাকলীনান, মর্গান, প্রভৃতি পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ। তাঁহাদের মতে, প্রাচীন রোম এবং আরও কয়েকটি দেশে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার দেখা গেলেও একথা বলা যায় না যে, ইহাই রাষ্ট্র-গঠনের আদি এবং সর্বজনীন রূপ। অনেকক্ষেত্রেই প্রাচীনকালে পরিবার ছিল মাতৃতান্ত্রিক। তাহা ছাড়াও অনেক লেখক এই মত পোষণ করেন যে, অনেক জাতি আছে যাহারা পরিবার গঠন না করিয়া এমনিতেই দলবদ্ধ হইয়া প্রাচীনকালে বাস করিত। পরিবারের সম্প্রসারণহেতু যে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে ইহা অনেকক্ষেত্রেই সত্য নহে।

মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ (Matriarchal theory)

এই মতবাদ অনুযায়ী প্রাচীনকালের পরিবারগুলি ছিল মাতৃতান্ত্রিক,—অর্থাৎ, মাতার দিক দিয়াই পরিবারের পরিচয় প্রকাশ পাইত। তৎকালীন যুগে বহুবিবাহ প্রথার প্রচলন ছিল এবং মাতৃশ্রেষ্ঠাই (matriarch) পরিবারের প্রধান বলিয়া বিবেচিতা হইতেন। পরিবার হইতে ক্রমে সৃষ্টি হয় গোষ্ঠীর এবং তাহার পরিচয়ও হয় মাতার দিক হইতে। গোষ্ঠী হইতে উপজাতি এবং উপজাতি হইতে হয় রাষ্ট্রের সৃষ্টি। ম্যাকলীনান, জেংকস্ এবং এই মতবাদের অন্যান্য সমর্থকগণ মনে করেন যে, প্রাচীনকালে মাতাই ছিলেন সন্তান-সন্ততিদের অভিভাবিকা। বিবাহ-প্রথার বহু পূর্ব হইতেই মাতার সম্বন্ধ দিয়া সন্তানের পরিচয় নিরূপিত হইত।

কিন্তু রাষ্ট্রগঠনের এই রূপটিও যে সর্বজনীন নয়—তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহাছাড়া ইতিহাসে এমন কোন প্রমাণ নাই যে, রাষ্ট্রের সৃষ্টি পিতৃতান্ত্রিক অথবা মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের সম্প্রসারণের ফলে হইয়াছে। রাষ্ট্র গঠনের কারণ হইতেছে বহুবিধ। সুতরাং, রক্তের সম্পর্কহেতু অথবা স্বগোত্রীয় মানুষের বন্ধনহেতুই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে, একথা বলা ঠিক নহে। রাষ্ট্র হইতেছে একটি বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট, এই বিবর্তন-প্রক্রিয়ার অনেকক্ষেত্রে জ্ঞাতিত্ব মাত্র একটা কারণ হইয়াছে—কিন্তু ইহাই একমাত্র কারণ নহে।

বলপ্রয়োগ মতবাদ (Theory of Force)

বলপ্রয়োগ মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে অধিকতর শক্তিশালী লোক অথবা গোষ্ঠী কর্তৃক অপেক্ষাকৃত দুর্বল লোক অথবা গোষ্ঠীর উপর বলপ্রয়োগের দ্বারা। আমরা এই মতবাদের দুইটি তাৎপর্য দেখিতে পাই। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের সৃষ্টি সম্বন্ধে এই মতবাদ একটি নির্দিষ্ট যুক্তি দেয়,—তাহা হইতেছে বলই রাষ্ট্রের ভিত্তি এবং দ্বিতীয়তঃ, শুধু রাষ্ট্রের সৃষ্টিই নহে, রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব কোন্ জিনিষ ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত তাহার নির্দেশও এই মতবাদে দেখিতে পাওয়া যায়। এই মতবাদের গোড়ার কথা হইতেছে যে শক্তিশালী লোক অথবা শক্তিশালী গোষ্ঠী বা উপজাতি যথাক্রমে দুর্বল লোক অথবা দুর্বল গোষ্ঠী বা উপজাতিকে শারীরিক পরাক্রমে পরাজিত করিয়া রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রাচীন মানবসমাজে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভেদ দেখিয়াছি। গোষ্ঠী, উপজাতি এবং জাতির মধ্যে এই বিভেদ সৃষ্টির পরিণতিই হইল দুর্বলের উপর সবলের আধিপত্য। এইরূপে কোন দলপতি যখন তাঁহার নিজের সেনাবাহিনীর সাহায্যে কোন নির্দিষ্ট ভূভাগে স্থায়ী আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিতেন, তখনই রাষ্ট্রের

বলপ্রয়োগ হইতেছে রাষ্ট্রের মূলভিত্তি

সৃষ্টি হইত। সুতরাং এই মতবাদ অনুযায়ী যুদ্ধ রাষ্ট্রের সৃষ্টির অন্যতম উপাদান।

কিন্তু সামরিক শক্তিই রাষ্ট্রের একমাত্র ভিত্তি নয়। রাষ্ট্র রক্ষার জন্য যেমন সামরিক আয়োজন অথবা সেনাবাহিনী চাই, তেমনি এক সদাসতর্ক এবং সচেতন জনমতেরও প্রয়োজন আছে। কারণ, রাষ্ট্রের প্রকৃত ভিত্তি হইতেছে রাষ্ট্রের অধিবাসীদের সাধারণ ইচ্ছা। সুসংগঠিত এবং সচেতন জনমত অপেক্ষা বড় শক্তি বর্তমানকালের রাষ্ট্রের নাই। মধ্যযুগীয় ধর্মযাজকগণ বলপ্রয়োগ মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। পরাক্রান্ত রাজারাও সাম্রাজ্যের লিপ্সা চরিতার্থ করিবার জন্য বলপ্রয়োগ মতবাদ গ্রহণ করিতেন। জনসাধারণ রাষ্ট্রের প্রতি যে স্বাভাবিক আনুগত্য প্রকাশ করে তাহার কারণ রাষ্ট্রের ভয় নহে; রাষ্ট্র মানুষের অনেক চাহিদা পূরণ করে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ বুঝিতে পারে রাষ্ট্রের আইন তাহার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এবং সুষ্ঠু নাগরিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় ততক্ষণ পর্যন্তই সে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। একথা অস্বীকার করা যায় না যে আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার জন্য রাষ্ট্রকে অনেক সময় পশুবলের উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু এই পশুবলই রাষ্ট্রের ভিত্তি নহে। রুশো বলেন, যে অধিকারের ভিত্তি হইতেছে পশুবল, তাহা কখনও চিরস্থায়ী হয় না। রাষ্ট্রের ভিত্তি হইতেছে জনসাধারণের শাসককুলের প্রতি পূর্ণ সমর্থন। শুধু মানুষের সাধারণ ইচ্ছাই আবার রাষ্ট্রের একমাত্র ভিত্তি নহে। কারণ বিভিন্ন যুগে সমাজ-জীবনের বিভিন্ন শক্তি বিভিন্নভাবে রাষ্ট্র গঠনে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। একদিকে যেমন বলপ্রয়োগ মতবাদ গণতন্ত্রবিরোধী, অপরদিকে তেমনি ইহা ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের বিবর্তন উপেক্ষা করে। তৃতীয়তঃ, শুধু বলপ্রয়োগের সাহায্যে রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব এবং ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভবপর নহে। কারণ, সামরিক শক্তির সমাপ্তি একদিন হইবেই, তখন এই মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রেরও বিলুপ্তি ঘটিবে। কিন্তু ইতিহাসের দিক হইতে বলপ্রয়োগ মতবাদ সত্য নহে। চতুর্থতঃ, এই মতবাদের কোন নৈতিক ভিত্তি নাই। মানুষের সর্বাংগীন কল্যাণ সাধন করাই রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু "জোর যার মুল্লুক তার" এই মতবাদে কোন দিনই রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য অর্থাৎ, রাষ্ট্রকে একটি কল্যাণরাষ্ট্রের রূপ দেওয়ার ইচ্ছা বাস্তবে রূপায়িত হইবে না।

রাষ্ট্রের প্রকৃত ভিত্তি হইতেছে জনগণের সাধারণ ইচ্ছা

তবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এবং আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখিবার জন্য রাষ্ট্রকে সর্বদাই সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করিতে হয়। এইজন্য রাষ্ট্র কিছু পরিমাণে শক্তির উপর নির্ভর করে। কিন্তু এইজন্য পশুবলই

রাষ্ট্রের সৃষ্টির কারণ নহে। অধ্যাপক গ্রীণ তাঁহার "Principles of Political obligations" বইয়ে বলিয়াছেন, "রাষ্ট্রের ভিত্তি জনগণের ইচ্ছা, বলপ্রয়োগ নয়"। ("Will, and not force, is the basis of the state") রাষ্ট্রের ক্ষমতা সর্তাধীনে প্রদত্ত,—ইহা সর্বদাই অছি স্বরূপ। অর্থাৎ, রাষ্ট্রের ক্ষমতা জনগণেরই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য। জনগণ কেন রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে তাহার সন্তোষজনক যুক্তি এই মতবাদ দেখাইতে পারে না। গণতন্ত্রের যুগে জনগণের সক্রিয় সমর্থন ব্যতীত কোন রাষ্ট্রই স্থায়ী হইতে পারে না। ১৬৮৮ সালের ইংলণ্ডের "গৌরবময় বিপ্লব", ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব, ১৭৭৬ সালের আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং সর্বোপরি ভারতের অহিংস স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রমাণ করিয়াছে যে বলপ্রয়োগ অপেক্ষাও জনগণের ইচ্ছার উপরেই রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব অধিক নির্ভর করে।

সামাজিক চুক্তি মতবাদ (The Social Contract Theory)

সামাজিক চুক্তি মতবাদ খুবই প্রাচীন। গ্রীক্ দার্শনিক প্লেটো এবং ভারতীয় দার্শনিক ও রাষ্ট্রনীতিবিদ কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রে" ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। সামাজিক চুক্তি মতবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তির বিভিন্ন মতবাদগুলির মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই মতবাদ শুধু রাষ্ট্রের উৎপত্তির কারণই বিশ্লেষণ করে না,—ইহা রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণের বিশেষ সহায়ক। এই মতবাদের তিনজন প্রধান প্রচারক হইলেন হবস্ (Hobbes), লক্ (Locke) এবং রুশো (Rousseau)। তাঁহারা তিনজনেই এই বিষয়ে একমত যে রাষ্ট্রের সৃষ্টির পূর্বে একটি প্রকৃতির রাজ্য (State of Nature) ছিল এবং সেখানে কোন সুসংগঠিত সমাজ ছিল না। তবে প্রকৃতির রাজ্যের বর্ণনায় এই তিনজনের মধ্যে বিশেষ মতভেদ আছে। এই তিনজন আর একটি বিষয়ে একমত যে প্রকৃতির রাজ্যের জনগণ একটি সুসংগঠিত রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া একটি চুক্তি সম্পন্ন করে এবং এই চুক্তি অনুযায়ী রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয় এবং মানুষ প্রকৃতির রাজত্বের অরাজকতা হইতে মুক্তিলাভ করে। এই সামাজিক চুক্তি সম্পন্ন হয় একজন বিশেষ ব্যক্তি অথবা ব্যক্তি-সংসদের সহিত জনগণের। তবে সামাজিক চুক্তি মতবাদের বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়ে আমরা হবস্, লক এবং রুশোর মধ্যে মতের অনেক অমিল দেখিতে পাই।

তিনজনের মতেই রাষ্ট্র সৃষ্ট হইবার পূর্বে একটি প্রকৃতির রাজত্ব ছিল

হবসের অভিমত (Views of Hobbes)

"লেভিয়াথান" নামক পুস্তকে হবস্ তাঁহার মতবাদ প্রচার করেন।

হব্‌সের মতে প্রকৃতির রাজত্ব ছিল দুর্বিষহ। মানুষের জীবনযাত্রা প্রকৃতির পরিবেশে খুবই "দীন, নিঃসংগ, কদর্য, পশুসুলভ এবং স্বল্পায়ু" ছিল। এই পরিবেশে মানুষের জীবনের কোন নিরাপত্তা ছিল না এবং মানুষের প্রণীত কোন আইন ছিল না। এই ভয়াবহ অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য মানুষ নিজেদের মধ্যেই একটি চুক্তি সম্পাদন করে এবং চুক্তি অনুযায়ী একজনকে শাসক নির্বাচিত করে। শাসক এই চুক্তির একটি পক্ষ নহে। শাসকের হস্তে জনসাধারণ অপরিমেয় ক্ষমতা বিনা সর্তে অর্পণ করে। রাজা জনগণ কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী হইতেন; কিন্তু, নিজের কাজের জন্য প্রজাদের কাছে তিনি দায়ী থাকিতেন না। প্রজারাও রাজার নিকট কোন ব্যাপারে কৈফিয়ৎ দাবী করিতে পারিত না অথবা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে পারিত না। হব্‌সের মতে সামাজিক চুক্তির মাধ্যমেই রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি রাষ্ট্র এবং সরকারের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না। তিনি রাজশক্তিকে অব্যাহত রাখিবার সমর্থক ছিলেন বলিয়াই "লেভিয়াথান" (Leviathan) পুস্তকে গণশক্তিকে অস্বীকার করেন। যাহারা সামাজিক চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিল সেই জনসাধারণকে হব্‌স্ একটি নিকৃষ্ট স্তরের জীব হিসাবে চিত্রিত করেন। লেভিয়াথান নামক সুবৃহৎ সামুদ্রিক জীবের ক্ষমতা যেমন অবাধ, এবং অপরিমেয়, তেমনি "লেভিয়াথান" পুস্তকে হব্‌স্ শাসকের ক্ষমতাকে অবাধ এবং অপরিমেয় মনে করিয়াছেন। তবে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, সর্বশক্তিমান রাজশক্তিও জনসাধারণের মধ্যেই একটি চুক্তি অথবা ইচ্ছার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মূলতঃ হব্‌স্ ছিলেন আইনানুগ সার্বভৌমত্বে (legal sovereignty) বিশ্বাসী।

হব্‌স্ গণশক্তিকে উপেক্ষা করিয়া রাজশক্তিকে অব্যাহত রাখিতে চাহিয়াছিলেন

লকের অভিমত (Views of Locke)

জন্ লক্‌ও এই সামাজিক চুক্তির মতবাদের প্রচারক ছিলেন। লকের সহিত হব্‌সের সাদৃশ্য ছিল তিনটি বিষয়ে, যথা :—মানুষ প্রকৃতির রাজত্বে বাস করিত, জীবন-যাপনের জন্য তাহাদের একটি সুশৃংখল রাষ্ট্রের এবং সুসংগঠিত শাসনযন্ত্রের প্রয়োজন ছিল এবং তাহারা নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তি করিয়া একজনকে রাজা অথবা শাসক নির্বাচিত করিত এবং এই চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইত। কিন্তু হব্‌সের সহিত লকের পার্থক্য আমরা নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে পাই :—

লকের মতে প্রকৃতির রাজত্ব কদর্য, পশুসুলভ এবং দুর্বিষহ ছিল না। এই প্রকৃতির রাজত্বে মানুষের ছিল অবাধ স্বাধীনতা। মানুষের মধ্যে সাম্যভাবও বিদ্যমান ছিল। তবে এই অবস্থা ছিল প্রাক্ রাজনৈতিক অবস্থা। প্রাক্ রাজনৈতিক পরিবেশে সুন্দর এবং সুশৃংখল জীবনযাত্রার কতিপয় বিশেষ অসুবিধা ছিল এবং সেই অসুবিধাগুলি দূর করিবার জন্য একটি রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

লকের মতে প্রকৃতির রাজত্ব পশুসুলভ এবং কদর্য ছিল না

দ্বিতীয়তঃ, লকের মতে রাজা অথবা শাসক সামাজিক চুক্তির একটি পক্ষ এবং সামাজিক চুক্তির সর্ত অনুযায়ী তিনি জনসাধারণের একটি প্রতিনিধিমণ্ডলীর প্রতি তাঁহার কাজের জন্য দায়ী। রাজাকে অবাধ এবং অপরিমেয় ক্ষমতা দেওয়া হয় না। কারণ, রাজা যদি চুক্তি ভংগ করেন তবে তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার অধিকার গণশক্তির হাতে থাকে।

লকের মতে প্রথমে একটি সামাজিক চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় এবং তাহার পর একটি রাজনৈতিক চুক্তি (political or governmental compact) মাধ্যমে সীমাবদ্ধ ক্ষমতাসহ একটি সরকার প্রতিষ্টিত হয়। লক্ আইনানুগ সার্বভৌমত্বে (legal sovereignty) বিশ্বাসী ছিলেন না; তিনি ছিলেন রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বে (political sovereignty) বিশ্বাসী। লক্ হব্‌সের ন্যায় গণশক্তিকে নীচ এবং ছোট করিয়া দেখেন নাই। তাঁহার সময়ে ইংলণ্ডে গণতন্ত্রের যে ক্রমিক প্রসার লক্ষ্য করা গিয়াছিল, সেইদিকে দৃষ্টি রাখিয়াই তিনি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, মানুষ নিঃশেষে এবং বিনাসর্তে তাহার সমুদয় ক্ষমতা রাজাকে অর্পণ করে নাই। হব্‌সের মতবাদে ব্যক্তি-স্বাধীনতার কোন স্থান ছিল না। কিন্তু লক্ ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে একেবারে উপেক্ষা করেন নাই। তবে লক্ যেভাবে সরকার গঠনের কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতে সরকারের স্থায়িত্ব অল্প ছিল। কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, গণতন্ত্রের যুগে সব সরকারেরই স্থায়িত্ব অনেক কমিয়া গিয়াছে,—কেননা, গণতান্ত্রিক সরকারের অস্তিত্ব জনসাধারণের ইচ্ছাধীন। লক্ তাঁহার মতবাদ অনুযায়ী ১৬৮৮ সালের ইংলণ্ডের গৌরবময় বিপ্লব সমর্থন করেন।

লক্ রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী ছিলেন

রুশোর অভিমত (Views of Rousseau)

হব্‌স্ এবং লকের মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য আনয়ন করিবার জন্য রুশো চেষ্টা করিয়াছিলেন। ("Rousseau tried to combine the views of

Hobbes and Locke.") ১৭৬২ সালে "Contract Sociale" বইয়ে রুশো তাঁহার মতবাদ প্রচার করেন। হব্‌স্‌ এবং লকের মতবাদের সংগে তাঁহার মতবাদের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য ছিল। তিনিও মনে করিতেন যে, রাষ্ট্র সৃষ্ট হইবার পূর্বে একটি প্রকৃতির রাজত্ব ছিল। কিন্তু হব্‌সের ন্যায় তিনি সেই প্রকৃতির পরিবেশকে ভয়াবহ অথবা দুর্বিষহ বলিয়া চিত্রিত করেন নাই। রুশোর মতে তাহা ছিল ভূস্বর্গের ন্যায়। লকের ন্যায় তিনি মনে করিতেন যে সেই প্রকৃতির রাজত্বে মানুষের ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা এবং সাম্যভাব। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রবর্তনের ফলে মানুষ নানাবিধ জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতে থাকে এবং তখন হইতেই প্রকৃতির রাজত্ব ক্রমশঃ অসহনীয় হইতে লাগিল। এই অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য জনসাধারণ নিজেদের মধ্যে একটি সামাজিক চুক্তি সম্পাদন করিয়া একজনকে শাসক নির্বাচিত করিল। হব্‌সের মত রুশোও মনে করিতেন যে, শাসক সামাজিক চুক্তির একটি পক্ষ নয়। মানুষ নিজেদের মধ্যেই চুক্তি সম্পাদন করিয়া সার্বভৌম ক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখিল। কিন্তু হব্‌স্‌ মনে করিতেন, সার্বভৌম ক্ষমতা থাকিবে রাজার। রুশো বর্ণিত সামাজিক চুক্তি সাধারণ ইচ্ছার (General will) ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে যে ক্ষমতার অধিকারী ছিল, তাহা সর্বদাই সমষ্টিগতভাবে প্রয়োগ করা হইবে, অর্থাৎ, ব্যক্তিগত ইচ্ছা সর্বদাই সমষ্টিগত ইচ্ছার অধীন থাকিবে—ইহাই ছিল রুশোর অভিমত। সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ সমষ্টিগত ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল ছিল। সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করা হইল হব্‌সের অভিমত অনুযায়ী রাজার নিকট নয় অথবা লকের অভিমত অনুযায়ী সংসদের নিকট নয়,—ইহা প্রয়োগ করা হইল সমাজের নিকট, যে সমাজ ছিল সুবিপুল গণশক্তির আধার। রুশোর মতবাদে রাজতন্ত্রের স্থান নাই,—রাষ্ট্রের নিছক প্রতিনিধি হিসাবেই সরকারের প্রয়োজনীয়তা। রুশোর মতে সরকারও চুক্তির পক্ষ নহে; সুতরাং, সরকারও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নহে। গণ-সার্বভৌম ইচ্ছা করিলেই সরকারের অদল-বদল করিতে পারে। রুশোর মতবাদ ১৭৭৬ সালের আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবের গোড়াপত্তন করে। রুশোর মতবাদে স্বাধীনতা, সাম্য এবং মৈত্রীর (liberty, equality and fraternity) বাণী প্রচারিত হয়। রুশো বলিতেন, "জনসাধারণের কথাই ঈশ্বরের বাণী" ("Voice of the people is the voice of God.") এবং "মানুষ স্বাধীন

হব্‌স্‌ ও রুশোর মতবাদের সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য

শাসক ও সরকার চুক্তির একটি পক্ষ নহে

হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু সর্বত্রই সে অধীনতাপাশে বদ্ধ"। (Man is born free, but everywhere he is in chains") মানুষের স্বাধীনতা সম্পর্কে এমন উদাত্ত ঘোষণা অন্য কোন রাষ্ট্রনীতিবিদ্ করিতে পারেন নাই। হব্‌সের মতবাদের সহিত রুশোর মতবাদের একটি ক্ষেত্রে সাদৃশ্য বিশেষভাবে চোখে পড়ে। হব্‌সের মতে সার্বভৌম ক্ষমতা রাজার হাতে এবং তাহা অবিভাজ্য ও হস্তান্তরের অযোগ্য। রুশোর মতেও সার্বভৌম ক্ষমতা অবিভাজ্য ও হস্তান্তরের অযোগ্য; কিন্তু তাহা রাজার হাতে নহে, তাহা সমাজের হাতে, সাধারণ ইচ্ছার (General will) হাতে। লকের মতবাদের সংগেও রুশোর মতবাদের একটি সাদৃশ্য আছে। লকের মতে রাজার হাতে অর্থাৎ শাসকের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে না। রুশোর মতেও সার্বভৌম ক্ষমতা রাজার হাতে অর্থাৎ শাসকের হাতে থাকে না তবে রুশোর ন্যায় লক্ কখনই জনসাধারণের হাতে সমুদয় ক্ষমতা অর্পণের ("all powers to the people") কথা বলেন নাই। লকের মতে রাজার বিরুদ্ধে প্রয়োজন হইলে বিদ্রোহ করিবার আইনসংগত অধিকার গণপ্রতিনিধিদের আছে; কিন্তু রুশোর মতে তাহা মানুষের জন্মগত অধিকার। সুতরাং রুশো লোকায়ত্ত সার্বভৌমত্বে (Popular sovereignty) বিশ্বাসী ছিলেন।

মানুষের স্বাধীনতাই বড় জিনিষ

লক্ এবং রুশোর মধ্যে পার্থক্য

অধ্যাপক লাস্কি রুশোর "সাধারণ ইচ্ছার" (General will) নীতিকে সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, সাধারণের ইচ্ছা সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা (will of the majority) ছাড়া কিছুই নহে এবং ইহাতে সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাহা ছাড়া, এই নীতি সংখ্যাগরিষ্ঠদের স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্রয় দান করে এবং সেইদিক দিয়া বিচার করিলে রুশো বর্ণিত 'সাধারণ ইচ্ছা' হব্‌সের 'লেভিয়াথানের' ন্যায় অমিত-শক্তিশালী এবং স্বেচ্ছাচারী। রুশো চেষ্টা করিয়াছিলেন হব্‌স্ এবং লকের মতবাদের মধ্যে সমন্বয় আনিবার জন্য,—কিন্তু তাঁহার সেই প্রচেষ্টা সার্থক হয় নাই। অধ্যাপক লাস্কি মনে করেন, বর্তমান-কালের রাষ্ট্রীয় জীবনে 'সাধারণ ইচ্ছা' মতবাদের পূর্ণ প্রয়োগ সম্ভবপর নহে।

সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমালোচনা—

সামাজিক চুক্তি মতবাদের অনেক সমালোচনা করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, এই মতবাদের পিছনে কোন ঐতিহাসিক সত্য নাই। ১৬২০ সালে ইংলণ্ড হইতে ১০১ জন দেশত্যাগীর মধ্যে সম্পাদিত রাষ্ট্রীয় সমাজ প্রতিষ্ঠার

মে-ফ্লাওয়ার চুক্তিকে আমরা কখনই এই মতবাদের সমর্থনে গ্রহণ করিতে পারি না। কারণ, সেই চুক্তি অনুযায়ী কোন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় নাই অথবা সেই চুক্তি সম্পাদিত হইবার পূর্বে কোন প্রকৃতির রাজত্বও আমরা দেখিতে পাই নাই। দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদটি অযৌক্তিক। যাহারা আদিমকালের প্রকৃতির রাজত্বে বাস করিত এবং যেখানে হব্‌সের ভাষায় মানবজীবন ছিল কদর্য ও পশুসুলভ, সেখানে কিভাবে রাজনৈতিক চেতনার সৃষ্টি হইল এবং সামাজিক চুক্তি হইল,—তাহার কোন যুক্তি আমরা খুঁজিয়া পাই না। এরিস্টটল অনেক আগেই বলিয়াছিলেন, মানুষ সামাজিক প্রাণী। সুতরাং ভূস্বর্গ হোক অথবা একেবারে কদর্য ও পশুসুলভই হোক,—প্রকৃতির রাজত্ব একটি উদ্ভট পরিকল্পনা। প্রকৃতির রাজত্বে মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং "স্বাভাবিক" অধিকার ছিল, ইহা অসম্ভব। কেননা, স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য কোন কর্তৃপক্ষ সেখানে ছিল না—সেখানে একজনের স্বাধীনতার উপরে অপরের হস্তক্ষেপ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং এই মতবাদটি অযৌক্তিক।° কাণ্ট (Kant) অভিমত পোষণ করিয়াছিলেন যে, রাষ্ট্রের উৎপত্তি সামাজিক চুক্তি অনুযায়ী না হইলেও, এই মতবাদ রাষ্ট্র এবং ব্যক্তির সম্পর্ক সঠিকভাবে বর্ণনা করিতে পারে। কিন্তু কাণ্টের অভিমতও গ্রহণযোগ্য নয়। রাষ্ট্র ও ব্যক্তির সম্পর্ক যে সর্বদাই চুক্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে তাহা ঠিক নহে। তৃতীয়তঃ, এই মতবাদের একটি বিপজ্জনক দিক আছে। তাহা হইতেছে এই যে, মানুষের সাধারণ ইচ্ছা অনেক সময়েই রাষ্ট্রকে খেয়ালের বস্তুতে পরিণত করিতে পারে এবং সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বেচ্ছাচারিতাই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে। এই মতবাদে জনমতকে অতিরিক্ত প্রাধান্য প্রদান করায় অনেক-ক্ষেত্রেই বিপ্লবের সৃষ্টি হইতে পারে। কারণ, জনমত যে সর্বদাই বিবেক বুদ্ধি প্রণোদিত হয় তাহা নহে।

মানুষের পক্ষে রাষ্ট্রের সদস্যপদ চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলা ভিত্তিহীন। রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে এক বিবর্তনের মাধ্যমে,—ইহা অনেক ঘাত-প্রতিঘাতে উদ্ভূত, সামাজিক চুক্তির ফলে উদ্ভূত নয়। রাষ্ট্রের সৃষ্টির পিছনে আছে এক ঐতিহাসিক পটভূমিকা।

সামাজিক চুক্তি মতবাদ ও গণতন্ত্রের বিকাশ (The Social Contract Theory and the evolution of Democracy)

রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিষয়ে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করিতে না পারিলেও সামাজিক চুক্তি মতবাদ বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। রাষ্ট্র মানবীয় প্রতিষ্ঠান এবং শাসকের ক্ষমতার উৎস হইতেছে

জনসাধারণের সম্মতি,—এই সত্যটি সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমর্থকগণের মধ্যে সাধারণভাবে গৃহীত হইয়াছে এবং এইদিক হইতে ইহা গণতন্ত্রের পথপ্রদর্শক। একটি চুক্তি বলিতে আমরা বুঝি চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী উভয়পক্ষের কতিপয় বাধ্যবাধকতা। আধুনিককালে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সরকার একটি শাসনতন্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই শাসনতন্ত্র শাসক এবং শাসিতের মধ্যে একটি চুক্তির সমতুল্য। এই শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সরকারকে কাজ করিতে হয়। সামাজিক মতবাদে ইহাই বলা হইয়াছে যে, শাসক এবং শাসিতের মধ্যে একটি সম্পর্ক বা বোঝাপড়ার সর্ত থাকিবে এবং শাসককে তাহা মানিয়া চলিতে হইবে। ইহাই গণতন্ত্রের মূলকথা। কারণ, গণতন্ত্র জনগণের সাধারণ ইচ্ছার (General will) উপর প্রতিষ্ঠিত। সামাজিক চুক্তি মতবাদে যে চুক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে একটি "সামাজিক" চুক্তি; অর্থাৎ সমাজের প্রত্যেকেই এই চুক্তির অংশীদার। এখানেই সামাজিক চুক্তি মতবাদ গণতন্ত্রের পথ প্রদর্শক হইয়াছে। আমরা এক্ষেত্রে ডক্টর ফ্রিড্ম্যানের কথা উল্লেখ করিতে পারি। তাঁহার মতে, রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস যে গণশক্তি,—ইহাই সামাজিক চুক্তি মতবাদকে গণতান্ত্রিক মতবাদগুলির অগ্রণী করিয়াছে। ("What links all protagonists of the social contract theory is that they find the source of political power in the people. In that sense, the whole theory of social contract is forerunner of democratic theory.") রাষ্ট্রের অস্তিত্ব যে রাষ্ট্র এবং জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতার উপর নির্ভর করে এবং রাজা অথবা শাসককুলকে যে নিজেদের ক্রিয়াকলাপের জন্য যাহারা তাঁহাদিগকে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে তাহাদের নিকট দায়ী থাকিতে হয়, গণতন্ত্রের এই সত্যটি স্বীকৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে লকের মতবাদ প্রচারের সময় হইতে। লক্ বলিয়াছিলেন; সরকার হইতেছে জনসাধারণের একটা নৈতিক অছি (moral trust) স্বরূপ। যখনই রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য সরকার কর্তৃক অস্বীকৃত হইবে, তখনই জনসাধারণ সরকারের উপর হইতে তাহাদের বিশ্বাস প্রত্যাহার করিবে এবং নিজেদের হাতে ক্ষমতা গ্রহণ করিবে। ("......the trust must necessarily be forfeited and the power must devolve into the hands of those that gave it.")

রাষ্ট্রের সমুদয় ক্ষমতার উৎস হইতেছে গণশক্তি

শাসকগণ নিজেদের কাজের জন্য প্রজাগণের নিকট দায়ী

১৬৮৮ সালের ইংলণ্ডের গৌরবময় বিপ্লব, ১৭৭৬ সালের আমেরিকার

জনগণের স্বাধীনতা এবং স্বাধিকারের সংগ্রাম, ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব,—ইতিহাসের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর লক্ এবং পরবর্তীকালে রুশোর মতবাদের সুস্পষ্ট প্রভাব আমরা দেখিতে পাই। ইহাই সামাজিক চুক্তি মতবাদের স্থায়ী মূল্য। স্বাধীনতা, সাম্য এবং মৈত্রীর বাণী চিরকাল নিপীড়িত মানবাত্মাকে সংগ্রামে প্রেরণা দিয়াছে। নিজেদের সরকার নিজেদেরই প্রতিষ্ঠা করা, সাধারণ ইচ্ছার উপর সরকারের স্থায়িত্ব—ইহাই গণতন্ত্রের মূল কথা। রাষ্ট্রের উৎপত্তির মতবাদ হিসাবে সামাজিক চুক্তি মতবাদ অযৌক্তিক হইলেও রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণে ইহার অবদান খুবই বেশী। সমাজে প্রত্যেককেই সমান সুযোগ এবং অধিকার প্রদান করা,—আধুনিক গণতন্ত্রের আদর্শ। কিন্তু রুশো এই মতবাদ পূর্বেই প্রচার করিয়াছেন। আধুনিককালে আমরা নাগরিকদের সর্বজনীন ভোটাধিকারের পক্ষে যে সব যুক্তি প্রদর্শন করি, সেইগুলির উপর রুশোর মতবাদের প্রভাব সুস্পষ্ট। বলপ্রয়োগ নীতির অবসান ঘটাইয়া এবং রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐশ্বরিক মতবাদ অগ্রাহ্য করিয়া সামাজিক চুক্তি মতবাদ দেখাইয়াছে যে প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই কর্তৃত্ব জনগণের সম্মতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। গণতান্ত্রিক নীতিগুলির প্রসারে সামাজিক চুক্তি মতবাদের ইহাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান। সামাজিক চুক্তি সম্পাদিত হইল সমাজের সব লোকের মধ্যে। মূলতঃ ইহা যে একটা চুক্তি, অর্থাৎ, ইহার পিছনে যে চুক্তিকারীদের প্রত্যেকেরই সমর্থন আছে এবং সর্বোপরি ইহা যে একটি সামাজিক চুক্তি—তাহাই সামাজিক চুক্তি মতবাদকে গণতান্ত্রিক করিয়াছে। যদিও হব্‌স্ আইনানুগ সার্বভৌমত্বের সমর্থক ছিলেন, তবুও পরবর্তীকালে লক্ এবং রুশোর মতবাদ সামাজিক চুক্তি মতবাদকে বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সাহায্য করিয়াছে এবং গণতন্ত্রের ক্রমপরিণতির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করিয়াছে।

এই মতবাদ গণতন্ত্রের পথপ্রদর্শক

ঐতিহাসিক মতবাদ (Historical theory)—রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা করিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, রাষ্ট্রগঠনের কোন একক উপাদান নাই। ঐশ্বরিক বিধানের ফলে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় নাই, অথবা পশুবলও রাষ্ট্রের উৎপত্তির প্রধান কারণ নহে, পারস্পরিক চুক্তিদ্বারা অথবা পারিবারিক সম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাও সত্য নহে।

রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে মানব-সমাজের এক বিবর্তনের মধ্য দিয়া—আদিম কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান কাল পর্যন্ত মানব-সমাজের স্বাভাবিক

বিবর্তনের মধ্য দিয়া রাষ্ট্র শ্রেষ্ঠ সামাজিক সংগঠন হিসাবে গঠিত হইতেছে। এই মতবাদকে আমরা ঐতিহাসিক মতবাদ (Historical theory) অথবা বিবর্তনমূলক মতবাদ (Evolutionary theory) বলিয়া থাকি। এই মতবাদ বর্তমানে সকলেই গ্রহণ করিয়াছেন। এই মতবাদের নিম্নলিখিত উপাদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মানব সমাজের বিবর্তনের মধ্যেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি

প্রথমতঃ, মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে চায়। এরিস্টটল অনেক আগেই বলিয়া গিয়াছেন, মানুষ স্বভাবতঃই সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক প্রাণী। সমাজবদ্ধ হিসাবে বাস করিবার প্রেরণা সৃষ্ট হইয়াছে পরিবার হইতে। সুতরাং রাষ্ট্রগঠনের প্রাথমিক উপাদান হিসাবে পরিবারের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। রক্তসম্পর্কের বন্ধন মানুষকে পরিবারে একত্রিত করে। বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে পারিবারিক বন্ধনের সৃষ্টি হইতে গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। পরিবার হইতে গোষ্ঠী এবং গোষ্ঠী হইতে সৃষ্ট হয় বৃহত্তর উপজাতি এবং সর্বশেষে জাতি। এইভাবে রক্তসম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র পরিবারের চরম পরিণতি হইয়াছে জাতিগঠনের মধ্যে।

দ্বিতীয়তঃ, ধর্মের বন্ধনও রাষ্ট্রগঠনের একটি বিশেষ উপাদান। রক্তসম্পর্কের বন্ধন ছাড়াও মানুষ অনেক সময়ে একত্রিত হইয়াছে এবং তাহা হইয়াছে একই ধর্মের ভিত্তিতে। অতি প্রাচীনকালে মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে শ্রদ্ধা এবং ভয়ের চক্ষে দেখিত। সমাজের বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ এই নৈসর্গিক শক্তিগুলিকে আয়ত্ত করার দাবী করিয়া সমাজের অন্যান্যদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল। অনেকসময় রাজারাও এই ধর্মসম্বন্ধের সুযোগ গ্রহণ করিয়া নিজেদের ধর্মগুরু আখ্যা দিতেন। বর্তমানকালে ইংলণ্ডের রাণী সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মমহাসংগঠনের প্রধান (Head of the Established Church) হিসাবে পরিচিত। সুতরাং দেখা যাইতেছে রাষ্ট্রীয় চেতনার উন্মেষ হইবার অনেক পূর্বেই মানুষের মধ্যে ধর্মীয় ঐক্য-বোধ গড়িয়া উঠে। সেই অবস্থায় রাষ্ট্র-শাসকের বশ্যতা স্বীকার করা এবং তাহার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা একটি নৈতিক বাধ্যবাধকতা (ethical compulsion) বলিয়া বিবেচিত হয়।

ধর্মের বন্ধন রাষ্ট্রের সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক

তৃতীয়তঃ, রক্তসম্পর্কের বন্ধন এবং ধর্মীয় বন্ধন ছাড়াও রাষ্ট্রগঠনের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হইতেছে সামরিক শক্তি এবং ক্ষেত্রবিশেষে পাশবিক শক্তি। ভ্রাম্যমান জীবন পরিত্যাগ করিয়া মানুষ যখন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইল এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারী হইল, তখন নিজেদের ধনসম্পত্তি ও

প্রাণের নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা দেখা যাওয়ায় যাঁহারা শক্তিশালী তাঁহারা অপরের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া সেই নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যুদ্ধকালে যিনি নেতা নির্বাচিত হইতেন শান্তির সময়েও তাঁহার নেতৃত্ব স্বীকৃত হইত।

সামরিক শক্তি ও রাষ্ট্র-সৃষ্টির অন্যতম ভিত্তি

তবে এক্ষেত্রে মনে রাখিতে হইবে যে শুধু শারীরিক বল অথবা সামরিক শক্তিই দলপতির নেতৃত্বের প্রধান ভিত্তি ছিল না। শাসিতের ইচ্ছা এবং সহযোগিতা রাষ্ট্র-গঠনের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। কারণ, শাসিতের ইচ্ছা ও সহযোগিতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ মানুষের রাজনৈতিক চেতনা উদ্বুদ্ধ করে। রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, জাতীয় চরিত্র এবং জাতীয়তাবোধ রাষ্ট্র-গঠনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। এই সকল উপাদান ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে রাষ্ট্র বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। প্রথম পর্যায়ে পরিবারের সৃষ্টি হয়, পরিবার হইতে গোষ্ঠী, গোষ্ঠী হইতে উপজাতি এবং সর্বশেষে উপজাতি হইতে জাতির সৃষ্টি হয়। জাতি যখন সার্বভৌম ক্ষমতা অর্জন করিল, তখন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইল। কিন্তু, দ্বিতীয় পর্যায়ে বাষ্ট্রের গঠনের ভিত্তি ছিল মানব-সমাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক চেতনা। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, কোন রাষ্ট্র ধনতান্ত্রিক অথবা সমাজতান্ত্রিক তাহা ইহার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। আন্তর্জাতিকতার প্রসারের সংগে সংগে রাষ্ট্রনীতিরও পরিবর্তন হইতেছে।

সংক্ষেপে ইহাই রাষ্ট্রগঠনের বিবর্তনমূলক মতবাদ অথবা ঐতিহাসিক মতবাদ। রাষ্ট্র সৃষ্টির অন্যান্য মতবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির সমাবেশ আমরা এই মতবাদে দেখিতে পাই। শুধু তাহাই নহে, এই মতবাদের সহিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর পূর্ণ সংগতি রহিয়াছে। মানুষ একত্রিত হইয়া বাস করিতে চায়,—মানুষের মধ্যে সমাজবদ্ধ অবস্থায় বাস করিবার এই অনুপ্রেরণার মধ্যে এবং একজন শাসকের আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইবার মধ্যে আমরা একটি ঐশ্বরিক উপাদান (divine element) খুঁজিয়া পাই। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রগঠনের আদিরূপ যে একটি পরিবার এবং তাহা যে বহুল পরিমাণে শারীরিক শক্তির (physical force) উপর নির্ভরশীল ছিল এই তথ্যটির স্বীকৃতিও আমরা এই মতবাদে দেখিতে পাই। কিন্তু এককভাবে কোন উপাদানই রাষ্ট্রগঠনের জন্য দায়ী নয়। সবগুলি উপাদানের বিচিত্র সমাবেশেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি এবং ক্রমপ্রগতি।

রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে জৈব মতবাদ (Organic theory of the nature of State)

জৈব মতবাদ রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে। সামাজিক চুক্তি মতবাদ এবং রাষ্ট্রের সৃষ্টি সম্পর্কিত অন্যান্য মতবাদের অসারতা অনুধাবন করিয়া অনেক লেখক এই মতবাদটি গ্রহণ করেন। এই মতবাদে রাষ্ট্রকে জীবদেহের (organism) সহিত তুলনা করা হইয়াছে। জীবদেহের জন্ম, বিকাশ, মৃত্যু এবং ইহার বিভিন্ন অংগ প্রত্যংগের ক্রমবর্ধন সবই রাষ্ট্রদেহে আমরা অনুরূপ দেখিতে পাই। জীবদেহের বিভিন্ন অংশ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। রাষ্ট্রও একটি মানবদেহের অতিকায় রূপ বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। হব্‌স রাষ্ট্রকে তুলনা করিয়াছিলেন "লেভিয়াথান" নামে এক বিরাট সামুদ্রিক জীবের সহিত।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিভিন্ন চিন্তানায়কগণ রাষ্ট্র এবং জীবদেহের মধ্যে বিভিন্ন সাদৃশ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রীসের প্লেটো ও এরিস্টটল এবং রোমের সিসারো রাষ্ট্র এবং জীবদেহের বিভিন্ন সাদৃশ্য লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। বর্তমানকালে ব্লান্ট্‌স্লি, স্পেন্সার প্রভৃতি লেখকগণ এই তত্ত্বের সমর্থক। স্পেন্সার রাষ্ট্র ও জীবদেহের মধ্যে শুধু সাদৃশ্যগুলিই নহে, বৈসাদৃশ্যগুলিও আলোচনা করিয়াছেন। রাষ্ট্র এবং জীবদেহের মধ্যে আমরা নিম্নলিখিত সাদৃশ্য দেখিতে পাই :—

রাষ্ট্র ও জীবদেহের মধ্যে সাদৃশ্য

(১) জীবদেহে যেমন আমরা অনেক জীব-কোষ দেখিতে পাই, রাষ্ট্রের মধ্যেও আমরা অনেক ব্যক্তি দেখিতে পাই। জীবদেহের কোষগুলি যেমন পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, এবং সমগ্রভাবে দেহের উপর নির্ভরশীল, রাষ্ট্রের জনসাধারণও সেইপ্রকার পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং সমগ্রভাবে রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল।

(২) জীবদেহ এবং রাষ্ট্র উভয়েরই জীবন ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে আরম্ভ করে। রাষ্ট্রের আদিতে ছিল কতিপয় মানুষ যাহারা রক্তসম্পর্কের বন্ধনে একটি পরিবার গঠন করে। জীবদেহের ক্রমবর্ধনের সহিত যেমন বিভিন্ন জীবকোষ জটিল আকার ধারণ করে, রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধনের সহিত সেইপ্রকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের এবং জনসাধারণের ক্রিয়াকলাপের পরিধি বাড়িয়া যায়। শরীর হইতে কোনও একটি সাধারণ কোষ বিচ্ছিন্ন হইলে যেমন সমগ্র শরীরের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না, তেমনি রাষ্ট্র হইতে কোন নাগরিক বিচ্ছিন্ন হইলে সমগ্রভাবে রাষ্ট্রের কোন ক্ষতি হয় না অথবা ব্যক্তিবিশেষের মৃত্যু হইলে রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব নষ্ট হয় না।

(৩) জীবদেহের বিভিন্ন কোষ যেমন একটি স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা চালিত হয়, রাষ্ট্রের বিভিন্ন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানও সেইপ্রকার একটি সরকার কর্তৃক চালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। জীবদেহের বিভিন্ন কোষের মধ্যে যেমন শিরা-উপশিরা মারফৎ যোগাযোগ আছে, সেইপ্রকার রাষ্ট্রের মধ্যেও আমরা যোগাযোগ ব্যবস্থা (communication system) দেখিতে পাই।

(৪) জীবদেহের কোন অংগ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে যেমন প্রাকৃতিক নিয়মে নূতন অংশ অনেক সময়ে গঠিত হয় ও ক্ষয়প্রাপ্ত অংশের স্থান পূরণ করে সেইপ্রকার রাষ্ট্রে বৃদ্ধ এবং রোগগ্রস্ত ব্যক্তির স্থান নূতন লোক দিয়া পূরণ হয়।

সমালোচনা :—রাষ্ট্র এবং জীবদেহের মধ্যে উপরে বর্ণিত সাদৃশ্যগুলি থাকা সত্ত্বেও স্পেন্সারের মতে তাহাদের মধ্যে দুইটি মূল পার্থক্য আছে।

এই মতবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি

প্রথমতঃ, মানবদেহের গঠন দৃঢ় সংবদ্ধ,—যে সকল কোষ লইয়া ইহা গঠিত সেইগুলি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন অথবা অসংলগ্ন নহে; একটি দেহকে কেন্দ্র করিয়া সেইগুলি পরস্পরের সহিত দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন রহিয়াছে। কিন্তু সমাজ-জীবনে এবং রাষ্ট্রের অধীন বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান পরস্পরের সহিত দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত নহে। তাহারা খুবই অসংলগ্ন। দ্বিতীয়তঃ, মানবদেহের একটি ক্ষুদ্র অংশে ইহার সমগ্র চেতনা পুঞ্জীভূত থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত কোন ব্যক্তিবিশেষ অথবা প্রতিষ্ঠান-বিশেষকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে না। এই তত্ত্বটি রাষ্ট্র এবং জীবদেহের মধ্যে একটি তুলনা মাত্র; ইহা কখনই সত্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। রাষ্ট্র এবং জীবদেহের মধ্যে আমরা অনেক বৈসাদৃশ্যও দেখিতে পাই। প্রথমতঃ, জীবদেহ হইতে যদি কোন কোষ বিচ্ছিন্ন হয়, তবে ইহার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু, কোন রাষ্ট্র হইতে যদি কোন ব্যক্তি সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া অপর রাষ্ট্রে চলিয়া যায়, তাহাতে সেই ব্যক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নষ্ট হয় না। দ্বিতীয়তঃ, জীবদেহের কোন কোষের নিজস্ব কোন অস্তিত্ব অথবা ইচ্ছা নাই,—সমগ্র দেহকে কেন্দ্র করিয়াই ইহার অস্তিত্ব। কিন্তু, রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত কোন ব্যক্তিবিশেষের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অথবা পৃথক ইচ্ছা থাকে। জীবদেহের চেতনা যেখানে মস্তিষ্কে কেন্দ্রীভূত, রাষ্ট্রের চেতনা সেখানে সরকারে কেন্দ্রীভূত নহে। রাষ্ট্রের ভিত্তিতে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের ভিতর সেই চেতনা বিক্ষিপ্ত থাকে। জীবদেহের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু রাষ্ট্রের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী নয়। জীবদেহে অনবরত মস্তিষ্কের অথবা স্নায়ুতন্ত্রের পরিবর্তন হয় না, কিন্তু রাষ্ট্রের মধ্যে অনবরত সরকারের পরিবর্তন হয়। কোন জীবদেহ পূর্ববর্তী কোন জীবদেহ হইতে জন্মলাভ করিয়া প্রাকৃতিক নিয়মে

বর্ধিত হয়, কিন্তু রাষ্ট্রের সৃষ্টি সম্বন্ধে ইহা খাটে না। রাষ্ট্র প্রাকৃতিক নিয়মের ভিত্তিতে গঠিত হয় না। রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে ঐতিহাসিক ক্রমপ্রগতি অথবা বিবর্তনের সাহায্যে।

জৈবমতবাদ রাষ্ট্রের মধ্যে জনসাধারণের ঐক্যের উপর গুরুত্ব প্রদান করে। প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজেরই একটি অংশ,—শরীর হইতে হাত, পা যেমন বাদ দেওয়া যায় না, সেইপ্রকার সমাজ এবং রাষ্ট্র হইতে ব্যক্তিকে বাদ দেওয়া যায় না। শরীর যেমন বিভিন্ন কোষের উপর নির্ভরশীল, রাষ্ট্রও সেই প্রকার জনসাধারণের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। এই পর্যন্ত জৈবমতবাদের প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব আছে। কিন্তু ডক্টর লিকক্ (Dr. Leacock) এই মতবাদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। তাঁহার "Elements of Politics" বইয়ে তিনি বলিয়াছেন, "Too great amalgamation of the individual and the state is as dangerous an ideal as too great emancipation of the individual will." রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে সৃষ্টি করা হয় নাই, ইহারা গড়িয়া উঠিয়াছে,—এই কথা বলিয়া জৈবমতবাদ, ডক্টর লিককের মতে, রাজনৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারে নাই। ("The organic theory by telling us that our institutions grow and are not made hardly offers any practical guide to political conduct." Dr. Leacok.)

স্পেন্সার এই মতবাদের সাহায্যে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন এবং ইহার ভিত্তিতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু, অপরপক্ষে রাষ্ট্র এবং ব্যক্তির মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্কের ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া এই মতবাদ প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এই যুক্তির ভিত্তিতে জার্মান দার্শনিকগণ রাষ্ট্রসম্পর্কিত আদর্শবাদ (Idealistic theory of the state) প্রচার করেন। এই দুইটি দিক হইতে জৈবমতবাদ রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের উপর কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

রাষ্ট্রসম্পর্কিত আদর্শবাদ (Idealistic or Absolute Theory of the State)

রাষ্ট্রসম্বন্ধে এই মতবাদটি খুবই প্রাচীন,—কিন্তু ইহাতে বাস্তবতার খুবই অভাব। গ্রীক দার্শনিক Grotius রাষ্ট্রকে সর্বপ্রকার বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণের হাত হইতে মুক্ত রাখিবার নীতি ("the freedom of the State from all

external restraints") প্রচার করিতেন। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো তাঁহার "Republic" গ্রন্থে এই মতবাদের ভিত্তিতে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা করেন। এই রাষ্ট্রে ন্যায়ের স্থান খুব উচ্চে, এবং মানুষ এই রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে সর্বাংগসুন্দর আদর্শ জীবনযাপন করিতে পারে। প্লেটোর পর এরিস্টটলও একটি আদর্শরাষ্ট্রের কল্পনা করেন, কিন্তু তাঁহার আদর্শরাষ্ট্র একেবারে বাস্তবতাবর্জিত ছিল না।

জার্মান দার্শনিক কাণ্ট, ফিচি এবং হেগেলের হাতে এই মতবাদ বিশেষ পরিণতি লাভ করে। হেগেল রাষ্ট্রে দেবত্ব আরোপ করেন। হেগেলের মতে রাষ্ট্র একটি সর্বশক্তিমান অতিমানবীয় প্রতিষ্ঠান ও এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত জনসমষ্টির ব্যক্তিত্ব ছাড়াও রাষ্ট্রের একটি অতি-মানবীয় ব্যক্তিত্ব আছে। সেই ব্যক্তিত্বের স্থান সর্বকিছুর উপরে এবং ইহার একটি বিশেষ নৈতিক মান (ethical standard) আছে যাহার ভিত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার এবং ইচ্ছার পরিমাপ করিতে হইবে। হেগেলের ভাষায় রাষ্ট্র হইতেছে, 'a self-conscious ethical substance and a self-knowing and self-actualizing individual." যেহেতু রাষ্ট্র একটি অতি-মানবীয় প্রতিষ্ঠান এবং ইহা কোনও অন্যায় কাজ করিতে পারে না,—সেইজন্য জনসাধারণকে দ্বিধাহীনভাবে রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হইবে। ব্যক্তিগত ইচ্ছা এবং অধিকারের উৎস হইল রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রই মানুষের ব্যক্তিত্বকে সৃষ্টি অথবা রক্ষা করিতে পারে,—সুতরাং রাষ্ট্রের নির্দেশ পালন করাই জনগণের একমাত্র কর্তব্য। রাষ্ট্র জনগণের যাহা কিছু ভাল এবং মহৎ, তাহারই অভিব্যক্তি, সুতরাং রাষ্ট্রের নির্দেশ পালনের মধ্য দিয়া মানুষ নিজেদেরই শ্রেষ্ঠ প্রেরণাগুলিকে রূপ দেয়। হেগেলের মতে যে স্বাধীনতা মানুষ একাকী অর্জন করিতে পারে না, রাষ্ট্রই মানুষকে সেই স্বাধীনতা অর্জন করিতে সাহায্য করে। হেগেলের ভাষায় "Nothing short of the State is the actualization of freedom." রাষ্ট্রের ইচ্ছাই হইতেছে সাধারণ ইচ্ছা (general will) এবং মানুষের ইচ্ছার সমষ্টি হইতেছে সেই সাধারণ ইচ্ছা। হেগেলের অনুগামীগণের হাতে, বিশেষ করিয়া নীৎসে (Nietzsche), বার্নহার্ডি (Bernhardi), ট্রিট্স্কের (Treitsche) হাতে এই মতবাদের চূড়ান্ত পরিণতি আমরা দেখিতে পাই। হেগেলের সমর্থকগণের মতে এবং তাঁহার পরবর্তী এই মতবাদে বিশ্বাসী দার্শনিকগণের মতে রাষ্ট্র একটি অপরিসীম শক্তির আধার। এই অতি-মানবীয় শক্তির প্রতিনিয়ত প্রয়োগ আবশ্যক যাহাতে রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব ও অস্তিত্ব বজায় থাকে। তাঁহাদের মতে বড় বড় রাষ্ট্রের উচিত ছোট ছোট রাষ্ট্রকে যুদ্ধে জয় করা,

যাহাতে সেইগুলি একটি বড় রাষ্ট্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে পারে। মানুষের সুস্থ, সুখী এবং সুন্দর জীবনের জন্য রাষ্ট্রের ক্ষমতার শেষ থাকা উচিত নয় এবং মানুষেরও উচিত সেই ক্ষমতার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া। অনেকে মনে করেন, জার্মানদের যুদ্ধপ্রিয়তার কারণ ছিল রাষ্ট্রের আদর্শবাদ।

ইংলণ্ডে টি. এইচ. গ্রীন, ব্র্যাড্লি এবং বোসাংকেট এই মতবাদ সম্পূর্ণভাবে না হইলেও অনেক পরিমাণে সমর্থন করেন। তাঁহারা হেগেলের শিষ্যদের মতবাদ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন নাই যদিও অধ্যাপক গ্রীন রাষ্ট্রের মহিমার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু, গ্রীনও মনে করেন, রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব কখনই অসীম নহে,—ইহারও ভিতর এবং বাহির উভয় দিক হইতে একটি সীমা আছে।

সমালোচনা :—

রাষ্ট্রসম্পর্কিত আদর্শবাদে রাষ্ট্রকে সমাজের উপর স্থান দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব অথবা ক্রিয়াকলাপের পরিধি সমাজের পরিধি অপেক্ষা সংকীর্ণতর। এই মতবাদে রাষ্ট্রে দেবত্বের আরোপ করা হইয়াছে, অর্থাৎ, সাধারণ মানুষের ইচ্ছাকে রাষ্ট্রের ইচ্ছার কাছে বলি দেওয়া হইয়াছে। জোয়াডের (Joad) মতে এই মতবাদ ব্যক্তি-স্বাধীনতার পরিপন্থী ("…inimical to individual freedom")। রাষ্ট্র হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তির কোনও মূল্য নাই—ইহা সত্য নহে। অধ্যাপক লাস্কি এইজন্য এই মতবাদের তীব্র বিরোধিতা করিয়াছেন। তাঁহার মতে রাষ্ট্রের ইচ্ছাকেই সর্বোচ্চস্থান দেওয়ার অর্থ মানুষের সাধারণ ইচ্ছাকেই (general will) নিষ্ক্রিয় করিয়া তোলা। এই মতবাদ ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিরোধী এবং ইহা রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব যাঁহাদের হাতে তাঁহাদের স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেয়। বর্তমানকালে রাষ্ট্র কখনই স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। জনগণের কল্যাণের জন্য এবং সামাজিক জীবনের শ্রেষ্ঠতম বিকাশের জন্য রাষ্ট্র একটি অতি কার্যকরী এবং প্রয়োজনীয় মাধ্যম। আমরা ইহা বিশ্বাস করিতে পারি যে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন কাজে অংশ গ্রহণ না করিলে মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ হয় না। কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে রাষ্ট্রই সর্বশক্তিমান এই মতবাদ স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। জোয়াডের (Joad) ভাষায় আমরা বলিতে পারি, "The State exists for individuals ; individuals do not exist for the State." ব্যক্তির প্রয়োজনেই স্বাধীনতার সার্থকতা। যদি রাষ্ট্র অথবা সমাজ জন-কল্যাণের প্রতি উদাসীন থাকে, তবে সমাজ বা রাষ্ট্রের কল্যাণের কোনও মূল্য অথবা অর্থ নাই। এই মতবাদের একটা বিপজ্জনক দিক আছে। এই মতবাদ বড় বড়

রাষ্ট্রগুলিকে ছোট ছোট রাষ্ট্র-বিজয়ের জন্য উৎসাহ দেয়,—অর্থাৎ, এই মতবাদ যুদ্ধের সমর্থক। সর্বশেষে, রাষ্ট্রকে সমগ্র জনসমষ্টির প্রকৃত ইচ্ছার সমন্বয় বলা কঠিন। সমগ্র জনসমষ্টির ইচ্ছার মধ্যে অমিল কিছু না কিছু থাকিবেই। যতটুকু ইচ্ছার সমন্বয় হইতে পারে তাহাও যে সর্বদাই সদিচ্ছা-প্রণোদিত হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই।

এই মতবাদের একটি সত্য হইল এই যে, সংঘ হিসাবে রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব এবং গুরুত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। রাষ্ট্রের সংঘ হিসাবেই জনসাধারণ বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সুবিধা ও অধিকার ভোগ করে। রাষ্ট্র নিজের শ্রেষ্ঠত্বের জোরে জনসাধারণকে এই সকল সুবিধা ও অধিকার উপযুক্তভাবে উপভোগ করিবার ব্যবস্থা করে। নাগরিক অধিকারের উৎস এবং রক্ষক হিসাবে রাষ্ট্র জনগণের আনুগত্য দাবি করিতে পারে। সর্বশেষে, একটি আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা করিয়া এই মতবাদ জনসাধারণকে আদর্শ রাষ্ট্রের আদর্শ নাগরিক হইবার জন্য অনুপ্রাণিত করে।

রাষ্ট্র-সম্বন্ধে মার্কসীয় মতবাদ (Marxist conception of the State)

রাষ্ট্র-সম্বন্ধে মার্কসের মতবাদ জানিতে হইলে প্রথমতঃ মার্কস্ প্রদত্ত সমাজতন্ত্রবাদের ব্যাখ্যা আমাদের জানা প্রয়োজন। ১৮৬৭ সালে মার্কস্ তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত "Daskapital" বইয়ে ঘোষণা করেন যে সমাজতন্ত্রই যে কোনও রাষ্ট্রব্যবস্থার চরম পরিণতি। মার্কসের সমাজতন্ত্র প্রধানতঃ অর্থনৈতিক যুক্তির ভিত্তিতে গঠিত। তিনি তিনটি মূল সূত্রের সাহায্যে তাঁহার সমাজতন্ত্রের নীতি বুঝাইয়াছিলেন। সেইগুলি হইতেছে, (১) উদ্বৃত্ত মূল্যের (Theory of Surplus Value) তত্ত্ব, (২) ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা (Materialistic interpretation of History) এবং (৩) শ্রেণীসংগ্রাম মতবাদ (Theory of Class struggle)। মার্কসের মতে উৎপাদনের উপাদান মাত্র একটি এবং তাহা হইতেছে 'শ্রম'। শ্রমিক যে কাজ করে তাহার দুইটি সময় আছে, একটি হইতেছে সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় পরিশ্রমের সময় (Socially necessary labour time) এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমের সময় (Surplus labour time)। শ্রমিক কর্তৃক উৎপাদিত সামগ্রী মালিক যে দামে বিক্রয় করে, শ্রমিক সেই পরিমাণে মজুরি পায় না। যতটা মজুরি তাহাকে দেওয়া হয়, তাহা হইতেছে সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় পরিশ্রমের সময়ের মূল্য এবং যতটা মজুরি হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা

মার্কস্ প্রদত্ত সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা

হইতেছে, তাহা হইতেছে তাহার অতিরিক্ত পরিশ্রমের সময়ের মূল্য। মালিকশ্রেণী প্রত্যেক শ্রমিককে কিছু না কিছু শোষণ করে। এই উদ্বৃত্ত মূল্য (surplus value) অথবা শোষণলব্ধ মুনাফা হইতেই মূলধনের সঞ্চয় (accumulation of capital) হয়। কিন্তু, তখন ইহার দুইটি পরিণতি দেখা যায়। প্রথমতঃ, একদিকে মালিকশ্রেণীর হাতে যতই মূলধন সঞ্চিত হইবে অপরদিকে শোষিত শ্রমিকশ্রেণী ততই সংঘবদ্ধ হইবে। দ্বিতীয়তঃ, মালিকদের মূলধন যতই বিনিয়োগ করা হইবে, অতিরিক্ত শ্রমিকগণ (Reserve army of Labour) ততই কাজে নিযুক্ত হইবে। পরে দেখা যাইবে যত বিনিয়োগ হইতেছে, সেই পরিমাণে শ্রমিক পাওয়া যাইতেছে না এবং মুনাফার হারও কমিয়া আসিয়াছে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইলেই মালিকশ্রেণীর মুনাফার হার কমিতে থাকে। তখন ধনতন্ত্রের সংকট আগাইয়া আসে এবং শ্রমিকশ্রেণী সংঘবদ্ধ হইয়া মালিকশ্রেণীকে অপসারণ করিয়া সমাজতন্ত্রের অথবা শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র (Dictatorship of the Proletariat) প্রতিষ্ঠা করে। তখনই শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থার সূচনা হয়।

মার্ক্স্ প্রদত্ত ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যার (Materialistic interpretation of History) ভিত্তি হইতেছে শ্রেণী-সংগ্রাম (class struggle)। মানুষের সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনধারা তাহার অর্থনৈতিক জীবনেরই একটি প্রতিবিম্ব। সমাজের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ভিত্তি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইতিহাসের দিকে তাকাইলে বরাবরই একটা শ্রেণী-সংগ্রাম দেখা যায়। প্রাচীন যুগে সমাজ-ব্যবস্থায় অভিজাতশ্রেণী ও ক্রীতদাস এই দুইটি শ্রেণীর মধ্যে স্বার্থের সংঘাত ছিল। মধ্যযুগেও সংগ্রাম ছিল ভূম্যধিকারী অভিজাত-সম্প্রদায় (feudal lords) এবং কৃষকদের মধ্যে; শিল্প-বিপ্লবের পর সেই সংগ্রাম দেখা যাইতেছে মালিক-শ্রেণী এবং শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে। যাহাদের কিছু আছে এবং যাহাদের কিছুই নাই, তাহাদের মধ্যে একটি চিরন্তন বিরোধ লাগিয়াই আছে।

মার্কসের মতে রাষ্ট্র উৎপত্তির সূচনা হইল তখনই যখন সমাজে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে মানুষ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইল। মার্কসের মতানুযায়ী শোষিত শ্রেণীকে অবদমিত করিয়া রাখিবার জন্যই শোষকগণ রাষ্ট্রের সংগঠন করে যাহাতে তাহাদের শোষণ কাজ অব্যাহত থাকে। রাষ্ট্রীয় আইনও এমনভাবে প্রযুক্ত হইতে থাকে যাহাতে শোষকশ্রেণীর স্বার্থ রাষ্ট্রীয় আইনের মধ্যে রূপ পায়। কিন্তু অবশেষে শোষিত শ্রেণী নিজেকে সংঘবদ্ধ করিয়া বিপ্লবের মাধ্যমে শোষকশ্রেণীর রাষ্ট্রব্যবস্থার অবসান ঘটাইবে এবং সমাজ হইতে

শ্রেণীসংগ্রামের শেষ চিহ্নটি দূর করিবে। তখনই প্রতিষ্ঠিত হইবে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র (Dictatorship of the Proletariat)।

মন্তব্য

মার্কসের মতবাদের প্রধান ত্রুটি হইতেছে এই যে, তিনি শুধু অর্থনৈতিক শক্তিগুলির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপর সভ্য মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনধারাকে ভিত্তিশীল করিয়াছেন। কিন্তু, অনেক সময় অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াও অন্যান্য কারণ, যে (যেমন, ধর্ম, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, ইত্যাদি) সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসকে প্রভাবিত করিতে পারে, মার্কস্ এই দিকটি মোটেই চিন্তা করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, মার্কসের মতে সমাজে শ্রেণী-সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী এবং সেই সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর জয়লাভ অবধারিত। কিন্তু শ্রেণী-সংগ্রামে পৃথিবীতে ধনতন্ত্রের অবসান হয় নাই। শ্রেণী-সংগ্রামে শ্রমিকদের জয়লাভ হইবেই, এই মতবাদটির আবেদন শ্রমিকশ্রেণীর কাছে যতই অকৃত্রিম হোক্ না কেন, ইতিহাসে তাহা এখনও একান্ত সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। সর্বশেষে, উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব (Theory of surplus value) সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময়েও মার্কস্ শুধু শ্রমিককেই উৎপাদনের একমাত্র উপকরণ হিসাবে গণ্য করিয়াছেন। কিন্তু, বাস্তবক্ষেত্রে এই ধারণাও ঠিক নহে।

সংক্ষিপ্তসার

রাষ্ট্রের সৃষ্টি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ

১। **"রাষ্ট্র ঈশ্বরের সৃষ্টি" মতবাদ**—এই মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের সৃষ্টি সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও অনুকম্পার উপর নির্ভর করে এবং রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি। রাজতন্ত্র হইল ঈশ্বর কর্তৃক অনুমোদিত শাসনপদ্ধতি। রাজা কাহারও নিকট কাজের জন্য দায়ী নহেন; প্রজাদের উচিত বিনা দ্বিধায় রাজার কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া। এই মতবাদ স্টুয়ার্ট রাজাদের আমলে ইংলণ্ডে প্রচলিত ছিল, কারণ, রাজারা নিজেদের ক্ষমতা অপ্রতিহত রাখিবার জন্য এই মতবাদ সমর্থন করিতেন। পরবর্তীকালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ এই মতবাদ সমর্থন করেন নাই।

২। **"রাষ্ট্র বলপ্রয়োগে সৃষ্ট" মতবাদ**—এই মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে বলবান কর্তৃক অপেক্ষাকৃত দুর্বলের উপর বলপ্রয়োগের দ্বারা। এই মতবাদ অনুযায়ী বলই রাষ্ট্রের ভিত্তি। কিন্তু এই মতবাদ রাষ্ট্রের সৃষ্টির পক্ষে সম্পূর্ণভাবে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নহে; তবে, বলপ্রয়োগ রাষ্ট্র সৃষ্টি অথবা রাষ্ট্র সংগঠনের পক্ষে অনেকগুলি উপাদানের মধ্যে একটি। রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব বজায় রাখার জন্য সামরিক শক্তি অপরিহার্য।

৩। **সামাজিক চুক্তি মতবাদ**—এই মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় একটি সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে। হব্‌স্, লক্, এবং রুশো এই মতবাদ প্রচার করেন। হব্‌সের মতে রাষ্ট্র সৃষ্টির আগে একটি প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ বাস করিত। এই প্রকৃতির রাজ্য ছিল কদর্য, নিঃসংগ, এবং হীন। এই অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য মানুষ নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তি করিয়া তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে রাজা বা শাসক নির্বাচন করে এবং তাহার হাতে সমুদয় ক্ষমতা অর্পণ করে। এইভাবে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। হব্‌স্ আইনগত সার্বভৌমত্বের (Legal Sovereignty) সমর্থক ছিলেন।

লকের মতে রাষ্ট্রের পূর্বে যে প্রকৃতির রাজ্য ছিল তাহা পশুসুলভ এবং দুর্বিষহ ছিল না; মানুষ সেখানে স্বাধীনতা ভোগ করিত। কিন্তু, সুশৃংখল সামাজিক জীবনের জন্য একটি রাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তখন লোকেরা একটি চুক্তি করিয়া একজনকে রাজা বা শাসক নির্বাচন করিল। রাজা সামাজিক চুক্তির শর্ত অনুযায়ী জনসাধারণের একটি প্রতিনিধিমণ্ডলীর নিকট দায়ী। লক্ রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের (Political Sovereignty) সমর্থক ছিলেন।

রুশোর মতবাদে হব্‌স্ এবং লকের মতবাদের সামঞ্জস্য দেখিতে পাই। রুশোর মতে প্রকৃতির রাজ্য ছিল ভূস্বর্গের ন্যায়। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রবর্তনের ফলে মানুষ বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন হওয়ায় প্রকৃতির রাজ্য অসহনীয় মনে হইতে থাকে। তখন এই অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য মানুষ নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিল এবং সার্বভৌম ক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখিল। এই সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ সমষ্টিগত ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল ছিল। রুশো ছিলেন গণ-সার্বভৌমত্ব বা লোকায়ত্ত সার্বভৌমত্বের (Popular Sovereignty) সমর্থক।

৪। **ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনমূলক মতবাদ**—এই মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে মানব-সমাজের এক বিবর্তনের মধ্য দিয়া। মানুষের ক্রমে ক্রমে পরিবার, গোষ্ঠী, উপজাতি এবং সর্বশেষে জাতিগঠনের মাধ্যমে একত্রে বাস করিবার প্রেরণা, ধর্মের বন্ধন, রক্ত-সম্পর্কের বন্ধন, সামরিক শক্তি, রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, এই উপাদানগুলির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে রাষ্ট্র বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। প্রথম পর্যায়ে প্রথমে পরিবারের সৃষ্টি, তারপর পরিবার হইতে গোষ্ঠী, গোষ্ঠী হইতে উপজাতি এবং সর্বশেষে উপজাতি হইতে জাতির সৃষ্টি হয়। জাতি যখন সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ করে, তখন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি হইতেছে মানব-সমাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক

ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক চেতনা। এই মতবাদের সহিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর পূর্ণ সংগতি রহিয়াছে।

রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ

১। **জৈব মতবাদ** (Organic Theory)—জৈব মতবাদে রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষিত হইয়াছে। এই মতবাদে জীবদেহের সহিত রাষ্ট্রের তুলনা করা হইয়াছে। জীবদেহে যেমন আমরা অনেক জীবকোষ দেখিতে পাই, রাষ্ট্রের মধ্যেও আমরা অনেক ব্যক্তি দেখিতে পাই, এবং জীবকোষগুলি যেমন পরস্পরের উপর নির্ভরশীল—এবং সমগ্রভাবে জীবদেহের উপর নির্ভরশীল, রাষ্ট্রের জনসাধারণও সেই প্রকার পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং সমগ্রভাবে রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল। জীবদেহ ও রাষ্ট্র উভয়েরই জীবন ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে আরম্ভ হইয়াছিল; রাষ্ট্রের আদিতে কতিপয় মানুষ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। জীবদেহের বিভিন্ন কোষ যেমন একটি স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা চালিত হয়, রাষ্ট্রের বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানও সেই প্রকার একটি সরকার দ্বারা চালিত হয়। জীবদেহের কোনও অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে ইহা যেমন পূরণ হইতে পারে সেই প্রকার রাষ্ট্রে বৃদ্ধ ও রোগগ্রস্ত ব্যক্তির স্থান নূতন লোক দিয়া পূরণ হয়। কিন্তু, এই মতবাদ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমতঃ মানবদেহের গঠন দৃঢ়সংবদ্ধ এবং মানবদেহের বিভিন্ন কোষ পরস্পর অসংলগ্ন নহে। কিন্তু, রাষ্ট্রের অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অসংলগ্ন। দ্বিতীয়তঃ, মানবদেহের ক্ষুদ্র অংশে ইহার সমগ্র চেতনা পুঞ্জীভূত থাকে; কিন্তু, রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা কোন ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানে পুঞ্জীভূত থাকে না। তৃতীয়তঃ, জীবদেহ হইতে কোন কোষ বিচ্ছিন্ন হইলে ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না; কিন্তু কোন রাষ্ট্র হইতে কোন ব্যক্তি সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া অন্য রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে।

২। **রাষ্ট্রসম্পর্কিত আদর্শবাদ** (Idealist Theory)—এই মতবাদে রাষ্ট্র যে সর্বশক্তিমান এবং রাষ্ট্রের ইচ্ছার উপরে যে জনসাধারণের কোন ইচ্ছা থাকিতে পারে না এবং রাষ্ট্রই যে জনসাধারণের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ-সাধন করিতে পারে, ইহাই বলা হইয়াছে। হেগেল, কাণ্ট, প্রমুখ দার্শনিকগণ এই মতবাদ প্রচার করেন। এই মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের একটি অতি-মানবীয় ব্যক্তিত্ব আছে এবং ইহার স্থান সব কিছুর উপরে। এই নৈতিক মানের ভিত্তিতে ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও ব্যক্তিত্বের পরিমাপ করিতে হইবে। গণতন্ত্রের পূজারীগণ এই মতবাদকে কঠোরভাবে কশাঘাত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এই মতবাদ ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক। তাহা ছাড়া,

এই মতবাদ বড় বড় রাষ্ট্রগুলিকে ছোট ছোট রাষ্ট্র বিজয়ের জন্য উৎসাহ দেয়। সুতরাং এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। তবে এই মতবাদের একটি সত্য হইল এই যে, ইহাতে সংঘ হিসাবে রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে।

রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্কসের মতবাদ (Marxist Conception of the State)

রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্কসের মতবাদ সমাজতন্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মার্কস্ প্রদত্ত সমাজতন্ত্রের তিনটি মূলসূত্র আছে ; সেইগুলি হইতেছে।

(১) উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব, (২) ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা এবং (৩) শ্রেণী-সংগ্রাম মতবাদ।

শ্রেণী-সংগ্রাম হইতেছে মার্কসের মতে রাষ্ট্র-উৎপত্তির সূচনা ; কারণ, শোষক-শ্রেণী নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাষ্ট্রের সংগঠন করে। রাষ্ট্রীয় আইনের মধ্যে শুধু শোষকশ্রেণীর স্বার্থই রূপ পায়। অবশেষে শোষিত শ্রেণী সংঘবদ্ধ হইয়া একটি বিপ্লবের মাধ্যমে ধনতন্ত্রের অবসান ঘটায় এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কতন্ত্র (Dictatorship of the Proletariat) প্রতিষ্ঠা করে। মার্কসের মতে ইতিহাসের ঘটনাবলী অর্থ-নৈতিক শক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়। কিন্তু, এই মতবাদটি ত্রুটিপূর্ণ। কারণ, অর্থনৈতিক কারণ নয়, এইরকম বিভিন্ন শক্তি সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনা-প্রবাহকে প্রভাবিত করিতে পারে।

Exercises

1. Examine the Theory of Divine Origin of the State. (২০-২২ পৃষ্ঠা)

2. Do you think that the State is the handiwork of God ? (২০-২২ পৃষ্ঠা)

3. Describe the Patriarchal and the Matriarchal Theories of the origin of the State. (২২-২৩ পৃষ্ঠা)

4. State and criticise the Theory of Force regarding the origin of the State. (২৩-২৫ পৃষ্ঠা)

5. "Government rests on force",
"Government rests on opinion."—Discuss the statements carefully. (২৩-২৫ পৃষ্ঠা)

6. How do Hobbes, Locke and Rousseau differ from one another in their interpretations of the Social Contract Theory and its implications ? (২৫-২৯ পৃষ্ঠা)

7. Criticise the Social Contract Theory of the origin of the State. (২৯-৩০ পৃষ্ঠা)

8. "Rousseau tries to combine the theories of Hobbes and Locke." Elucidate. (২৭-২৯ পৃষ্ঠা)

9. State the points of agreement and difference between Hobbes and Locke as expounders of the Social Contract theory. (২৫-২৭ পৃষ্ঠা)

10. Discuss the Social Contract theory of the origin of the State. (২৫-২৯ পৃষ্ঠা)

11. Discuss the practical importance of the Social Contract Theory in actual political development. (৩০-৩২ পৃষ্ঠা)

12. Do you find anything of permanent value in the Social Contract Theory ? (৩০-৩২ পৃষ্ঠা)

13. In what sense is the Social Contract Theory an antidote to the Theory of Divine Origin ?

[**উত্তর-সংকেত**—এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমে এই দুইটি মতবাদের মধ্যে পার্থক্য দেখাইতে হইবে। "রাষ্ট্র ঈশ্বরের সৃষ্টি" এই মতবাদে একচ্ছত্র রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে এবং রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে অসীম ক্ষমতা প্রদান করিবার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে ; তাহা ছাড়া এই মতবাদে রাজা উত্তরাধিকারসূত্রে রাজত্ব করেন। অথচ 'সামাজিক চুক্তি' মতবাদে বলা হইয়াছে যে রাষ্ট্র মানুষের একটি চুক্তির ফলে সৃষ্ট হইয়াছে। শাসক জনগণের নিকট হইতেই ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন, এবং লক্ ও রুশোর মতে শাসককে জনগণের নিকট দায়ী থাকিতে হয়। প্রথম মতবাদটিতে রাজশক্তির উৎস হইতেছে ঐশ্বরিক বিধান, দ্বিতীয় মতবাদটিতে শাসকের ক্ষমতার উৎস হইতেছে জনসাধারণের সাধারণ ইচ্ছা। প্রথম মতবাদটি স্বৈরতন্ত্রের ধারক ও বাহক ; দ্বিতীয় মতবাদটি গণতন্ত্রের পদপ্রদর্শক।]

14. "The Social Contract Theory contributed much to the growth of Democracy."—Discuss the statement. (৩০-৩২ পৃষ্ঠা)

15. "The accepted theory of the origin of the State is the Historical or Evolutionary Theory."—Discuss. (৩২-৩৪ পৃষ্ঠা)

16. "The State is a growth, not a make".—Discuss the statement. (৩২-৩৪ পৃষ্ঠা)

17. "Rightly understood, all the best elements in the several theories of the State—the Dvine Right Theory, the Force Theory and the Contract Theory—enter into the Evolutionary Theory of the State."—Discuss the statement.

(৩২-৩৪ পৃষ্ঠা)

18. "The State is a living organized unit, not a lifeless instrument."—Discuss the soundness or otherwise of this view. (৩৫-৩৭ পৃষ্ঠা)

19. Discuss the Idealist Theory of the State. (৩৭-৪০ পৃষ্ঠা)

20. "The State is an entity over and apart from people who compose it, with a real will and entity of its own." —Examine the theory of the State embodied in this statement.

(৩৭-৪০ পৃষ্ঠা)

21. Discuss the Marxist conception of the State.

(৪০-৪২ পৃষ্ঠা)

চতুর্থ অধ্যায়

সার্বভৌমত্ব
(Sovereignty)

সার্বভৌমত্বের অর্থ (Meaning of Sovereignty) :

রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে সার্বভৌমত্ব। উইলোবির (Willoughby) মতে, সার্বভৌমত্ব হইতেছে রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান ইচ্ছা। ("Sovereignty is the supreme will of the state,") উড্রো উইলসনের (Woodrow Wilson) মতে ইহা আইন সৃষ্টি করিবার এবং আইনের ক্ষমতা বাড়াইবার একটি দৈনন্দিন কার্যকরী শক্তি ("the daily operative power of forming and giving efficiency to laws")। উইলোবি এবং উইলসনের সংজ্ঞা অপেক্ষা বার্জেসের (Burgess) সংজ্ঞা অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ। বার্জেসের মতে সার্বভৌমত্ব হইতেছে প্রত্যেক প্রজা এবং ইহাদের সকল প্রকার প্রতিষ্ঠানের উপর রাষ্ট্রের মৌলিক, চূড়ান্ত এবং অসীম ক্ষমতা। ("original, absolute, unlimited power over the individual subject and over all associations of subjects". —Burgess) এই সংজ্ঞা অনুযায়ী মনে হইতে পারে যে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে। কিন্তু আইনবিশারদের মতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের মধ্যে কোনও আপাতবিরোধ নাই।

সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা অনুযায়ী রাষ্ট্রই চরম আদেশ প্রদান করিবার এবং রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সব লোক এবং প্রতিষ্ঠানকে নিজের নির্দেশ পালনে বাধ্য করিবার চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। আভ্যন্তরীণ অথবা বাহ্যিক কোন শক্তিই রাষ্ট্রের এই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার বিরোধিতা করিতে পারে না। আইনের দিক হইতে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী কোন রাষ্ট্র বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। এই সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে কোন বিশেষ ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান অথবা সংসদের হাতে।

সার্বভৌমত্বের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য (Attributes of Sovereignty) :

সার্বভৌমত্বের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা মৌলিক (original) অথবা আদিম। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব সর্বদাই একটি অনিয়ন্ত্রিত চূড়ান্ত ক্ষমতা (absolute power)। এই চূড়ান্ত ক্ষমতার বলে রাষ্ট্র সম্পূর্ণ স্বাধীন। ইহা আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যেমন চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী, সেইপ্রকার ইহা কোন বৈদেশিক শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা অসীম (unlimited)। যে কোন আইন

রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা, মৌলিক, অনিয়ন্ত্রিত ও অসীম

প্রণয়ন করিবার এবং ইহা বাতিল করিয়া দিবার ক্ষমতা সার্বভৌমের আছে। রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা অবাধভাবে দেশের ভিতরে এবং বৈদেশিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু কোন কোন লেখকের মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা অসীম নয়, ইহা সসীম। তাঁহাদের মতে ঐশ্বরিক বিধান এবং প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা অনেকক্ষেত্রে সার্বভৌমত্ব নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু, ইহা মনে রাখিতে হইবে যে সার্বভৌম-ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি যদি প্রাকৃতিক নিয়ম ভংগ করেন, তবে তাঁহাকে শাস্তি প্রদান করিবার কেহ থাকে না। সুতরাং আইনগতভাবে ইহার দ্বারা সার্বভৌমের ক্ষমতা সংকুচিত হয় নাই। আবার কেহ কেহ বলেন,

শাসনতান্ত্রিক আইন সার্বভৌম ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ণ করে না

শাসনতান্ত্রিক আইন (constitutional law) অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু ইহা সত্য নহে। শাসনতান্ত্রিক আইন নিয়ন্ত্রণ করে সরকারের ক্ষমতা, রাষ্ট্রের ক্ষমতা নহে। শাসনতান্ত্রিক আইনের পরিবর্তন এবং সংশোধন করার ক্ষমতা সার্বভৌমের সর্বদাই থাকে। কোন কোন লেখকের মতে আন্তর্জাতিক আইন (international law) রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু, এই যুক্তিটিও সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। রাষ্ট্র কখনই আন্তর্জাতিক আইন পালন করিতে আইনগতভাবে বাধ্য নয় এবং ইচ্ছা করিলে যে কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি (যাহা ইহা নিজেই পূর্বে সংগঠিত করিয়াছিল) বাতিল করিয়া দিতে পারে। সুতরাং আন্তর্জাতিক আইন কোন দেশেরই সার্বভৌম ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ণ করে না। সর্বশেষে যাঁহারা বহুত্ববাদে (pluralism) বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা বিভিন্ন ব্যক্তিসংঘ অথবা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছড়াইয়া থাকে এবং এই সমস্ত সংঘ অথবা প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করে। কিন্তু, একথা মনে রাখিতে হইবে যে বিভিন্ন সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের যতই ক্ষমতা থাকুক না কেন, বিভিন্ন সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের উপর সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান হইতেছে রাষ্ট্র এবং বিভিন্ন সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহা চূড়ান্তভাবে মীমাংসা করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রের আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আপাতদৃষ্টিতে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের সীমা থাকিলেও কার্যক্ষেত্রে রাষ্ট্রের মধ্যে ইহা অসীম। চতুর্থতঃ, সার্বভৌমত্বের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার অনন্যতা (exclusiveness)। ইহার তাৎপর্য হইতেছে রাষ্ট্রের

সার্বভৌম ক্ষমতা অনন্য ও সর্বজনীন

অভ্যন্তরে সার্বভৌম অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতা-সম্পন্ন কোন শক্তি থাকিতে পারে না। যদি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সার্বভৌম অপেক্ষাও অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী অপর কোন শক্তি থাকিত, তবে সেই শক্তির সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইত।

সার্বভৌমের চূড়ান্ত ক্ষমতা (absolute power) হইতেই আমরা এই অনুসিদ্ধান্ত করিতে পারি। পঞ্চমতঃ, সার্বভৌমের চূড়ান্ত ক্ষমতারই আর একটি রূপ হইতেছে ইহার সর্বজনীনতা (All-comprehensiveness)। রাষ্ট্রের এলাকাধীন সব ব্যক্তি, ব্যক্তিসংঘ এবং প্রতিষ্ঠানের উপরেই সার্বভৌমের ক্ষমতা বিস্তৃত থাকে। ষষ্ঠতঃ, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা সর্বদাই স্থায়ী (Permanent)। রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের সহিত সার্বভৌমের স্থায়িত্ব থাকে। সরকার অথবা শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে রাষ্ট্রের পরিবর্তন হয় না এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের পরিবর্তন হয় না। সপ্তমতঃ, সার্বভৌমত্ব কখনই হস্তান্তরযোগ্য নহে (Inalienable)। আত্ম-বিলোপ সাধন ছাড়া সার্বভৌম ক্ষমতার হস্তান্তর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। সার্বভৌমত্ব ছাড়া কোনও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। কিন্তু রাষ্ট্র যদি স্বেচ্ছায় ইহার ভূখণ্ডের একটি অংশ অন্য রাষ্ট্রকে প্রদান করে তবে সেই ভূখণ্ডের সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে না এবং সেখানে অন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে কোন রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা বিনষ্ট হয়। ইংরাজ ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া গিয়াছে। তাহাতে ইংলণ্ডের অথবা ভারতের কাহারও সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট হয় নাই। এই যুক্তি হইতেই আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার আইনানুমোদিত স্বত্ব আছে (Imprescriptible)। রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা অপপ্রয়োগ অথবা অব্যবহারের জন্য বিনষ্ট হয় না। সর্বশেষে, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা অবিভাজ্য (Indivisible)। একটি মাত্র কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান এই ক্ষমতার অধিকারী হয়,—ইহার বিভাগ অসম্ভব। সমাজে একাধিক প্রতিষ্ঠান এই ক্ষমতার অধিকারী থাকিলে সমাজব্যবস্থা অব্যাহত থাকে না এবং সেখানে কোন কিছুরই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় না। সুতরাং, একাধিক প্রতিষ্ঠান কখনই একযোগে চূড়ান্ত, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারে না। বহুত্ব-বাদীরা (Pluralists) এই যুক্তি গ্রহণ করেন না। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই কিছু না কিছু বিক্ষিপ্ত আছে। কারণ, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই নিজের ক্ষেত্রে স্বাধীন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে স্বায়ত্তশাসন এবং সার্বভৌম ক্ষমতা এক জিনিষ নহে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যতই আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অধিকারী হোক না কেন, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে কেহ অস্বীকার করিতে পারে না।

ইহা স্থায়ী এবং হস্তান্তরের অযোগ্য

সার্বভৌম ক্ষমতা অবিভাজ্য

আইনানুমোদিত সার্বভৌমত্ব ও বাস্তব সার্বভৌমত্ব (De jure Sovereignty and De facto Sovereignty) :

আইনের চোখে যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সার্বভৌম বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে আইনানুমোদিত সার্বভৌম অথবা আইনসংগত সার্বভৌম (De jure Sovereign) বলা হয়। এই সার্বভৌম শক্তি আইন-সংগতভাবে রাষ্ট্রের জনগণের অকুণ্ঠ আনুগত্য দাবী করিতে পারে। এই সার্বভৌমত্ব আইন অনুযায়ী সংগৃহীত এবং প্রযুক্ত হয়। আবার যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আইনের চোখে সার্বভৌম স্বীকৃত না হইয়াও নিজের ক্ষমতার জোরে জনসাধারণের আনুগত্য লাভ করে, সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বাস্তব সার্বভৌম (De facto Sovereign) বলা হয়। ইংলণ্ডে রাজা-সমেত-পার্লামেণ্ট (King-in-Parliament) আইনসংগতভাবে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী,—কিন্তু বাস্তবে মন্ত্রীসভা, বিশেষতঃ প্রধানমন্ত্রী সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। কারণ, রাজশক্তি বর্তমানে একটি নিয়মতান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। ইংলণ্ডে ক্রমওয়েল জোর করিয়া পার্লামেণ্ট ভাংগিয়া দিয়া ইংলণ্ডের বাস্তব সার্বভৌম (De facto Sovereign) হইয়াছিলেন। বাস্তবে সার্বভৌম ক্ষমতার যিনি অধিকারী, তিনি যদি দীর্ঘদিন সেই ক্ষমতায় আসীন থাকেন তবে জনমত নিজের অনুকূলে আনিয়া তিনি তাঁহার ক্ষমতাকে আইনসংগত সার্বভৌম ক্ষমতায় রূপান্তরিত করিতে পারেন। মিশরের প্রেসিডেণ্ট নাসের বর্তমানে আইনের চোখে এবং বাস্তবে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

নামমাত্র সার্বভৌমত্ব এবং প্রকৃত সার্বভৌমত্ব (Titular Sovereignty and Actual Sovereignty) :

যাঁহার নামে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা বলবৎ হয় অথচ বাস্তবে যিনি নিজের ইচ্ছানুযায়ী এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন না, তাঁহাকে নামমাত্র সার্বভৌম (Titular Sovereign) বলা হয়। নামমাত্র সার্বভৌম সাধারণতঃ দেশের নিয়মতান্ত্রিক (constitutional) শাসকরূপে পরিচিত হন্। ইংলণ্ডে রাজা-সমেত-পার্লামেণ্ট (King-in-Parliament) আইনের চোখে সার্বভৌম। কিন্তু রাজা সেখানে শুধু নামমাত্র সার্বভৌম। প্রকৃত সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করেন মন্ত্রিসভা এবং বিশেষতঃ প্রধান মন্ত্রী। যিনি প্রকৃতভাবে রাষ্ট্রের মৌলিক ও চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া সেই ক্ষমতাকে বলবৎ করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত সার্বভৌম (Actual Sovereign)।

আইনগত সার্বভৌমত্ব এবং রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব (Legal Sovereignty and Political Sovereignty)

সামাজিক চুক্তি মতবাদে হব্‌স্ এবং লকের মতের পার্থক্যের মধ্যে আমরা আইনগত সার্বভৌমত্ব এবং রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের পার্থক্য দেখিতে পাই। আইনগত সার্বভৌম রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োগ করিবার চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। অস্টিন (Austin) বলিয়াছিলেন, সার্বভৌমের আদেশই হইল আইন ("Law is the command of the Sovereign")। অস্টিনের মতে প্রত্যেক রাষ্ট্রের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের একজন নির্দিষ্ট লোক অথবা কর্তৃপক্ষ থাকিবেন যিনি রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতার অধিকারী ও যাঁহার মাধ্যমে চরম ক্ষমতা বলবৎ করা হয়। আইনের চোখে এই নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী, এবং রাষ্ট্রের জনসাধারণ এই নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত আদেশ মানিতে বাধ্য। এই আইনগত সার্বভৌমের আদেশ অনেক সময়ে জনমতের বিপক্ষে যাইতে পারে, কিন্তু আইনগত কোন সার্বভৌমের কোন নির্দেশের বৈধতা সম্বন্ধে বিচার করিবার মত উচ্চতর কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রের মধ্যে থাকে না। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলিতে পারি, ইংলণ্ডে রাজা-সমেত-পার্লামেণ্ট (King-in-Parliament) আইনগত সার্বভৌম বলিয়া পরিচিত এবং এই আইনগত সার্বভৌম রচিত আইন ইংলণ্ডের সর্বত্র প্রয়োগ করা হয়।

আইনগত সার্বভৌমত্ব

রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা আইনগত সার্বভৌমের হাতে থাকিলেও বাস্তবে সেই ক্ষমতা হয়ত অপর একটা কর্তৃপক্ষ প্রয়োগ করিতে পারেন। আইনগত সার্বভৌমের পিছনে যে শক্তি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে সেই শক্তিকে আমরা রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব (Political Sovereignty) বলি। রাজনৈতিক সার্বভৌম জনমতের নির্দেশে পরিচালিত হয় বলিয়া অনেক ক্ষেত্রেই ইহা আইনগত সার্বভৌমের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে এবং প্রয়োজন হইলে আইনগত সার্বভৌমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে পারে। রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের অধিকারী হইল দেশের নির্বাচকমণ্ডলী, যাহারা দেশের সরকার নির্বাচিত করেন। সরকারকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর সাধারণ নির্বাচনের অনুষ্ঠান করিতে হইবে এবং নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট অথবা রাজনৈতিক সার্বভৌমের নিকট ভোটের জন্য প্রার্থী হইতে হয়। তবে রাজনৈতিক সার্বভৌম কতটা শক্তিশালী তাহা নির্ভর করে নির্বাচকমণ্ডলীর রাজনৈতিক সচেতনতার উপর। কারণ, রাজনৈতিক সার্বভৌম কখনই রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার অধিকারী নহে। সাধারণ নির্বাচনে শক্তিশালী রাজনৈতিক সার্বভৌম

রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব

আইনগত সার্বভৌমের পরিবর্তন করাইতে পারে। শাসনতন্ত্র রচয়িতাগণের কৃতিত্ব তখনই যখন তাঁহারা রাজনৈতিক সার্বভৌম এবং আইনগত সার্বভৌমের মধ্যে সামঞ্জস্য আনিতে পারেন। কোন কোন লেখক বলেন, যেহেতু সার্বভৌমত্ব অবিভাজ্য (indivisible), সেইজন্য আইনগত সার্বভৌম এবং রাজনৈতিক সার্বভৌমের মধ্যে পার্থক্য করা উচিত নহে। কিন্তু, এই যুক্তিটি ঠিক নহে। সার্বভৌমত্বের বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে পার্থক্য করার অর্থ সার্বভৌমত্বকে বিভাগ করা নহে।

অধ্যাপক ডাইসির মতে, আইনগত সার্বভৌমকে রাজনৈতিক সার্বভৌমের নিকট নতি স্বীকার করিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে হয়ত রাজনৈতিক সার্বভৌম খুব ক্ষমতাশালী না হইতে পারে, তবে ইহা ঠিকই যে রাজনৈতিক সার্বভৌম আইনগত সার্বভৌমের উপর প্রভাব বিস্তার করে। রাজনৈতিক সার্বভৌমের আইনগত সার্বভৌমের ন্যায় বিশেষ রূপ না থাকিতে পারে,—কিন্তু, ইহার এমন একটি শক্তি আছে যাহা কোনও রাষ্ট্রনায়কই নিশ্চিন্ত মনে উপেক্ষা করিতে পারেন না। অধ্যাপক গিলক্রাইস্ট বলেন, "Political Sovereign is the sumtotal of the influences in a state which lie behind the law."

পূর্বেই বলা হইয়াছে, ইংলণ্ডের আইনগত সার্বভৌম হইতেছে রাজা-সমেত-পার্লামেণ্ট (King-in-Parliament) আর রাজনৈতিক সার্বভৌম হইতেছে নির্বাচকমণ্ডলী (electorate)।

গণ-সার্বভৌমত্ব (Popular Sovereignty) :

গণ-সার্বভৌমত্ব মতবাদ অনুযায়ী জনসাধারণের হাতেই রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতা (All powers to the People) থাকে। রুশো তাঁহার সামাজিক চুক্তি মতবাদ আলোচনাকালে জনগণের সার্বভৌমত্বের কথা বলিয়াছিলেন। স্বৈরতন্ত্র হইতে রাষ্ট্রকে গণতন্ত্রে উন্নীত করাই গণ-সার্বভৌমত্ব মতবাদের শ্রেষ্ঠ অবদান। অধ্যাপক রিচির (Prof. Ritchie) মতে জনসাধারণ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে। প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণ নির্বাচনী শক্তির (electoral power) সাহায্যে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে, পরোক্ষভাবে জনসাধারণ নিজেদের প্রভাবের সাহায্যে অথবা বিদ্রোহ করিবার শক্তির সাহায্যে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে। মোটের উপর সার্বভৌম ক্ষমতা হইতেছে শক্তির জিনিষ এবং ইহা নির্ভর করে জনগণের আনুগত্য আদায় করিবার সামর্থ্যের উপর। সুতরাং সংগ্রামের ক্ষেত্রে জনসাধারণের আনুগত্য আদায় করিবার সামর্থ্য যে শক্তির থাকে তাহাই সার্বভৌম। গণ-সার্বভৌমত্ব মতবাদে জনগণই

গণ-সার্বভৌম

দেশের শাসক। জনসাধারণ রাষ্ট্রের প্রতি যে আনুগত্য প্রদর্শন করে সেই আনুগত্য নিজেদেরই প্রতিনিধির প্রতি। "জনগণের কথা, ভগবানেরই কথা" ("Voice of the People is the voice of God")—ইহাই ছিল রুশোর গণ-সার্বভৌমত্বের মূল কথা। রাষ্ট্র যখন জনসাধারণের আনুগত্য আদায় করিতে সমর্থ হইবে অর্থাৎ, যখন রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে, তখন বুঝিতে হইবে রাষ্ট্র জনসাধারণের ইচ্ছানুযায়ী জনসাধারণেরই প্রতিনিধি কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে জনগণ রাষ্ট্র অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাশালী। কারণ, জনমতকে কখনই দমন করিয়া রাখা যায় না এবং জনমত যদি কখনও রাষ্ট্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে যায় তবে বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়।

গণ-সার্বভৌমত্ব মতবাদটি নিম্নলিখিত যুক্তি অনুযায়ী আমরা সমালোচনা করিতে পারি।

গণ-সার্বভৌমত্ব মতবাদের সমালোচনা

প্রথমতঃ, "জনগণ", এই কথাটি নির্দিষ্ট জনসমষ্টিকে বুঝায় না। দেশের মোট জনসমষ্টির একটি বিশেষ অংশ, অর্থাৎ, নির্বাচকমণ্ডলী, রাষ্ট্রের শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। সকলেই ভোট দানের অধিকার লাভ করে না। দ্বিতীয়তঃ, প্রশ্ন হইতেছে, কিভাবে জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে। নির্বাচকমণ্ডলী ভোটের দ্বারা প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া সরকার গঠন করে এবং প্রয়োজন হইলে নির্বাচনে সরকারের বিরুদ্ধে ভোট প্রদান করিয়া সরকারের পতন ঘটায়। সেক্ষেত্রেও নির্বাচকমণ্ডলীর সকলেই ভোট প্রদান করে না এবং যাহারা ভোট প্রদান করে তাহাদের অধিকাংশই দলীয় নেতাদের ইচ্ছাকেই নিজেদের ইচ্ছা অপেক্ষা বড় করিয়া দেখে। সুতরাং ভোটের অধিকারের সাহায্যে জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে, এবং গণ-সার্বভৌমত্বের অর্থ নির্বাচনী শক্তির সাহায্যে রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করা—এই মতবাদ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নহে। তাহা ছাড়া, অনেকক্ষেত্রে সক্রিয় সংখ্যালঘু ভোটাধিকারীগণ সমগ্র নির্বাচকমণ্ডলীকে এবং এমনকি সরকারকেও প্রভাবিত করিতে পারে। সেক্ষেত্রে 'গণ-সার্বভৌমত্ব' বাক্যটির মধ্যে যথেষ্ট অসংগতি দেখা যায়।

তৃতীয়তঃ, জনসমষ্টি সুসংবদ্ধভাবে নিজেদের সাধারণ ইচ্ছা ব্যক্ত করিতে অক্ষম। কারণ, জনগণের ইচ্ছা ব্যক্ত করিবার এবং তাহা রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়নকালে বিবেচনা করিবার দায়িত্ব হইল আইনসভার। জনসাধারণের একটি খুবই ক্ষুদ্র অংশ আইনসভার মাধ্যমে রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে সুসংবদ্ধভাবে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করিতে পারে। রাষ্ট্রের জনসাধারণ একত্রিত হইয়া কখনও নিজেদের আইন প্রণয়ন করিতে পারে না, তাহা করিতে হইলে

আইনসভার মাধ্যমে করিতে হয়। শুধু তাহাই নহে, যদি কখনও জনগণ প্রবল জনমতের মাধ্যমে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয়, তখনই সেই অভিব্যক্ত জনমত আইন বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। কেননা, বিচারালয়ের বিচারপতিগণ কখনও জনমতের নির্দেশ অনুযায়ী কোন জিনিসের বিচার করেন না;—তাঁহারা কোন জিনিসের বিচার করেন ন্যায় এবং আইন অনুযায়ী। সুতরাং গণ-সার্বভৌমত্বের দাবি সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। চতুর্থতঃ, অধ্যাপক রিচি (Prof. Ritchie) বলেন, শক্তির পরীক্ষা দ্বারা আমরা দেখিতে পাই জনগণের শক্তি রাষ্ট্রের অপেক্ষা বেশী এবং ইহাতে গণ-সার্বভৌমত্বের দাবী সমর্থন করা চলে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে অল্পসংখ্যক সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর সাহায্যেই রাষ্ট্র লক্ষ লক্ষ লোকের বশ্যতা স্বীকার করাইতে পারে। সুতরাং, অধ্যাপক রিচির যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, গণ-সার্বভৌমত্ব মতবাদ সম্পূর্ণভাবে সমর্থনযোগ্য নয়। এই মতবাদের চূড়ান্ত বিশ্লেষণেই ইহা প্রতীয়মান হয় যে গণতান্ত্রিক সরকার সর্বদাই জনগণের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। পরিপূর্ণ রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন নির্বাচকমণ্ডলীকেই আমরা গণ-সার্বভৌম বলি। 'এই মতবাদের মূল কথা হইল, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সর্বাপেক্ষা প্রধান শক্তি হইল জনমতের শক্তি এবং কোনও শক্তিই জনমতকে তুচ্ছজ্ঞান করিতে পারে না। জনগণের এই সার্বভৌম ক্ষমতাই একমাত্র রাষ্ট্রে স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিরোধ করিতে পারে। অধ্যাপক লাস্কির মতে যে শক্তি দ্বারা জনস্বার্থ উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয়, তাহাই হইল গণ-সার্বভৌম শক্তি। যদি রাষ্ট্রীয় আইন জনস্বার্থ রক্ষায় ব্যর্থ হয় তবে এই গণ-সার্বভৌম শক্তির সাহায্যে জনগণ রাষ্ট্রের আইন অমান্য করে। লাস্কির মতে রাষ্ট্রের আইন জনস্বার্থের অথবা জনগণের বিভিন্ন চাহিদার উপর ভিত্তিশীল। ("Legal imperatives are the functions of effective demands of the people."—Laski)।

অস্টিন প্রদত্ত সার্বভৌমত্ব (Austin's theory of Sovereignty)

বিখ্যাত আইনবিদ অস্টিন (Austin) আইনবিদের দৃষ্টিভংগী লইয়া 'সার্বভৌমত্ব' তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ১৮৩২ সালে অস্টিন তাঁহার মতবাদ প্রকাশ করেন। অস্টিনের মতে, "যদি কোন সমাজের কোনও নির্দিষ্ট উর্দ্ধতন মানবীয় কর্তৃপক্ষ (কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি অথবা ব্যক্তি-সংসদ) সমাজের অন্য কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষের আনুগত্য অথবা বশ্যতা স্বীকার না করেন, অথচ সমাজের অধিকাংশ লোকের নিকট হইতে স্বভাবজাত আনুগত্য প্রাপ্ত হন, তবে সেই সমাজের ঐ নির্দিষ্ট উর্দ্ধতন মানবীয় কর্তৃপক্ষ হইলেন সার্বভৌম এবং ঐ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ লইয়া গঠিত সমাজ হইল রাজনৈতিক ও স্বাধীন।"

("If a determinate human superior, not in a habit of obedience to a like superior, receives habitual obedience from the bulk of a given society, that determinate superior is the sovereign in that society, and that society, including the determinate superior, is a society political and independent."—Austin)।

অস্টিন প্রদত্ত সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি চোখে পড়ে :—

অস্টিনের মতবাদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য

(১) অস্টিনের মতে সার্বভৌম হইবেন একটি নির্দিষ্ট মানবীয় কর্তৃপক্ষ। জনমত অথবা 'সাধারণ ইচ্ছা' প্রভৃতি অ-ব্যক্তিবাচক সংজ্ঞাগুলিতে সার্বভৌমত্ব আরোপ করা চলে না। এই নির্দিষ্ট মানবীয় কর্তৃপক্ষের অর্থাৎ নির্দিষ্ট ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিসংসদের আদেশই আইন বলিয়া পরিগণিত হইবে। (২) এই নির্দিষ্ট মানবীয় কর্তৃপক্ষ হইবেন সমাজের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। এই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কাহারও প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে না। বরং এই কর্তৃপক্ষ সমাজের অধিকাংশ লোকের স্বভাবজাত আনুগত্য লাভ করেন। (৩) এই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ঈশ্বরের প্রদত্ত ক্ষমতা নয়। ইহা সম্পূর্ণভাবে মানবীয়। (৪) সমাজের অধিকাংশ লোকের স্বভাবজাত আনুগত্য যদি সার্বভৌম প্রাপ্ত হন, তবেই যথেষ্ট। সমাজের সকল লোকের আনুগত্য প্রাপ্ত না হইলেও নির্দিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সার্বভৌম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন। তবে সেই আনুগত্য স্বভাবজাত আনুগত্য হইতে হইবে। (৫) সার্বভৌমের আদেশই আইন বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। অর্থাৎ, সার্বভৌমের ক্ষমতা চূড়ান্ত ও অসীম। (৬) যেহেতু সার্বভৌম একটি নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ, সেইজন্য সার্বভৌমত্ব অনন্য এবং অবিভাজ্য।

সমালোচনা

গণ-সার্বভৌমত্ব এবং রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হয় নাই

সিজউইক, ক্লার্ক, স্যার হেনরী মেইন্ প্রমুখ লেখকগণ অস্টিনের সার্বভৌমত্ব মতবাদের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। প্রথমতঃ, অস্টিনের মতবাদ গণতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। তিনি আইন প্রণয়নে রাষ্ট্রের স্বৈর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া গণ-সার্বভৌমকে অস্বীকার করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদ শুধু আইনগত সার্বভৌমত্বের কথাই আলোচনা করিয়াছে, রাজনৈতিক সার্বভৌমকে এখানে একেবারেই উপেক্ষা করা হইয়াছে। অথচ আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে আইনগত সার্বভৌম রাজনৈতিক সার্বভৌমের নির্দেশের দ্বারা

সীমাবদ্ধ। আইনবিদগণের নিকট রাজনৈতিক সার্বভৌমের গুরুত্ব অল্প থাকিলেও গণতন্ত্রের যুগে রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের গুরুত্ব আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। স্যার হেন্‌রী মেইনের মতে অনেক সময় সার্বভৌম ক্ষমতা এমন কতিপয় লোকের হাতে ন্যস্ত থাকে যাহাদের অস্টিনের মতানুযায়ী নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ মনে করা যায় না। তৃতীয়তঃ, স্যার হেন্‌রী মেইনের মতে আইন সম্বন্ধে অস্টিনের ধারা ত্রুটিপূর্ণ। অস্টিনের মতে সার্বভৌমের আদেশই আইন। কিন্তু বহু প্রথাগত আইন (customary laws) আছে যেগুলি কোন সার্বভৌমের আদেশ নহে। হেন্‌রী মেইনের মতে অস্টিন যে প্রকার নির্দিষ্ট উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কথা বলিয়াছেন, পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ ছিলেন সেই প্রকার নির্দিষ্ট উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ এবং সার্বভৌম। কিন্তু রণজিৎ সিংহ কখনই বিভিন্ন প্রথাগত আইন অমান্য করেন নাই এবং সেই আইনগুলিও তিনি নিজের আদেশে জারী করেন নাই। নিজের সার্বভৌম ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি কখনই দেশের লোকাচার অথবা প্রথাগত আইনের বিরুদ্ধে যাইতে সাহস করেন নাই। স্যার হেন্‌রী মেইনের এই সমালোচনার উত্তরে অস্টিন বলেন, "সার্বভৌম যাহা অনুমোদন করেন, তাহাই তাঁহার আদেশ" ("What the Sovereign permits he commands."—Austin) অর্থাৎ, এই প্রথাগত আইনগুলি চলিতে দিবার অনুমোদনের দ্বারাই তিনি এইগুলিকে আইনে পরিণত হইবার আদেশ দিয়াছেন। কিন্তু এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, যেখানে কিছু পরিবর্তন করার ক্ষমতা নাই, সেখানে তাহা অনুমোদন করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। চতুর্থতঃ, অস্টিন্ একটি নির্দিষ্ট মানবীয় কর্তৃপক্ষের উপর সার্বভৌমিকতা আরোপ করায় সার্বভৌমিকতাকে সরকারের একটি বৈশিষ্ট্য-রূপে মনে করা হইয়াছে। কিন্তু, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, সরকারের নহে। পঞ্চমতঃ, বহুত্ববাদীরা (Pluralists) অস্টিনের মতবাদ সমালোচনা করিয়া বলেন যে ইহা সার্বভৌমকে স্বেচ্ছাচারীতে পরিণত করে। রাষ্ট্র কখনই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী নয়, রাষ্ট্রের ভিতরে বিভিন্ন সংঘ অথবা প্রতিষ্ঠানের নিজ নিজ ক্ষেত্রে কিছু না কিছু সার্বভৌম ক্ষমতা আছে। অধ্যাপক বার্কারের মতে রাষ্ট্রের সহিত বর্তমানে আর মানুষের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই, প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বর্তমানে আমরা দেখিতে পাই রাষ্ট্র ও সংঘের মধ্যে। ("No longer we write Man vs. the State, we write Group vs. the State."—Barker)

প্রথাগত আইনের ভূমিকা

বহুত্ববাদীদের যুক্তি

পরিশেষে ডক্টর গার্নারের মতে, অস্টিনের প্রধান ভুল হইয়াছিল, তিনি

আইনগত সার্বভৌমত্বের উপর অত্যধিক গুরুত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সাধারণ আইনের পিছনে যে সমস্ত শক্তি এবং প্রভাব কাজ করে তিনি সেইগুলি একেবারে উপেক্ষা করিয়াছেন। "লোকে প্রথমতঃ মনে করে অস্টিনের মতবাদ স্বতঃসিদ্ধ, ইহার পর লোকে জানিতে পারে এই মতবাদের অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি আছে এবং সর্বশেষে লোকে তাঁহার সমস্ত বিশ্লেষণটিকেই হাস্যাস্পদ এবং তত্ত্বগত মনে করে।"

("One begins by thinking Austin self-evident, one learns that many qualifications have to be made and finally, one ends by treating his whole method as absurd and theoretic.")

তবুও মনে রাখিতে হইবে, আইনগত সার্বভৌমত্বের ব্যাখ্যা হিসাবে অস্টিনের মতবাদ স্পষ্ট এবং যুক্তিসংগত। বিশেষতঃ তিনি আইনগত সার্বভৌমকে রাজনৈতিক সার্বভৌম হইতে পৃথকরূপে দেখিয়া ইহার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। অস্টিনের প্রধান কৃতিত্ব, তিনি "সার্বভৌমত্ব" তত্ত্বটিকে একটি বিশেষ রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তবে তাঁহার মতবাদ অসম্পূর্ণতা-দোষে (inadequacy) দুষ্ট।

সার্বভৌম ক্ষমতার বহুত্ববাদ (Pluralistic conception of sovereignty):

সার্বভৌমিকতার একত্ববাদ (monistic view) সমর্থনকারীদের মতে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সকল প্রকার প্রতিষ্ঠান ও সংঘের উপর সার্বভৌমের চূড়ান্ত এবং অবাধ ক্ষমতা আছে। বোডিন, হব্‌স্ এবং অস্টিন সার্বভৌমত্বের এই বৈশিষ্ট্যটি সমর্থন করেন। এই একত্ববাদের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বহুত্ববাদের (Pluralism) আবির্ভাব হয়। রাষ্ট্র সর্বশক্তিমান এবং চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হইলে ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবে এবং বিভিন্ন সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপর্যস্ত হইবে—এই ধারণা হইতেই সার্বভৌম ক্ষমতার বহুত্ববাদের (Pluralistic view) সমর্থকগণ রাষ্ট্রের অসীম ক্ষমতা নিজেদের মতবাদের সাহায্যে প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বহুত্ববাদীদের মধ্যে ফিগিস্ (Figgis), মেইটল্যাণ্ড (Maitland), বার্কার (Barker), ম্যাক আইভার (Mac Iver) এবং লাস্কিই (Laski) প্রধান।

সার্বভৌম ক্ষমতার একত্ববাদের বিরুদ্ধে বহুত্ববাদীদের সমালোচনা প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের বিস্তর পরিবর্তন হইয়াছে। বর্তমানে রাষ্ট্র শুধু শক্তির ধারক নহে,—রাষ্ট্রকে বর্তমানে 'কল্যাণ-রাষ্ট্র' হইতে হয় জনসাধারণের সেবার মাধ্যমে। নূতন ক্রিয়াকলাপের মধ্যে রাষ্ট্রের ভিতরে

জনগণের আনুগত্য শুধু রাষ্ট্রের প্রতি সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। একটি নাগরিক একই সময়ে নিজের রাজনৈতিক দল, ধর্ম-সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, ক্লাব প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, অধ্যাপক লাস্কির মতে সার্বভৌম ক্ষমতা চূড়ান্ত অথবা অনন্ত নয় ইহা বহুমুখী, নিয়মতান্ত্রিক এবং দায়িত্বশীল। ইহা যে ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাহার দ্বারাই ইহা সীমিত, ইহার আদর্শের মধ্যে দিয়া ইহা নির্দেশাত্মক—, আধিপত্য বিস্তারকারী নহে। ইহা কখনই স্থায়ী নহে, নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতিটি ইচ্ছা অনুযায়ী ইহা পরিবর্তনশীল। ইহার ক্ষমতা বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বিভিন্ন কার্যসমষ্টির মধ্যে ছড়াইয়া থাকে। আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উভয়ভাবেই ইহার ক্রিয়াকলাপ সীমিত এবং পর্যালোচনার অধীন। প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ন্যায় রাষ্ট্রও একটি প্রতিষ্ঠান যাহার বিশেষ কাজ হইল রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের সমন্বয় করা। ইহা হইতেছে একটি জনসেবার সংস্থা।

সার্বভৌম ক্ষমতার একত্ববাদের বিপক্ষে যুক্তি

চার্চ, শ্রমিকসংঘ, বিশ্ববিদ্যালয়, রাজনৈতিক দল, সেবামূলক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি বিভিন্ন সংঘ জনসাধারণের সংঘবদ্ধতার প্রবৃত্তির ফলেই হইয়াছে। রাষ্ট্রের যেমন উপযোগিতা আছে, এই প্রতিষ্ঠানগুলিরও সেই প্রকার উপযোগিতা আছে। এইসব সংঘের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে রাষ্ট্রের সংগে ব্যক্তিবিশেষের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। বর্তমানে আমরা দেখিতে পাই বিভিন্ন সংঘ অথবা প্রতিষ্ঠানের সংগে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক। অধ্যাপক লাস্কির মতে রাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার থাকা উচিত এবং রাষ্ট্র ও বিভিন্ন সংঘের মধ্যে সার্বভৌম ক্ষমতা বণ্টন করিয়া দেওয়া উচিত। রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ একটি নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ। অধ্যাপক ম্যাক আইভার (Mac Iver) বলেন, একটি পেন্সিল কাটিবার পক্ষে যেমন একখানি কুঠার খুবই অনুপযোগী অস্ত্র, মানুষের জীবনের বিভিন্ন সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলির বিকাশের পক্ষেও রাষ্ট্র সেইরূপ অনুপযোগী। বহুত্ববাদীদের মতে সসীম রাষ্ট্রকে কখনই সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী করা উচিত নহে।

তৃতীয়তঃ, সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি, যেমন, শ্রমিকসংঘ, বিশ্ববিদ্যালয়, সেবাব্রতী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি, নিজ নিজ কার্যক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেরই নিজস্ব শাসনতন্ত্র আছে এবং ইহার সদস্যেরা সেই শাসনতন্ত্র মানিয়া না চলিলে শাস্তি পায়। যেমন কোন ছাত্র অথবা ছাত্রী যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেওয়ার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসনতন্ত্র ভংগ করে তখন বিশ্ববিদ্যালয় সেই ছাত্র অথবা ছাত্রীকে শাস্তি প্রদান করিতে পারে

সেক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত ইহা নিজস্ব শাসনতন্ত্র অনুযায়ী পরিচালিত হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সংগত কারণেই থাকা উচিত এবং সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব করিবার কোন সংগত কারণ নাই। সার্বভৌম ক্ষমতা কখনই রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার নহে। যে কোন সংঘের নিজের গণ্ডীর মধ্যে সার্বভৌম ক্ষমতা দাবী করিবার অধিকার আছে। এইভাবে বহুত্ববাদের সমর্থকগণ রাষ্ট্রের একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, বহুত্ববাদের সমর্থকগণ মনে করেন যে, রাষ্ট্রের যতই সার্বভৌম ক্ষমতা থাকুক না কেন, রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গঠিত জনমত যদি কোনও আইনের তীব্র বিরোধিতা করে তখন রাষ্ট্রকে নতি স্বীকার করিতে হয়।

সর্বশেষে রাষ্ট্রের চূড়ান্ত এবং অনন্য ক্ষমতা যাঁহারা স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা যেরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সীমাবদ্ধ, সেই প্রকার আন্তর্জাতিক আইন অথবা চুক্তির দ্বারাও ইহা সীমাবদ্ধ। এইভাবে বহুত্ববাদীগণ আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উভয়দিকেই রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার সীমারেখা দেখাইয়াছেন।

সমালোচনা

কতিপয় ক্ষেত্রে বহুত্ববাদীদের মতবাদ সত্য। কিন্তু, এই মতবাদও সম্পূর্ণভাবে সত্য নহে। অধ্যাপক লাস্কি তাঁহার "Grammar of Politics" বইয়ের চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায় বহুত্ববাদের স্বয়ং-সম্পূর্ণতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইলেও রাষ্ট্রের একটি বিশেষ দায়িত্ব আছে। তাহা হইতেছে প্রতিষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সমন্বয় আনা। এই কাজের দায়িত্ব শুধু রাষ্ট্রেরই। একথা ভুলিলে চলিবে না যে রাষ্ট্রের অবর্তমানে এমন কোনও সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান নাই যাহা বিভিন্ন সংঘের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দূর করিতে পারিবে অথবা কতকগুলি সাধারণ সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে। কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে অন্যান্য সংঘের মধ্যে কলহের সৃষ্টি হইলে রাষ্ট্র নিরপেক্ষ বিচারকের ভূমিকা গ্রহণ করিবে। কিন্তু, সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কোন সংশয়ের অবকাশ নাই।

সার্বভৌম ক্ষমতার বহুত্ববাদ সম্পূর্ণভাবে সত্য নহে

বহুত্ববাদের শ্রেষ্ঠ অবদান হইল ইহা রাষ্ট্রকে স্বৈরতন্ত্র হইতে গণতন্ত্রে উন্নীত করিয়াছে। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতার

উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করিয়া বহুত্ববাদ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতা প্রমাণ করিয়াছে এবং তাহাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করিয়াছে। বহুত্ববাদ রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বিলোপ করিতে পারে নাই। তবে এই মতবাদ রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সার্বভৌম সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার, বিশেষতঃ, আইনগত সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার সংস্কার সাধন করিতে পারিয়াছে। তবে সমাজের মধ্যে রাষ্ট্রই যে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান এই সত্য বহুত্ববাদীরা কখনই অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

সার্বভৌম ক্ষমতার সীমা (Limits to Sovereignty or Theory of Limited Sovereignty) :

সার্বভৌমত্বের প্রচলিত অর্থানুযায়ী ইহা রাষ্ট্রের চূড়ান্ত, অনন্য এবং অপ্রতিহত ক্ষমতা এবং রাষ্ট্র ইহা অবাধে প্রয়োগ করিতে পারে। কিন্তু যদিও আইনের দিক হইতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা চূড়ান্ত এবং অসীম, রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ যে নিয়ন্ত্রিত করা যায় না তাহা নহে। অধ্যাপক ডাইসির মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার উপর দুইপ্রকার নিয়ন্ত্রণ আছে, একটি বাহ্যিক এবং অপরটি আভ্যন্তরীণ। বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ আসে আন্তর্জাতিক আইন অথবা অপর কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত চুক্তির দিক হইতে। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ হইতেছে ঐশ্বরিক বিধান, জনমত এবং শাসনতান্ত্রিক আইন।

বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সীমা

কিন্তু, চিন্তা করিলে দেখা যায় যে কোন রাষ্ট্রেরই সার্বভৌম ক্ষমতা চূড়ান্তভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় না। আন্তর্জাতিক আইন এবং চুক্তি রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে আংশিক নিয়ন্ত্রণ করে সন্দেহ নাই। যদি কোন রাষ্ট্র অপর কোন রাষ্ট্রের সহিত কোন সন্ধি অথবা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, তবে সেই সন্ধি এবং চুক্তির সর্ত ইহাকে পালন করিতে হয়। কিন্তু কোন রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক আইন মানিয়া চলিতে বাধ্য নয়। আন্তর্জাতিক চুক্তি অথবা সন্ধি হইতে যে কোন রাষ্ট্র নিজের নাম যে কোন সময়ে বাতিল করিতে পারে। সুতরাং আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে। আন্তর্জাতিক আইন পালন সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের সম্মতির উপর নির্ভর করে। তবে নিজের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইন পালন করে। কিন্তু এই আইনগুলি রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে, এই কথা বলা চলে না।

আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তি

রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার আভ্যন্তরীণ সীমার মধ্যে ঐশ্বরিক বিধান একটি। কিন্তু বর্তমান যুগে ঐশ্বরিক আইন, স্বভাবের নিয়ম এবং মানবতার দোহাই—ইহাদের কোনটিই রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রেই বর্তমানকালে রাষ্ট্রীয় আইন নীতিশাস্ত্রের বিরোধী হয়,—কিন্তু তাহাতে রাষ্ট্রীয় আইনের পরিবর্তন হয় না। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধান করাই রাষ্ট্রের প্রথম আইন এবং এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় আইন নীতির সংস্রব বর্জিত হইতে পারে। ("The safety of the State is its first law and to realise the end, it must be above morality.)" ইংলণ্ডে রাজা-সমেত-পার্লামেণ্ট (King-in-Parliament) যদি নীতিবিবর্জিত কোন আইন প্রণয়ন করে তবে ইংলণ্ডের আদালত সেই আইন কার্যকরী করিতে বাধ্য।

ঐশ্বরিক বিধান

ঐশ্বরিক আইন যেমন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না, শাসনতান্ত্রিক আইনও (Constitutional Law) সেই প্রকার রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। শাসনতান্ত্রিক আইন সরকারী ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। কিন্তু সরকারী ক্ষমতা এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা এক জিনিষ নহে। রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক আইন পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা আছে।

শাসনতান্ত্রিক আইন

জনমত যত শক্তিশালীই হোক্ না কেন, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার শক্তি ইহার নাই। জার্মানীতে হিটলার যখন শাসনভার নিজের হাতে গ্রহণ করেন, তখন তিনি জনমতের প্রবল বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও আগেকার শাসনতন্ত্র বাতিল করিয়া নূতন শাসনতন্ত্র চালু করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আইনতঃ রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা সীমাবদ্ধ নহে। জনমতের চাপের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র যদি সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে, তবে রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করা যায় না। তবে যতক্ষণ রাষ্ট্র জনমত, শাসনতান্ত্রিক আইন এবং আন্তর্জাতিক আইন মানিয়া চলে ততক্ষণ নিজের ইচ্ছায়ই রাষ্ট্র ইহার সার্বভৌম ক্ষমতাকে কৃত্রিম উপায়ে নিয়ন্ত্রিত করে। সম্প্রতি বহুত্ববাদীরা মনে করেন যে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা সসীম হওয়া প্রয়োজন। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের, যেমন, বিশ্ববিদ্যালয়, রাজনৈতিক দল শ্রমিকসংঘ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, প্রভৃতির নিজ নিজ ক্ষেত্রে যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে এবং সেখানে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ থাকে না। এই সকল প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব স্বাধীনতা এবং ক্ষমতা রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে আংশিক সীমাবদ্ধ করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হয় না। কারণ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যদি কলহের সৃষ্টি হয়, তবে তাহা মীমাংসা করিবার

দায়িত্ব হইতেছে রাষ্ট্রের। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সংঘের যে সকল ক্রিয়াকলাপ থাকে, সেইগুলির মধ্যে প্রকৃত সমন্বয় সাধন করার দায়িত্বও রাষ্ট্রের উপর।

সার্বভৌম ক্ষমতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার অবিভাজ্যতা (indivisibility), কিন্তু সাম্প্রতিককালে অছিশাসনব্যবস্থা (Mandated territories), দ্বি-রাষ্ট্রায়ত্ত শাসন-ব্যবস্থা (Condominium) প্রভৃতি উদ্ভবের ফলে সার্বভৌমিকতার অবিভাজ্যতা সম্বন্ধে বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। অছি-শাসন-ব্যবস্থায় একটি অনগ্রসর জাতি এক বা একাধিক উন্নত এবং সভ্য জাতির তত্ত্বাবধানে শাসিত হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে মনে হয় যে রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি দুইটি ভিন্ন কর্তৃপক্ষ প্রয়োগ করেন। দ্বি-রাষ্ট্রায়ত্ত শাসন-ব্যবস্থায় একটি রাজ্যের শাসন কর্তৃপক্ষ হইতেছেন যুগপৎ দুইটি রাষ্ট্র। পূর্বে সুদানের শাসনভার যুগপৎ মিশর ও গ্রেট্ ব্রিটেনের উপর ন্যস্ত ছিল। সেক্ষেত্রেও সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করিত দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে সার্বভৌম ক্ষমতা কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ভাগাভাগি হয় বলিয়া মনে হয়; বিশেষতঃ যদি রাজ্য সরকারগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া অবাধভাবে নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে।

সার্বভৌম ক্ষমতা প্রকৃতই অবিভাজ্য কিনা

কিন্তু অছিশাসন-ব্যবস্থা এবং দ্বি-রাষ্ট্রায়ত্ত শাসনব্যবস্থা চিরকাল স্থায়ী হয় না। সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবেই এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। সুতরাং সাময়িকভাবে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা অপর রাষ্ট্র কর্তৃক প্রয়োগ করা হয়। অছিশাসন-ব্যবস্থা অথবা দ্বি-রাষ্ট্রায়ত্ত শাসনব্যবস্থার অধীনে কোন রাষ্ট্রকে আমরা পূর্ণ সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্র বলিতে পারি না। কেননা, ইহা তখনও পরাধীন থাকে। এক সংগে দুইটি রাষ্ট্রই সেই ক্ষেত্রে সমানভাবে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারে না। যদি সার্বভৌম ক্ষমতার বিভাগ করা হয়, তবে ইহার বিনাশ হয়। সার্বভৌম ক্ষমতার যদি বিভাগ করা না হয়, অর্থাৎ রাষ্ট্রের হাতে যদি ইহা বিনষ্ট না হয়, তবে নিশ্চয়ই ইহা একটি অথবা দুইটি রাষ্ট্র কর্তৃক মিলিতভাবে গঠিত একটি আইনসভা অথবা শাসক-মণ্ডলী অথবা অনুরূপ কোন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থার হাতে ন্যস্ত থাকে। দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থায় সরকারের ক্ষমতার ভাগ হয়, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার ভাগ হয় না। শুধু যে সমস্ত বিষয়গুলির উপর শাসনক্ষমতা প্রয়োগ হয়, সেই বিষয়গুলিকে ভাগ করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হয়। প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রেই প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্রীয়

সম্পর্ক, অর্থসংক্রান্ত ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় এবং রাষ্ট্রের সামগ্রিক স্বার্থের সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌম ক্ষমতার বিভাগ হয় বলা ঠিক নয়। সার্বভৌম ক্ষমতা সর্বদাই অবিভাজ্য। ইহাকে ভাগ করিলে ইহার বিনাশ হয়।

সার্বভৌম ক্ষমতা সর্বদাই অবিভক্ত

সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থান (Location of Sovereignty) :

রাষ্ট্রের মধ্যে সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থান সহজে নির্ধারণ করা যায় না। বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদ্ সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থিতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। প্রথমতঃ, কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গণ-সার্বভৌমত্ব অথবা সর্বজনীন সার্বভৌমত্বের (Popular Sovereignty) মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু, জনগণের মধ্যে শুধু একটি নির্দিষ্ট অংশ নির্বাচকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। কার্যক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে (বিশেষতঃ রাষ্ট্রের সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে) দাঁড়াইয়া জনগণ কখনই অবাধে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন লেখক বলেন, যে কর্তৃপক্ষ শাসনতন্ত্র পরিবর্তন এবং সংশোধন করিবার অধিকারী সেই কর্তৃপক্ষকেই আমরা সার্বভৌম বলিতে পারি। এই মতবাদ অনুযায়ী ইংলণ্ডে রাজা-সমেত-পার্লামেণ্ট (King-in-Parliament) সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। কারণ, ইহা সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতি অনুযায়ী শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন অথবা সংশোধন করিতে পারে। কিন্তু আমেরিকায় কংগ্রেস অথবা রাজ্য আইনসভাগুলি এককভাবে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন অথবা সংশোধন করিতে পারে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র খুব অনমনীয় (rigid)। সেইদেশে শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের জন্য কংগ্রেসের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য অথবা রাজ্য-আইনসভাগুলির দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যার দাবীতে আহূত একটি বিশেষ সভা (convention) কর্তৃক সমর্থিত প্রস্তাব রাজ্য-আইনসভাগুলির তিন-চতুর্থাংশ অথবা আহূত বিশেষ সভার তিন-চতুর্থাংশের সম্মতি লাভ করিলে কার্যকরী হয়।

এই পদ্ধতি খুবই জটিল। কংগ্রেসের দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতি থাকিলেই চলিবে না, রাজ্য-আইনসভাগুলিরও অন্ততঃ তিন-চতুর্থাংশের সম্মতি থাকা চাই। আবার যদি রাজ্য-আইনসভাগুলির দুই-তৃতীয়াংশ কোন বিশেষ সভা আহ্বান করে, তবে সেই বিশেষ সভারও তিন-চতুর্থাংশেরও সম্মতি থাকা চাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এবং রাজ্য-সরকারগুলি শাসনতন্ত্রের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া নিজ নিজ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু এইজন্য

এখানে সার্বভৌম ক্ষমতার বণ্টন করা হয় নাই,—বণ্টন করা হইয়াছে সরকারী ক্ষমতার। যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থান এককভাবে কোন আইন-সভায় নয়। এইজন্য বলা হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্রই সার্বভৌম। শাসন-তন্ত্রের পরিবর্তন কিভাবে হইবে তাহা শাসনতন্ত্রেই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, অধ্যাপক গেটেলের (Gettel) মতে রাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন আইন প্রণয়নকারী সংসদের মধ্যেই সার্বভৌমত্ব অবস্থান করে। আইনসভা বলিতে তিনি কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক এবং স্থানীয় আইন-প্রণয়নকারী সংসদের কথা ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে অনেক ক্ষেত্রে বিচার বিভাগও আইনের নূতন ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া নূতন আইন সৃষ্টি করিতে পারে। শাসন-বিভাগও অনেক ক্ষেত্রে আইনের সৃষ্টি করিতে পারে। সুইজারল্যাণ্ডে জনসাধারণ গণভোট, গণনির্দেশাধিকার প্রভৃতি উপায়ের সাহায্যে আইন প্রণয়নে অংশ গ্রহণ করে। সুতরাং গেটেলের মতে দেশের সমুদয় আইনসভা, শাসনবিভাগ, বিচারবিভাগ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে জনগণ হইল সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু অধ্যাপক গেটেলের এই যুক্তি আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। কেননা, শাসনবিভাগ, বিচারবিভাগ, অথবা আইনসভা সরকারের বিভিন্ন অংশ মাত্র। রাষ্ট্রের কোন অংশ অর্থাৎ, সরকার, এই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারে না। রাষ্ট্রই একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। সুতরাং সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থান একমাত্র রাষ্ট্রের মধ্যেই, ইহা একটি অবিভাজ্য, অনন্য এবং চূড়ান্ত ক্ষমতা।

সংক্ষিপ্তসার

১। সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য—

সার্বভৌমত্ব হইতেছে রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান ইচ্ছা এবং এই ইচ্ছা অনুযায়ী রাষ্ট্র প্রত্যেক প্রজা ও ইহাদের সকল প্রকার প্রতিষ্ঠানের উপর মৌলিক, চূড়ান্ত এবং অসীম ক্ষমতা ভোগ করিতে পারে। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা হইতেছে মৌলিক (original), অনিয়ন্ত্রিত ও চূড়ান্ত (absolute), অসীম (unlimited) অবিভাজ্য (indivisible), অনন্য (exclusive), স্থায়ী (permanent) হস্তান্তরের অযোগ্য (inalienable) এবং সর্বজনীন (all-comprehensive)। ইহার একটি আইনানুমোদিত স্বত্ব (imprescriptible) আছে।

২। সার্বভৌমত্বের বিভিন্ন রূপ—

সার্বভৌমত্ব আইনসংগত (De Jure) সার্বভৌম এবং বাস্তব (De Facto) সার্বভৌম হইতে পারে। আবার নামমাত্র (Titular) সার্বভৌম এবং

নিয়মতান্ত্রিক (Constitutional) সার্বভৌম, এই দুই প্রকার সার্বভৌমও আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু সার্বভৌমত্বের তিনটি শ্রেণী-বিভাগ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সেইগুলি হইতেছে, আইনগত সার্বভৌমত্ব (Legal Sovereignty), রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব (Political Sovereignty) এবং গণ-সার্বভৌমত্ব (Popular Sovereignty)। 'সামাজিক চুক্তি' মতবাদের লেখকদের মধ্যে হব্‌স্‌ আইনগত সার্বভৌমত্ব, লক্‌ রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব এবং রুশো গণ-সার্বভৌমত্ব প্রচার করিয়াছিলেন।

৩। অস্টিনের মতবাদ—ইহার সমালোচনা এবং বহুত্ববাদ—

অস্টিনের মতে সার্বভৌম হইবেন একটি নির্দিষ্ট মানবীয় কর্তৃপক্ষ এবং এই নির্দিষ্ট মানবীয় কর্তৃপক্ষ সমাজের ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ হিসাবে থাকিবেন। সমাজের অধিকাংশ লোকের স্বভাবজাত আনুগত্য যদি সার্বভৌম প্রাপ্ত হন, তবেই যথেষ্ট। সার্বভৌমের আদেশই আইন বলিয়া গৃহীত হইবে, এবং তাঁহার ক্ষমতা অসীম, অনন্য ও অবিভাজ্য।

অস্টিনের মতবাদের বিপক্ষে প্রধান সমালোচনা হইতেছে এই যে,—ইহা গণতন্ত্রের বিরোধী এবং এই মতবাদে গণ-সার্বভৌমত্ব, রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব ও আইন প্রণয়নে প্রথাগত বিধান অথবা জনমতের ভূমিকা স্বীকৃত হয় নাই। এই ক্ষেত্রে বহুত্ববাদীরা অভিযোগ করিয়া বলেন যে অস্টিনের মতবাদ সার্বভৌমকে স্বেচ্ছাচারীতে পরিণত করে; রাষ্ট্রের ভিতরে বিভিন্ন সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের যে নিজ নিজ ক্ষেত্রে কিছু না কিছু সার্বভৌম ক্ষমতা আছে অস্টিন তাহা স্বীকার করেন নাই। বহুত্ববাদীরা বলেন যে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা চূড়ান্ত অথবা অনন্য নয়। সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলি নিজ নিজ কার্যক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু সার্বভৌম ক্ষমতার বহুত্ববাদও সম্পূর্ণভাবে সত্য নয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইলেও রাষ্ট্রের একটি বিশেষ দায়িত্ব আছে এবং তাহা হইতেছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সমন্বয় আনা। বহুত্ববাদের শ্রেষ্ঠ অবদান হইল ইহা রাষ্ট্রকে স্বৈরতন্ত্র হইতে গণতন্ত্রে উন্নীত করিয়াছে।

৪। সার্বভৌম ক্ষমতার সীমা—

সার্বভৌম ক্ষমতা আইনের দিক হইতে চূড়ান্ত ও অসীম হইলেও ইহার দুই প্রকার সীমা আছে; একটি হইতেছে বাহ্যিক (external) এবং অপরটি হইতেছে আভ্যন্তরীণ (internal)। সার্বভৌমের বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ আসে আন্তর্জাতিক আইন অথবা অপর কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত চুক্তির দিক হইতে এবং আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ আসে ঐশ্বরিক বিধান, জনমত, এবং

শাসনতান্ত্রিক আইন হইতে। কিন্তু, এই সীমাগুলি বাস্তবে কার্যকরী হইলেও ইহা বলা চলে যে তত্ত্বের দিক হইতে রাষ্ট্রের সার্বভৌমশক্তি এই নিয়মগুলি মানিয়া চলিতে বাধ্য নহেন। কিন্তু যতই গণতন্ত্রের প্রসার হইতেছে ততই জনগণের সাধারণ ইচ্ছা রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে অথবা সার্বভৌম শক্তিকে প্রকাশ করিতেছে। আন্তর্জাতিক আইন প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে কিনা সেই বিষয়ে সন্দেহ আছে। কারণ, আন্তর্জাতিক আইন কি পরিমাণে অনুসরণ করিতে হইবে তাহা তত্ত্বের দিক হইতে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তবে আন্তর্জাতিক আইনের অনুমোদনের পিছনে থাকে আন্তর্জাতিক জনমত এবং কোন রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক জনমতকে উপেক্ষা করিয়া আন্তর্জাতিক রাজনীতি-ক্ষেত্রে নিজেকে দুর্বিপাকে জড়াইতে চাহে না। সেই দিক হইতে বিবেচনা করিলে আন্তর্জাতিক আইন রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তিকে কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে।

৫। সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থান—

রাষ্ট্রের মধ্যে সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থান সহজে নির্ধারণ করা যায় না। অনেকে সর্বজনীন সার্বভৌমত্বের মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু, জনগণের মধ্যে শুধু একটি নির্দিষ্ট অংশ নির্বাচকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় রাষ্ট্রের ক্রিয়া-কলাপ তাহারা আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, সম্পূর্ণভাবে তাহাদের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা ন্যস্ত আছে বলা যায় না। আবার, অনেকের মতে, যে কর্তৃপক্ষ শাসনতন্ত্র সংশোধন করিবার অধিকারী সেই কর্তৃপক্ষকে আমরা সার্বভৌম বলিতে পারি। এই মতবাদ অনুযায়ী ইংলণ্ডের রাজা-সমেত-পার্লামেণ্ট (King-in-Parliament) সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। অধ্যাপক গেটেলের মতে রাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন আইন প্রণয়নকারী সংসদের মধ্যেই সার্বভৌমত্ব অবস্থান করে।

Exercises

1. What do you understand by Sovereignty? What are the attributes of Sovereignty? (৪৮-৫০ পৃষ্ঠা)

2. Distinguish between (a) De Jure and De Facto Sovereignty, and (b) Actual and Titular Sovereignty, and (c) Legal, Political and Popular Sovereignty. Give illustrations. (৫১-৫৪ পৃষ্ঠা)

3. Explain clearly the *Doctrine of Popular Sovereignty*. Discuss its limitations. (৫৩-৫৫ পৃষ্ঠা)

4. *State and examine Austin's Theory of Sovereignty.* (৫৫-৫৮ পৃষ্ঠা)

5. Discuss the pluralistic criticisms of the Classical Theory of Sovereignty. (৫৮-৬০ পৃষ্ঠা)

6. What attacks have been made on the Theory of Sovereignty in recent times and how far has there been a change in the conception of Sovereignty ? (৫৮-৬১ পৃষ্ঠা)

7. What do you mean by 'limited sovereignty' ? How far is Sovereignty of a State limited by (a) Constitutional Law and (b) International Law ? (৬১-৬৪ পৃষ্ঠা)

8. "Sovereignty is limited from within and from without". —Examine the statement. (৬১-৬৪ পৃষ্ঠা)

9. "To divide Sovereignty is to destroy it."—Discuss the statement. (৬৩-৬৪ পৃষ্ঠা)

10. Discuss the Theory of Divided Sovereignty. (৬৩-৬৪ পৃষ্ঠা)

11. How can Sovereignty of a State be located ? Answer your question with reference to the British and the American constitutions. (৬৪-৬৫ পৃষ্ঠা)

12. Explain carefully what you understand by Sovereignty. How far can Sovereignty be said properly to belong to the people ? (৪৮ পৃষ্ঠা ; ৫৩-৫৫ পৃষ্ঠা)

পঞ্চম অধ্যায় | আইন (Law)

আইনের সংজ্ঞা (Definition of Law)

সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে অলোচনা করিলে স্বভাবতঃই আইনের প্রশ্ন উঠে। কারণ আইনের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব প্রকাশিত হয়।

"আইন" শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়, সমাজ-জীবনে মানুষ সামাজিক আইন (Social Law) মানিয়া চলে, অথবা সভ্য জীবন-যাপনের জন্য মানুষকে নৈতিক আইন (Ethical Law) পালন করিতে হয়। কিন্তু, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আইনের সংজ্ঞা এবং প্রকৃতি সম্পূর্ণ পৃথক।

আইনের বিভিন্ন সংজ্ঞা

আইন সম্বন্ধে অনেকগুলি সংজ্ঞা প্রচলিত আছে। অস্টিনের মতে আইন হইতেছে সার্বভৌমের আদেশ। অর্থাৎ, আইনের একমাত্র উৎস সার্বভৌম শক্তি। সার্বভৌম শক্তি হইতেছে একটি উচ্চস্তরের মানবীয় কর্তৃপক্ষ" ("a determinate human superior")। জনসাধারণকে এই সার্বভৌমের আদেশকেই আইন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু, ঐতিহাসিক মতবাদের সমর্থকগণের মতে অস্টিনের দেওয়া সংজ্ঞা গ্রহণযোগ্য নয়। প্রত্যেক দেশেই প্রচলিত প্রথা (convention or traditions) এবং বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত হইতে কিছু না কিছু আইনের সৃষ্টি হয়। অস্টিনের সংজ্ঞানুযায়ী সেইগুলিকে উপেক্ষা করা হয়। পরবর্তীকালে অস্টিনের সমর্থকগণ অস্টিনের প্রদত্ত সংজ্ঞার কিছু পরিবর্তন করেন। তাঁহাদের মতে আইন হইতেছে সমাজে প্রচলিত চিন্তাধারা ও অভ্যাসের সেই অংশ, যে অংশ কতিপয় নির্দিষ্ট নিয়মের মাধ্যমে জনগণ কর্তৃক স্বীকৃত হয় এবং যে নিয়মগুলি শাসন-কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের সার্বভৌম ক্ষমতা এবং প্রভাব দ্বারা কার্যকরী করেন।

("Law is that portion of the established thought and habit which has gained distinct and formal recognition in the shape of uniform rules backed by the authority and power of government."—Wilson)

অধ্যাপক হল্যাণ্ডের (Prof. Holland) মতে আইন হইল মানুষের বহির্জীবনের কাজের একটি সাধারণ নিয়ম যাহা একটি রাষ্ট্রনৈতিক সংস্থার সার্বভৌম ক্ষমতার সাহায্যে বলবৎ হয় ("Law is a political rule of

external action enforced by a sovereign political authority".) উড্রো উইলসনের মতে আইন কোন ব্যক্তির সৃষ্টি নহে, ইহা সমাজের বিশেষ প্রয়োজন, বিশেষ সুযোগ অথবা বিশেষ দুর্দশার সৃষ্টি। ("Law is the creation, not of individual, but of special needs, the special opportunities, special perils of misfortunes of the communities."—Wilson)

আইনের প্রকৃতি (Nature of Law)

আইনের সংজ্ঞা হইতে বুঝা যায় যে আইন হইতেছে একটি অথবা কতিপয় নিয়ম যাহা শুধু মানুষের বহির্জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং যাহা রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির দ্বারা কার্যকরী হয়।

আইনের স্বরূপ (Nature of Law)

উড্রো উইলসনের মতে আইন হইতেছে মানুষের চিন্তাধারার দর্পণ স্বরূপ। ইহা একটি সক্রিয় শক্তি যাহা শারীরিক এবং নৈতিক শক্তির মাধ্যমে বলবৎ হয়। ("Law is a mirror of conception. It is an active force which has got a physical and an ethical compulsion.") মানুষের পরিবর্তনশীল চিন্তাধারা মানুষেরই সৃষ্ট আইনের মধ্যে রূপ পায়। কোন দেশের বিভিন্ন আইন পর্যালোচনা করিলে আমরা সেই দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন বিশিষ্টতার পরিচয় পাই। আইনের প্রকৃতি আলোচনা করিলে আমরা ইহার দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই। একটি হইতেছে ইহার সর্বজনীন রূপ (Generality)। আইন সমাজের প্রত্যেকের প্রতিই সমভাবে প্রযোজ্য। যাঁহারা আইন প্রণয়ন করেন, তাঁহারাও বর্তমানকালে আইনের হাত হইতে রেহাই পান না। ধনী-নির্ধন, বড়-ছোট, সকলেই সমানভাবে আইনের অধীন। দ্বিতীয়তঃ, আইনের একটি বাধ্যবাধকতা আছে। অর্থাৎ, লোকে আইন পালন করিতে বাধ্য হয়। ইহার দুইটি কারণ আছে। প্রথমটি হইতেছে, কেহ যদি আইন পালন না করে তবে রাষ্ট্র তাহাকে শাস্তি দিবে। ইহা হইতেছে শারীরিক বাধ্যতা (physical compulsion)। তাহা ছাড়া, কেহ কেহ নৈতিক বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া আইন পালন করে। ইহা হইতেছে আইনের নৈতিক বাধ্যতা (ethical compulsion)। কিন্তু যখন মানুষ আইন অমান্য করিয়া স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেয় এবং অপরের স্বাধীনতা খর্ব করে, তখনই রাষ্ট্র শক্তি-প্রয়োগ করিতে বাধ্য হয়। সামাজিক আইন (Social Laws) এবং রাজনৈতিক আইনের (Political Laws) কতিপয় সাদৃশ্য আছে। কিন্তু রাজনৈতিক

আইন যতটা জোর করিয়া কার্যকরী করা যায়, সামাজিক আইন কার্যকরী করিবার জন্য ঠিক সেই পরিমাণ জোর করিতে হয় না। বিভিন্ন সংঘের আইন সেই পরিমাণেই কার্যকরী হয় যে পরিমাণে জনসাধারণ তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকে ; যদি জনসাধারণ তাহা গ্রহণ না করে, তবে তাহাদের সংশ্লিষ্ট সংঘগুলির সদস্যপদ ছাড়িতে হয়। সেইজন্য ম্যাক আইভার (Mac Iver) বলেন, "The law of the State alone, in a demarcated or advanced society, is coercive".

আইনের অনুমোদন (Sanction of Law—Grounds of Political Obligation)

আইনের অনুমোদনের ভিত্তি সম্বন্ধে বিভিন্নযুগে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। "রাষ্ট্র ঈশ্বরের সৃষ্টি" এই মতবাদে যাঁহারা বিশ্বাস করিতেন তাঁহাদের মতে আইনের অনুমোদনের ভিত্তি ছিল ঐশ্বরিক বিধান। অর্থাৎ, যেহেতু রাজা আইন প্রয়োগ করেন এবং যেহেতু রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি, সেইজন্য আইন পালন করিতেই হইবে, ইহাই ছিল তাঁহাদের অভিমত। কিন্তু, বর্তমানে সেই মতবাদ গৃহীত হয় না। কান্ট, হেগেল, প্রমুখ আদর্শবাদীদের মতে আইনের অনুমোদনের ভিত্তি ছিল সর্বময় কর্তৃত্ব। যেহেতু রাষ্ট্র সর্বশক্তিমান, সেইজন্য রাষ্ট্রীয় আইন সর্বাবস্থায় পালন করিতে হইবে, এই ছিল তাঁহাদের অভিমত। কিন্তু, এই যুক্তিটিও বর্তমানে গৃহীত হয় না। যাঁহারা সামাজিক চুক্তি মতবাদে, বিশেষতঃ, লক্ ও রুশোর মতবাদে বিশ্বাসী, তাঁহাদের মতে আইন পালন করিতে হইবে এইজন্য যে যাঁহারা আইন প্রণয়ন করেন এবং প্রয়োগ করেন, তাঁহারা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং তাঁহারা চুক্তি অনুযায়ী জনগণের স্বার্থকেই আইনের মধ্যে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু, এই মতবাদও সম্পূর্ণভাবে আইনের অনুমোদন কিভাবে হইবে তাহা বুঝাইতে পারে না। অস্টিনের মতে আইনের অনুমোদন সার্বভৌমের আদেশের মধ্যেই নিহিত থাকে। কারণ, সার্বভৌমের আদেশই হইতেছে আইন। কিন্তু বহুত্ববাদীরা (Pluralists) আইনের অনুমোদন সম্পর্কে এই মতবাদ গ্রহণ করেন না।

আধুনিক লেখকদের মতে আইন হইতেছে মানুষের বহির্জীবন নিয়ন্ত্রণের কতিপয় নিয়ম যাহা জনসাধারণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত। জনসাধারণের সম্মতিই প্রকৃতপক্ষে আইনের কার্যকারিতার ভিত্তি। অধ্যাপক লাস্কির মতে আইন কার্যকরী চাহিদার উপর ভিত্তিশীল। যাহারা রাজনৈতিক শক্তির কেন্দ্রস্থলে নিজেদের ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, আইন তাহাদের ইচ্ছানু-

যায়ীই গঠিত হয়। ("Legal imperatives are a function of effective demand. They will correspond to the desires of those who know how to make their wishes felt at the centre of Political power."—Laski) বর্তমানকালে জনগণের কার্যকরী চাহিদা রাষ্ট্রের ভিতর অর্থনৈতিক শক্তির বণ্টনের উপর নির্ভর করে। রাষ্ট্রের আইন জনগণের যে ইচ্ছা নিজেকে কার্যকরী করিতে জানে, সেই ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দেয়। ("Law appears as the registration of that will in society which has known how to make itself effective." —Laski)। জনগণ কর্তৃক আইন পালন করা অথবা না করা আইনের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাহাদের ধারণার উপর নির্ভর করে। আইনের প্রতি আনুগত্য বর্তমানকালের লেখকদের মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার উপর নির্ভর করে না। রাষ্ট্র সার্বভৌম শক্তির ধারক মাত্র। জনসাধারণ কর্তৃক রাষ্ট্রকে এই ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। এখানে আমরা অস্টিনের মতবাদের সমর্থকগণ এবং ঐতিহাসিক মতবাদের সমর্থকগণের মধ্যে আইনের উৎস সম্বন্ধে ধারণার পার্থক্য দেখাইতে পারি। ঐতিহাসিক মতবাদের সমর্থকগণের মতে আইনের উৎস বলিতে বুঝায় সেই উপায়, যাহার সাহায্যে মানুষের বহির্জীবনের নিয়ন্ত্রক নিয়মগুলি প্রণীত হয় অথবা সেই কর্তৃপক্ষ যাঁহারা এই নিয়মগুলি প্রণয়ন করেন। কিন্তু, অস্টিনের অনুগামীদের মতে আইনের উৎস হইতেছে সেই কর্তৃপক্ষ যাঁহারা এই নিয়মগুলিকে আইন হিসাবে কার্যকরী হইবার মত শক্তি-সম্পন্ন করেন।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আইনের পিছনে জনগণের সম্মতির (sanction) ভিত্তি খুঁজিতে হইলে আমাদিগকে শুধু রাষ্ট্রের শক্তি প্রয়োগের কথা চিন্তা করিলে চলিবে না। অধ্যাপক লাস্কির মতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছাড়াও অন্যান্য কারণে রাষ্ট্রের আইনকে নিজের সার্থকতা প্রমাণ করিতে হইবে। রাষ্ট্র সম্বন্ধে রাষ্ট্রদর্শনের পক্ষে উপযুক্ত কোন তত্ত্ব গ্রহণ করিবার পূর্বে আমাদের অনুসন্ধান করিতে হইবে. রাষ্ট্রের আইন কেন রচিত হইয়াছে, ইহার কি লক্ষ্য, অথবা কেন ইহা মনে করে যে এই লক্ষ্যগুলি আমাদেরও লক্ষ্য হওয়া উচিত। আইনের অনুমোদনের একটি ভিত্তি হইতেছে ইহা পালন করিবার আইনগত বাধ্যবাধকতা। কিন্তু, তাহা অপেক্ষাও বড় সর্ত হইতেছে ইহার জনগণের আশা ও আকাংখাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার ক্ষমতা।

রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অনেক শক্তি অনেকভাবে কাজ করে। কাহারও ব্যক্তিগত অনেক স্বার্থ থাকিতে পারে, অথবা যৌথভাবে হয়ত বিভিন্ন সংগঠনের বিভিন্ন স্বার্থ থাকিতে পারে। এইসব স্বার্থ যে সর্বদাই একপ্রকার

হয়, তাহা নহে,—ইহারা কোনও সময়ে পরস্পরের প্রতিযোগী, আবার কোনও সময় পরস্পরের সহযোগী। সুতরাং রাষ্ট্র যদি কখনও এই ইচ্ছা করে যে জনসাধারণ রাষ্ট্রের আইনের প্রতি স্বভাবজাত আনুগত্য প্রকাশ করিবে তবে ইহাকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন ইহা সর্বাধিক পরিমাণে সমাজের বিভিন্ন চাহিদা মিটাইতে পারে। রাষ্ট্রের আইন এবং সমাজের বিভিন্ন স্বার্থ এবং চাহিদার মধ্যে একটি সমতা আনিতে হইবে। নাগরিকদের জীবনের সুখ-সুবিধার জন্য রাষ্ট্রের আইন কতটা কি করে তাহার উপরেই নির্ভর করে রাষ্ট্রীয় আইনের প্রতি জনসাধারণ কতটা আনুগত্য প্রকাশ করিবে।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি, আইনের অনুমোদন সম্বন্ধে ধারণার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বর্তমানের আইন হইতেছে সমাজের সাধারণ ইচ্ছার (general will) একটি বাস্তব রূপ। সরকারকে আইনের প্রতি জনগণের আনুগত্য আদায়ের জন্য শক্তি প্রয়োগ না করিলেও চলে যদি সেই আইন জনসাধারণের আশা-আকাংখাগুলি বাস্তবে রূপায়িত হইবার পথে প্রতিবন্ধক না হইয়া সহযোগী হয়। সেইক্ষেত্রে জনগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই আইনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। কারণ, আইন সেখানে তাহাদের স্বাধীনতা বজায় রাখিবার পক্ষে সহায়ক হয়। রাষ্ট্রের আইন ছাড়াও প্রচলিত প্রথা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে থাকিতে পারে যেগুলিকে আইনের মর্যাদা আমরা প্রদান করি। যেমন, ইংলণ্ডে আমরা বিভিন্ন প্রচলিত নিয়ম (conventions) দেখিতে পাই। সেইগুলি অনুমোদনের (sanction) প্রধান ভিত্তি হইল জনমতের প্রভাব। তাহা ছাড়া, এই প্রচলিত নিয়মগুলি মানিয়া না চলিলে শাসনকার্যে বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। জনমতই হইল আইন অনুমোদনের প্রধান শক্তি। রাষ্ট্র যদি জনমতকে স্বপক্ষে আনিতে পারে তবে আইনের কার্যকারিতা সম্বন্ধে ইহা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। রাষ্ট্র তখনই জনমতকে স্বপক্ষে আনিতে পারে এবং আইনের প্রতি জনসাধারণের আনুগত্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারে যখন ইহার উদ্দেশ্যের সহিত জনগণের স্বার্থের সংঘাত হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

যে কোন রাষ্ট্রের আইন সার্থকতা অর্জন করে ইহা কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চাহে তাহা অনুযায়ী এবং আমাদিগকেও সেভাবেই আইন সম্বন্ধে বিচার করিতে হইবে।

আইনের উৎস (Sources of Law)

রাষ্ট্রই যে সর্বদা আইনের সৃষ্টি করে, তাহা নহে। আইনের সৃষ্টি অনেক শক্তির মাধ্যমে হইতে পারে; যেমন, সামাজিক প্রথা, ধর্ম, বিচারালয়ের

সিদ্ধান্ত, ন্যায়পরতা, আইন্‌বিদ্‌গণের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা, আইন প্রণয়ন, ইত্যাদি।

১। **প্রথা** (Custom) :—বিভিন্ন দেশে কতিপয় প্রথাগত বিধান আইনের সৃষ্টি করিয়াছে। এই প্রথাগুলি আইনগত সার্বভৌমের আদেশে সৃষ্ট হয় না। এমনকি আইনগত সার্বভৌমকেও এই প্রথাগত বিধানগুলি মানিয়া চলিতে হয়। রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন আইনের পরিপূরক হিসাবে এই প্রথাগত বিধানগুলিও আইনের মর্যাদা লাভ করে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা ইংলণ্ডের কথা উল্লেখ করিতে পারি। ইংলণ্ডে প্রথাগত বিধান অনুযায়ী মন্ত্রীসভাই দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করে এবং রাজা শুধু নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা হিসাবে কাজ করেন। কিন্তু অনেক পূর্বে রাজাই দেশের প্রকৃত শাসক ছিলেন। প্রয়োজনের তাগিদেই এই প্রথা গড়িয়া উঠিয়াছে যে রাজাকে নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা হিসাবে কাজ করিতে হইবে। দেশে যদি লিখিত এবং অনমনীয় শাসনতন্ত্র থাকে, তবুও প্রথাগত বিধান গড়িয়া উঠিতে পারে। আমেরিকার শাসনতন্ত্রে মন্ত্রীসভার কোন উল্লেখ নাই। অথচ প্রথাগত বিধানের ফলে আমেরিকায় একটি মন্ত্রীসভা গড়িয়া উঠিয়াছে। শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নহে, সামাজিক ক্ষেত্রেও অনেক প্রথা আইনের মর্যাদা প্রাপ্ত হয়। যদি জনমত এই সকল প্রথা বজায় রাখিবার পক্ষপাতী হয়, তবে রাষ্ট্র সেইগুলি উপেক্ষা করিতে পারে না।

২। **ধর্ম** (Religion) :—শুধু প্রচলিত প্রথাই নহে, ধর্মীয় অনুশাসনও অনেক ক্ষেত্রে আইনের উৎস হিসাবে বিবেচিত হইয়াছে। সমাজ-জীবনে শৃংখলা আনয়নে ধর্মীয় অনুশাসনগুলির বরাবরই একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। পুরাকাল হইতেই ধর্মীয় অনুশাসন মানুষের সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিতেছে। বর্তমানকালেও আমরা ইহার প্রভাব দেখিতে পাই। ভারতে উত্তরাধিকার আইন (Succession Act) প্রণয়নে ধর্মীয় অনুশাসন অনুসরণ করা হইয়াছে। হিন্দু এবং মুসলমান সমাজের জন্য সেক্ষেত্রে পৃথক পৃথক আইন ধর্মীয় অনুশাসনের প্রভাব সূচিত করে।

৩। **বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত** (Adjudication or judicial interpretation) :—আদালতে বিচারকগণের সিদ্ধান্ত অথবা আইন সম্পর্কিত ব্যাখ্যা অনেক সময়ে নূতন আইনের সৃষ্টি করে। যখন কোনও আইনের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর হয় না অথবা কোনও আইনের প্রকৃত অর্থ পরিষ্কার হয় না, তখন বিচারকগণ সেই আইন সম্বন্ধে নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন অথবা নূতনভাবে সেই আইনের ব্যাখ্যা করিতে পারেন। কোন

বিচারকের গৃহীত সিদ্ধান্ত অথবা ব্যাখ্যা যদি অপর বিচারকগণ অনুসরণ করেন, তবে সেই সিদ্ধান্ত অথবা ব্যাখ্যা নূতন আইনে পরিণত হয়।

৪। **ন্যায়বিচার** (Equity) :—শুধু আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করাই নহে, বিচারকগণ অনেকক্ষেত্রে ন্যায়ের (Justice) খাতিরে নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ীও কোন আইন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন। রাষ্ট্রের আইন যে সর্বদাই ন্যায়সংগত হয়, তাহা নহে, অনেক ক্ষেত্রেই ইহার মধ্যে ন্যায়পরতার অভাব থাকিতে পারে। সেক্ষেত্রে বিচারকগণ নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী কোনও আইন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন।

৫। **আইনবিদ্গণের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা** (Scientific discussion) :—অনেক সময় আইনবিদ্গণের মিলিতভাবে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার সাহায্যেও কোন আইনের নূতন ব্যাখ্যা হইতে পারে এবং সেই ব্যাখ্যা যদি আদালত কর্তৃক গৃহীত হয়, তবেই ইহা আইনে পরিণত হইতে পারে। প্রাচীনকালেও সর্বজন-স্বীকৃত পণ্ডিতদের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা আইনের মর্যাদা লাভ করিত। প্রসংগক্রমে আমরা মনু-সংহিতা, পরাশর-সংহিতা, ভৃগু-সংহিতা প্রভৃতির উল্লেখ করিতে পারি।

৬। **আইনসভা** (Law-making body) :—বর্তমানকালে আইনের সর্বপ্রধান উৎস হইল আইনসভা। গণতান্ত্রিক দেশে জনসাধারণের সম্মিলিত ইচ্ছা আইনের মাধ্যমে রূপ পায়। যেহেতু আইনসভা-প্রণীত আইন সার্বভৌম কর্তৃক কার্যকরী হয়, আইনসভাই বর্তমানে আইনের সর্বপ্রধান উৎস বলিয়া বিবেচিত হয়। তবে আইন প্রণয়ন করিবার সময় আইনসভা প্রচলিত প্রথা, ন্যায়বিচার, ধর্মীয় মতবাদ ইত্যাদি উপেক্ষা করিতে পারে না।

ওপেনহিম্ (Oppenheim) মনে করেন, আইনের মাত্র একটিই উৎস আছে, তাহা হইতেছে সমাজের সাধারণ সম্মতি। জনগণের সাধারণ সম্মতিই বিভিন্নভাবে প্রথা, আচার-ব্যবহার, ন্যায়পরতা, ধর্মীয় মতামত প্রভৃতির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

বিভিন্ন ধরনের আইন (Different types of Law) :—আমরা বিভিন্নভাবে আইনের শ্রেণী-বিভাগ করিতে পারি। প্রথমতঃ, আমাদের দেখিতে হইবে কোন্ উৎস হইতে আইন প্রণীত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, আইনটি সরকারী অথবা ব্যক্তিগত কিনা তাহাও আমাদের বিবেচনা করিতে হইবে। নাগরিকদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক ভাবে যে সকল অধিকার আছে তাহার বর্ণনা এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য যে আইন প্রণীত হয় তাহাকে আমরা ব্যক্তিগত আইন (Private Law) বলি। সরকারী আইন (Public Law)

এবং নাগরিকদের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে। সরকারী আইন রাষ্ট্র ও নাগরিকের পারস্পরিক অধিকার এবং সম্পর্কের সহিত সংশ্লিষ্ট।

উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগ ছাড়াও আমরা সাধারণ আইন (Common Law), সংবিধানিক আইন (Constitutional Law), পৌর আইন (Municipal Law), শাসন-সংক্রান্ত আইন (Administrative Law), ফৌজদারী আইন (Criminal Law), আইনসভা প্রণীত আইন (Statutes) এবং অডিন্যান্সের (Ordinance) মধ্যে পার্থক্য দেখিতে পাই।

সংবিধানে দেশের শাসন সম্পর্কিত, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক, কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত রাজ্য সরকারের, বিভিন্ন রাজ্য সরকারের মধ্যে পরস্পরের সম্পর্ক এবং নাগরিকগণের বিভিন্ন অধিকার সম্পর্কে যে সকল নিয়মকানুন লিপিবদ্ধ থাকে, সেইগুলিকে আমরা সংবিধানিক আইন (Constitutional Law) বলি। সাধারণ আদালত ছাড়া অপর একটি আদালতে অপরাধী সরকারী কর্মচারীদের পৃথক বিচার করিবার জন্য যে আইন প্রণীত হয়, তাহাকে আমরা বলি শাসন-সংক্রান্ত আইন (Administrative Law)। অপরাধ-সংক্রান্ত অথবা অপরাধ অনুযায়ী অপরাধীগণকে শাস্তি প্রদান করিবার জন্য যে আইন প্রণীত হয়, তাহাকে আমরা বলি ফৌজদারী আইন অথবা দণ্ডবিধি (Criminal Law)। যখন বিভিন্ন প্রথা হইতে উদ্ভূত আইন সংক্রান্ত কতিপয় নীতি দেশের আদালত স্বীকার করিয়া লয় এবং অন্যান্য আইনের ন্যায় বলবৎ করে, তখন সেইগুলিকে আমরা সাধারণ আইন (Common Laws) বলি। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কি প্রকার হইবে, এবং যুদ্ধ অথবা শান্তির সময়ে বিভিন্ন রাষ্ট্র কোন নীতি অনুযায়ী চলিবে, সেই সম্বন্ধে যে সকল আইন প্রচলিত সেগুলিকে আমরা আন্তর্জাতিক আইন বলি। আন্তর্জাতিক আইন হইতে রাষ্ট্রীয় আইনের পার্থক্য হইতেছে এই যে আন্তর্জাতিক আইন যদি কোনও রাষ্ট্র পালন না করে, তবে কোন আদালতে আইনভংগকারীরূপে ইহার বিচার হইতে পারে না। তবে বর্তমানে জাতিসংঘের অধীনে একটি আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু, যে কোনও রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের রায় অথবা আন্তর্জাতিক আইন অমান্য করিতে পারে, যদিও নিজের নিরাপত্তা এবং স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য কোনও রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক আইন ভংগ করিতে সাহস পায় না। অধ্যাপক হল্যাণ্ডের মতে কোন রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক কার্যকরী হইয়াছে এই প্রকার প্রচলিত আইনকে পৌর আইন (Municipal Law) বলা যাইতে পারে। কোনও রাষ্ট্রের আইনসভা সাধারণভাবে যে আইন প্রণয়ন করে, তাহাকে

আমরা আইন পরিষদ কর্তৃক সৃষ্ট আইন (Statutes) বলিতে পারি। আবার জরুরী অবস্থায় অথবা আইনসভার অধিবেশন স্থগিত থাকাকালীন অবস্থায় রাষ্ট্রের প্রধান শাসনকর্তা নিজের ঘোষণাপত্র দ্বারা সাময়িকভাবে একটি আদেশ (Ordinance) জারী করিতে পারেন। ইহাও আইন হিসাবে পরিগণিত হয়। আইনের বিধান (Rule of Law) কথাটির তাৎপর্য হইতেছে, (১) আইনের চোখে সকলেই সমান এবং (২) প্রত্যেক নাগরিকই সাধারণ আদালতের এলাকাধীন। আইন ভংগ না করিলে কাহাকেও শাস্তি দেওয়া যাইবে না। ইংলণ্ডে ইহা প্রচলিত আছে।

প্রাকৃতিক আইন (Natural Law) বলিতে আমরা বুঝি এমন একটি প্রাকৃতিক নিয়ম যাহা কোনও প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ এবং পরিণতির সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সম্পর্কে যে নিয়ম প্রচলিত, তাহাকে আমরা প্রাকৃতিক নিয়ম বলিতে পারি। গাছ হইতে আম মাটিতে পড়ে, ইহা একটি প্রাকৃতিক নিয়ম। প্রাকৃতিক নিয়ম কার্যকরী করিবার জন্য সার্বভৌম শক্তির প্রয়োজন হয় না। প্লেটো এবং এরিস্টটল প্রাকৃতিক আইনে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহাদের মতে মানবীয় আইনগুলি কতিপয় প্রাকৃতিক আইনের অনুরূপ হওয়া উচিত। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, মানুষের মধ্যে অসম্পূর্ণতা আছে। অথচ, প্রকৃতির রাজত্বে অনিয়মের অস্তিত্ব নাই। সুতরাং মানবীয় আইন প্রাকৃতিক আইনের ন্যায় সম্পূর্ণ, ইহা মনে করা অনুচিত। হবস্, লক এবং রুশোও প্রাকৃতিক আইনের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু, প্রাকৃতিক আইন সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা বিভিন্ন। যে সকল আইন বা নিয়ম মানুষের সামাজিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, অর্থাৎ, যে সকল আইন সামাজিক জীবনে সকলেই মানিয়া চলে, সেইগুলিকে সামাজিক আইন (Social Laws) বলা হয়। নৈতিক আইন (Moral laws) বলিতে আমরা বুঝি এমন কতিপয় নিয়ম যেগুলি মানুষের অন্তর্জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করিতে নাই,—ইহা একটি নৈতিক আইন। রাষ্ট্রের পক্ষে নিজের নিরাপত্তা বিধান করাই প্রথম আইন,—সেইজন্য প্রয়োজন হইলে ইহা নীতিশাস্ত্র-বিবর্জিত হইতে পারে। যখন কোন নিয়ম মানুষের বহির্জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং সেই নিয়ম রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক কার্যকরী হয়, তখন ইহাকে আমরা প্রকৃত আইন বলি। আন্তর্জাতিক আইনকে সাধারণতঃ আইন হিসাবে অভিহিত করিলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা আইন নহে, কেননা, কোনও রাষ্ট্রই আইনতঃ আন্তর্জাতিক আইন মানিয়া চলিতে বাধ্য নহে। তবুও প্রত্যেক রাষ্ট্রই নিজের নিরাপত্তার

প্রাকৃতিক আইন (Natural Law)

নৈতিক আইন (Moral Law)

জন্য এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত ভাল সম্পর্ক রাখিবার জন্য আন্তর্জাতিক আইন পালন করে। আন্তর্জাতিক আইনের একটি অনুমোদন (sanction) হইতেছে সমগ্র বিশ্বের জনমত। সেদিক হইতে 'আন্তর্জাতিক আইন' কথাটি আমরা ব্যবহার করিতে পারি। কিন্তু প্রাকৃতিক আইন এবং নৈতিক আইনকে আমরা প্রকৃতপক্ষে আইন বলিতে পারি না। কারণ ইহাকে কোন সার্বভৌম শক্তি কার্যকরী করে না।

আইন এবং নীতিশাস্ত্র (Law and Ethics) :

আইন এবং নীতিশাস্ত্রের মধ্যে একটি সম্পর্ক আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু, রাষ্ট্রীয় আইন এবং নৈতিক আইনের মধ্যে অনেক বিষয়েই পার্থক্য আছে। নীতিশাস্ত্র মানুষের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সমগ্র জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট। মানুষের চিন্তাধারা এবং বিভিন্ন কাজের উদ্দেশ্যও নীতিশাস্ত্রের আওতায় পড়ে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইন মানুষের শুধু বহির্জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। মিথ্যা কথা বলা, অপরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হওয়া, কাহাকেও হিংসা করা অথবা মনের নীচতা প্রকাশ করা নীতিশাস্ত্রের বিরোধী। কিন্তু ইহা যদি আইনভংগের কারণ না হয় অথবা কাহাকেও শারীরিক আঘাত দেওয়া না হয় তবে আমরা ইহাকে বে-আইনী বলিতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ, অনুমোদনের দিক হইতেও রাষ্ট্রীয় আইন এবং নৈতিক আইনের মধ্যে পার্থক্য আছে। রাষ্ট্রীয় আইন কেহ ভংগ করিলে তাহাকে শাস্তি পাইতে হয়। কিন্তু, নৈতিক আইন ভংগ করিলে তাহাকে রাষ্ট্রের নিকট হইতে শাস্তি পাইতে হয় না। তবে নিজের বিবেকের কাছে সে অপরাধী থাকে এবং হয়ত জনমত তাহাকে উপহাস করিতে পারে। সুতরাং শারীরিক শাস্তি যেখানে রাষ্ট্রীয় আইন ভংগ করা প্রতিরোধ করে, বিবেকের দংশন অথবা সমাজের উপহাস সেখানে নীতিবিরোধী কাজ করা প্রতিরোধ করে। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রীয় আইনগুলি নৈতিক আইন অপেক্ষা অনেক বেশী সুস্পষ্ট এবং সুসম্বদ্ধ। তাহা ছাড়া, নৈতিক আইন হইতেছে সর্বদেশের এবং সর্বকালের। কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইন হইতেছে আপেক্ষিক এবং বিশেষ একটি যুগে একটি দেশের উপযোগী। প্রয়োজন হইলে আমরা রাষ্ট্রীয় আইন বাতিল করিতে পারি অথবা ইহা সংশোধন করিতে পারি। কিন্তু, নৈতিক আইন অমান্য করিতে পারিলেও আমরা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী ইহার পরিবর্তন করিতে পারি না। চতুর্থতঃ, নৈতিক আইনের ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে একটি নির্দিষ্ট মান আছে এবং ধর্মভীরুদের এই মান অনুযায়ী কাজ করিতে হয়। কিন্তু, রাষ্ট্রীয় আইনে ব্যক্তিগত ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে কোনও মান নাই। তবে, রাষ্ট্রকে

আইন প্রণয়ন করিবার সময় সামাজিক মংগল-অমংগলের কথা চিন্তা করিতে হয়। রাষ্ট্রের পক্ষে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হইল রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং এইজন্য প্রয়োজন হইলে ইহার আইন নীতিশাস্ত্রের সহিত সম্পর্ক বিবর্জিত হইবে। ("The safety of the State is its first law and to realise this end it must be above morality.)" বিশেষতঃ যুদ্ধের সময় অনেক রাষ্ট্রীয় আইন নীতিশাস্ত্রের বিরোধী হয়। আইন হয়ত অনেক কাজ সম্পর্কে নাগরিকদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিতে পারে। কিন্তু সেগুলি যে সর্বদাই নৈতিক নিয়ম অনুযায়ী হইবে, তাহা নহে। তবে অনেক ক্ষেত্রে নৈতিক নিয়মকে রাষ্ট্রীয় আইনের মর্যাদা দেওয়া হয় যদি সেই নৈতিক নিয়ম সামাজিক স্বার্থের সাহত এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তার সহিত জড়িত থাকে। কাহাকেও হত্যা করা হইলে অন্যায় হয়, ইহা যেমন একটি নৈতিক নিয়ম, সেই প্রকার ইহা একটি রাষ্ট্রীয় আইন। সিজ্‌উইকের (Sidgwick) ভাষায় "Ethics is connected with Politics so far as well-being of any individual man is bound up with the well-being of his society". অনেক সময় রাষ্ট্রীয় আইন নৈতিক মানের পরিবর্তন ঘটাইতে পারে। পূর্বে আমাদের দেশে ধারণা ছিল, বালিকাদের খুবই অল্পবয়সে বিবাহ দেওয়া নীতিশাস্ত্র অনুমোদিত। কিন্তু, রাষ্ট্রীয় আইন যখন বাল্য-বিবাহ প্রতিরোধ করিল, তখন এই ধরণের বিবাহ নৈতিক আইনের দিক হইতে অবাঞ্ছনীয় মনে হইতে লাগিল। সতী-দাহ প্রথা বর্তমানে আমরা অন্যায় বলিয়া মনে করি, কেননা, লর্ড বেন্টিংকের আমলে ইহা আইন-বিরোধী কাজ বলিয়া পরিগণিত হয়।

রাষ্ট্রীয় আইন অনেকক্ষেত্রে নীতি-শাস্ত্রবিরোধী হইতে পারে; কিন্তু, ইহা নিছক নিরাপত্তার প্রয়োজনে। প্রকৃতপক্ষে যে সকল রাষ্ট্রীয় আইন নীতিশাস্ত্রের অনুমোদন লাভ করে, সেইগুলির প্রতি মানুষের আনুগত্য এবং শ্রদ্ধা বেশী থাকে। নীতিশাস্ত্র সম্পর্কে রাষ্ট্রের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া অধ্যাপক গিল্‌ক্রাইস্ট বলেন, রাষ্ট্রের এইক্ষেত্রে দুইটি কর্তব্য আছে, একটি হইতেছে, ভাল আইনের সৃষ্টি করা। রাষ্ট্রীয় আইনের সহিত প্রচলিত নৈতিক আইনগুলির যাহাতে সামঞ্জস্য থাকে, সেইদিকে রাষ্ট্রের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। দ্বিতীয়টি হইতেছে, খারাপ আইনগুলি রাষ্ট্রের বাতিল করিয়া দেওয়া উচিত। ভারতবর্ষে আমরা রাষ্ট্রের এই কাজ দেখিতে পাই। অস্পৃশ্যতানিবারণ, বাল্য-বিবাহ নিরোধ, শ্রম-কল্যাণের জন্য কারখানা আইন প্রবর্তন, জমিদারি ব্যবস্থার উচ্ছেদ প্রভৃতি ভাল ভাল আইন রাষ্ট্র প্রণয়ন করিয়াছে।

আন্তর্জাতিক আইন (International Law):

সুসভ্য রাষ্ট্রগুলি পরস্পরের সহিত সম্প্রীতি এবং মৈত্রী সম্পর্ক রাখিবার জন্য এবং অপর রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্কে নিজেদের শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখিবার জন্য সকলেরই সাধারণ সম্মতিতে যে নিয়ম পালন করে তাহাকেই আমরা আন্তর্জাতিক আইন বলি। লরেন্সের (Lawrence) ভাষায় আন্তর্জাতিক আইন হইতেছে, "the rules which determine the conduct of the general body of civilized States in their mutual dealings". ওপেনহিমের (Oppenheim) ভাষায় আন্তর্জাতিক আইন হইতেছে, "the body of customary and conventional rules which are considered legally binding by civilized States in their intercourse witb each other." হুইটনের (Wheaton) মতে আন্তর্জাতিক আইন হইতেছে স্বাধীন জাতিসমূহের সমাজব্যবস্থা হইতে গৃহীত ন্যায়সংগত এবং বিচার-সম্মত কতিপয় পালনীয় নিয়ম; সাধারণ সম্মতির ভিত্তিতে এই নিয়মগুলির সংশোধন করা যাইতে পারে অথবা সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। আন্তর্জাতিক আইন যুদ্ধের সময় এবং শান্তির সময় বিভিন্ন রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নিয়ন্ত্রণ করে। কোনও দেশ অপর দেশে অবস্থানকারী ইহার নাগরিকদের উপর কতটা কর্তৃত্ব করিতে পারে তাহাও আন্তর্জাতক আইন নির্দেশ করে। বর্তমান জগতে বিভিন্ন দেশ পরস্পরের উপর বিশেষ নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যেক দেশকেই অপর দেশের সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্যের সম্পর্ক স্থাপন করিতে হয়। বর্তমান যুগে বহির্বাণিজ্যের সম্পর্ক হইতে মুক্ত কোনও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (closed economy) আমরা দেখিতে পাই না। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কতিপয় নিয়ম থাকে এবং সেই বাণিজ্যে অংশ-গ্রহণকারী প্রত্যেক দেশকেই নিজের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য এই নিয়মগুলি পালন করিতে হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্য দিয়া প্রথমে স্থাপিত হয় আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক। এই অর্থনৈতিক সম্পর্কই কালক্রমে রাজনৈতিক সম্পর্কের আকার ধারণ করে। শুধু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যই নহে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্কও থাকিতে পারে। এক কথায়, বর্তমান জগতে কোনও রাষ্ট্রই এককভাবে টিঁকিয়া থাকিবার কথা চিন্তা করিতে পারে না।

প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই অপর রাষ্ট্রের উপর বিভিন্ন ব্যাপারে নির্ভর করিতে হয়। একটি রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের নিরাপত্তা এবং স্বার্থের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া যাহা খুশী করিয়া যাইবে এই নীতি কোনও রাষ্ট্রই সমর্থন করিতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে বিশ্বশান্তি ক্ষুণ্ণ হয়। এইজন্যই অধ্যাপক লাস্কি বলেন, "The world has become so interdependent that an unfettered

will in any State is fatal to the peace of other States." কিন্তু, প্রশ্ন হইতেছে, আমরা আন্তর্জাতিক আইনকে প্রকৃতই আইন বলিতে পারি কিনা। অস্টিনের মতে আন্তর্জাতিক আইন প্রকৃত আইন নহে। কারণ, প্রথমতঃ, ইহা কোনও নির্দিষ্ট উচ্চস্তরের মানবীয় কর্তৃপক্ষ প্রণয়ন করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, কোনও রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক আইন মানিয়া চলিতে বাধ্য নহে। যে আইন অমান্যের পিছনে কোনও শাস্তির ভয় নাই, সেই আইনকে প্রকৃতপক্ষে আইন বলা যায় না। কিন্তু কোনও রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইন ভংগ করিলেই অপর রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইনের মর্যাদা রাখিবার চেষ্টা করে, পালন করিলে নহে। সর্বশেষে, আন্তর্জাতিক আইন হইতেছে কতিপয় অসম্পূর্ণ নিয়মের সমষ্টি যেগুলিকে অসম্পূর্ণভাবে একটি সংগঠিত জাতিসংঘে প্রয়োগ করা হয়। এই সমস্ত কারণে বলা হয় "আন্তর্জাতিক আইন ব্যবহারিক-শাস্ত্রের লোপ-বিন্দু" ("International Law is the vanishing point of Jurisprudence". —Holland.) ইহা প্রকৃতপক্ষে নীতি-শাস্ত্রের অংগ,—ইহা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কতিপয় নীতি বর্ণনা করে। একটি রাষ্ট্র যতক্ষণ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক আইন পালন করিতে চাহে, ততক্ষণ পর্যন্তই আন্তর্জাতিক আইন গ্রাহ্য ("International law is only valid for a given State to the degree that it is prepared to accept its substance.",) কিন্তু, কোন রাষ্ট্রই বর্তমানকালে আন্তর্জাতিক আইন অস্বীকার করিয়া থাকিতে পারে না। কারণ, আন্তর্জাতিক আইন অমান্য করিলেই একটি রাষ্ট্রের পক্ষে অপর রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত হইবার আশংকা থাকে। সেই ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইন অমান্যকারী রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হয়। বিশ্বশান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এবং নিজের নিরাপত্তা বজায় রাখার স্বার্থে বর্তমানে সব রাষ্ট্রই যতদূর সম্ভব আন্তর্জাতিক আইন পালন করিয়া চলিতে চেষ্টা করে। কোনও রাষ্ট্র যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারে না,—কেননা, অপর রাষ্ট্রগুলি নিজেদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবার ভয়ে আন্তর্জাতিক আইনের দোহাই দিবে এবং সেইক্ষেত্রে প্রথম রাষ্ট্রটি নিজের নিরাপত্তার জন্য আন্তর্জাতিক আইন পালন করিতে বাধ্য হইবে। আন্তর্জাতিক আইনের প্রধান অনুমোদন হইল শক্তিশালী জনমত। এই জনমত কোনও বিশেষ রাষ্ট্রের নহে; আন্তর্জাতিক আইনের স্বপক্ষে জনমত সমগ্র বিশ্বের। হিংসার উন্মত্ততার অভিশাপে অভিশপ্ত এবং শান্তির জন্য আকুল বিশ্ববাসীর কাছে আন্তর্জাতিক মৈত্রীর বাণী চিরন্তন হইয়া থাকিবে। সুতরাং, বর্তমানে এমন দিন আসিয়াছে যে আন্তর্জাতিক আইন অমান্য করিলেই কোন রাষ্ট্রকে জনপ্রিয়তা হারাইতে হয়। কিন্তু, এইজন্য যে আন্তর্জাতিক চুক্তি ভংগ

আন্তর্জাতিক আইনের অনুমোদন

করা হয় না, তাহা নহে। কিন্তু, তাহাতে আন্তর্জাতিক আইনের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না। সাধারণ রাষ্ট্রীয় আইনও অনেক সময় ভংগ করা হয়, তাহাতে ইহার আইনের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না। এখন পর্যন্ত খোলাখুলিভাবে কেহই আন্তর্জাতিক আইন অমান্য করিতে সাহসী হয় নাই। গত মহাযুদ্ধের সময় জার্মান ও ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধবন্দীদের প্রতি ব্যবহার কালে আন্তর্জাতিক রেড্‌ক্রশ অনুসৃত নীতি পালন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আন্তর্জাতিক আইন বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করে এবং এই সম্পর্কের প্রধান অনুমোদন হইতেছে শক্তিশালী জনমত। নাগরিকদের ব্যক্তিগত জীবনে এবং রাজনৈতিক জীবনে রাষ্ট্রের আইন যতটা প্রযোজ্য, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণেও আন্তর্জাতিক আইন ততটা প্রযোজ্য, এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রই বর্তমানকালে সেই আইন পালন করিতে আইনতঃ না হইলেও জনমতের চাপে বাধ্য থাকে। সুতরাং আন্তর্জাতিক আইনকে আমরা প্রকৃতপক্ষে আইন বলিতে পারি। জাতিসংঘের অন্যতম কাজ হইল আন্তর্জাতিক আইন যেন সর্বদা বিভিন্ন রাষ্ট্র পালন করে, সেইদিকে দৃষ্টি রাখা।

আন্তর্জাতিক আইনের উৎস ও প্রকৃতি

আন্তর্জাতিক আইনের উৎস (sources) হইতেছে ছয়টি। যথা :—(১) রোমান আইন ; (২) বিজ্ঞানসম্মত গ্রন্থাবলী ; (৩) সন্ধি এবং বিভিন্নজাতির মহাসভা ; (৪) আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং বিচারবিভাগীয় ট্রাইবুন্যাল, (৫) বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় আইন এবং (৬) কূটনৈতিক মত আদান-প্রদান। উল্‌সি, লরেন্স, হল্‌, ওপেনহিম এবং গার্ণার প্রভৃতি লেখকদের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা এবং গ্রন্থাবলী বর্তমানের আন্তর্জাতিক আইনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। আন্তর্জাতিক আইনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই, আন্তর্জাতিক নিয়মগুলি একটি আইনগত আলোচনার মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। আন্তর্জাতিক মতভেদের ক্ষেত্রে পূর্বে গৃহীত এবং অনুসৃত নীতি সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয় ; লেখকদের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা-প্রসূত মতবাদ উদ্ধৃত করা হয় এবং রাষ্ট্রীয় আইনের ন্যায় সেই মতবাদের উপর নির্ভর করা হয় ; বিভিন্ন রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ আইনানুগ-বিবেচনার সহিত সমালোচনা, সমর্থন অথবা বিচার করা হয় ; এবং সর্বশেষে একটি আন্তর্জাতিক নৈতিক মান স্বীকৃত হয়। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণভাবে আইন নহে ; কারণ কেহ এই নৈতিক মান ভংগ করিলে আমরা অভিযোগ করিতে পারি না। তবুও বর্তমানে আন্তর্জাতিক আইনকে আমরা আইন বলিতে পারি। কারণ, ইহার একটি অনুমোদন আছে এবং তাহা হইতেছে একটি শক্তিশালী জনমত। আন্তর্জাতিক আইন ভংগ করিলে একটি রাষ্ট্রকে অন্যান্য রাষ্ট্রের

বিরাগভাজন হইতে হয় এবং এইজন্য ইহার নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকে,—আন্তর্জাতিক আইন পালনের ইহাই বাধ্যবাধকতা।

সংক্ষিপ্তসার

১। আইনের সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও অনুমোদন—

আইনের বিভিন্ন সংজ্ঞার মধ্যে হল্যাণ্ডের সংজ্ঞাটিই বিশেষভাবে গৃহীত হইয়াছে। হল্যাণ্ডের মতে আইন হইতেছে মানুষের বহির্জীবনের কাজের একটি সাধারণ নিয়ম যাহা একটি রাষ্ট্রনৈতিক সংস্থার সার্বভৌম ক্ষমতার সাহায্যে বলবৎ হয়। উড্রো উইলসন আইনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন যে আইন হইতেছে মানুষের চিন্তাধারার দর্পণ স্বরূপ। ইহা একটি সক্রিয় শক্তি যাহা শারীরিক এবং নৈতিক শক্তির মাধ্যমে বলবৎ হয়। আইনের দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আছে। একটি হইতেছে ইহার সর্বজনীন রূপ (generality) এবং অপরটি হইতেছে ইহা পালন করার বাধ্যবাধকতা (compulsion)।

আইন কেন পালন করা হইবে এই বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ থাকিলেও বর্তমানের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে জনসাধারণের সম্মতিই প্রকৃতপক্ষে আইনের কার্যকারিতার ভিত্তি। এই সম্মতির ভিত্তি খুঁজিতে হইলে আমাদিগকে শুধু রাষ্ট্রের শক্তি প্রয়োগের কথা চিন্তা করিলে চলিবে না। রাষ্ট্রীয় আইনকে নিজের সার্থকতা প্রমাণ করিতে হইবে এবং তাহা প্রমাণিত হইবে তখনই, যখন রাষ্ট্রীয় আইন জনগণের আশা ও আকাংখাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারিবে।

২। আইনের উৎস ও বিভিন্ন ধরণের আইন—

রাষ্ট্রীয় আইনের উৎস হইতেছে, সামাজিক প্রথা, ধর্ম, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত, ন্যায়বিচার, আইনবিদগণের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা, আইনসভা এবং সমাজের সাধারণ সম্মতি। আমরা ব্যক্তিগত আইন, সরকারী আইন, সাধারণ আইন, পৌর আইন, শাসন-সংক্রান্ত আইন, ফৌজদারী আইন, আইনসভা-প্রণীত আইন এবং অর্ডিন্যান্স, প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের আইন দেখিতে পাই। অনেক সময় কোন কোন দেশের প্রথাগত বিধান (conventions), যেমন ইংলণ্ডের প্রথাগত বিধান, আইনের মর্যাদা লাভ করে। আবার, কতিপয় আইন আছে যেগুলিকে আমরা নৈতিক আইন বলিতে পারি; এই নৈতিক আইন বলিতে আমরা বুঝি এমন কতিপয়

নিয়ম যেগুলি মানুষের অন্তর্জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। সুসভ্য রাষ্ট্রগুলি পরস্পরের সহিত সম্প্রীতি ও সহযোগিতা বজায় রাখিবার জন্য এবং অপর রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্কে নিজেদের শান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সকলের সাধারণ সম্মতিতে যে নিয়ম পালন করে তাহাকে আন্তর্জাতিক আইন বলা হয়। আন্তর্জাতিক আইনের উৎস হইতেছে ছয়টি ; যথা—(১) রোমান আইন, (২) বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা (৩) সন্ধি এবং বিভিন্ন জাতির মহাসভা, (৪) আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং বিচারবিভাগীয় ট্রাইবুন্যাল, (৫) বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় আইন এবং (৬) কূটনৈতিক মত আদান-প্রদান।

৩। **আইন ও নীতিশাস্ত্র—**

আইন ও নীতিশাস্ত্রের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হইল এই যে, আইন মানুষের বহির্জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, কিন্তু, নীতিশাস্ত্র মানুষের অন্তর্জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। কোন কোন আইন অমান্য করিলে নীতি বিগর্হিত কাজ হয় না ; আবার কোন কোন নৈতিক আইন অমান্য করিলে রাষ্ট্রীয় আইন-বিরোধী কাজ হয় না। আবার কতিপয় কাজ আছে যেগুলি অনুষ্ঠিত হইলে আইন ও নীতিশাস্ত্র উভয়ের দিক হইতেই ইহা অপরাধ। রাষ্ট্রীয় আইন অনেকক্ষেত্রে নীতি-শাস্ত্রবিরোধী হইতে পারে ; কিন্তু, ইহা নিছক নিরাপত্তার প্রয়োজনে। বর্তমানে রাষ্ট্রের কর্তব্য হইতেছে ভাল আইনের সৃষ্টি করা এবং খারাপ আইনগুলি বাতিল করিয়া দেওয়া।

৪। **আন্তর্জাতিক আইন** (International Law)—আন্তর্জাতিক আইন হইতেছে স্বাধীন জাতিসমূহের সমাজব্যবস্থা হইতে গৃহীত ন্যায়সংগত এবং বিচারসম্মত কতিপয় পালনীয় নিয়ম ; এই নিয়মগুলি বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে। বর্তমান পৃথিবীতে কোনজাতিই এককভাবে টিকিয়া থাকিতে পারে না। সেইজন্যই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রশ্ন উঠে, এবং এই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক যে নিয়মগুলিকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে, সেই নিয়মগুলিকেই আমরা বলি আন্তর্জাতিক আইন। আন্তর্জাতিক আইনগুলি পালন করিতে কোন জাতিই আইনতঃ বাধ্য নয় ; একটি রাষ্ট্র যতক্ষণ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক আইন পালন করিতে চাহে ততক্ষণ পর্যন্তই আন্তর্জাতিক আইন গ্রাহ্য। কিন্তু, বর্তমান জগতে কোন রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক আইনকে অস্বীকার করিতে পারে না। আন্তর্জাতিক আইনের প্রধান অনুমোদন (sanction) হইতেছে বিশ্বের জনমত। তাহাছাড়া, নিজের নিরাপত্তার জন্যই যে কোন রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইন মানিয়া চলিতে বাধ্য হয়। কারণ, আন্তর্জাতিক আইন অমান্য করিলে বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হইবার আশংকা থাকে। আন্তর্জাতিক

আইনের উৎস হইতেছে, (১) রোমান আইন, (২) বিজ্ঞানসম্মত গ্রন্থাবলী, (৩) সন্ধি এবং বিভিন্ন জাতির মহাসভা (Convention), (৪) আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং বিচারবিভাগীয় ট্রাইবুন্যাল, (৫) বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় আইন এবং (৬) কূটনৈতিক মত আদান-প্রদান।

Exercises

1. Define Law. Discuss the nature and sanction of Law. (৬৯-৭৩ পৃষ্ঠা)

2. "Law is the expression of the general will of the community." Discuss the statement. (৬৯-৭১ পৃষ্ঠা)

3. Discuss the sources of Law. What are the different types of Law ? (৭৩-৭৮ পৃষ্ঠা)

4. What do you mean by International Law ? Is Internatinal Law, properly speaking, Law ? (৮০-৮২ পৃষ্ঠা)

5. "International Law is the vanishing point of jurisprudence". Examine the statement. (৮০-৮২ পৃষ্ঠা)

6. "International Law is only valid for a given State to the degree that it is prepared to accept its substance".

"The world has become so interdependent that an unfettered will in any State is fatal to the peace of other states." How far do you agree with these two views ? (৮০-৮২ পৃষ্ঠা)

7. Do you support the view that international law is obeyed by courtesy, concession and grace ? Give reasons for your answer. (৮০-৮২ পৃষ্ঠা)

8. Examine the grounds of political obligation. (৭১-৭৩ পৃষ্ঠা)

9. Discuss the relation of Law to Morality. (৭৮-৭৯ পৃষ্ঠা)

10. "The safety of the State is its first law and to realise this end, it must be above morality". Discuss. (৭৮-৭৯ পৃষ্ঠা)

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্বাধীনতা ও সাম্য
(Liberty and Equality)

স্বাধীনতা, এবং ইহার অর্থ (Meaning of Liberty):

'স্বাধীনতা' কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য নিরূপণ করা খুব সহজ নহে। ইংরাজী শব্দ "Liberty" আসিয়াছে ল্যাটিন "liber" শব্দ হইতে। এই কথার অর্থ হইতেছে, অবাধ স্বাধীনতা। এই অর্থ হইতে বিচার করিলে "আইন" অথবা "নিয়ন্ত্রণ" এবং "স্বাধীনতা" আপাতবিরোধী ধারণা বলিয়া বিবেচিত হইবে। কিন্তু, 'স্বাধীনতা'র প্রকৃত অর্থ শুধু অবাধ স্বাধীনতাই নহে। সাধারণ অর্থে, স্বাধীনতা বলিতে আমরা বুঝি, সব রকম নিষেধাজ্ঞার অভাব ("absence of restraints")। কিন্তু, জনসাধারণ প্রত্যেকেই যাহাতে ঠিকভাবে নিজেদের স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে এবং যাহাতে স্বাধীনতা কখনও উচ্ছৃংখলতায় পরিণত না হয় সেইজন্য রাষ্ট্রে কতিপয় প্রচলিত নিষেধাজ্ঞা থাকে। এই প্রচলিত নিষেধাজ্ঞাগুলি পালন করিলে ব্যক্তিস্বাধীনতা মোটেই ক্ষুণ্ণ হয় না। তবে ব্যক্তিগত সুখের জন্য অত্যাবশ্যক যে সকল সামাজিক সর্ত সেইগুলির উপর কোন নিষেধাজ্ঞা থাকিবে না। এই সামাজিক সর্ত হইতে সব নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হইলে ব্যক্তিগত সুখ কাহারও ক্ষুণ্ণ হয় না। তখনই ইহাকে অধ্যাপক লাস্কির মতে আমরা 'স্বাধীনতা' আখ্যা দিতে পারি।

স্বাধীনতার অর্থ

অধ্যাপক লাস্কি বলেন, "I mean by liberty the absence of restraint upon the existence of those social conditions which in modern civilisation are the necessary guarantees of freedom." কিন্তু, শুধু নিষেধাজ্ঞার অভাবই স্বাধীনতার প্রধান লক্ষণ নয়। স্বাধীনতার আর একটি দিক্ আছে। তাহা হইতেছে, জনসাধারণকে এরকম কাজ করার ক্ষমতা দেওয়া যেগুলি সকলেরই সম্পাদন করার অথবা উপভোগ করার যোগ্য। মানুষের জীবন যাহাতে সর্বাংগীণ পরিপূর্ণতায় ভরিয়া উঠে এবং মনুষ্যত্বের যাহাতে পূর্ণ বিকাশ হয়, সেইজন্য একটি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার ক্ষমতা নাগরিকদের দেওয়া উচিত। তাহাই হইতেছে মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা, যে স্বাধীনতা মানুষকে নিজের জীবনকে সুন্দর করিবার জন্য এবং নিজের মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য, করা উচিত অথবা উপভোগ করা উচিত এরকম কাজ করিবার ক্ষমতা প্রদান

করে ("Freedom consists in a positive power or capacity of doing or enjoying something worth doing or worth enjoying."—Green,)। অধ্যাপক লাস্কি স্বাধীনতার এই দিকটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাঁহার মতে শুধু নিয়ন্ত্রণের প্রত্যাহার কখনই স্বাধীনতার প্রকৃত সর্ত হইতে পারে না। স্বাধীনতা তখনই সার্থক হয় যখন মানুষ চিন্তার অধিকার, কথা বলার অধিকার এবং কাজের অধিকার লাভ করে। কিন্তু, স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নহে। মানুষ যাহাতে সব অধিকার লাভ করিয়া সুন্দরভাবে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারে, সেইজন্য একটি নিয়ন্ত্রণী-শক্তি থাকা উচিত। সেই নিয়ন্ত্রণী শক্তি হইতেছে আইন। আইন এইক্ষেত্রে কতিপয় প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ দূর করে,—ইহা মানুষের উপর এমন কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে না যাহাতে মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়। ("Law means removal of natural restrictions and not addition of more.") একজনের স্বাধীনতায় যাহাতে অপরে হস্তক্ষেপ না করিতে পারে, সেজন্য রাষ্ট্রীয় আইনের বিধান থাকা দরকার। তাহা হইলেই মানুষ প্রকৃত স্বাধীনতা নিরুপদ্রবে ভোগ করিতে পারিবে।

স্বাধীনতা এবং আইনের মধ্যে সম্পর্ক (Liberty as related to Law or Authority).

প্রকৃত স্বাধীনতা এবং আইন অথবা সার্বভৌম ক্ষমতা পরস্পর বিপরীতার্থক শব্দ নহে। সার্বভৌম শক্তিকে মানিয়া চলিলেই জনসাধারণের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় না। বরং অধিকতর বলশালী এবং চতুর লোকের ইচ্ছায় যাহাতে কাহারও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ না হয়, সেজন্য প্রত্যেককেই রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তিকে সর্বদা মানিয়া চলা উচিত। আইনের সাহায্যে রাষ্ট্র স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করিয়া এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারে যেখানে সমাজের প্রত্যেকেই নিশ্চিন্তমনে স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে। সমষ্টিগত জীবনের কল্যাণ ব্যক্তিগত জীবনের কল্যাণ অপেক্ষা অনেক বড়। কাহারও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যদি সমাজের অন্যান্য নাগরিকদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পরিপন্থী হয়, তবে সেক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে সমাজের ক্ষতি হয় এবং রাষ্ট্র তখন আইনের সাহায্যে সকলের স্বাধীনতার পূর্ণ বিকাশের পথ সুগম করে। সংবিধানিক আইনে যখন মানুষের মৌলিক অধিকারগুলি লিখিত থাকে, তখন রাষ্ট্রীয় আইন নাগরিকদের স্বাধীনতার অন্যতম উৎস বলিয়া বিবেচিত হয়। রাষ্ট্রীয় আইনের সহিত ব্যক্তি-স্বাধীনতার তিনটি বিশেষ সম্পর্ক আমরা দেখিতে পাই। প্রথমতঃ,

যদি কাহারও স্বাধীনতা অন্য কোন নাগরিক কর্তৃক ব্যাহত হয়, তবে রাষ্ট্রীয় আইন তাহার স্বাধীনতা রক্ষা করে। দ্বিতীয়তঃ, শাসকসম্প্রদায় কর্তৃক যদি নাগরিকদের স্বাধীনতা অস্বীকৃত অথবা ব্যাহত হয় এবং সংবিধানিক আইন-গুলিও যদি ঠিকভাবে প্রয়োগ করা না হয়, তবে রাষ্ট্র উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করিয়া অথবা সংবিধানিক আইনগুলির উপযুক্ত প্রয়োগ করিয়া নাগরিক-দিগকে নিজ নিজ স্বাধীনতা ভোগ করিবার রাস্তা উন্মুক্ত করিয়া দিতে পারে। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রীয় আইন সমাজের সর্বপ্রকার দুর্নীতি দূর করিয়া এবং স্বাধীনতার প্রকৃত বিকাশ হইতে পারে এইপ্রকার পরিবেশের সৃষ্টি করিয়া নাগরিকদের স্বাধীনতা বজায় রাখিবার পক্ষে সহায়ক হইতে পারে। সুতরাং আইন এবং স্বাধীনতার মধ্যে কোনও আপাতবিরোধ নাই,—একে অন্যের পরিপূরক। আইন হইতেছে স্বাধীনতার সর্ত ("Law is the condition of Liberty.")। জনসাধারণকে কতিপয় কাজ করিতে নিষেধ করিয়া রাষ্ট্রীয় আইন নাগরিক স্বাধীনতার রক্ষক হইয়াছে। জীবনধারণের জন্য মানুষের কতিপয় অত্যাবশ্যক চাহিদা আছে, যেমন শিক্ষা, সমাজব্যবস্থা, সম্পত্তিরক্ষা, কর্মসংস্থান ইত্যাদি। এই সকল চাহিদা মিটিলেই নাগরিকগণ প্রকৃতভাবে স্বাধীনতা ভোগ করে। আইন মানুষের এই অত্যাবশ্যক চাহিদা-গুলি মিটাইয়া থাকে। অধ্যাপক লাস্কির মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা নির্ভর করে জনসাধারণের জন্য আইন যে জীবনযাত্রার সৃষ্টি করে উহার উৎকর্ষতার উপর। ("Sovereignty is a function of the quality of the life that it makes for its members"—Laski.)। যতক্ষণ পর্যন্ত আইন জনসাধারণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং যতক্ষণ ইহা জনসাধারণের সব অত্যাবশ্যক চাহিদাগুলি মিটাইতে সক্ষম, ততক্ষণ পর্যন্তই জনগণ আইন মানিয়া চলে। সুতরাং যতক্ষণ জনসাধারণ নিজেদের স্বার্থে রাষ্ট্রের আইন মানিয়া চলে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইহা স্বাধীনতার পরিপূরক, পরিপন্থী নহে। রাষ্ট্রের সংবিধানিক আইন, যেমন "হেবিয়াস কর্পাস আইন," (Habeas Corpus Act), "অধিকারের বিধি" (Bill of Rights), প্রভৃতি জনগণের স্বাধীনতার ধারক এবং বাহক। কিন্তু, রাষ্ট্রীয় আইন যে কখনই ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে না, তাহা নহে। যখন খুশী তখনই রাষ্ট্রীয় আইনের সাহায্যে দেশের আইনসভা ভাংগিয়া দিলে এবং উপযুক্ত কারণ না থাকা সত্ত্বেও আপৎকালীন ঘোষণা করিয়া জনগণের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করিলে গণ-স্বাধীনতা ব্যাহত হয়। কিন্তু, সতর্ক জনমত স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে ("Eternal vigilance is the price of Liberty."—Laski)। যতক্ষণ পর্যন্ত জনমত সতর্ক এবং সদা সচেতন থাকে, ততক্ষণ রাষ্ট্রীয় আইন জন-

সাধারণের স্বার্থের পরিপন্থী হইতে পারে না এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতে পারে না। সুতরাং স্বাধীনতা বলিতে যেমন নিয়ন্ত্রণের অভাব বুঝায় না, আইন বলিতেও স্বাধীনতার একমাত্র উৎস এবং রক্ষাকবচ বুঝায় না। কিন্তু, একে অন্যের পরিপূরক। অনেকক্ষেত্রে আইন হয়ত জনসাধারণের অজ্ঞতার ফলে এবং সতর্কতার অভাবে তাহাদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতে পারে, আবার আইন অনেকক্ষেত্রেই ব্যক্তি স্বাধীনতার ধারক ও বাহক হইতে পারে।

স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ (Different types of Liberty)

প্রাকৃতিক স্বাধীনতা (Natural Liberty)—কোন কোন ক্ষেত্রে 'স্বাধীনতা' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার অর্থ হইল প্রত্যেক মানুষের কতিপয় স্বাভাবিক এবং অবাধ কর্মক্ষমতা আছে যেগুলি মানুষ ইচ্ছা করিলেই প্রয়োগ করিতে পারে। সামাজিক চুক্তি মতবাদে বিশ্বাসী লেখকগণের মতে প্রকৃতির রাজত্বে মানুষ প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী নিজেদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করিত। প্রকৃতির রাজত্বে প্রাকৃতিক নিয়ম কর্তৃক প্রদত্ত যে স্বাধীনতা মানুষ উপভোগ করিত, তাহাই হইল প্রাকৃতিক স্বাধীনতা। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে প্রকৃতির রাজত্বে কোনও নিয়ন্ত্রণীশক্তি ছিল না, এবং রাষ্ট্রীয় আইনের অস্তিত্বও কেহ কল্পনা করিতে পারিত না। সুতরাং প্রাকৃতিক স্বাধীনতা সবলের স্বেচ্ছাচারিতা অথবা উচ্ছৃংখলতা ছাড়া কিছুই ছিল না।

পৌর স্বাধীনতা (Civil Liberty)—পৌর জীবনে মানুষের কতিপয় অধিকার একান্ত অপরিহার্য। নাগরিক জীবনের উপযুক্ত বিকাশের জন্য নাগরিকদের এই স্বাধীনতা থাকা উচিত। অনেক ক্ষেত্রে, যেমন ভারতে, সংবিধানের মধ্যেই এই স্বাধীনতার ব্যবস্থা থাকে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ছাড়া সভ্য সমাজে মানুষের ব্যক্তিত্ব কখনই পূর্ণাংগভাবে বিকশিত হইতে পারে না। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা, স্বাধীনভাবে কথা বলার এবং চিন্তা করিবার অধিকার, ধর্মমতের স্বাধীনতা, শিক্ষাগ্রহণের স্বাধীনতা—প্রভৃতি কতিপয় অধিকারের সমষ্টিকেই আমরা পৌর-স্বাধীনতা বলি। রাষ্ট্র অযথা জনসাধারণের পৌরস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না। যদি সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য পৌরস্বাধীনতায় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়, তবে সেক্ষেত্রে জনসাধারণেরই বৃহত্তর কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা থাকা উচিত। জনসাধারণ নিজেরা হয়ত নিজেদের স্বাধীনতা অনেক ক্ষেত্রেই যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করিতে জানে না, সেক্ষেত্রে

রাষ্ট্রেরই উচিত জনসাধারণকে নিজেদের স্বাধীনতার প্রকৃত সদ্ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত করিয়া তোলা। গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতার ন্যায় পৌর স্বাধীনতার গুরুত্বও কম নহে। বিশেষতঃ, বাক্-স্বাধীনতা এবং চলাফেরার স্বাধীনতা নাগরিকদের স্বীয় ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য এবং সুস্থ জীবনযাত্রার জন্য একান্ত প্রয়োজন। চিন্তার স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইলেই নাগরিকগণ উন্নত ধরণের জীবনযাত্রার জন্য উপযুক্ত পরিবেশের সৃষ্টি করিতে পারে। পৌর স্বাধীনতার সহিত রাষ্ট্রীয় আইনের সম্পর্ক আছে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণী-শক্তি থাকা প্রয়োজন। সেই নিয়ন্ত্রণী-শক্তি হইতেছে রাষ্ট্রীয় আইন। নাগরিকদের বাক্-স্বাধীনতা প্রদান করিবার এই অর্থ নয় যে একজন অপরলোকের বিরুদ্ধে যাহা খুশী তাহাই বলিতে পারে; অথবা, কাহাকেও চলাফেরার স্বাধীনতা দেওয়ার অর্থ এই নয় যে সে কাহারও বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ করিতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় আইনের হস্তক্ষেপ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। সুতরাং, যতক্ষণ পর্যন্ত পৌর-স্বাধীনতা সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য আবশ্যক, ততক্ষণ পর্যন্তই ইহা রাষ্ট্র জনসাধারণকে প্রদান করিবে। আবার, পৌর-স্বাধীনতা যাহাতে প্রকৃতভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে, সেইজন্যও রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানের আবশ্যক।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা (Political Liberty)—গণতন্ত্রের যুগে নাগরিকদের বিভিন্ন প্রকারের স্বাধীনতার মধ্যে রাজনৈতিক স্বাধীনতাই সর্বাপেক্ষা বেশী গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করিবার অধিকারসমষ্টিকেই রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলে। নির্বাচন করিবার অধিকার লাভ করা বর্তমান যুগে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি রাজনৈতিক অধিকার। নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটের উপরেই গণতান্ত্রিক সরকারের অস্তিত্ব নির্ভর করে। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের এবং যোগ্য ব্যক্তির ভোট দিবার এবং পাইবার ক্ষমতা, যোগ্যতা-সম্পন্ন হইলে রাষ্ট্রীয় কার্যে নিযুক্ত হইবার অধিকার এবং সরকারের অনুসৃত নীতির সমালোচনা করিবার অধিকার রাজনৈতিক স্বাধীনতার পর্যায়ে পড়ে। এই স্বাধীনতা মানুষকে প্রকৃত রাজনৈতিক শিক্ষা প্রদান করে এবং তাহাকে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন করিয়া তাহার নিজের অধিকার এবং রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ করে। সুতরাং এই স্বাধীনতা শুধু ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে সহায়ক, তাহাই নহে,—উপযুক্তভাবে এই স্বাধীনতার ব্যবহার হইলে রাষ্ট্রীয় জীবনের স্তরও অনেক উন্নত হয়।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা (Economic Liberty)—অর্থনৈতিক

স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ হইতেছে এই যে প্রত্যেক নাগরিককে তাহার নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করিয়া জীবিকা অর্জনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে এবং সেক্ষেত্রে কোনপ্রকার রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ থাকিবে না। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার তাৎপর্য হইতেছে এই যে, এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থাকা উচিত যেখানে বেসরকারী উদ্যোগের (Private enterprises) পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে। অ্যাডাম স্মিথ্ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ্‌গণের মধ্যে সকলেই অর্থনৈতিক স্বাধীনতার উপরে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। পৌর-স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা যেমন নাগরিকদিগকে আত্মসচেতন করে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও সেইপ্রকার নাগরিকগণকে আত্মনির্ভরশীল করে এবং সমাজের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ দৃঢ় করে। ধনতান্ত্রিক সমাজে নাগরিকদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থাকে। অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে সমাজতন্ত্রের সহিত অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কোন সামঞ্জস্য নাই। কারণ, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে চলিয়া আসে এবং সেই সমাজ-ব্যবস্থায় নাগরিকগণকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রদান করার পরিবর্তে অর্থনৈতিক সাম্যের (economic equality) প্রতিষ্ঠা করা হয়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অনেক ক্ষেত্রে সবলের হাতে দুর্বলের শোষণ ঘটাইতে পারে। কিন্তু, অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইলে অর্থনৈতিক শোষণের কোন সম্ভাবনা থাকে না। সমাজে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত করাই ধনতান্ত্রিক দেশগুলির লক্ষ্য। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়া দরকার। রাষ্ট্রের উচিত যাহাতে এই জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় সেইদিকে দৃষ্টি রাখা এবং সেই প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা। কাজ করিয়া জীবিকা অর্জনের অধিকার, শ্রম-কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রীয় সাহায্য পাইবার অধিকার, বেকার অবস্থায় ভাতা পাইবার অধিকার প্রভৃতিকে সাধারণতঃ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলে।

জাতীয় স্বাধীনতা (National Liberty)—জাতীয় স্বাধীনতার অর্থ হইল অন্য রাষ্ট্রের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া একটি জাতির পক্ষে স্বাধীনভাবে সমষ্টিগত জীবন পরিচালনা করিবার অধিকার। জাতীয় স্বাধীনতা না থাকিলে নাগরিকগণ কখনই সম্পূর্ণভাবে পৌর স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে না। যে স্বাধীনতা বিদেশী রাষ্ট্রের ইচ্ছা অথবা অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে, সেই স্বাধীনতাকে আমরা কখনই পূর্ণ স্বাধীনতা বলিতে পারি না। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলিতে পারি, ইংরেজ শাসনের অধীনে ভারতীয়দের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সব দিক

হইতেই ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। দেশ স্বাধীন হইবার পর এবং বিশেষতঃ, সংবিধানে নাগরিকদের কতিপয় মৌলিক অধিকার প্রদান করিবার পর আমাদের ব্যক্তি-স্বাধীনতা পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

স্বাধীনতা রক্ষা করিবার বিভিন্ন উপায় (Different safeguards of Liberty) :

নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের জন্য এবং গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য ব্যক্তি-স্বাধীনতার গুরুত্ব অপরিমেয়। সেইজন্য প্রত্যেক গণতান্ত্রিক দেশেই স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বিত হয়।

প্রথমতঃ, স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য সরকারকে সর্বদাই গণতান্ত্রিক হইতে হইবে। গণতন্ত্রের মূলকথা হইতেছে জনগণেরই নির্বাচিত সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের কাজে জনগণের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অংশ গ্রহণ। গণতন্ত্রে প্রত্যেক নাগরিক সমান সুযোগ লাভ করে। পৌরস্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করিবার ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে কখনও তারতম্য হয় না। যেহেতু গণতান্ত্রিক দেশে সব নাগরিকই নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন থাকে, সেক্ষেত্রে তাহাদের স্বাধীনতা কেহই ক্ষুণ্ণ করিতে পারে না; বরং স্বাধীনতা বিপন্ন হইলে নিজেরাই তাহা প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয়। একনায়কতন্ত্রে আইন থাকে, কিন্তু, সেই আইন জনগণের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে না। জোর জবরদস্তি করিয়া সেক্ষেত্রে জনমতের কণ্ঠরোধ করা হয়। গণতন্ত্রে জনসাধারণের হাতেই সম্পূর্ণ শক্তি থাকে বলিয়া এবং নিজেদেরই প্রতিনিধি কর্তৃক প্রণীত আইন তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষা করে বলিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় না। সুতরাং ব্যক্তি-

সচেতন জনমত

স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে জনসাধারণকে সতর্কদৃষ্টি রাখিতে হইবে যেন সরকার গণতন্ত্রের আদর্শ হইতে বিচ্যুত না হয়। এজন্য অধ্যাপক লাস্কি বলেন, চিরন্তন সতর্কতাই হইতেছে স্বাধীনতার মূল্য এবং যাহারা এই সতর্কতা বজায় রাখিতে অভ্যস্ত, তাঁহারাই স্বাধীনতার সচেতন রক্ষক হইয়া থাকেন," ("Eternal vigilance is the price of liberty and those who are trained to that vigilance become conscious guardians of liberty."—Laski)। স্বাধীনতার পরিপন্থী যাহা কিছু দেখা যাইবে, তাহা প্রতিরোধ করিবার সাহসই হইল স্বাধীনতা রক্ষার গোপন তথ্য। ("The secret of liberty is always in the end the courage to resist.")। জনমত যখন স্বাধীনতা রক্ষার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়, তখন রাষ্ট্রকে সেই স্বাধীনতা প্রদান করিতে হয়। তাহা

না হইলেই জনসাধারণ রাষ্ট্রীয় আইন অমান্য করিতে আরম্ভ করে এবং সেক্ষেত্রে জনমতের শক্তির কাছে স্বাধীনতার পরিপন্থী শক্তিগুলিকে হার মানিতে হয়। যখন রাষ্ট্রীয় আইন জনগণের অত্যাবশ্যক চাহিদাগুলি মিটাইতে সমর্থ হয় এবং জনগণের ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ গঠন করে, তখন রাষ্ট্রীয় আইনই জনগণের স্বাধীনতার সর্ত হইয়া পড়ে। তাহা একমাত্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই সম্ভবপর হইতে পারে। কিন্তু, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা সম্বন্ধে সব সময়েই নিশ্চিত হওয়া যায় না। কারণ, বর্তমান গণতন্ত্রে আমরা দেখিতে পাই মন্ত্রীসভার অথবা পরিচালকমণ্ডলীর (executive) শাসন। আইন প্রণেতাগণের ক্ষমতা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। সেক্ষেত্রে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা ছাড়াও ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার অন্যান্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

নাগরিকদের মৌলিক অধিকার

দ্বিতীয়তঃ, শাসনতন্ত্রে যদি নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি লিখিত থাকে তবে তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষিত হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতবর্ষে তাহা করা হইয়াছে। মৌলিক অধিকারগুলির কোনটি যদি শাসন-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত না হয়, তবে নাগরিকগণ শাসন-কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ করিতে পারে। সেক্ষেত্রে বিচার-বিভাগের নির্দেশ শাসন-কর্তৃপক্ষকে গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং লিখিত শাসনতন্ত্র এবং শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত নাগরিকদের মৌলিক অধিকার তাহাদের স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। ইংলণ্ডে কোন লিখিত শাসনতন্ত্র নাই। কিন্তু, ইংলণ্ডে আইনের নিরপেক্ষতার জন্য (Rule of law) নাগরিকদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় না। ইংলণ্ডে আইনের চোখে সকলেই মহান এবং বিনাবিচারে কাহারও শাস্তি হইতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, ক্ষমতার বিভাগ (Separation of Powers) করিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করা যাইতে পারে। সরকারের আইন প্রণয়ন, পরিচালন এবং বিচার-বিভাগকে কাজের ভিত্তিতে পরস্পরের নিকট হইতে আলাদা করিয়া দিলে জনসাধারণের অহেতুক অবিচার পাইবার সম্ভাবনা থাকে না। ক্ষমতা বিভাগ করার স্বপক্ষে বলা হয় যে পরিচালন বিভাগ এবং বিচার-বিভাগের মধ্যে যদি ক্ষমতা ভাগ করিয়া দেওয়া না হয় তবে শাসনকর্তৃপক্ষ অত্যাচারী হইতে পারেন; যেমন শাসন-কর্তৃপক্ষ যদি কাহাকেও আইন শৃংখলা ভংগ করার অজুহাতে গ্রেপ্তার করেন এবং নিজের বিচার-বিভাগীয় ক্ষমতার বলে সে প্রকৃত দোষী না হওয়া সত্ত্বেও তাহার শাস্তি বিধান করেন সেক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইল। এ ক্ষেত্রে সে প্রকৃতই দোষী কিনা তাহা নির্ধারণ করিবার দায়িত্ব থাকা উচিত

ক্ষমতার বিভাগ

বিচার-বিভাগের। তবেই তাহার স্বাধীনতা রক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু, এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, ইংলণ্ডে সরকারের ক্ষমতা বিভাগ করা হয় নাই; অথচ ইংলণ্ডের নাগরিকগণ স্বাধীনতা উপভোগ করে। তবে ইহা ঠিক যে, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের তত প্রয়োজন নাই যত প্রয়োজন আছে বিচার-বিভাগের স্বাধীনতার। বিচার-বিভাগ যদি স্বাধীন থাকে এবং পরিচালন বিভাগের নির্দেশে চালিত না হয়, তবে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না। ইংলণ্ডে বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা নাই, সরকারের ক্ষমতারও স্বতন্ত্রীকরণ হয় নাই। কিন্তু সেই দেশে আইনের নিয়ম (Rule of law) অথবা আইনের নিরপেক্ষতা আছে। আইনের নিয়মের তিনটি তাৎপর্য আছে; যথা—(১) আইনের সর্বোচ্চ সর্বজনীন ক্ষমতা থাকিবে, (২) আইনের চোখে সকলেই সমান হইবে এবং (৩) আইন ব্যক্তিবিশেষের মতানুযায়ী হইবে না অথবা কাহাকেও গ্রাহ্য করিবে না।

পূর্বেই বলা হইয়াছে স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ হইতেছে শক্তিশালী জনমত। জনসাধারণের সচেতনতাই তাহাদিগের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সাহায্য করিবে। এই ক্ষেত্রে জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষা, রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে সচেতন ধারণা ও দৃষ্টিভংগী এবং উন্নতধরণের সংবাদপত্রের বিশেষ ভূমিকা আছে। সর্বশেষে গণতান্ত্রিক দেশে আইনসভার বিরোধী-দলেরও এই বিষয়ে একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। শাসন-কর্তৃপক্ষ যাহাতে জনগণের ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতে না পারে সেইজন্য দেশবাসীকে সতর্ক রাখা বিরোধীদলের একটি প্রধান কাজ।

ভারতবর্ষে ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার প্রধান উপায় হইতেছে শাসনতন্ত্রের বর্ণিত নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি। সরকার যদি নাগরিকগণকে স্বাভাবিক সময়ে এই মৌলিক অধিকারগুলি প্রদান করিতে অস্বীকৃত হন, তবে সরকারের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ করা যাইতে পারে এবং সেক্ষেত্রে আদালতের নির্দেশ পালন করিতে সরকার বাধ্য থাকিবেন। দ্বিতীয়তঃ, বিচার-বিভাগ যাহাতে স্বাধীন-ভাবে কাজ করিতে পারে, সেইজন্য বিভিন্ন উপায়ে চেষ্টা করা যাইতেছে। কিন্তু, শাসনতন্ত্রের নির্দেশাত্মক নীতিগুলির (Directive Principles) মধ্যে উল্লেখ থাকা সত্বেও আমাদের দেশে এখনও শাসন-বিভাগ এবং বিচার-বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ হয় নাই। আমাদের দেশে বিনাবিচারে এখনও নাগরিকদের বন্দী করা যায়। তাহা ছাড়া, আমাদের দেশের জনসাধারণের রাজনৈতিক সচেতনতা খুবই কম। তবুও আমাদের দেশের নাগরিকগণ অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের তুলনায় স্বাধীনতা মোটেই কম উপভোগ করে না।

ভারতবর্ষে ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার উপায়

সাম্যের প্রকৃত অর্থ,—স্বাধীনতার সহিত সাম্যের সম্পর্ক (Real meaning of Equality—Relation between Liberty and Equality) :

সাম্য কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য হইতেছে সকলের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধার পথ খোলা রাখিয়া সমানভাবে সকলেরই ব্যক্তিত্ব বিকাশের অন্তরায়গুলি দূর করা। স্বাধীনতা মানুষের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যক। কিন্তু সাম্যনীতি প্রবর্তিত না হইলে স্বাধীনতা প্রকৃতভাবে ভোগ করা যায় না। মানুষে মানুষে পার্থক্য থাকিবেই। মানসিক বৃত্তি, শারীরিক কাঠামো, ব্যক্তিত্ব-বিকাশ, ইত্যাদি সব দিকেই আমরা জনসাধারণের মধ্যে বৈসাদৃশ্য দেখিতে পাই। কিন্তু, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সাম্য কথাটি অন্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সমাজে মুষ্টিমেয় লোক কতিপয় সুবিধা বিশেষভাবে ভোগ করে, ইহাই অসাম্য। এই অসাম্যের প্রতিবাদেই সাম্যনীতির (doctrine of equality) সৃষ্টি হইয়াছে। প্রাচীনকাল হইতে সামাজিক ক্ষেত্রে আমরা অসাম্য দেখিতে পাই। প্রাচীন গ্রীক রাষ্ট্রে স্বাধীন-মানুষ এবং ক্রীতদাসের মধ্যে অসাম্য ছিল, ইংলণ্ডে অভিজাতশ্রেণী এবং সাধারণলোকের মধ্যেও সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অসাম্য ছিল। কালক্রমে সমাজে সকলেই সমান সামাজিক এবং রাজনৈতিক অধিকারের দাবী করিতে থাকিলে সাম্যনীতির প্রসার হয় এবং সমাজ হইতে শ্রেণীবৈষম্য দূর করিবার চেষ্টা আরম্ভ হয়। অধ্যাপক লাস্কির মতে সাম্য হইতেছে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের একটি সোপান। সাম্য বলিতে বুঝায় "এমন একটি পরিবেশ বজায় রাখিবার আগ্রহ যেখানে মানুষ তাঁহার ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশের সুযোগ পায়।" "…the eager maintenance of that atmosphere in which men have the opportunity to be their best selves"—Laski)। সাম্য বলিতে বুঝায় এমন একটি পরিবেশ যেখানে বিভিন্ন মানুষ সমান সুযোগ-সুবিধা পাইয়া নিজেদের প্রতিভার বিকাশ সাধন করিতে সমর্থ হয়। একজন লোক এমন কোন বিশেষ সামাজিক অথবা রাজনৈতিক সুবিধা পাইবে না যাহাতে অপর কাহারও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। একদিক হইতে বিচার করিলে স্বাধীনতা এবং সাম্যের প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ নাই। কিন্তু, লর্ড অ্যাক্টনের মতে সাম্য অর্জিত হইলে স্বাধীনতা লাভের আশা ব্যর্থ হইবে "…the passion of equality makes vain the hope of freedom." Acton)। এই যুক্তিটি ঠিক নহে। স্বাধীনতা বলিতে যদি আমরা মনে করি কোন নাগরিকের যাহা খুশী করিবার একটি অনিয়ন্ত্রিত, অদম্য ইচ্ছা, তবে সেই স্বাধীনতা উচ্ছৃংখলতায় রূপান্তরিত হয় এবং তাহা প্রকৃত স্বাধীনতা নহে।

সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের দিক হইতে এই প্রকার স্বাধীনতা সমর্থনযোগ্য নহে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কোন নাগরিকের স্বাধীনতা যাহাতে অন্য কোন নাগরিকের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ না করে, সেইজন্য নাগরিকদের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলিতে পারি, ধনী লোকেরা যদি ইচ্ছা করেন যে তাঁহারা সরকার গঠন করিবেন, তবে তাঁহারা তাহা করিতে পারেন না; কেননা, গরীব, প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদেরও ধনীলোকদের ন্যায় সমান ভোটাধিকার আছে। ভোটের অধিকার প্রদানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই সাম্যনীতি অনুসৃত হওয়ায় সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণী কখনও সরকার গঠন করিয়া অপর কোনও শ্রেণীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না অথবা ইহার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিতে পারে না। এইভাবে সমাজে উভয়শ্রেণীরই স্বার্থ সমভাবে রক্ষিত হওয়ায় উভয়শ্রেণীর লোকেরাই সম্পূর্ণভাবে সামাজিক এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে স্বাধীনতা এবং সাম্য আপাতবিরোধী ধারণা নহে। প্রকৃকপক্ষে সাম্য হইতেছে স্বাধীনতার পরিপূরক। সমাজের সকলেই সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমান অধিকার না পাইলে স্বাধীনতা কখনই প্রকৃতভাবে ভোগ করা যায় না। আবার সমাজের সকলেরই সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকিলে সাম্যনীতি নিরর্থক হইয়া পড়ে। অধ্যাপক টনির মতে যদি স্বাধীনতার অর্থ হয় মানবাত্মার ব্যাপ্ত হইবার ক্ষমতা তবে ইহা যে সমাজে সাম্য নীতি অনুসৃত হয় না সেই সমাজ ছাড়া অন্যত্র সচরাচর দেখা যায় না। ("If liberty means the continuous power of expansion in the human spirit, it is rarely present save in a society of equals. '—(Prof. R. H. Tawney)। সমাজে যদি শুধু স্বাধীনতাই থাকে আর সাম্য না থাকে, তবে এক শ্রেণীর লোক নিজেদের শক্তির জোরে এবং স্বাধীনতার দাবীতে দুর্বল শ্রেণীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিবার চেষ্টা করিবে। তাহাতে দুর্বলশ্রেণীর জনগণ নিজেদের সব স্বাধীনতা হারাইয়া এমন এক পর্যায়ে উপনীত হইবে যাহা দাসত্বেরই সামিল। ইতিহাসের পাতায় আমরা দেখিয়াছি, সব নাগরিকেরই সমান ভোটাধিকার স্বীকৃত হইবার আগে শুধু যে শ্রেণীর লোকদের ভোটাধিকার ছিল, তাহাদেরই শিক্ষা, সম্পত্তি সংরক্ষণ এবং অন্যান্য স্বার্থের প্রতি সরকারের দৃষ্টি বেশী থাকিত। সরকার কর্তৃক এই প্রভেদমূলক আচরণ সামাজিক ঐক্য নষ্ট করে এবং সমাজে একটি বিরাট অংশের স্বাধীনতা খর্ব করে। আইনের চোখে যদি প্রত্যেকেরই সমান অধিকার থাকে, তবে তাহা রাজনৈতিক স্বাধীনতা বজায় রাখিবার একটি প্রধান সহায়ক। ভারতের

নাগরিকগণ অনেক স্বাধীনতা ভোগ করেন। কিন্তু, তাহা কখনই সম্ভবপর হইত না যদি শাসনতন্ত্রে প্রত্যেক নাগরিকেরই সমান সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকিত। এই সাম্য-বোধই নাগরিকগণকে প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করিতে সমর্থ করিয়াছে।

সাম্যের সংজ্ঞা এবং বিভিন্ন রূপ ঃ—(Definition and different types of Equality)—

সাম্যনীতি মানুষে মানুষে কোনও পার্থক্যের সৃষ্টি করে না। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে মানুষে মানুষে শারীরিক অথবা মানসিক গঠনে কোন পার্থক্য থাকিবে না। এখানে সাম্যনীতিকে আদর্শ হিসাবে ধরিতে হইবে। সমাজের সকলকেই সমান হইতে হইবে অথবা রাষ্ট্র সকলকেই সমান করিবে, এই অর্থে সাম্য কথাটি ব্যবহার করা যায় না। সাম্যের প্রকৃত অর্থ হইতেছে সমাজের প্রত্যেকের সমান সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অধিকার থাকে। প্রত্যেক নাগরিকই তাঁহার বংশ, পদমর্যাদা, শিক্ষা, জাতি-ধর্ম-নিবিচারে সমান সুযোগ পাইবে। আইনের চোখে সব নাগরিকই সমান। রাষ্ট্রও ইহার ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়া সমাজের কোন বিশেষ নাগরিকের প্রতি কোন পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিবে না অথবা কোন একটি শ্রেণীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়া অপর একটি শ্রেণীর স্বার্থ বজায় রাখিতে তৎপর হইয়া উঠিবে না। সকলকে সমান সুযোগ দিলে সকলেই যে সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিবে তাহা নহে। সমাজের প্রত্যেকেই পূর্ণ নাগরিক হয় না। কিন্তু, প্রত্যেক নাগরিকের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পথে যেন কোন বাধা না থাকে সেদিকে সরকারকে লক্ষ্য রাখার মধ্যে বিভিন্ন নাগরিকের মধ্যে কোন তারতম্য করা হইবে না। তবে সমাজজীবনে সামগ্রিক কল্যাণের জন্য যদি কখনও কোন একজন বিশেষ নাগরিককে তাঁহার উপযোগী কোন কাজের ভার দেওয়া হয় এবং সেইজন্য যদি তাঁহার যোগ্যতানুযায়ী তাঁহাকে কিছু অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া হয়, তাহাতে অপরের স্বাধীনতা খর্ব হয় না। কারণ, সমান সুযোগ দান করিবার, পরেও যদি নাগরিকগণ সমানভাবে তাহাদের ব্যক্তিত্বের উন্নতি করিতে না পারে সেইজন্য রাষ্ট্র দায়ী হইতে পারে না। সমান সুযোগ লাভ করিয়াও কেহ যদি কোনও বিশেষ কাজে অধিকতর যোগ্যতা অর্জন করে, তবে তাহাকে নিশ্চয়ই সেই যোগ্যতার জন্য পুরস্কৃত করা উচিত। সুতরাং সাম্যের অর্থ হইতেছে, সকলের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা যাহাতে সকলেরই ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সুন্দরতম পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে যে সকল বাধা, সেইগুলিও রাষ্ট্র দূর করিবে।

সাম্যের বিভিন্ন রূপ আছে। যথা—পৌর সাম্য (Civil Equality), সামাজিক সাম্য (Social Equality), রাজনৈতিক সাম্য (Political Equality), অর্থনৈতিক সাম্য (Economic Equality), আইনের সাম্য (Legal Equality), এবং প্রাকৃতিক সাম্য (Natural Equality)। স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপের ন্যায় সাম্যেরও বিভিন্ন রূপ আছে।

পৌর সাম্য

প্রথমতঃ, পৌর সাম্য বলিতে আমরা বুঝি পৌরজীবনে বিভিন্ন নাগরিকগণ সমানভাবে পৌর-স্বাধীনতা ভোগ করিবে। প্রত্যেকেই সমানভাবে নিজেদের মৌলিক অধিকারগুলি সংরক্ষণ করিতে পারিবে। ধর্মে স্বাধীনতা, শিক্ষালাভ করা, সম্পত্তি রক্ষা করা, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা প্রভৃতি সকল প্রকার নাগরিক অধিকার সকলেই সমানভাবে ভোগ করিবে।

সামাজিক সাম্য

দ্বিতীয়তঃ, সামাজিক জীবনে যখন জন্ম, ধন, বংশ, জাত অথবা ধর্মীয় মতবাদের ভিত্তিতে নাগরিকের মধ্যে কোন প্রকার তারতম্য করা হয় না, তখন ইহাকে আমরা সামাজিক সাম্য বলি। সামাজিক জীবনে সকলেই সমান। রাষ্ট্রে যদি একদল লোককে অস্পৃশ্য হিসাবে বাস করিতে হয়, তবে রাষ্ট্রের সাম্যনীতি তাহাতে ক্ষুণ্ণ হয়।

রাজনৈতিক সাম্য

তৃতীয়তঃ, রাজনৈতিক সাম্য বলিতে আমরা বুঝি দেশের সব প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের সমান রাজনৈতিক অধিকার। নির্বাচনে ভোট প্রদান করিবার অধিকার, সরকারী ক্রিয়াকলাপে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার, সরকারী চাকুরি করিবার অধিকার, প্রয়োজনবোধে সরকারের সমালোচনা করিবার অধিকার, এই রাজনৈতিক অধিকারগুলি যখন সকলেই সমানভাবে ভোগ করে, তখন ইহাকে আমরা রাজনৈতিক সাম্য বলি। অনেক সময় হয়ত উন্মাদ, দেউলিয়া, নাবালক অথবা ফৌজদারী আইনে অপরাধীগণকে রাজনৈতিক অধিকার হইতে সাময়িকভাবে বঞ্চিত করা হয়, তাহাতে রাজনৈতিক সাম্য নীতির অবমাননা হয় না। কারণ, এই ব্যতিক্রম সব দেশেই থাকে। যদি স্ত্রী-পুরুষ হিসাবে অথবা জাতি হিসাবে কখনও নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করার ব্যাপারে তারতম্য হয়, তবে ইহাকে আমরা রাজনৈতিক সাম্য নীতির বিরোধী বলিতে পারি। যে সমস্ত দেশে সব প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকই ভোট প্রদান করিবার অধিকারী, সেই সকল দেশের নাগরিকগণ রাজনৈতিক সাম্যের সুবিধা প্রাপ্ত হয়। ভারতবাসীগণ রাজনৈতিক সাম্যের সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছে।

চতুর্থতঃ, অর্থনৈতিক সাম্য বলিতে আমরা বুঝি নাগরিকগণের সমান সম্পত্তি এবং সমান আয়। আয়ের এবং ধনের বৈষম্য দূরীভূত হইলেই অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। রাশিয়া প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেই অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। অর্থনৈতিক অধিকার এবং অর্থনৈতিক সাম্য একসংগে থাকিতে পারে না। কারণ, যখনই কাহারও পূর্ণ অর্থনৈতিক অধিকার থাকিবে, তখনই সে তাহার আয় এবং ধন বাড়াইবার জন্য বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা চালাইতে পারে। কিন্তু অর্থনৈতিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে কেহই একটি নির্দিষ্ট সীমার উপরে আয় এবং ধন বাড়াইতে পারে না এবং সকলেই যাহাতে সেই নির্দিষ্ট পরিমাণে আয় এবং ধন অর্জন করিতে পারে, রাষ্ট্র নিজের উদ্যোগে সেই ব্যবস্থা করিয়া দেয়। কিন্তু রাজনৈতিক অধিকার অথবা পৌর অধিকার এবং অর্থনৈতিক সাম্য একসংগে থাকিতে পারে। আবার রাজনৈতিক অধিকার অথবা পৌর অধিকার এবং অর্থনৈতিক অধিকারও একসংগে থাকিতে পারে। সোভিয়েট রাশিয়ায় অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু, সেখানেও অর্থনৈতিক সাম্য নীতির কিছুটা পরিবর্তন হইয়াছে। রাশিয়ায় যে একেবারেই বে-সরকারী সম্পত্তি নাই তাহা নহে,—তবে সব কিছুরই উপর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব থাকে যাহাতে অর্থনৈতিক শোষণ না হয়।

অর্থনৈতিক সাম্য

পঞ্চমতঃ, আইনগত সাম্য বলিতে আমরা বুঝি আইনের চোখে সকলেরই সমান অধিকার। সাম্যের যে সমস্ত বিভিন্ন রূপ আমরা উপরে আলোচনা করিয়াছি, সেইগুলি বাস্তবে প্রকৃতভাবে কার্যকরী হইলে আইনগত সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আইন সকলের প্রতি সমানভাবে প্রযোজ্য, ইহাই আইনগত সাম্যের মূল কথা। তবে কোন কোন দেশে সরকারী কর্মচারীদের অপরাধ বিচারের জন্য আলাদা বিচারালয়ের ব্যবস্থা থাকায় আইনগত সাম্য ক্ষুন্ন হয় কিনা সেই বিষয়ে প্রশ্ন উঠিতে পারে। ইংলণ্ডে আইনের চোখে সকলেই সমান ; কিন্তু, ইংলণ্ডের সরকারী কর্মচারীদের অপরাধ বিচার করিবার জন্য আলাদা আদালতের ব্যবস্থা আছে। ভারত, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল প্রভৃতি রাষ্ট্রকর্ণধারগণের বিচার যে সাধারণ আদালতে হয় না, ইহাতে আইনগত সাম্যের আদর্শ হয়ত কিছুটা ক্ষুন্ন হয়, কিন্তু জনস্বার্থের বিবেচনায় এই ব্যবস্থায় খুব দোষের কিছু নাই।

আইনগত সাম্য

সর্বশেষে, প্রাকৃতিক সাম্য বলিতে আমরা বুঝি, মানুষ একই অবস্থায় এবং একই ইন্দ্রিয় লইয়া জন্মগ্রহণ করে বলিয়া জন্মের সময় প্রাকৃতিকভাবে সকলেই সমান। এজন্যই সাধারণতঃ বলা হয়, "সকলেই স্বাধীন এবং সমান হইয়া

জন্মগ্রহণ করে।" ("All are born free and equal.") কিন্তু, এই তত্ত্বটি আমাদের বহুদূর লইয়া যাইতে পারে না। কারণ, জন্মের পর হইতেই প্রাকৃতিক সাম্য ক্রমশঃ প্রাকৃতিক অসাম্যে পরিণত হয়।

অনেকে বলেন, অর্থনৈতিক সাম্যের উপর পৌর স্বাধীনতা অনেকাংশে নির্ভর করে। এই যুক্তির সমর্থনে আমরা বলিতে পারি, যদি দেশে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে নাগরিক জীবনের সব অধিকার সকলের পক্ষে সমান ভাবে ভোগ করা সহজ হইবে। নাগরিক জীবনের স্বাধীনতা তখনই পূর্ণভাবে ভোগ করা সম্ভবপর যখন ইহার উপর কাহারও কোন রকমের হস্তক্ষেপ অথবা আধিপত্য থাকে না। দেশে যদি অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে সম্পত্তি রক্ষা করা, চাকুরি করা, বিভিন্ন উপায়ে অর্থ উপার্জন করা প্রভৃতি ব্যাপারে সকলেরই সমান ক্ষমতা এবং অধিকার থাকিবে, এবং যাহাতে একজন অপরকে শোষণ না করিতে পারে, এই ব্যবস্থা রাষ্ট্র অবলম্বন করিবে। সুতরাং পৌর স্বাধীনতার অর্থনৈতিক দিক চিন্তা করিলে ইহা অর্থনৈতিক সাম্যের উপর নির্ভরশীল।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে যাহাতে নাগরিকগণ ভোগ করিতে পারে সেইজন্ম অর্থনৈতিক সাম্যের একান্ত আবশ্যক। দেশে যদি অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে নাগরিকগণ যথেচ্ছভাবে নিজেদের আয় এবং ধন বাড়াইতে পারে এবং ইহার ফলে দেশে শ্রেণী-বৈষম্যজনিত সংগ্রাম এবং অর্থনৈতিক শোষণের শুরু হইতে পারে। তখন শ্রেণীগত স্বার্থে সকলেই সরকার গঠনের চিন্তা করে এবং গণতন্ত্রের মূল আদর্শ সকলে ভুলিয়া যায়। যদি ধনীশ্রেণী সরকার গঠন করেন, তবে হয়ত গরীবের উপর অর্থনৈতিক চাপ বেশী পড়িতে পারে। তাহাতে সমাজজীবনে বিশৃংখলা সৃষ্টি হইতে পারে। সেইজন্যই রাজনৈতিক অধিকারের পূর্ণ বিকাশের জন্য অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। অধ্যাপক কোল (Cole) বলেন, "Political liberty in the absence of economic equality is held to be a mere myth."

এই যুক্তিটির তাৎপর্য আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, আমেরিকা, ইংলণ্ড, ভারত প্রভৃতি দেশে আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, অথচ এই দেশগুলির নাগরিকেরা পরিপূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে। অপরদিকে সোভিয়েট রাশিয়ায় অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অথচ সেই দেশের নাগরিকগণ পরিপূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারিতেছে না। কারণ সেই দেশে একদলীয় শাসন প্রচলিত থাকায় সরকার-বিরোধী দলের কোন স্থান নাই। সরকার যদি জনস্বার্থের বিরুদ্ধে

কোন কাজ করেন এবং নাগরিকগণের যদি তাহা সমালোচনা করিবার অধিকার না থাকে, তবে "রাজনৈতিক স্বাধীনতা" কথাটি সম্পূর্ণ অর্থহীন। মূলকথা হইতেছে রাজনৈতিক স্বাধীনতার মূল ভিত্তি হইতেছে সুদৃঢ় জনমত। তবে পরিপূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করা সহজ হয় যদি দেশে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

সংক্ষিপ্তসার

১। **স্বাধীনতার অর্থ**—স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় এমন কতিপয় নিষেধাজ্ঞার অভাব যে নিষেধাজ্ঞাগুলি আধুনিক সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিবার পথে অন্তরায় হয়। কিন্তু, নিষেধাজ্ঞার অভাবই স্বাধীনতা নয়। স্বাধীনতা তখনই সার্থক হয় যখন মানুষ চিন্তার অধিকার, কথা বলার অধিকার এবং কাজের অধিকার লাভ করে। স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নহে। স্বাধীনতার একটি নিয়ন্ত্রণী শক্তি থাকা দরকার, এবং তাহা হইতেছে আইন। স্বাধীনতা নানাপ্রকার হইতে পারে; যথা,

প্রাকৃতিক স্বাধীনতা, পৌর স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, জাতীয় স্বাধীনতা।

২। **স্বাধীনতা ও আইনের মধ্যে সম্পর্ক**—প্রকৃত স্বাধীনতা ও সার্বভৌম ক্ষমতা পরস্পর বিপরীতার্থক শব্দ নহে। আইনের সাহায্যে রাষ্ট্র স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করিয়া এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারে যেখানে সমাজের প্রত্যেকেই নিশ্চিন্তমনে স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে। রাষ্ট্রীয় আইন নাগরিকদের স্বাধীনতা রক্ষা করে এবং স্বাধীনতার প্রকৃত বিকাশের পক্ষে উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রের সংবিধানিক আইন, যেমন, "হেবিয়াস কর্পাস আইন", "অধিকারের বিধি", প্রভৃতি জনগণের স্বাধীনতার ধারক এবং বাহক। তাহা ছাড়া, জনসাধারণের স্বাধীন চিন্তাধারা রাষ্ট্রীয় আইনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। এইজন্যই বলা হয়, আইন হইতেছে স্বাধীনতার সর্ত ("Law is the condition of liberty.")।

৩। **স্বাধীনতার রক্ষাকবচ**—স্বাধীনতা রক্ষা করিবার বিভিন্ন উপায় আছে। প্রথমতঃ, স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য সরকারকে গণতান্ত্রিক হইতে হইবে। গণতন্ত্রে প্রত্যেক নাগরিক সমান সুযোগ লাভ করে। দ্বিতীয়তঃ, সচেতন জনমত স্বাধীনতা রক্ষা করিবার সর্ত হিসাবে অপরিহার্য। অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেন, চিরন্তন সতর্কতাই হইতেছে স্বাধীনতার মূল্য। তৃতীয়তঃ,

নাগরিকদের মৌলিক অধিকার লিখিত থাকিলে জনগণের স্বাধীনতা সুরক্ষিত থাকে। চতুর্থতঃ, সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্য বিধান নাগরিকদের স্বাধীনতা রক্ষার অন্য একটি উপায়। সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্য বিধান করা হইলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সুরক্ষিত হয় এবং ইহাতে জনসাধারণের স্বাধীনতাও অক্ষুণ্ণ থাকে।

৪। **সাম্যের অর্থ এবং স্বাধীনতা ও সাম্যের মধ্যে সম্পর্ক**—সাম্য কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য হইতেছে সকলের জন্য সমান সুযোগ সুবিধার পথ খোলা রাখিয়া সমানভাবে সকলেরই ব্যক্তিত্ব বিকাশের অন্তরায়গুলি দূর করা। অধ্যাপক লাস্কির মতে সাম্য হইতেছে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের একটি সোপান; —ইহা হইতেছে এমন একটি পরিবেশ বজায় রাখার ব্যবস্থা যেখানে মানুষ তাঁহার ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশের সুযোগ পায়। রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক সাম্য, অথবা সামাজিক স্বাধীনতা এবং সামাজিক সাম্য পরস্পরের পরিপূরক; কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক সাম্য পরস্পর বিরোধী আদর্শ। অর্থনৈতিক সাম্যে জনগণের মধ্যে আয় ও ধনের বৈষম্য থাকে না; কিন্তু, অর্থনৈতিক স্বাধীনতায় জনগণ স্বাধীনভাবে উপার্জন বাড়াইবার চেষ্টা করিতে পারে, এবং ইহাতে সমাজে শ্রেণীবিভাগের সৃষ্টি হয়।

Exercises

1. What do you mean by Liberty? "The liberty of an individual is not always in inverse ratio to the amount of State Legislation." Examine the statement.

Or, Define Liberty. "Sovereignty and Liberty are not contradictory terms." Examine the statement.

[**উত্তর-সংকেত** ঃ—এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমে স্বাধীনতা কাহাকে বলে সেই সম্বন্ধে এবং স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতে হইবে। ইহার পর আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে।]

2. Discuss the safeguards of Liberty. Does Liberty quarrel with itself? Give reasons for your answer.

(প্রথম অংশটির জন্য ৯২-৯৪ পৃষ্ঠা দেখ।)

[**শেষ অংশটির উত্তর-সংকেত** ঃ—অনেক সময় বলা হয় যে স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপের মধ্যে কোন একটি হয়ত অন্য কোন একটির বিরোধী হইতে

পারে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অনুযায়ী একজন লোক হয়ত কোন কিছু করার অধিকারী। কিন্তু, কোন কাজ করিবার সময় সে হয়ত তাহার চাকুরি ক্ষেত্রের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রাষ্ট্রীয় আইনের অজুহাতে কোন কাজ করা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে। কোন শ্রমিক হয়ত রাজনীতিতে যোগদান করিয়া ট্রেড্ ইউনিয়ন আন্দোলন পরিচালিত করিতে পারে। আবার হয়ত রাষ্ট্রই এমন আইন করিয়া দিতে পারে যে কতিপয় কারখানার (যেমন, জনস্বার্থের সংগে জড়িত কারখানা) শ্রমিকগণ নিজেদের ট্রেড্ ইউনিয়নকে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের কর্মক্ষেত্র করিতে পারিবে না; কারণ, ইহাতে সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। এই ক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই যে স্বাধীনতার একটি রূপ অপর একটি রূপের বিরোধী। কিন্তু, এই রকম ঘটনা সর্বদা ঘটে না। যদিই বা কখনও এই রকম বিরোধ ঘটে, তবে সেই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় আইন কার্যকরী হয়।

3. What do you mean by Equality ? What are its different types ? Discuss the relation between Liberty and Equality.

(৯৫-৮১ পৃষ্ঠা)

4. "The passion of equality makes vain the hope of freedom." (Lord Acton.)—Examine the statement.

(৯৫-৯৭ পৃষ্ঠা)

সপ্তম অধ্যায়

রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদ—সভ্যতার সহিত জাতীয়তাবাদের সম্পর্ক

(State and Nationalism—Relation between Nationalism and Civilisation)

জাতীয় জনসমাজ গঠনের পূর্বে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বজাতীয় জনসমষ্টি (People) বলিতে কি বুঝায় আমাদের তাহা জানিতে হইবে। বার্জেসের মতে, স্বজাতীয় জনসমষ্টি বলিতে বুঝায় একটি জনসমষ্টি যাহাদের একই ভাষা ও সাহিত্য, একটি সাধারণ ঐতিহ্য ও ইতিহাস, সাধারণ আচার-ব্যবহার এবং ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে সাধারণ চেতনা আছে এবং যাহারা একটি ভূভাগে বাস করে। কিন্তু স্বজাতীয় মানুষের গঠনে নির্দিষ্ট ভূভাগ অপেক্ষা একই ঐতিহ্য এবং ঐক্যবোধের গুরুত্ব অনেক বেশী।

স্বজাতীয় জনসমষ্টি কাহাকে বলে ?

জাতীয় জনসমাজ (Nationality) গঠিত হয় তখনই যখন স্বজাতীয় একদল লোক আরও গভীর ঐক্যবোধের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া নিজেদের অন্যান্য জনসমাজ হইতে স্বতন্ত্র মনে করে। জাতীয় জনসমাজ গঠিত হয় একদল জনসমষ্টি লইয়া যাহাদের মধ্যে ভাষাগত, বংশগত, ধর্মগত বা কৃষ্টিগত ঐক্য বিদ্যমান থাকে এবং যাহারা একটি নির্দিষ্ট ভূভাগে বাস করে। স্বজাতীয় মানুষের মধ্যে বংশগত ঐক্য থাকিবেই এমন কোন কথা নাই। কিন্তু জাতীয় জনসমাজে বংশগত ঐক্য থাকিবে। কারণ, ইংরাজী "Nationality" কথাটি আসিয়াছে "Natio" কথা হইতে। "Natio" কথাটির অর্থ হইল জন্ম। জাতীয় জনসমাজের রাজনৈতিক চেতনা অন্যতম বৈশিষ্ট্য। স্বজাতীয় মানুষের নির্দিষ্ট মাতৃভূমি অথবা রাজনৈতিক চেতনার অভাব থাকিতে পারে; যেমন, কিছুকাল পর্যন্ত ইহুদী জাতির কোন নির্দিষ্ট মাতৃভূমি ছিল না অথবা ইহুদীদের রাজনৈতিক চেতনা ছিল না, কিন্তু তাহারা একটি সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী ছিল,—ইহাই তাহাদিগকে একটি স্বজাতীয় জনসমষ্টিতে পরিণত করিয়াছিল। জাতীয় জনসমাজ যখন রাষ্ট্রনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ সচেতন হয় এবং একটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্রের মাধ্যমে নিজেদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার চেষ্টা করে, তখন জাতীয় জনসমাজ জাতিতে পরিণত হয়। জাতীয়তাবোধের সহিত যখন একটি রাষ্ট্র গঠিত হয় তখন জাতীয় জনসমাজ রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়।

জাতীয়তাবোধের সৃষ্টির পিছনে দুইটি রাজনৈতিক আদর্শ বিশেষ কার্যকরী হইয়াছিল; একটি হইতেছে রেঁনেসার যুগে সার্বভৌম শক্তি সম্বন্ধে জনসাধারণের ধারণা এবং আর একটি হইতেছে নিজস্ব সরকার গঠন করিবার বৈপ্লবিক অধিকার। রেঁনেসার যুগে প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই স্থানীয় স্বাধীনতা (local independence) বজায় রাখিবার পক্ষে আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল। অপরদিকে প্রত্যেকেরই নিজস্ব সরকার গঠন করিবার অধিকার থাকিবে, এই বৈপ্লবিক অধিকার সম্বন্ধেও জনসাধারণ ক্রমশঃ সচেতন হইয়াছিল। এই দুইটি আদর্শের সমন্বয়ে সৃষ্ট হইয়াছে জাতীয়তাবাদের আদর্শ, বার্নসের (Burns) ভাষায় "Out of Renaissance Sovereignty combined with Revolutionary Rights comes Nationalism"।

জাতীয় জনসমাজের উপাদান (Elements of Nationality)

বংশের ঐক্য একটি প্রধান উপাদান, কিন্তু অপরিহার্য নয়।

জাতীয় জনসমাজের উপাদানগুলির মধ্যে আমরা দুইটি ভাগ করিতে পারি, যথা—বাহ্যিক ও ভাবগত। প্রথমতঃ, বংশগত ঐক্য (racial unity) জাতীয় জনসমাজ গঠনের একটি প্রধান উপাদান। কিন্তু বংশগত ঐক্য যে একেবারে অপরিহার্য তাহা নহে। জার্মান এবং ইংরাজ একই টিউটন বংশোদ্ভব, কিন্তু তাহারা দুইটি পৃথক জাতির সৃষ্টি করিয়াছে। অপরপক্ষে পাঞ্জাবী এবং বাংগালী এক বংশোদ্ভব না হইলেও বর্তমানে এক জাততে পরিণত হইয়াছে। পৃথিবীর দুইটি সভ্য জাতি, ইংরাজ এবং ফরাসী, বিভিন্ন বংশের সংমিশ্রণে সৃষ্ট হইয়াছে।

ভাষাগত ঐক্য—ইহাও অপরিহার্য নয়।

দ্বিতীয়তঃ, ভাষাগত ঐক্য (Sameness of language) জাতীয় জনসমাজ গঠনের অপর একটি প্রধান উপাদান। কিন্তু এই উপাদানটিও একেবারে অপরিহার্য নয়। ভারতবর্ষে অনেক ভাষাভাষী আছে কিন্তু, তাহাতে আমাদের জাতীয় সংহতি বিপর্যস্ত হয় নাই। সুইজারল্যাণ্ডের লোকেরা তিন ভাষায় কথা বলে; রাশিয়ায়ও অনেক ভাষা প্রচলিত। কিন্তু এইজন্য ভাষার বৈষম্য কখনই অখণ্ড জাতীয়তাবোধ গঠনের অন্তরায় হয় নাই। তবে ভাষাগত ঐক্য যে জাতীয়তাবোধ গঠনের পক্ষে খুবই সহায়ক তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু, এই উপাদান না থাকিলেও অর্থাৎ, ভাষার ঐক্য না থাকিলেও জাতীয় জনসমাজ গঠিত হইতে পারে।

তৃতীয়তঃ ধর্মগত ঐক্য (Religious unity) জাতীয় জনসমাজ গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু ধর্ম-নিরপেক্ষ

রাষ্ট্রগুলিতে ইহার গুরুত্ব অনেক কমিয়া গিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ ভারতের কথা ধরা যাইতে পারে। পাকিস্তানে যদিও মুসলমান-ধর্মাবলম্বীর সংখ্যাধিক্য, হিন্দুধর্মের অস্তিত্ব সেখানে এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। ভারতবর্ষে অনেক ধর্মের লোক বাস করে। সোভিয়েট ইউনিয়নে খৃষ্টান, মুসলমান, ইহুদি এবং বৌদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের লোকের বাস। কিন্তু, ধর্মের অনৈক্য সেই দেশে জাতীয় জনসমাজ গঠনে অন্তরায় হয় নাই।

ধর্মগত ঐক্য—ইহার গুরুত্বও কমিয়া গিয়াছে

একজাতি, একরাষ্ট্র নীতি (Principle of One Nation, One State)—যখনই কোন জাতীয় জনসমাজ নিজের পৃথক সত্তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ হয় তখনই ইহা নিজের পৃথক সত্তাকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে, বজায় রাখিতে সচেষ্ট হয়। প্রত্যেক জাতিই চায় নিজের জাতীয় চরিত্র বজায় রাখিতে এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি রক্ষা করিতে। গত শতাব্দীতে জন স্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন যে সাধারণভাবে স্বাধীন সরকার বজায় রাখিতে হইলে জাতীয় জনসমাজের সীমারেখার সমানুপাতে রাষ্ট্রের সীমারেখা টানা উচিত। ("It is in general a necessary condition of free institutions that the boundaries of governments should coincide in the main with those of nationalities."—Mill).[১] ইহা হইতেছে জাতির আত্মনির্ধারণের অধিকার (Right of self-determination)। জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে যখনই কোন জাতীয় ঐক্য প্রবল হয়, তখনই সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত জনগণের নিজস্ব ও পৃথক সরকার দাবী করিবার প্রাথমিক যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত। ("Where the sentiment of nationality exists in any form, there is a prima facie case for uniting all the members of the nationality under the same government.)[২] অর্থাৎ, জন স্টুয়ার্ট মিল "এক জাতি, এক রাষ্ট্র" (one Nation, one State) নীতি সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার মতে বিভিন্ন জাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রে স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। ("Free institutions are next to impossible in a country made up of different nationalities.")।[৩] একটি জাতীয় জনসমাজ লইয়া গঠিত রাষ্ট্রের (mono-national state) পক্ষে প্রধান যুক্তি

১। Mill—Representative Government, Chapter on 'Nationality'.

২। Ibid.

৩। Ibid.

হইতেছে, ইহা একটি জাতির নিজস্ব সংস্কৃতি এবং বৈশিষ্ট্যগুলি রক্ষা করিতে সাহায্য করে। তাহা ছাড়া, বহু জাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রে (poly-national state) বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাদ হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। সেক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে কাজ করা কঠিন হয় এবং বিভিন্ন স্বাধীন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষেও টিকিয়া থাকা কঠিন হইয়া পড়ে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর প্রেসিডেন্ট উইলসন একটি জাতি লইয়া রাষ্ট্র গঠন করিবার নীতি সমর্থন করেন। তাঁহার মতে বিভিন্ন জাতীয় জনসমাজকে আত্ম-নির্ধারণের অধিকার প্রদান করিলে পৃথিবী হইতে যুদ্ধের সম্ভাবনা তিরোহিত হইবে। পতনোন্মুখ জাতির পক্ষে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে নিজের একটি স্বাধীন রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান চাই। অপর জাতির পদানত হইয়া থাকিলে কোনও জাতীয় জনসমাজের পক্ষে নিজের ঐতিহ্য বজায় রাখা সম্ভব নহে। যদি অনেকগুলি জাতি লইয়া একটি রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং সেখানে যদি একটি বড় জাতি সর্বদাই অবিচার পাইতে থাকে অথবা নিজস্ব স্বাধীন রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন না করিতে পারিয়া অতৃপ্ত থাকে, তবে সেক্ষেত্রে সেই জাতির আত্মনির্ধারণের অধিকার লাভ করার যথেষ্ট দাবী আছে। কোন জাতির ন্যায়সংগত দাবি যদি অগ্রাহ্য করা হয় তবে জাতির আন্তর্জাতিক সম্পর্কে শান্তি নষ্ট হইতে পারে। উইলসন বলেন, আত্মনির্ধারণ অধিকার শুধু নিছক বাক্যাংশ নহে, ইহা একটি পালনীয় কার্যনীতি যাহা উপেক্ষা করিলে রাজনীতিজ্ঞগণ নিজেদের বিপদ সৃষ্টি করিবেন। ("Self-determination is not a mere phrase : it is an imperative principle of action which statesmen will henceforth ignore at their peril.")

কিন্তু লর্ড অ্যাক্টন (Lord Acton) এবং গাম্প্লোউইক্ (Gumplowicz) "এক জাতি, এক রাষ্ট্র" নীতি সমর্থন করেন না। অ্যাক্টনের মতে, জাতিতত্ত্ব হইতেছে ইতিহাসের পশ্চাদ্‌গামী পদক্ষেপ ("The theory of Nationality is a retrograde step in history.")। একটি জাতির বিভিন্ন অধিকারের সর্বপ্রধান বিরোধী হইতেছে জাতিতত্ত্ব স্বয়ং। ("The greatest adversary of the rights of nationality is the theory of nationality itself.") গাম্প্লোউইক্ (Gumplowicz) বলেন, একটি জাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রের যে বহু জাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্র অপেক্ষা অনেক বেশী সুবিধা আছে এই মতের কোনও ঐতিহাসিক অথবা সমাজতাত্ত্বিক যুক্তি নাই। ("There is no historical or sociological justification of the view that mono-national states possess elements of advantage over those composed of a number of nationalities.")

প্রথমতঃ, লর্ড অ্যাক্টনের মতে সমাজে জনসমষ্টি যেমন অত্যাবশ্যক, সেইরকম সুসভ্য জীবনের একটি প্রয়োজনীয় সর্ত হইল একটি রাষ্ট্রে জাতিসমষ্টি। বুদ্ধি এবং জ্ঞানের দিক দিয়া উন্নত জাতির সংস্পর্শে আসিয়া অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর জাতিগুলিও উন্নত হয়। এই সংমিশ্রণ হয় রাষ্ট্রের মধ্যেই যাহার ফলে মানবসমাজের একটি অংশের বীর্য, জ্ঞান এবং ক্ষমতা অপর একটি অংশে সঞ্চারিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, বহুজাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রে স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলি টিকিয়া থাকে না, এই কথা বলা অযৌক্তিক। সুইজারল্যাণ্ড, আমেরিকা, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে অনেক জাতি আছে। কিন্তু এই দেশগুলিতেই আমরা স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব দেখিতে পাই।

তৃতীয়তঃ, আত্মনির্ধারণ নীতি বাস্তবজীবনে প্রয়োগ করা অনেক সময়েই জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূল হয়। যে সমস্ত দেশে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি অনেকদিন যাবৎ বসবাস করিয়া একটি ভাবগত ঐক্যের মাধ্যমে এক আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছে, পরবর্তীকালে যদি সেই জাতিগুলিকে আত্মনির্ধারণের অধিকার প্রদান করা হয়, অর্থাৎ নিজেদের পৃথক পৃথক রাষ্ট্র করিবার সুযোগ দেওয়া হয়, তবে তাহা জাতিগুলির স্বার্থের প্রতিকূল হইবে। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে লোক-বিনিময়ের সাহায্যে আত্মনির্ধারণ নীতি প্রয়োগ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। যেমন প্রথম মহাযুদ্ধের পর গ্রীস এবং তুরস্কের মধ্যে লোক বিনিময় হইয়াছিল। তাহা ছাড়া, জার্মানি ও চেকোশ্লোভাকিয়া এবং জার্মানি ও পোলাণ্ডের মধ্যেও লোক-বিনিময় নীতি অনুসরণ করা হইয়াছে। আংশিকভাবে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেও লোক-বিনিময় নীতি প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হইয়াছে।

চতুর্থতঃ, আত্মনির্ধারণ নীতি কার্যকরী করিলে অনেক রাষ্ট্রেরই বর্তমান কাঠামো ভাংগিয়া যাইবে এবং তাহাতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি নষ্ট হইয়া যাইবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, এই নীতি কার্যকরী হইলে ইউরোপে বর্তমানের আটাশটি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আটষট্টি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইবে। বর্তমানের সুইজারল্যাণ্ড এবং ইংলণ্ড ত্রিধা বিভক্ত হইবে। ভারতবর্ষকেও মোটামুটিভাবে ১৫।১৬টি রাষ্ট্রে বিভক্ত করিতে হইবে। সেক্ষেত্রে কোনও রাষ্ট্রই সম্পূর্ণভাবে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে না। নিজেদের মধ্যে কেবল বিবাদবিসংবাদ লাগিয়াই থাকিবে। আত্মনির্ধারণ নীতির দুইটি দিক্ আছে। একদিকে যেমন ইহা কোন জাতীয় জনসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করিতে পারে, অন্যদিকে ইহা জনসমাজের মধ্যে ভাংগনের সৃষ্টি করিতে পারে। লর্ড কার্জন বলিয়াছিলেন, "The right of self-deter-

mination is a double-edged sword ; it is and has been in the past a unifying force but it may be, and has recently become, also a disintegrating force". জাতিগুলির আত্মনির্ধারণ নীতি একদিকে জার্মানী, ইটালী প্রভৃতি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়াছিল ; অপর দিকে এই জাতি অস্ট্রিয়া-হাংগারী, তুরস্ক এবং রাশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রে ভাংগনের সৃষ্টি করিয়াছিল।

পঞ্চমতঃ, স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করিতে পারিলেই যে বিভিন্ন জাতি সর্বাংগীণ উন্নতি করিয়া আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলি কোন না কোন বৃহৎ শক্তির তাঁবেদার হইয়া পড়ে। পাকিস্তানের সৃষ্টি হইয়াছিল মিঃ জিন্না কর্তৃক প্রস্তাবিত দ্বিজাতি-তত্ত্বের ভিত্তিতে। মুসলমান জাতি পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে ; কিন্তু বর্তমানে ইহা আমেরিকার তাঁবেদার হইয়া পড়িয়াছে।

ষষ্ঠতঃ, জাতিগুলির আত্মনির্ধারণ-নীতি একবার প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলে ইহার পরিসমাপ্তি কোনদিনই হইবে না এবং ইহার ফলে জাতিতে জাতিতে যে কলহের সৃষ্টি হইবে তাহা আন্তর্জাতিক শান্তি বিপন্ন করিতে পারে। উইল্সন্ বলিয়াছিলেন, আন্তর্জাতিক শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই বিভিন্ন জাতিকে আত্মনির্ধারণের অধিকার দেওয়া উচিত। কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে এই নীতি কার্যকরী হইলে অনেক ঐক্যবদ্ধ বৃহৎ রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটিবে। তাহাতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হইবে।

সপ্তমতঃ, অনেক জাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে বিভিন্ন জাতি নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতি এবং বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে পারে না তাহা নহে। বস্তুতঃ, এই রাষ্ট্রগুলি একটি জাতির ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রগুলি অপেক্ষা বেশী উন্নত। আমেরিকা, রাশিয়া, গ্রেট্ব্রিটেন্ প্রভৃতি রাষ্ট্র ইহা প্রমাণ করে।

পরিশেষে বলা যাইতে পারে, কোন কোন ক্ষেত্রে আত্মনির্ধারণ-নীতির প্রয়োগ করা উচিত। যদি অনেক জাতি লইয়া গঠিত কোন রাষ্ট্রে দেখা যায় যে একটি জাতি অপর জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে চাহে, অথবা ইহাদের মধ্যে বিবাদবিসংবাদ লাগিয়াই আছে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আত্ম নির্ধারণ নীতি প্রয়োগ করা উচিত। সর্বক্ষেত্রে জাতিতত্ত্ব (Theory of Nationality) রাষ্ট্রগঠনের সন্তোষজনক ভিত্তি নহে।

জাতীয় জনসমাজের অধিকার (Rights of a Nationality)—একটি জাতীয় জনসমাজের প্রধান অধিকার হইল আত্মনির্ধারণের অধিকার। প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সন্ ইহার উপর অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমানে আমরা একটি রাষ্ট্রে বিভিন্ন জাতির সমন্বয় দেখিতে পাই। তবুও বিভিন্ন জাতির অন্যান্য অধিকার আছে। সেগুলি নিম্নে আলোচিত হইল :—

(ক) জাতীয় চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার অধিকার প্রত্যেক জাতিকেই দেওয়া উচিত। রাষ্ট্র কখনই এমন আইন প্রয়োগ করিবে না যাহাতে রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা এই অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। ইহা মূলতঃ জাতির বাঁচিয়া থাকিবার দাবী (Right to exist)।

(খ) একটি জাতীয় জনসমাজের আর একটি দাবী হইল ভাষারক্ষার অধিকার। প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব সংস্কৃতি এবং আচার-ব্যবহার আছে। এই সংস্কৃতি এবং আচার-ব্যবহার যাহাতে টিঁকিয়া থাকে সেজন্য প্রত্যেক জাতিই চেষ্টা করে। ভাবের আদান-প্রদানের সুবিধা না থাকিলে এবং সংস্কৃতির পুষ্টিসাধন না হইলে কোন জাতিই উন্নত হইতে পারে না। সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতির কখনই সংখ্যালঘিষ্ঠদের ভাষার উন্নতির পথে বাধার সৃষ্টি করা উচিত নহে, অথবা নিজেদের ভাষা সংখ্যালঘিষ্ঠদের উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া উচিত নহে।

(গ) সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতিকে সর্বদাই স্থানীয় আচার ও প্রথা রক্ষার (right to retention of local laws and customs) অধিকার প্রদান করা উচিত। এই সামাজিক প্রথাগুলি জাতীয় জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। লীগ্ অব নেশন্‌স্ সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতির এই অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। অবশ্য দেখিতে হইবে স্থানীয় আচার ও প্রথা যেন সমগ্র জাতীয় জীবনের ক্ষতির কারণ না হয়।

(ঘ) একটি রাষ্ট্রে সব জাতিরই আইনগত এবং রাজনৈতিক সাম্যের অধিকার (right to legal and political equality) থাকা উচিত। রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকই এই অধিকার দাবী করিতে পারে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনের চোখে সকলেই সমান।

জাতীয়তাবাদের মূল্য ও ত্রুটি—জাতীয়তাবাদের আদর্শ ও সভ্যতা (Value and limitations of the ideal of Nationalism—Ideal of Nationalism and Civilisation)

জাতীয়তাবাদ মূলতঃ একটি অনুভূতি যাহা একটি জাতীয় জনসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে। এই অনুভূতিকে আমরা ভাবগত ঐক্য বলিতে পারি।

শুধু কুলগত, ভাষাগত অথবা ধর্মগত ঐক্য থাকিলেই যে এই অনুভূতি আসে, তাহা নহে। এই অনুভূতি মূলতঃ একটি মানসিক স্বাজাত্যবোধ হইতে আসে। জাতীয়তাবাদের দুইটি দিক্ আছে। প্রথমটি হইতেছে প্রকৃত জাতীয়তাবাদ (True Nationalism), যাহা একটি জাতিকে অপর জাতির প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইতে অথবা অপর জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে প্রণোদিত করে না। এই প্রকার জাতীয়তাবোধ পরস্পরের মধ্যে কলহের সৃষ্টি করে না; বরং ইহা পরস্পরকে আরও কাছে টানিয়া আনে। এই প্রকার জাতীয়তাবোধ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে এবং বহুজাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা করে। আদর্শ জাতীয়তাবাদের মূলনীতি হইতেছে—'নিজে বাঁচ এবং অপরকে বাঁচিতে দাও।' নিজে বাঁচিবার জন্যই তখন যে কোন রাষ্ট্রকে অপর রাষ্ট্রের সহিত ভাল সম্পর্কের সৃষ্টি করিতে হয়। কারণ, বর্তমান জগতে কোন জাতি অথবা কোন রাষ্ট্রই অন্যান্য জাতি অথবা অন্যান্য রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না। রাজনৈতিক বিশেষতঃ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সব রাষ্ট্রকেই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হইতে হয়। অধ্যাপক লাস্কি বলেন বর্তমান জগতে বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পরের উপর এত নির্ভরশীল হইয়াছে যে কোন একটি রাষ্ট্রের অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছা অন্যান্য রাষ্ট্রের পক্ষে মারাত্মক হইতে পারে। ("The world has become so interdependent that an unfettered will of a state may be fatal to the peace of others"—Laski)[১]। যে জাতীয়তাবোধ কোন রাষ্ট্রকে পররাজ্য আক্রমণ করিতে দেয় না এবং সব জাতির সহিত সদ্ভাব রাখিয়া চলিতে অনুপ্রাণিত করে, সেই জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ রাষ্ট্র যে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারে। আদর্শ হিসাবে জাতীয়তাবোধের প্রকৃত মূল্য এইখানে। কারণ, প্রকৃত জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হইলে সব রাষ্ট্রেরই কল্যাণ হয়। প্রকৃত জাতীয়তাবোধ যেখানে বজায় থাকে, সেখানে প্রত্যেক জাতিই অপর জাতির কাছে একান্ত প্রয়োজনীয়। এ ক্ষেত্রে বার্নস্ (Burns) বলেন,[২] "The value of Nationalism, so far as it implies a relation of one nation to the other, is but a fuller development of the same value as that which each finds in independence. For if each nation is to develop its own characteristics, then each nation is valuable to every other not as a rival of exactly the same kind but

১। Laski—Introductions to Politics—Chapter-4.

২। Burns—Political Ideals, Chapter on Nationalism p. 164

as a contrast; and humanity at large is benefited by the preservation of so many distinct types".

কিন্তু জাতীয়তাবাদের দ্বিতীয় দিকটি বিবেচনা করিলে আমরা এই আদর্শের একটি ত্রুটিও দেখিতে পাই। অনেকক্ষেত্রেই আমরা জাতীয়তা-বোধের বিকৃত (Perverted) বিকাশ দেখিতে পাই। সেক্ষেত্রে শক্তিমদে মত্ত জাতিগুলি নিজেদের সাম্রাজ্যবাদের লিপ্সা চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে। অধ্যাপক লাস্কি বলেন, যখন কোনও রাষ্ট্রের ক্ষমতা বাড়িয়া যায়, তখনই জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হয়।[১] ("As power extends, nationalism becomes transformed into imperialism".) বিকৃত জাতীয়তাবাদ হইতে যে সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি হয়, তাহা সভ্যতার অগ্রগতির প্রতিবন্ধক। জাতীয়তাবাদের বিকৃত রূপ একটি রাষ্ট্রকে পররাষ্ট্র আক্রমণ করিবার প্ররোচনা দেয়। এই আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি ছোট ছোট রাষ্ট্রের উপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করিবার চেষ্টা করে। এই আধিপত্য বিস্তারের প্রথম পর্যায় হইল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের উপর আধিপত্য বিস্তার। তারপর, ক্রমশঃ "বণিকের মানদণ্ড দেখা দেয় রাজদণ্ডরূপে।" অর্থনৈতিক অধিকার স্থাপনের পর শক্তিশালী রাষ্ট্র দুর্বল রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করে এবং নিজের সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করে। এইভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার হয়; সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি নিজেদের শিল্পজাত সামগ্রীগুলির বিক্রয়করণের জন্য অথবা শিল্পোন্নয়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহ করিবার জন্য বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে। এই উপনিবেশগুলিই পরে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। অনেক সময় এই শক্তিগুলি সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্বেরও অবতারণা করে,—যেমন, দুর্বল জাতিগুলির উচিত উন্নত জাতিগুলির সংস্পর্শে আসিয়া নিজেদের উন্নত করা, ইত্যাদি। অনেকক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে অর্থ সাহায্য দিয়াও বড় বড় রাষ্ট্রগুলি সাম্রাজ্য বিস্তার করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। এই প্রকার বিকৃত জাতীয়তা-বোধ এবং সাম্রাজ্যবাদ কখনই আন্তর্জাতিক অনুশাসনের সহিত সুসমঞ্জস নহে। আন্তর্জাতিকতা (Internationalism) এবং সাম্রাজ্যবাদের (Imperialism) মধ্যে সর্বদাই সামঞ্জস্যের অভাব দেখা যায়। সাম্রাজ্য-বিস্তার করিতে গেলে একটি রাষ্ট্রকে অপর রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ করিতেই হইবে এবং আক্রান্ত রাষ্ট্রকেও সর্বদাই আত্মরক্ষার জন্য সেনাবাহিনী প্রস্তুত রাখিতে হইবে। তাহাতে আন্তর্জাতিক শান্তি বিপন্ন হইয়া পড়ে। দেখা যাইতেছে, আদর্শ

১। Laski—Grammar of Politics—Chapter-6.

হিসাবে জাতীয়তাবাদের ইহা একটি ত্রুটি। যদি "একজাতি এক রাষ্ট্র" নীতি অনুসৃত হয়, তবে বিভিন্ন জাতি-রাষ্ট্রের (Nation-states) মধ্যে গোলমালের এবং কলহের আশংকা থাকে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে যতক্ষণ গ্রাম্যকলহ, সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগী এবং দলগত হিংসা থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদের প্রকৃত বিকাশ হয় না, সভ্যতারও অগ্রগতি হয় না। অপর দিকে একই রাষ্ট্রে যদি বিভিন্ন জাতি থাকে তবে তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সহযোগিতার একটি ক্ষেত্র থাকে। কিন্তু ইহার আর একটি দিক্ আছে। যদি একটি জাতির ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং সেই জাতি যদি প্রকৃত জাতীয়তাবোধের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়, তবে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রটি আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে। অপরদিকে যদি বহুজাতির ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং সেই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত জাতিগুলির মধ্যে পারস্পরিক কলহ ও অসহযোগিতা লাগিয়াই থাকে তবে, সেক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে জটিলতার সৃষ্টি হয় এবং বিশ্বশান্তির উপর ইহার খারাপ প্রভাব হইতে পারে। ভারতবর্ষে অনেক জাতির বাস। শক, হুনদল, পাঠান-মোগল এখানে এক দেশে লীন হইয়াছে। কিন্তু, বর্তমানে বিভিন্ন জাতির মধ্যে পূর্ণ সম্প্রীতি থাকায় ভারতবর্ষ প্রকৃত জাতীয়তাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইতে পারিয়াছে এবং বিশ্বশান্তি রক্ষা করার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করিতে পারিয়াছে।

আন্তর্জাতিকতা (Internationalism) :

আন্তর্জাতিকতা শুধুমাত্র একটি রাষ্ট্রনৈতিক অনুভূতি নহে। ইহার একটি আধ্যাত্মিক দিক্ আছে যাহার প্রেরণায় মানুষ বিশ্বভ্রাতৃত্বে (universal brotherhood) এবং আন্তর্জাতিক মৈত্রীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়। ব্যক্তিগত জীবনের ন্যায় যদি জাতীয়জীবন হইতেও পরবিদ্বেষ এবং পররাষ্ট্রের উপর লিপ্সা দূর করা যায় তবে আর কখনই আন্তর্জাতিক বিদ্বেষ এবং কলহের সম্ভাবনা থাকে না। আন্তর্জাতিকতার প্রধান উদ্দেশ্য হইল প্রত্যেক স্বতন্ত্র জাতিকে তাহার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে দিয়া বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক সংস্কৃতিগত সহযোগিতা, ভাবের আদান-প্রদান এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। যদি জাতীয়তাবাদ কখনও বিকৃত না হয়, তবে ইহা আন্তর্জাতিকতার পরিপূরক হয়। এই দুইটি আদর্শই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। একটি রাষ্ট্রের সদস্য হইয়া যেমন জনসাধারণ তাহাদের সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের চরম উৎকর্ষতা অর্জন করিতে পারে, সেই প্রকার একটি আন্তর্জাতিক পরিবারের (Family of nations) সদস্য হইয়া বিভিন্ন রাষ্ট্র

ইহাদের রাষ্ট্রনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে পারে। আন্তর্জাতিকতা গড়িয়া উঠিবার একটি কেন্দ্র থাকা চাই,—তাহা হইতেছে বিভিন্ন জাতি-রাষ্ট্র (Nation States)। সুতরাং যতক্ষণ বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রকৃত জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ না হইতেছে ততক্ষণ আন্তর্জাতিকতার প্রসার হইতে পারে না। একটির পরিণতি হইতেছে অপরটি। আন্তর্জাতিকতার ভিত্তি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি অপেক্ষা অনেক ব্যাপক। জাতীয়তাবাদ গড়িয়া উঠে একটি জাতীয় জনসমাজ অথবা একটি রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া। কিন্তু আন্তর্জাতিকতা গড়িয়া উঠে বিভিন্ন এবং সমগ্র জনসমাজকে কেন্দ্র করিয়া। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক আইন এবং আন্তর্জাতিক নীতি-জ্ঞান বিভিন্ন রাষ্ট্রকে পরস্পরের সান্নিধ্যে আনিয়া আন্তর্জাতিকতার সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির বাহ্যিক সীমা সম্বন্ধে চলিত ভ্রান্ত ধারণা আন্তর্জাতি-কতার প্রসার লাভের প্রধান অন্তরায় সৃষ্টি করে। যখন সব রাষ্ট্রই বুঝিতে পারিবে যে আন্তর্জাতিক আইন অথবা আন্তর্জাতিক নীতিজ্ঞান পালন করিয়া চলিলে কোন রাষ্ট্রেরই সার্বভৌম ক্ষমতা ক্ষুন্ন হয় না, তখনই প্রকৃতভাবে আন্তর্জাতিকতার বিস্তৃতি হইবে। পারস্পরিক সদিচ্ছা এবং সহযোগিতার ভিত্তিতে যতক্ষণ বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পরের সান্নিধ্যে না আসিতেছে, ততক্ষণ আন্তর্জাতিকতার প্রসার হইতে পারে না। পঞ্চশীলের আদর্শ আন্তর্জাতিকতার প্রসারের পক্ষে খুবই সহায়ক।

বর্তমান বিশ্বে আন্তর্জাতিক মৈত্রী এবং সদিচ্ছা প্রসারের গুরুত্ব খুবই বেশী। অল্প সময়ের মধ্যে দুইটি বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে বর্তমানের ঠাণ্ডা লড়াইয়ের (cold war) চাপে এবং আণবিক শক্তির বিস্ফোরণে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ক্রমেই জটিল হইয়া পড়িতেছে। পঞ্চশীলের উপরেও বিভিন্ন জাতি যেন ক্রমেই আস্থা হারাইয়া ফেলিতেছে। সেইজন্য আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উন্নতি করিতে হইলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে যাহাতে ভাবের আদান-প্রদান খুব বেশী পরিমাণে হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

জাতিসংঘ (United Nations) :

প্রথম মহাযুদ্ধের পর সব জাতিই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং মৈত্রীর প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিয়া লীগ্ অব্ নেশন্স্ (League of Nations) প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠানের গঠনজনিত এবং প্রকৃতিগত কতিপয় ত্রুটি ছিল। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত একটি উন্নত রাষ্ট্র লীগের সদস্য ছিল না। ইটালী এবং আবিসিনিয়ার যুদ্ধে লীগ নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না, এবং ইহার ব্যর্থতার জন্য দ্বিতীয়

মহাযুদ্ধও ত্বরান্বিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর লীগ অব নেশনস্ ভাংগিয়া যায় এবং ইহার স্থানে জাতিসংঘ অথবা "United Nations" স্থাপিত হয়। এই আন্তর্জাতিক সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় প্রধানতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি রুজভেল্টের চেষ্টায় এবং ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ও রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্ট্যালিনের সহযোগিতায়। ১৯৪৫ সালের ২৫শে জুন, স্যানফ্রান্সিসকো শহরে জাতিসংঘের সনদ গৃহীত হয়। সনদ অনুযায়ী জাতিসংঘের উদ্দেশ্য হইল: (১) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা, (২) পররাজ্য আক্রমণ এবং শান্তিভংগের আশংকা দূরীকরণের জন্য সম্মিলিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা, (৩) শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক কলহের মীমাংসা করা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্র তৈয়ার করা, (৪) অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং মানবীয় আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অর্জন করা, এবং (৫) ক্ষুদ্র, বৃহৎ সকল জাতির সমানাধিকার স্বীকার করিয়া সকল জাতিকেই পরস্পরের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হইতে সাহায্য করা। উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলি ছাড়াও জাতিসংঘ বিভিন্ন দেশের জনগণের মৌলিক অধিকার, তাহার মর্যাদা ও মূল্য সংরক্ষণ এবং জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি-বিধানের জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালাইবে বলিয়া সনদে লেখা আছে। বর্তমানে জাতিসংঘের সদস্য-রাষ্ট্রের সংখ্যা একশত ছাড়াইয়া গিয়াছে।

জাতিসংঘের প্রধান বিভাগগুলি হইতেছে, সাধারণ সভা (General Assembly), নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council), অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic and Social Council), আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice), অছি পরিষদ (Trusteeship Council) এবং দপ্তরখানা (Secretariat)।

(১) সাধারণ সভায় সকল সদস্যরাষ্ট্রই জাতিসংঘের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কিত আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে। এই সনদের অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিষয় লইয়া ইহারা আলোচনা করিতে পারে।

(২) নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য-সংখ্যা হইতেছে এগার জন। তাহার মধ্যে পাঁচটি রাষ্ট্র হইতেছে স্থায়ী সদস্য, যথা,—ইংলণ্ড, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিকা, ফ্রান্স এবং জাতীয়তাবাদী চীন। তাহা ছাড়া আরও ছয়টি সদস্য-রাষ্ট্র আছে। সেইগুলি প্রতি দুই বৎসর অন্তর সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত হয়। আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এই পরিষদ সকল সদস্য-রাষ্ট্রকেই সামরিক এবং অন্যান্য সুবিধা প্রদান করিবার জন্য আহ্বান জানাইতে পারে। এই পরিষদের স্থায়ী পাঁচটি সদস্য-রাষ্ট্রের ভিটো-ক্ষমতা (veto power) আছে। এই ক্ষমতা অনুযায়ী বৃহৎ পঞ্চশক্তির যে

কোন একটি নিরাপত্তা পরিষদের যে কোন প্রস্তাব ভিটো-ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া বাতিল করিয়া দিতে পারে।

(৩) সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত ১৮টি সদস্য রাষ্ট্র লইয়া অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদ গঠিত হয়। এই পরিষদ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সহযোগিতা-সংক্রান্ত বিষয়গুলি লইয়া আলোচনা করে এবং উহা উন্নত করিতে চেষ্টা করে। ইহার তেরটি বিশেষ সংস্থা আছে; তন্মধ্যে আন্তর্জাতিক শ্রম-সংস্থা (International Labour Organisation), খাদ্য ও কৃষি-সংস্থা (Food and Agricultural Organisation) এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য-সংস্থা (World Health Organisation) উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়াও শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতিমূলক সংস্থার (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করিতে বিশ্বব্যাংকের (World Bank) ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

(৪) অছি-পরিষদের কাজ হইতেছে যে সকল এলাকা জাতিসংঘের অধীনে আসিবে সেগুলির শাসন এবং তত্ত্বাবধানের জন্য আন্তর্জাতিক অছি গঠন করা। (…"an international trusteeship system for the administration and supervision of such territories as may be placed thereunder.) ইহার উদ্দেশ্য হইল অধীনস্থ রাষ্ট্রগুলিকে স্বায়ত্ত-শাসনের উপযুক্ত করিয়া তোলা।

(৫) আন্তর্জাতিক বিচারালয় আন্তর্জাতিক কলহের বিচার করে এবং আইনসংক্রান্ত বিষয়গুলির মীমাংসা করে। এই বিচারালয়ে ১৫ জন বিচারপতি থাকেন।

(৬) সর্বশেষে, জাতিসংঘের একটি দপ্তরখানা আছে। একজন প্রধান সচিবের (Secretary General) অধীনের আটটি বিভাগের সাহায্যে দপ্তরখানার কাজ পরিচালিত হয়।

জাতিসংঘের ভূমিকা—বিশ্বশান্তি এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা রক্ষায় জাতিসংঘের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সন্দেহ নাই। কিন্তু, জাতিসংঘের বিগত তের বৎসরের ক্রিয়াকলাপ পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়াইতে এই সংগঠন অনেকটা সাফল্য অর্জন করিলেও আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে খুব সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই। কাশ্মীর এবং খালের জল লইয়া ভারত-পাকিস্তান বিরোধ, ইসরাইল-আরব সীমান্ত সমস্যা, ইরানের তৈল লইয়া বিরোধ, সুয়েজ খাল লইয়া মিশরের সহিত ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বিরোধ,

হাংগেরীতে সোভিয়েট রাশিয়ার আক্রমণ, কোরিয়ার গৃহযুদ্ধ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির স্থায়ী সমাধানে জাতিসংঘ সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই। পৃথিবীর বৃহত্তম লোকবসতিপূর্ণ দেশ চীন সাধারণতন্ত্র সরকার রাশিয়া, ভারত, ইংলণ্ড প্রভৃতি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াও জাতিসংঘ কর্তৃক এখনও স্বীকৃত হয় নাই। অপরদিকে আমেরিকার তাঁবেদার চিয়াং-শাসিত ক্ষুদ্র জাতীয়তাবাদী চীন আমেরিকার তাঁবেদার হইয়াও পঞ্চশক্তির শোভা বর্ধন করিতেছে। যতদিন জাতিসংঘ সম্পূর্ণভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি-মূলক না হইবে এবং বৃহৎ পঞ্চশক্তির ভিটো ক্ষমতা তুলিয়া না দিবে, ততদিন পর্যন্ত জাতিসংঘের কাজে সাফল্য অর্জনের কোনও আশা নাই। বর্তমানে জাতিসংঘের মধ্যে দুইটি দল আমরা দেখিতে পাই। একটি হইতেছে ইংলণ্ড ও আমেরিকা প্রভাবিত দল,—অপরটি হইতেছে রাশিয়া প্রভাবিত দল। তাহা ছাড়া আর একটি দল আছে, যে দলের সদস্যগণ নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করিতে চাহে,—যেমন, ভারত, মিশর, ব্রহ্মদেশ, সুইজারল্যাণ্ড ইত্যাদি। এই দলীয় রাজনীতির প্রভাবে জাতিসংঘের কাজ কখনই পরিপূর্ণভাবে সফল হয় না। তবে জাতিসমূহের মধ্যে সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক সহযোগিতার প্রসার করিতে জাতিসংঘ অনেক পরিমাণে সফল হইয়াছে। বিশেষতঃ ইহার তেরটি বিশেষ সংস্থার (Special Agencies) মাধ্যমে সহযোগিতার ক্ষেত্র বিশেষ প্রশস্ত হইয়াছে।

সংক্ষিপ্তসার

জাতীয় জনসমাজ, জাতি ও রাষ্ট্র—জাতীয় জনসমাজের নিম্নলিখিত উপাদান থাকে;—বাংলার ঐক্য, ভাষাগত ঐক্য, ধর্মগত ঐক্য, এবং ভৌগোলিক ঐক্য, কিন্তু জাতীয় জনসমাজের পক্ষে এইগুলি হইতেছে বাহ্যিক উপাদান; ইহাদের কোনটিই অপরিহার্য নয়। এই উপাদানগুলি না থাকিলেও জাতীয় জনসমাজ গঠিত হইতে পারে যদি জাতীয় জনসমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ভাবগত ঐক্যে অনুপ্রাণিত হইয়া একজাতিতে পরিণত হয়।

আমরা একটি জাতির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই,—(১) একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকা অথবা ভৌগোলিক ঐক্য, (২) একটি জনসমষ্টি যাহাদের মধ্যে সাধারণতঃ বংশগত, ধর্মগত, ভাষাগত এবং আচার-ব্যবহার-গত ঐক্য থাকে, (৩) একটি সরকার যাহা স্বাধীন হইতে পারে অথবা নাও হইতে পারে (স্বাধীন না হইলেও এই রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনটি স্বাধীন হইবার জন্য ইচ্ছুক থাকিবে)। কিন্তু, জাতির সার্বভৌমত্ব থাকে না। যদি কোনও

জাতীয় সরকারের সার্বভৌম ক্ষমতা (Sovereign authority) থাকে, তবে ইহা রাষ্ট্রে পরিণত হইবে। রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই সার্বভৌমিকতা এবং রাষ্ট্র বলিতে বুঝায় সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের অধিকারী এক জাতীয় জনসমাজ। রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য চারিটি,—যথা, একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, একটি জনসমষ্টি, একটি সরকার এবং ইহার সার্বভৌম ক্ষমতা। প্রথম তিনটি বৈশিষ্ট্য একটি জাতির মধ্যে আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু সর্বশেষ বৈশিষ্ট্যই অর্থাৎ সার্বভৌম ক্ষমতা শুধু মাত্র রাষ্ট্রেই দেখা যায়।

জাতির আত্মনির্ধারণের নীতি অথবা 'এক জাতি, এক রাষ্ট্র' নীতি— প্রত্যেক জাতিই চায় নিজের চরিত্র বজায় রাখিতে এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলিকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে। গত শতাব্দীতে জন স্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছিলেন যে সাধারণভাবে স্বাধীন সরকার বজায় রাখিতে হইলে জাতীয় জনসমাজের সীমারেখার সমানুপাতে রাষ্ট্রের সীমারেখা টানা উচিত। ইহা হইতেছে একটি জাতির আত্ম-নির্ধারণের অধিকার। অর্থাৎ, মিল্ "এক জাতি, এক রাষ্ট্র" সমর্থন করিয়াছিলেন।

'এক জাতি, এক রাষ্ট্রের' পক্ষে যুক্তি (Arguments in favour of a Mono-National State)—অধ্যাপক মিলের মতে বহু জাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রে স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলি টিকিয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলি বজায় রাখার স্বার্থেই 'এক জাতি, এক রাষ্ট্র' নীতি গ্রহণ করা উচিত।

একটি জাতীয় জনসমাজ লইয়া গঠিত রাষ্ট্রের (Mono-national State) পক্ষে প্রধান যুক্তি হইতেছে, ইহা একটি জাতির নিজ সংস্কৃতি এবং বৈশিষ্ট্যগুলি রক্ষা করিতে সাহায্য করে। তাহা ছাড়া বহু জাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রে (Poly-national State) বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাদ হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। সেক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে কাজ করা কঠিন হয় এবং বিভিন্ন স্বাধীন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষেও টিঁকিয়া থাকা কঠিন হইয়া পড়ে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর প্রেসিডেণ্ট উইলসন একটি জাতি লইয়া রাষ্ট্র গঠন করিবার নীতি সমর্থন করেন। তাঁহার মতে অপর জাতির পদানত হইয়া থাকিলে কোনও জাতীয় জনসমাজের পক্ষে নিজের ঐতিহ্য বজায় রাখা সম্ভবপর নহে। যদি অনেকগুলি জাতি লইয়া একটি রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং সেখানে যদি একটি বড় জাতি সর্বদাই অবিচার পাইতে থাকে অথবা নিজস্ব স্বাধীন রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন না করিতে পারিয়া অতৃপ্ত থাকে, তবে সেক্ষেত্রে সেই জাতির আত্মনির্ধারণের অধিকার লাভ করায় যথেষ্ট

দাবী আছে। কোন জাতির ন্যায়সংগত দাবী যদি অগ্রাহ্য করা হয় তবে জাতির আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পর্যন্ত নষ্ট হইতে পারে।

'এক জাতি, এক রাষ্ট্র' গঠনের বিপক্ষে অথবা জাতির আত্মনির্ধারণ নীতির বিপক্ষে যুক্তি—প্রথমতঃ, লর্ড অ্যাক্টনের (Acton) মতে সমাজে জনসমষ্টি যেমন অত্যাবশ্যক, সেইরকম সুসভ্য জীবনের একটি প্রয়োজনীয় সর্ত হইল একটি রাষ্ট্রে জাতিসমষ্টি। বুদ্ধি এবং জ্ঞানের দিক দিয়া উন্নত জাতির সংস্পর্শে আসিয়া অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর জাতিগুলির উন্নত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, বহুজাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রে স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলি টিকিয়া থাকে না, এই কথা বলা অযৌক্তিক। সুইজারল্যাণ্ড, আমেরিকা, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে অনেক জাতি আছে। কিন্তু এই দেশগুলিতেই আমরা স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব দেখিতে পাই।

তৃতীয়তঃ, আত্মনির্ধারণ নীতি বাস্তবজীবনে প্রয়োগ করা অনেক সময়েই জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূল হয়। যে সমস্ত দেশে অনেক ক্ষুদ্র জাতি অনেকদিন যাবৎ বসবাস করিয়া একটি ভাবগত ঐক্যের মাধ্যমে এক আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছে, পরবর্তীকালে যদি সেই জাতিগুলিকে আত্মনির্ধারণের অধিকার প্রদান করা হয়, অর্থাৎ নিজেদের পৃথক পৃথক রাষ্ট্র গঠন করিবার সুযোগ দেওয়া হয়, তবে তাহা জাতিগুলির স্বার্থের প্রতিকূল হইবে।

চতুর্থতঃ, আত্মনির্ধারণ নীতি কার্যকরী করিলে অনেক রাষ্ট্রেরই বর্তমানে কাঠামো ভাংগিয়া যাইবে এবং তাহাতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি নষ্ট হইয়া যাইবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, এই নীতি কার্যকরী হইলে ইউরোপে বর্তমানের আটাশটি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আটষট্টিটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইবে এবং বর্তমানের সুইজারল্যাণ্ড এবং ইংলণ্ড ত্রিধা বিভক্ত হইবে। ভারতবর্ষকেও মোটামুটিভাবে ১৫।১৬টি রাষ্ট্রে বিভক্ত করিতে হইবে।

পঞ্চমতঃ, স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করিতে পারিলেই যে কোন জাতি আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই, অনেক ক্ষেত্রে ছোট ছোট জাতিগুলি নিজেরা রাষ্ট্র গঠন করিয়া বৃহৎ শক্তির তাঁবেদার হইয়া পড়ে।

ষষ্ঠতঃ, জাতির আত্মনির্ধারণ নীতি একবার কার্যকরী করিতে আরম্ভ করিলে কোনদিনই ইহার পরিসমাপ্তি হইবে না। ইহাতে ছোট ছোট অসংখ্য রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইবে এবং তাহাতে আন্তর্জাতিক শান্তি নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

সর্বশেষে অনেক জাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রে (Poly-national State) যে বিভিন্ন জাতি নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে পারে না;

তাহা নহে। প্রকৃতপক্ষে এই রাষ্ট্রগুলি একটি জাতির ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রগুলি অপেক্ষা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক বেশী উন্নত। রাশিয়া, গ্রেটবৃটেন ভারতবর্ষ প্রভৃতি রাষ্ট্র ইহা প্রমাণ করে।

তবে পরিশেষে আমাদের মনে রাখা উচিত, কোন কেনে ক্ষেত্রে জাতির আত্মনির্ধারণ নীতির প্রয়োগ করা উচিত। যদি অনেক জাতি লইয়া গঠিত কোন রাষ্ট্রে দেখা যায় যে একটি জাতি অপর জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে চাহে, অথবা ইহাদের মধ্যে বিবাদবিসংবাদ লাগিয়াই আছে সেইক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আত্মনির্ধারণ নীতি প্রয়োগ করা উচিত। সর্বক্ষেত্রে জাতিতত্ত্ব (Theroy of Nationality) রাষ্ট্রগঠনের সন্তোষজনক ভিত্তি নহে।

জাতীয় জনসমাজের অধিকার (Rights of Nationalities)—একটি জাতীয় জনসমাজের প্রধান অধিকার হইল আত্মনির্ধারণের অধিকার। প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সন ইহার উপর অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন জাতির অন্যান্য অধিকার আছে। সেইগুলি নিম্নে আলোচিত হইল:—

(ক) জাতীয় চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার অধিকার প্রত্যেক জাতিকেই দেওয়া উচিত।

(খ) একটি জাতীয় জনসমাজের আর একটি দাবি হইল ভাষারক্ষার অধিকার।

(গ) সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতিকে সর্বদাই স্থানীয় আচার ও প্রথা রক্ষার (Right to retention of local laws and customs) প্রদান করা উচিত।

(ঘ) একটি রাষ্ট্রে সব জাতিরই আইনগত এবং রাজনৈতিক সাম্যের অধিকার (Right to legal and political equality) থাকা উচিত।

আন্তর্জাতিকতা (Internationalism) আন্তর্জাতিকতা ও শুধু মাত্র একটি রাষ্ট্রনৈতিক অনুভূতি নহে। ইহার একটি আধ্যাত্মিক দিক আছে যাহার প্রেরণায় মানুষ বিশ্বভ্রাতৃত্বে (Universal brotherhood) এবং আন্তর্জাতিক মৈত্রীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়। আন্তর্জাতিকতার প্রধান উদ্দেশ্য হইল, প্রত্যেক স্বতন্ত্র জাতিকে তাহার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে দিয়া বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক সংস্কৃতিগত ভাবের আদান-প্রদান এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে প্রস্তুত করা। যদি জাতীয়তাবাদ কখনও বিকৃত না হয়, তবে ইহা আন্তর্জাতিকতার পরিপূরক হয়। দুইটি আদর্শই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। রাষ্ট্রনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে পারে। আন্তর্জাতিকতা গড়িয়া উঠিবার একটি কেন্দ্র থাকা চাই,—তাহা হইতেছে

বিভিন্ন জাতি-রাষ্ট্র (Nation-States)। সুতরাং যতক্ষণ বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রকৃত জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ না হইতেছে ততক্ষণ আন্তর্জাতিকতার প্রসার হইতে পারে না। একটির পরিণতি হইতেছে অপরটি। আন্তর্জাতিকতার ভিত্তি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি অপেক্ষা অনেক ব্যাপক। জাতীয়তাবাদ গড়িয়া উঠে একটি জাতীয় সমাজ অথবা একটা রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া। কিন্তু আন্তর্জাতিকতা গড়িয়া উঠে বিভিন্ন রাষ্ট্রে এবং সমগ্র জনসমাজকে কেন্দ্র করিয়া। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক আইন এবং আন্তর্জাতিক নীতিজ্ঞান বিভিন্ন রাষ্ট্রকে পরস্পরের সান্নিধ্য আনিয়া আন্তর্জাতিকতার সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির বাহ্যিক সীমা সম্বন্ধে চলিত ভ্রান্ত ধারণা আন্তর্জাতিকতার প্রসার লাভের প্রধান অন্তরায় সৃষ্টি করে। যখন সব রাষ্ট্রই বুঝিতে পারিবে যে আন্তর্জাতিক আইন অথবা আন্তর্জাতিক নীতিজ্ঞান পালন করিয়া চলিলে কোন রাষ্ট্রেরই সার্বভৌম ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হয় না, তখনই প্রকৃতভাবে আন্তর্জাতিকতার বিস্তৃতি হইবে। পারস্পরিক সদিচ্ছা এবং সহযোগিতার ভিত্তিতে যতক্ষণ বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পরের সান্নিধ্যে না আসিতেছে ততক্ষণ আন্তর্জাতিকতার প্রসার হইতে পারে না।

Exercises

1. Define People and Nationality. What are the basic elements of Nationality? Is everyone of them absolutely essential? (১০৪-১০৬ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the factors that create a sense of unity in a State. (১০৫-১০৬ পৃষ্ঠা)

3. What are the factors that tend to create a Nationality? How does a nation come into being in a country of diverse nationalities? (১০৫-১০৬ পৃষ্ঠা)

4. Distinguish between (a) Nationality, (b) Nation and (c) State.

5. Discuss the value and limitations of the doctrines of Self-determination as a political principle. (১০৬-১০৯ পৃষ্ঠা)

6. "Self-determination is not a mere phrase. It is an imperative principle of action which statesmen will henceforth ignore at their peril."—Examine the statement. (১০৬-১০৯ পৃষ্ঠা)

7. Examine the theory of "One Nation, One State". Do you think that the theory of Nationality is a retrograde step in history ?"—(Lord Acton). Examine the statement. (১০৬-১০৯পৃষ্ঠা)

8. What are the rights of Nationalities ? (১১০ পৃষ্ঠা)

9. "Nationalism is a menace to civilisation."—Do you agree with this statement ? Give reasons for your answer.
(১১০-১১৩ পৃষ্ঠা)

10. Do you think that Nationalism is incompatible with an international order ? Give reasons for your answer. Write a note on "Internationalism". (১১০-১১৩ পৃষ্ঠা)

11. Give an account of the composition, functions and working of the United Nations. (১১৪-১১৭ পৃষ্ঠা)

নাগরিকতা—নাগরিকের অধিকার ও ক

(Citizenship—Rights and Duties of Citizen)

নাগরিকতার সংজ্ঞা এবং নাগরিক ও বিদেশীর মধ্যে পার্থক্য • (Definition of citizenship and the distinction between a citizen and an alien) :

(নাগরিক কথাটির সাধারণ অর্থ হইতেছে, নগরের অধিবাসী। প্রাচীন গ্রীক শহর-রাষ্ট্রের অধিবাধীগণের মধ্যে যাহারা সরকারের কাজে অংশ গ্রহণ করিত তাহাদিগকেই নাগরিক বলা হইত। কিন্তু, বর্তমানে শহর-রাষ্ট্রের (city-state) অস্তিত্ব নাই বলিয়া 'নাগরিকতা' শব্দটি আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।)(বর্তমানে কোন নাগরিক বলিতে আমরা বুঝি এমন লোক যে একটি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং সেই রাষ্ট্রের নিকট হইতে সমুদয় পৌর, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অধিকার লাভ করে।) কিন্তু, যাহারা রাজনৈতিক অধিকার লাভ করে না, তাহারা নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হয় না। (কিন্তু, এরিস্টটলের মতে নাগরিককে রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে সক্রিয় এবং প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। ভ্যাটেলের (Vattel) মতে নাগরিক হইতেছে পৌর সমাজের কতিপয় সদস্য যাহারা এই সমাজের প্রতি কতিপয় কর্তব্য করিতে বাধ্য এবং ইহার কর্তৃত্বাধীনে থাকিয়া ইহার সকল প্রকার সুবিধার অংশগ্রহণ করিবার অধিকারী। ("Citizens are the members of the civil society bound to this society by certain duties, subjected to its authority and equal participation in its advantages.") আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি মিলার একটি বিখ্যাত মামলায় মন্তব্য করিয়াছিলেন, "নাগরিকগণ হইতেছে একটি রাজনৈতিক সমাজের সদস্য। তাহারাই রাষ্ট্র গঠন করে, এবং তাহারাই নিজেদের যৌথ ক্ষমতায় একটি সরকারের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে অথবা নিজেদের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত অধিকার রক্ষার জন্য সেই সরকারের অধীন হইয়াছে।" ("Citizens are members of the political community to which they belong.

They are the people who compose the state and who in their associated capacity have established or subjected themselves to the dominion of their collective rights.")।) বর্তমান কালেও নাগরিকগণকে সরকারের কাজে অংশ গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু, আধুনিককালের পরোক্ষ গণতন্ত্রের যুগে অধিকাংশ নাগরিকই পরোক্ষভাবে সরকারী কাজে অংশ গ্রহণ করে। নাগরিকজীবনে সকলেই কতিপয় সুযোগ-সুবিধা সরকারের নিকট হইতে পাইয়া থাকে। কিন্তু, রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকলেই সমান সুযোগসুবিধা পায় না বলিয়া সকলকেই আমরা নাগরিক বলিতে পারি না। বিদেশীগণ সবরকম পৌর-স্বাধীনতা এবং সামাজিক স্বাধীনতা পাইতে পারে, কিন্তু, রাজনৈতিক স্বাধীনতা পায় না। আধুনিক কালে রাজনৈতিক স্বাধীনতার গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী। কারণ, রাজনৈতিক স্বাধীনতার উপযুক্ত ব্যবহার হইলে অনেক ক্ষেত্রে সরকারের পরিবর্তন হয়। নাগরিকগণ সকলেই রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ,—রাষ্ট্রের উন্নতিতেই নাগরিকগণের উন্নতি। আবার, নাগরিকগণ উন্নত ধরণের নাগরিক শৃংখলা বজায় রাখিলে নাগরিকজীবন শান্তিময় হইয়া উঠে এবং রাষ্ট্রের তাহাতে উন্নতি হয়। নাগরিকগণকে যেমন বিভিন্ন অধিকার দেওয়া হয়, নাগরিকগণেরও উচিত সেই অধিকারগুলির সদ্ব্যবহার করিয়া চেষ্টা করা যাহাতে সমষ্টিগত জীবন রাষ্ট্রের মাধ্যমে একটি আদর্শস্তরে উন্নীত হয়। রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপে সক্রিয় এবং পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করা হয়ত সব নাগরিকের পক্ষে সম্ভবপর নয়। কিন্তু নিজের ক্রিয়াশীলতার মাধ্যমে এবং নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি ও স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার শক্তি প্রয়োগ করিয়া প্রত্যেক নাগরিকেরই সমষ্টিগত জীবনকে উন্নততর করিবার জন্য সচেষ্ট থাকা উচিত। এজন্যই অধিকারের সহিত নাগরিকদের কতিপয় কর্তব্যও আছে। অধ্যাপক লাস্কি আধুনিককালের নাগরিকতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন যে নাগরিকতার সার কথা নিহিত রহিয়াছে সাধারণের মংগলের জন্য, নাগরিকের শিক্ষা-দ্বারা-প্রাপ্ত মার্জিত বিচার-বুদ্ধির অবদানের মধ্যে ("contribution of one's instructed judgment to the public good."—Laski)। সুতরাং নাগরিক বলিতে আমরা বুঝি এমন একজন লোক যে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, রাষ্ট্রের সমুদয় পৌর এবং রাজনৈতিক অধিকার লাভ করে এবং সর্বদাই সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত থাকে। একজন নাগরিক এবং একজন বিদেশীর (alien) মধ্যে আমরা নিম্নলিখিত পার্থক্য দেখিতে পাই।

প্রথমতঃ, বিদেশী হইতেছে ভিন্ন দেশের অধিবাসী। একজন বিদেশী

একটি ভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে। যে দেশে সে বাস করে, সেই দেশের বিভিন্ন নিয়মকানুন তাহাকে মানিয়া চলিতে হয় এবং কর প্রদান করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ একজন বিদেশী যে রাষ্ট্রে বসবাস করে সেই রাষ্ট্রের সমুদয় পৌর স্বাধীনতা সে ভোগ করিতে পারে, কিন্তু রাজনৈতিক অধিকার দাবী করিতে পারে না। তৃতীয়তঃ, একজন বিদেশীকে বিধি-নিষেধ ভংগ করার অপরাধে অথবা অসদাচরণের জন্য কোন রাষ্ট্র হইতে বহিষ্কৃত করা যাইতে পারে, কিন্তু, জোর করিয়া তাহাকে সেনাবাহিনীতে যোগদান করান যায় না। সে যদি কখনও রাষ্ট্র (যে রাষ্ট্রে সে সাময়িকভাবে বাস করিত) ত্যাগ করিয়া যায়, তবে তাহার সম্পত্তি ও জীবনের নিরাপত্তার জন্য সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের কোন দায়িত্ব নাই। অপরদিকে, নাগরিকের জীবনের নিরাপত্তা সর্বদাই তাহার রাষ্ট্র রক্ষা করে। একজন নাগরিক সম্পূর্ণভাবে সবরকম পৌর ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে কদাচিৎ তাহার ব্যতিক্রম ঘটে। যেমন, কোন বিদেশী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করিতে পারিলেও এবং সে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পূর্ণাংগ নাগরিক বলিয়া স্বীকৃত হইলেও তাহাকে সমস্ত রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হয় না। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি এবং উপ-রাষ্ট্রপতির পদ জন্মসূত্রে নাগরিকতা প্রাপ্ত নাগরিক ব্যতীত অন্য কোন নাগরিক পাইতে পারে না। আবার, কোন হিন্দু পাকিস্তানের নাগরিক বলিয়া স্বীকৃত হইলেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি হইতে পারে না। কারণ, সেই পদটি মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত। একজন নাগরিককে নাগরিক জীবনের সব দায়িত্বই পালন করিতে হয়। রাষ্ট্রের প্রয়োজন হইলে তাহাকে সেনা-বাহিনীতেও যোগদান করিতে হয়।

নাগরিকতা অর্জনের বিভিন্ন উপায় (Different methods of acquiring citizenship)

নাগরিক দুইপ্রকার হইতে পারে। একটি হইতেছে জন্মসূত্রে নাগরিক, অপরটি হইতেছে অর্জনের দ্বারা নাগরিক। নাগরিকতা অর্জনেরও দুইটি উপায় আছে,—প্রথমটি হইতেছে জন্মাধিকারে এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে অর্জনের দ্বারা। জন্মাধিকার আবার দুই প্রকার হইতে পারে—একটি হইল রক্তগত অধিকার (Jus Sanguinis) এবং অপরটি হইল জন্মভূমিগত অধিকার (Jus Soil)। প্রথম নীতিটির ভিত্তিতে কোন রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রজাত তাহার নাগরিকের সন্তানকে পিতৃত্বের ভিত্তিতে নিজের নাগরিক বলিয়া দাবী করিতে পারে। অর্থাৎ পিতা যে দেশের নাগরিক, পুত্র যদি সেই দেশে জন্মগ্রহণ না করে তবুও নিজের পিতার নাগরিকতার দাবীতে সে

সেই দেশের নাগরিকতা লাভ করিতে পারিবে। ভারতীয় পিতামাতার সন্তান পৃথিবীর যে দেশেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, ভারতীয় বলিয়াই স্বীকৃত হইবে। দ্বিতীয়টির ভিত্তিতে যদি কোন ভারতীয় পিতামাতার সন্তান অন্য কোন দেশে জন্মগ্রহণ করে তবে সেই সন্তান তাহার পিতামাতা ভারতীয় হওয়া সত্ত্বেও সে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হইবে। এই নিয়মটিতে জন্মভূমির উপর ভিত্তি করিয়াই নাগরিকতা অর্জিত হয়। যদি কোনও রাষ্ট্র এক সংগে উভয় নীতিই প্রয়োগ করিয়া নাগরিকতা স্থির করে তবে একই ব্যক্তি দুইটি বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিকতা একই সময়ে অর্জন করিতে পারে। যদি কোন ভারতীয় নাগরিকের কোন সন্তান আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করে, তবে ব্যক্তিগত অধিকারের ভিত্তিতে সে ভারতীয় নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হইবে; আবার জন্মস্থানগত অধিকারের ভিত্তিতে সে আমেরিকার কোন নাগরিক বলিয়া স্বীকৃত হইবে। এরূপক্ষেত্রে কোন নাগরিক সাবালক হইয়া স্থির করিবে কোন্ রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার সে ভোগ করিতে চাহে।

অর্জনের দ্বারা যে নাগরিকতা লাভ করা যায় তাহাকে অর্জিত নাগরিকতা (naturalized citizenship) বলে। এই নীতি অনুযায়ী কোন দেশের জন্মগত নাগরিক অপর দেশের কতিপয় সর্ত পালন করিয়া সেই দেশের নাগরিকতা অর্জন করে। স্ত্রীলোকগণ বিবাহের দ্বারা তাঁহাদের স্বামীর নাগরিকতা অর্জন করেন। তাহা ছাড়া, বৈদেশিক রাষ্ট্রের সরকারী চাকরি করিয়া, বহুদিন একটানা বিদেশে বসবাস করিয়া, বিদেশে সম্পত্তি ক্রয় করিয়া অথবা সেনাবাহিনীতে যোগদান করিয়া কোন ব্যক্তি বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করিতে পারে। নাগরিকতা অর্জন করিবার জন্য বিদেশীকে প্রথম আবেদন করিতে হয় এবং তাহার পর কতিপয় শর্ত পূরণ করিতে হয়। তন্মধ্যে একাদিক্রমে ঐ রাষ্ট্রে কয়েক বৎসর বাস করা এবং শান্তিপূর্ণ ও সৎস্বভাবাপন্ন জীবনযাপন করা প্রধান। অনেক ক্ষেত্রে সেই দেশের ভাষা আয়ত্ত করাও একটি সর্ত হইয়া দাঁড়ায়। এইভাবে নাগরিকতা অর্জন করিয়া বিদেশী ঐ রাষ্ট্রের সমুদয় পৌর এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার অধিকারী হয়। কিন্তু, অনেক সময় সে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারে না। যেমন, আমেরিকায় কেহ জন্মগত নাগরিক না হইলে রাষ্ট্রপতি অথবা উপ-রাষ্ট্রপতি পদের জন্য নির্বাচনে অবতীর্ণ হইতে পারে না।

বিভিন্ন দেশে নাগরিকতা অর্জনে বিভিন্ন নীতি অনুসৃত হয়। ইটালী, জার্মানী, সুইডেন এবং সুইজারল্যাণ্ড রক্তগত অধিকারের ভিত্তিতে

নাগরিকতা প্রদানের নীতি অনুসরণ করে। আবার আর্জেন্টিনা এবং অন্যান্য কতিপয় ক্ষুদ্র রাষ্ট্র জন্মস্থানের ভিত্তিতে নাগরিকতা প্রদানের নীতি অনুসরণ করে। কিন্তু, গ্রেটব্রিটেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্স সুবিধা অনুযায়ী যখন যে নিয়মটি প্রয়োগ করা উচিত, তাহাই প্রয়োগ করে। ভারতবর্ষ কর্তৃক অনুসৃত নীতিটি একটু স্বতন্ত্র। স্বাধীনতা লাভের সময় যে স্থায়িভাবে বসবাস করিতে ইচ্ছুক, যে ভারতে জণগ্রহণ করিয়াছে অথবা যাহার পিতামাতা ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে অথবা দেশ স্বাধীন হইবার পূর্ব পর্যন্ত যে একাদিক্রমে ভারতে বসবাস করিয়াছে, তাহাকেই ভারতের নাগরিক অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। তাহা ছাড়া, যে অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং যাহার পিতামাতা অথবা পিতামহ-পিতামহীর মধ্যে যে কোনও একজন অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং বর্তমান শাসনতন্ত্র কার্যকরী হইবার অন্ততঃ ছয় মাস পূর্বে ভারতে বসবাসের জন্য চলিয়া আসিয়াছে, তাহাকেও নাগরিক অধিকার প্রদান করা হইবে। এই ব্যক্তি যদি এতকাল ভারতের বাহিরে বাস করিয়া থাকে, তবে তাহাকে কতিপয় সর্ত পালন সাপেক্ষে নাগরিক অধিকার প্রদান করা যাইতে পারে।

এক্ষেত্রে জাতীয়তা এবং দ্বি-জাতীয়তার মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হইতে পারে। ধরা যাক, একজন ভারতীয় নাগরিকের সন্তান ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করিল। রক্তগত অধিকারের ভিত্তিতে সে ভারতীয় নাগরিক, জন্মস্থানগত অধিকারের ভিত্তিতে সে ব্রিটিশ নাগরিক। শান্তিপূর্ণ সময়ে ইহা লইয়া হয়ত কোন গোলমাল হইবে না—কিন্তু যুদ্ধের সময় তাহার সেনাবাহিনীতে যোগদানের প্রশ্ন লইয়া উভয় দেশের মধ্যে বিতর্কের এবং কলহের সৃষ্টি হইতে পারে। রক্তগত অধিকারের ভিত্তিতে নাগরিকতা অর্জন করিবার যে নীতি প্রচলিত তাহার একটি প্রধান ত্রুটি হইল, পিতার জাতীয়তা নির্ধারণ করা অনেক ক্ষেত্রে কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু জন্মস্থানগত অধিকারের ভিত্তিতে জাতীয়তা নির্ধারণের সমস্যা হয় না। কিন্তু ইহাও একটি বিজ্ঞানসম্মত নীতি নহে। কেননা, এই নীতি অনুযায়ী নাগরিকতা একটি বিশেষ স্থানে জন্ম সংক্রান্ত একটি দৈবদুর্ঘটনার উপর নির্ভর করে। ধরা যাক্ একটি ভারতীয় দম্পতি বিশ্বপরিক্রমায় বাহির হইল। রাস্তায় জাপানে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিছুকাল তাহারা থাকিয়া যাইতে বাধ্য হইল, কারণ জাপানে তাহাদের একটি সন্তান জন্মলাভ করিল; পুনরায় তাহাদের চারিটি সন্তান যথাক্রমে ইংলণ্ড, জার্মানী, ইটালী এবং সুইডেনে জন্মগ্রহণ করিল। তাহাতে পাঁচটি সন্তান পাঁচদেশের নাগরিক হইল। কিন্তু, আমরা এই অবস্থা অচিন্তনীয় মনে করি।

সেইজন্য জন্মস্থানের ভিত্তিতে নাগরিকতা অর্জন করিবার নীতি বিজ্ঞানসম্মত এবং যুক্তিসংগত নহে।

অর্জিত নাগরিকতা অনেক সময় আদালতের মাধ্যমে স্বীকৃত হয়। আদালতের নিকট নাগরিকতা লাভের জন্য আবেদন করিতে হয়। আদালত সেই আবেদনপত্রটির খুঁটিনাটি বিচার করিয়া পরীক্ষা করিয়া নাগরিকতা লাভের সব সর্ত পূরণ করা হইয়াছে কিনা। অর্জিত নাগরিকতা সম্পূর্ণ (complete or grand) এবং অসম্পূর্ণ হইতে পারে। বেলজিয়াম, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে এই দুই প্রকার অর্জিত নাগরিকতার মধ্যে পার্থক্য করা হয়। যখন রক্তগত অধিকারের ভিত্তিতে নাগরিকতা এবং জন্মস্থানগত অধিকারের ভিত্তিতে নাগরিকতার মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হয় না এবং উভয় প্রকার নাগরিককেই সব রকম সামাজিক এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তখন ইহাকে আমরা সম্পূর্ণভাবে অর্জিত নাগরিকতা (citizenship by grand naturalization) বলি। যখন এই দুই প্রকার নাগরিকের মধ্যে তারতম্য করা হয়, তখন ইহাকে আমরা অসম্পূর্ণভাবে অর্জিত নাগরিকতা (citizenship by partial naturalization) বলি। আমেরিকায় রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রার্থী মনোনয়নের সময় জন্মগত নাগরিকতা এবং অর্জিত নাগরিকতার মধ্যে পার্থক্য হয়। আমেরিকায় সম্পূর্ণভাবে অর্জিত নাগরিকতা নাই।

এখানে উল্লেখযোগ্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে বিদেশীদের প্রবেশ এবং বসবাস সম্পর্কে অনেক নিয়ন্ত্রণমূলক আইন-কানুন আছে। আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়ার অভিবাসন আইনগুলি (immigration laws) প্রণীত হইয়াছে দেশের জনসমষ্টির বংশের শুচিতারক্ষার জন্য। নাগরিকতা সম্পর্কে এই নিয়ন্ত্রণমূলক নীতির কুফল হইল বিভিন্ন জাতির মধ্যে অথবা বর্ণের মধ্যে জাতিগত অথবা বর্ণগত বিদ্বেষ।

নাগরিক অধিকারের বিলুপ্তি (Loss of citizenship) :

বিভিন্ন উপায়ে যেমন নাগরিক অধিকার লাভ করা যায়, সেই প্রকার নাগরিক অধিকারের বিলুপ্তিও আমরা দেখিতে পাই। বিবাহের দ্বারা স্ত্রীলোকেরা মূল নাগরিকতা হারাইয়া থাকে। কোনও নূতন নাগরিকতা অর্জন করিলে পূর্ব নাগরিকতার অবসান ঘটে। বিদেশী রাষ্ট্রের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করিলে কোন ব্যক্তির মূল নাগরিকতা নষ্ট হইয়া যায়। তবে এই চাকুরি গ্রহণ করিবার পূর্বে যদি নিজের রাষ্ট্রের অনুমতি লওয়া থাকে অথবা যদি সে নিজের রাষ্ট্রের নির্দেশেই এই চাকরি লইয়া থাকে, তবে সে

এইজন্য নাগরিকতা হারাইবে না। বিদেশে জমি অথবা সম্পত্তি ক্রয়, দীর্ঘকাল যাবৎ স্বদেশের বাহিরে অবস্থান, গুরুতর অপরাধের শাস্তি হিসাবে নিজের রাষ্ট্র হইতে বহিষ্কার প্রভৃতি কারণেও কেহ নাগরিক অধিকার হারাইতে পারে।

সুনাগরিকতার অন্তরায় (Hindrances to good citizenship) :

ব্রাইসের মতে প্রকৃত নাগরিক জীবনের প্রধান অন্তরায় হইতেছে উদাসীনতা, ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি এবং দলগত স্বার্থবুদ্ধি। মূলতঃ, ব্যক্তিগত জীবনে কতিপয় গুণের সমাবেশ হইলেই নাগরিক জীবন সার্থক হইতে পারে। প্রথমতঃ, নাগরিককে সর্বদাই নিজের অধিকার এবং কর্তব্য সম্বন্ধে সতর্ক থাকিতে হইবে। অধিকার ভোগের জন্য অত্যুৎসাহী এবং কর্তব্যপালনে উদাসীন থাকিলে ভাল নাগরিক হওয়া যায় না। নাগরিকগণ যখন পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সম্বন্ধে উদাসীন থাকে এবং সামাজিক ও পৌর কর্তব্যগুলি সম্পাদন করিবার সময় অপরের মুখাপেক্ষী হইয়া গুরুত্ব সহকারে নিজেরা কোন কাজ করিতে চাহে না, তখনই নাগরিকজীবন সার্থকতা লাভ হইতে বঞ্চিত হয়। কোন নাগরিক হয়ত দেশের নির্বাচনে ভোট প্রদান করিবার ব্যাপারে একেবারে উদাসীন। অথচ, এই উদাসীনতার মধ্য দিয়া আধুনিক গণতন্ত্রের যুগে সে শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করার সুযোগ স্বেচ্ছায় নষ্ট করিতেছে। এই অবস্থায় কখনই নাগরিক জীবনের চরম সার্থকতা আমরা দেখিতে পাই না। তাহাতে রাজনৈতিক শিক্ষা কখনও সার্থক হয় না এবং জনসাধারণের সচেতনতা ক্রমশঃ কমিয়া যায়। মানুষ যখন রাজনৈতিক ক্ষমতাগুলি প্রয়োগ করার পিছনে আশুলাভের সম্ভাবনা দেখিতে পায় না তখনই সে এই সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া পড়ে। বর্তমানে শিক্ষার প্রসার এবং সংবাদপত্রগুলির ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় নাগরিকজীবনের এই অন্তরায় ক্রমশঃ দূর হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি অনেক সময় সুস্থ, সুন্দর নাগরিকজীবনের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। নাগরিকগণ যখন সমাজের এবং দেশের স্বার্থ অপেক্ষাও নিজেদের স্বার্থ বড় করিয়া দেখে, তখন নাগরিক-জীবন কখনই পূর্ণ এবং সার্থক হইতে পারে না। অনেক সময় এমন হয়, কতিপয় অর্থনৈতিক স্বার্থের সিদ্ধির জন্য নাগরিক নির্বাচনে অনুপযুক্ত প্রার্থীর পক্ষে ভোট প্রদান করিয়া থাকে। নির্বাচনে ভোট দান করা একটি পবিত্র দায়িত্ব; নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থকে উপেক্ষা করিয়া যদি অনুপযুক্ত প্রার্থীকে সমর্থন করা হয় তবে নাগরিকজীবন কখনই পূর্ণ ও সার্থক হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ, দলগত স্বার্থ অনেক সময়

নাগরিকগণকে নিজের বিবেক বুদ্ধি অনুযায়ী চলিতে দেয় না। গণতান্ত্রিক সরকার রাজনৈতিক দলীয় ব্যবস্থার উপরে নির্ভর করে। সুতরাং আধুনিক গণতন্ত্রে নির্বাচনে ভোট দান করিবার সময় নাগরিকগণকে নিজের দলের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয় এবং দলীয় স্বার্থে পরিচালিত হইতে হয়। অনেক সময় নাগরিকগণ বাধ্য হইয়া দলীয় স্বার্থের চাপে অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তির পক্ষে ভোট প্রদান করে। এই বিবেকবিরুদ্ধ কাজ তাহাদের করিতে হয় দলীয় রাজনীতির চাপে পড়িয়া। তাহাতে নাগরিকজীবন সহজ, সুন্দর এবং সার্থক হয় না। দলীয় স্বার্থে যখন নাগরিকগণ পরিচালিত হয়, তখন রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা অপেক্ষা নিজের দলের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করার প্রশ্নটাই বড় হইয়া দেখা দেয়। দলীয় স্বার্থের প্রভাবে রাজনৈতিক জীবনে অনেকক্ষেত্রেই আলোড়নের সৃষ্টি হয়। ভারত, আয়ারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ দ্বিধা-বিভক্ত হইবার কারণ হইতেছে নাগরিকগণ কর্তৃক দলীয় স্বার্থে পরিচালিত হওয়া।

নাগরিকজীবনের সার্থকতার পথে যে সকল বাধা আমরা দেখিতে পাই সেগুলি দূর করিতে হইলে সরকারকে দুইটি নীতি গ্রহণ করিতে হইবে। প্রথমতঃ, সরকারের কাঠামো, ক্রিয়াকলাপ এবং শাসন-ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের আমূল সংস্কার করিতে হইবে। ভোট দান প্রথার পরিবর্তন, বাধ্যতামূলকভাবে ভোটদান প্রথার প্রবর্তন, গণ-নির্দেশ (Initiative) এবং গণভোট (Referendum) প্রথার প্রবর্তন এবং শাসনবিভাগে সম্পূর্ণভাবে দুর্নীতির অবসান করা, সরকারের ক্রিয়াকলাপের এইভাবে সংস্কার করিলে নাগরিকদের রাজনৈতিক সচেতনতা অনেক বাড়িয়া যাইবে এবং তাহারা সুনাগরিক হইতে পারিবে। যদি সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের (Proportional reprsentation) প্রথা প্রচলিত হয়, তবে সব রাজনৈতিক দলই আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব পাইবে এবং তাহাতে রাষ্ট্রের সব নাগরিকেরই দলমত নির্বিচারে রাজনৈতিক সচেতনতা অনেক বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা সব রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভবপর নহে। বাধ্যতামূলকভাবে ভোট দান প্রথার প্রবর্তন করিলেই যে নাগরিকজীবন সার্থকতার পথে অগ্রসর হইবে এরকম কোন নিশ্চয়তা নাই। কারণ, এই প্রথার একটা বিপদও আছে। অশিক্ষিত ভোটদাতাগণ অনেক সময় নিজেদের খেয়াল খুশীমত ভোট দান করিতে পারে। গণ-নির্দেশ এবং গণভোট প্রথার প্রবর্তন সুইজারল্যাণ্ডে সম্ভবপর হইলেও বড় দেশগুলির পক্ষে ইহা চালু করা খুবই কষ্টসাধ্য। অবশ্য ইহা যে অসম্ভব তাহা নহে। শাসন-ব্যবস্থা হইতে সর্বপ্রকার দুর্নীতি নিঃশেষে দূর করিবার জন্য যদি সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় এবং জনগণের বিশ্বাসভংগকারীর

জন্ম যদি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা থাকে তবে নাগরিকজীবনে সকলেই শৃংখলা-পরায়ণ এবং ন্যায়পরায়ণ হইবার চেষ্টা করিবে।

দ্বিতীয়তঃ, নাগরিকদের শিক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা যদি রাষ্ট্র গ্রহণ করে তবে নাগরিকজীবন সার্থকতার পথে দ্রুত আগাইয়া যায়। সুনাগরিক যদি কেহ হইতে না পারে, তবে তাহার প্রধান কারণ হইতেছে শিক্ষার অসম্পূর্ণতা। যদি প্রত্যেকে নিজের জীবনে উপযুক্ত সাধারণ এবং রাজনৈতিক শিক্ষা পায়, তবে প্রত্যেকেই সুন্দর নাগরিকজীবন যাপন করিতে চেষ্টা করিবে। একটি জাতির প্রধান সম্পদ হইল শিক্ষিত নাগরিকবৃন্দ। দেশের সাংস্কৃতিক জীবন যদি উন্নত হয়, এবং কেহ যদি শিক্ষা অর্জন করা একটি আদর্শ বলিয়া মনে করে, শিক্ষার আলোকে যদি সে ন্যায়-অন্যায় বুঝিতে পারে এবং মানসিক দুর্বলতা ত্যাগ করিতে পারে, তবে তাহার পক্ষে একজন সুনাগরিক হওয়া মোটেই অসম্ভব নহে, বরং তাহার নাগরিক জীবন পূর্ণ হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ সাধারণ শিক্ষা এবং জ্ঞান অর্জন হইতেই লোকের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। নিজের অধিকার এবং কর্তব্য সম্বন্ধে সে সচেতন হয়। সেইজন্য সুন্দর নাগরিক জীবনের একটি প্রধান সর্ত হইল নাগরিকদের উপযুক্ত শিক্ষা এবং রাজনৈতিক সচেতনতা।)

নাগরিক ও স্বজাতীয় মানুষের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Citizen and People)

নাগরিক এবং স্বজাতীয় মানুষ (People) এক নহে। স্বজাতীয় মানুষের মধ্যে এমন অনেক লোক থাকিতে পারে যাহাদের নাগরিক অধিকার নাই। স্বজাতীয় কোন লোক যদি কোন দেশের নাগরিকতা অর্জন করে তখন সে একটি জাতির অন্তর্গত হইয়াও দেশের নাগরিক নহে। কোন বাংগালী যদি ইংলণ্ডের নাগরিকতা অর্জন করেন, অথবা আমেরিকার নাগরিকতা অর্জন করেন, তবে তিনি যে বাংগালী সেই পরিচয় কখনই বিলুপ্ত হইবে না, স্বজাতীয় লোক যদি ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে অথচ তাহার পিতামাতা যদি ভারতীয় হয়, তবে তাহাকে কোন দেশের নাগরিক অধিকার সে গ্রহণ করিবে তাহা স্থির করিয়া লইতে হইবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বজাতীয় মানুষ বলিতে বুঝা যায় একই ঐতিহ্য দ্বারা পরিপুষ্ট একদল লোক যাহারা একটি সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী হইয়া এক গভীর ঐক্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়। নাগরিকের ন্যায় তাহাতে রাষ্ট্রের অধিবাসী হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই।

নাগরিক ও প্রজার মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Citizen and Subject) :

নাগরিক এবং প্রজা উভয়েই এক রাষ্ট্রে বাস করে। কিন্তু প্রজা সবসময় নাগরিকের ন্যায় কতিপয় মর্যাদাসম্পন্ন এবং ন্যায়সংগত অধিকার ভোগ করিতে পারে না। ভারতবাসীরা যখন ইংরেজের অধীন ছিল, তখন তাহারা প্রজা বলিয়া অভিহিত হইত। যাহাদের প্রজা বলা হয় তাহারা সম্পূর্ণভাবে সব রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করিতে পারে না এবং সামাজিক ক্ষেত্রেও নাগরিকের সমান পদমর্যাদার অধিকারী হয় না। প্রজার কোন অধিকার শাসকসম্প্রদায় সাধারণতঃ স্বীকার করিতে চায় না। শাসকের ইচ্ছায় প্রজার সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। বর্তমানে 'প্রজা' শব্দটি খুব কম ব্যবহৃত হয়, কেননা, গণতন্ত্রের যুগে এই শব্দটির কোন স্থান নাই।

নাগরিক ও নির্বাচকের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Citizen and Elector) :

অনেকে নাগরিক এবং নির্বাচক এক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাহা সবসময় ঠিক নহে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক নিশ্চয়ই নির্বাচক হইবে; কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক হয়ত নির্বাচক নাও হইতে পারে, আবার কেহ হয়ত নির্বাচক হইতে পারে, কিন্তু সেজন্য সে নাগরিক নাও হইতে পারে। কারণ,রাষ্ট্র কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বিদেশীকেও নির্বাচন অধিকার প্রদান করিতে পারে। সেইক্ষেত্রে বিদেশীকে আমরা নাগরিক বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

অধিকারের সংজ্ঞা এবং বিভিন্ন রূপ (Definition and different types of Rights.) :

সাধারণ অর্থে "অধিকার" কথাটির অর্থ হইতেছে কতিপয় কাজ করা অথবা না করার স্বাধীনতা। অধিকার জিনিষটি নিছক দৈহিক শক্তি হইতে অথবা একটি সামাজিক মূল্যের ভিত্তি হইতে উদ্ভূত হইতে পারে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আমরা 'অধিকার' জিনিষটিকে মানুষের সামাজিক চরিত্র হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে করি। প্রাকৃতিক অধিকার সব মানুষেরই থাকে। কিন্তু, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অর্থে অধিকার সব মানুষের থাকে না। যাহারা সামাজিক এবং রাজনৈতিকভাবে সংঘবদ্ধ তাহারাই অধিকার ভোগ করে। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল সর্বাধিক সামাজিক কল্যাণের ব্যবস্থা করা।. সামাজিক কল্যাণ ব্যক্তিগত কল্যাণের উপর ভিত্তিশীল। সেইজন্য সর্বাধিক ব্যক্তিগত কল্যাণের

জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে কতিপয় পৌর, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা এবং অধিকার প্রদান করার দরকার হয়। অধ্যাপক লাস্কির মতে 'অধিকার' হইতেছে সামাজিক জীবনের এমন কতিপয় সর্ত যেগুলি ব্যতীত মানুষ কখনও নিজের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিতে পারে না। ("Rights are those conditions of social life without which no man can be his best self."—Laski)। রাষ্ট্রের উচিত নাগরিকগণের কতিপয় সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যেগুলির সাহায্যে তাহাদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে এবং সামাজিক জীবনেও তাহাদের কল্যাণ হইতে পারে। সামাজিক জীবনে নাগরিকদের বিভিন্ন অত্যাবশ্যক চাহিদা মিটাইবার জন্য রাষ্ট্র যদি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে, তবেই রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকগণ পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করিবে। তখন রাষ্ট্র এবং নাগরিকদের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতার ভিত্তিতে সর্বাধিক সমাজকল্যাণ হয়। অধ্যাপক গ্রীণের মতে 'অধিকার' হইতেছে এমন একটি শক্তি যাহা সাধারণের কল্যাণ-বৃদ্ধিকারী হিসাবে স্বীকৃত হয় এবং দাবী করা হয় ("Right is a power claimed and recognised as contributory to common good."—Green.)। অধিকার বলিতে সামাজিক জীবনের এমন কতকগুলি সুবিধা বুঝায় যেগুলি জনসাধারণ নিজেদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য অত্যাবশ্যক মনে করে এবং সমাজও অনুরূপ স্বীকার করে। এই অধিকারগুলির অস্তিত্বের জন্য চাই একটি সুসংহত সামাজিক জীবন। তাহা ছাড়া, এই অধিকারগুলির যাহাতে অপব্যবহার না হয়, অর্থাৎ এই অধিকারগুলি যেন জনসাধারণকে নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে উদাসীন করিয়া স্বেচ্ছাচারীতে পরিণত না করে সেইজন্য কতিপয় রাষ্ট্রীয় আইন থাকে। অধিকার সর্বদাই রাষ্ট্রীয় আইন কর্তৃক স্বীকৃত এবং কার্যকরী হয় এবং হওয়া উচিত। কেননা, প্রত্যেকটি আইনের যেমন একটি সামাজিক মূল্য এবং উদ্দেশ্য আছে, প্রত্যেকটি অধিকারেরও সেরকম একটি সামাজিক মূল্য এবং উদ্দেশ্য আছে।

অধিকারগুলিকে আমরা প্রথমতঃ নৈতিক অধিকার (Moral Rights) এবং আইনগত অধিকার (Legal Rights), এই দুইভাগে বিভক্ত করিতে পার। নৈতিক অধিকারগুলি আমাদের নীতিজ্ঞান, বিচারবুদ্ধি এবং বিবেকের প্রেরণার উপর ভিত্তিশীল। এই অধিকারগুলি রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক কার্যকরী হয় না। কিন্তু, আইনগত অধিকারগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয় এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক কার্যকরী হয়। একজন লোক যদি মিথ্যা কথা বলে, তবে সে সত্য কথা বলার নৈতিক অধিকারের অপচয় করিল,—রাষ্ট্র সেক্ষেত্রে তাহাকে শাস্তি প্রদান করিতে পারে না। কিন্তু,

একজন নাগরিক যদি অপর কোন নাগরিকের নামে সাধারণ নির্বাচনে জাল ভোট প্রদান করে, তবে রাষ্ট্র তাহাকে আইনগত অধিকার ভংগকারী হিসাবে শাস্তিপ্রদান করিতে পারে। আইনগত অধিকারগুলিকে আমরা পৌর অধিকার (Civil Rights) এবং রাজনৈতিক অধিকার (Political Rights) এই দুইভাগে বিভক্ত করিতে পারি। পৌর অধিকার বলিতে সাধারণতঃ একন কতিপয় অধিকার মনে করা হয় যেগুলি ছাড়া সভ্য নাগরিক জীবন যাপন করা অসম্ভব। এই অধিকারগুলি নাগরিকদের চরিত্রের পূর্ণ বিকাশের জন্য অপরিহার্য। বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক নাগরিকদের নিম্নলিখিত পৌর অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে।

পৌর অধিকার (Civil Rights) :

১। **জীবন রক্ষার অধিকার** (Right to life)—পৌর অধিকারগুলির মধ্যে ইহাই আদিম অধিকার। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যদি গোলযোগ হয় অথবা রাষ্ট্রের উপর যদি বাহিরের আক্রমণ হয়, তবে নাগরিকগণের রাষ্ট্রের নিকট নিজেদের জীবন রক্ষার দাবী করিবার অধিকার আছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই সেইজন্য নাগরিকদের জীবনের নিরাপত্তার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। কোন নাগরিককে আত্মহত্যা করা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করাও রাষ্ট্রের কর্তব্য।

২। **স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবার অধিকার** (Right to move freely)—প্রত্যেক নাগরিকেরই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবার এবং নিজের মানসিক বৃত্তিগুলিকে নিজের রুচি অনুযায়ী বিকাশ করিবার অধিকার আছে। কোনও লোককে বিনা বিচারে আটক রাখা যাইবে না।

৩। **কাজ করিবার এবং সম্পত্তিরক্ষার অধিকার** (Right to move and Right to property)—কাজ করিবার অধিকার সব নাগরিকেই থাকে। তবে কোন কোন রাষ্ট্রে, যেমন সোভিয়েট ইউনিয়নে, রাষ্ট্রের নির্দেশে নাগরিককে অনেক সময় নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অনেক কাজ করিতে হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে কাজ করার অধিকারের উপর এই নিয়ন্ত্রণ নাই। সম্পত্তিরক্ষার প্রত্যেকেরই নিজের পছন্দমত জীবিকা গ্রহণের স্বাধীনতা থাকে। নিজের অধিকারও নাগরিক জীবনের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই অধিকারটি সার্বজনীন নহে। সামাজিক কল্যাণের জন্য—অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে সমাজের অন্যান্য নাগরিকদের শোষণমুক্ত করিবার জন্য—রাষ্ট্র কোন সম্পত্তি নিজের হাতে গ্রহণ করিতে পারে; সেক্ষেত্রে সম্পত্তির অধিকারীকে

ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। এমনিতে সাধারণ অবস্থায় নিজের ধন-সম্পত্তি রক্ষা করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিককেই রাষ্ট্র প্রদান করিয়া থাকে।

৪। স্বাধীনভাবে আইনসংগত চুক্তি করিবার অধিকার (Right of Contract)—এই অধিকারটি সম্পত্তিরক্ষার অধিকারের একটি বিশেষ দিক। বর্তমান সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে চুক্তি একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই চুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন নাগরিক ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থে কোন বিষয় সম্পর্কে বাধ্যবাধকতা মানিয়া লয়। তবে চুক্তি যাহাতে সর্বদাই রাষ্ট্রের প্রচলিত আইনের সহিত সংগতি রাখিয়া সম্পাদিত হয়, সেদিকে রাষ্ট্র লক্ষ্য রাখিবে এবং আইনভংগকারীকে শাস্তি প্রদান করিবে। চুক্তি করার স্বাধীনতা এবং মর্যাদা যাহাতে নাগরিকগণ বজায় রাখিতে পারে সেই স্বাধীনতা তাহাদের প্রদান করা উচিত।

৫। বাক্-স্বাধীনতার অধিকার (Right to freedom of speech)—বাক্স্বাধীনতা বর্তমানে নাগরিকদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অধিকার। এই পৌর অধিকার রাজনৈতিক বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অধিকার হিসাবেও বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু মূলতঃ, ইহা একটা পৌর অধিকার। সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কথা বলিবার অধিকার যদি মানুষ না পায়, তবে তাহার ব্যক্তিগত পূর্ণ বিকাশ কখনই সম্ভবপর হয় না। নিজের মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিবার অধিকার সব মানুষেরই থাকা উচিত। এই অধিকারটিই গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। কারণ, কোন গণতান্ত্রিক সরকারের শক্তি এবং স্থায়িত্ব প্রধানতঃ নির্ভর করে জনমতের সমর্থনের উপর। নাগরিকদের বাক্-স্বাধীনতাই প্রধানতঃ একটি বিশেষ দিকে জনমত সংগঠনের জন্য দায়ী। বক্তৃতার সাহায্যে জনমতের উপর এতটা প্রভাব বিস্তার করা যায় না। কিন্তু, এই অধিকারটিও সর্বজনীন নহে। কাহারও কথা বলার স্বাধীনতা যদি রাষ্ট্রের নিরাপত্তার পক্ষে অথবা অন্যান্য নাগরিকদের অধিকার বজায় রাখার পক্ষে ক্ষতিকর হয়, তবে রাষ্ট্র সেই অধিকার নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। আমাদের স্বাধীনভাবে কথা বলার অধিকার আছে বলিয়াই যে আমাদের যাহা খুশী তাহাই করিব অথবা কাহাকেও অপমান করিব তাহা কখনই রাষ্ট্র সমর্থন করিবে না। বিশেষতঃ, যুদ্ধ অথবা আপাতকালীন সময়ে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য নাগরিকদের এই অধিকার নিয়ন্ত্রণ করা রাষ্ট্রের পক্ষে একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে।

৬। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা (Freedom of the Press)—সভ্য নাগরিকজীবন এবং গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার নাগরিকদের যেমন স্বাধীনভাবে কথা বলার অধিকার আছে, সেইরূপ

স্বাধীনভাবে কোন কিছু লিখিবারও অধিকার আছে। সরকারের ক্রিয়াকলাপ, সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিক এবং নাগরিকগণের সহিত রাষ্ট্রের সম্পর্ক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে কাহারও যদি কিছু বলার থাকে, তবে তাহা সংবাদপত্রের মাধ্যমে বলা যাইতে পারে। সংবাদপত্র জনমতকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে। সংবাদপত্রের মতবাদ অনুযায়ী সরকারও প্রভাবান্বিত হয়। সংবাদপত্রের যখন সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের খোলাখুলি সমালোচনা হয়, তখন তাহাতে সরকারও উপকৃত হয় এবং জনসাধারণের ইচ্ছানুযায়ী নিজের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। গণতন্ত্রের যুগে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। যুদ্ধের সময় অথবা দেশে জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হইলে প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্র দেশের সামগ্রিক নিরাপত্তার স্বার্থে এই অধিকারটি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে।

৭। সভাসমিতি গঠনের স্বাধীনতা (Right of Association):—মানুষ সামাজিক প্রাণী। সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিবার প্রেরণায় মানুষ সভা-সমিতি গঠন করিতে চায়। যখন বিভিন্ন নাগরিক কোন বিষয়ে একই অভিমত পোষণ করে তখন তাহারা একটি সমিতি গঠন করে। একটি সভার মাধ্যমে তাহারা নিজেদের মতামত প্রচার করিতে পারে। সুতরাং সভ্য নাগরিকজীবনের জন্য সভাসমিতি গঠনের অধিকার নাগরিকদের থাকা আবশ্যক। এই অধিকারটি রাজনৈতিক অধিকার হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে যদি নাগরিকগণ রাজনৈতিক সভাসমিতি গঠন করেন। কিন্তু সভা-সমিতি সর্বদাই রাজনৈতিক হইবে এমন কোন কথা নাই।

৮। পরিবার গঠনের স্বাধীনতা (Right to family):—সভ্য নাগরিক-জীবনের জন্য প্রত্যেক নাগরিকেরই বিবাহ করিয়া পরিবার গঠনের অধিকার আছে। এই ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতার প্রশ্ন থাকিতে পারে না।

৯। ধর্মাচরণ এবং বিবেকের স্বাধীনতা (Freedom of worship and conscience):—মানুষের মধ্যে ধর্মভীরুতা থাকা খুবই স্বাভাবিক। সভ্য নাগরিকজীবনের জন্য মানুষের চিন্তার এবং বিবেকবুদ্ধি স্বাধীনভাবে চালনা করিবার অধিকার থাকা উচিত। একজন নাগরিকের কাছে যে ধর্মীয় মতবাদ গ্রহণযোগ্য মনে হইবে, আরেকজন নাগরিকের কাছে তাহা গ্রহণযোগ্য নাও হইতে পারে। ধর্মাচরণে প্রত্যেক নাগরিকেরই নিজের স্বাধীনতা থাকা উচিত। মানুষের বিবেকবুদ্ধির প্রেরণায় চালিত হইবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। যে সকল রাষ্ট্র ধর্ম-নিরপেক্ষ (যেমন ভারতবর্ষ), সেই সকল রাষ্ট্রেও প্রত্যেক নাগরিকের নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী ধর্মীয় আচরণ করার অধিকার আছে। ধর্মের ভিত্তিতে যুদ্ধ-বিগ্রহ মধ্যযুগীয় ইতিহাসে আমরা

অনেক দেখিয়াছি। সুতরাং সভ্য নাগরিকজীবনের জন্য এই অধিকারের গুরুত্ব মোটেই কম নহে।

১০। শিক্ষার অধিকার (Right to education):—নাগরিকগণ যাহাতে নাগরিক দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত হইতে পারে, সেইজন্য শিক্ষা পাইবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকেরই আছে। রাষ্ট্র যদি উপযুক্ত শিক্ষা নাগরিকগণকে প্রদান না করে তবে নাগরিকগণ কখনই নিজেদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে পারে না।

উপরোক্ত অধিকারগুলি ছাড়াও নাগরিকদের আরও কতিপয় পৌর অধিকার আছে, যেমন, নিজেদের কৃষ্টি ও ভাষা রক্ষা করিবার অধিকার, আইনের চোখে সমানাধিকার, নিজেদের ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার ইত্যাদি।

রাজনৈতিক অধিকার (Political Rights):

রাজনৈতিক অধিকারের দ্বারা নাগরিকগণ সরকার পরিচালনার কাজে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশে আমরা নাগরিকদের নিম্নলিখিত রাজনৈতিক অধিকার দেখিতে পাই।

১। বাসস্থানের অধিকার (Right of residence):—এই অধিকার অনুযায়ী যে কোন নাগরিক রাজনৈতিক স্বার্থ ও কারণ নির্বিশেষে দেশের যে কোন স্থানে বসবাস করিতে পারে। এই অধিকারটিতে রাজনৈতিক অধিকার বলা হয় এই কারণে যে, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিদেশীগণ এই অধিকার লাভ করিতে পারে না। যদি বিদেশীগণ এই অধিকার ভোগ করিতে পারিত. তবে ইহা রাজনৈতিক অধিকার না হইয়া পৌর অধিকার হইত। কোন নাগরিকের বাসস্থানের সহিত রাষ্ট্রের অথবা রাষ্ট্রের অন্যান্য নাগরিকের নিরাপত্তা কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে জড়িত থাকিতে পারে।

২। বিদেশে থাকাকালীন জীবনরক্ষার অধিকার (Right to protecttion while staying abroad):—কোন নাগরিক যদি বিদেশে গমন করে তবে বিদেশে যাইয়াও সে নিজ রাষ্ট্রের নিকট হইতে তাহার জীবনরক্ষার অধিকার দাবী করিতে পারে।

৩। ভোট প্রদান করিবার অধিকার (Right to vote)—সমুদয় রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে ইহাই প্রধান। বিশেষতঃ, পরোক্ষ গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য এই অধিকারটি অপরিহার্য। প্রত্যেক নাগরিকেরই সরকারের ক্রিয়াকলাপে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিবার এবং রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করিবার অধিকার আছে। সেইজন্য সে নির্বাচনে প্রার্থী হইবার

অথবা তাহার পছন্দমত প্রার্থীর পক্ষে ভোট প্রদান করিবার অধিকারী হইবে। প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ইহা একটি মৌলিক অধিকার। বিদেশীগণ এই অধিকার হইতে বঞ্চিত।

৪। সরকারী চাকুরি করিবার অধিকার (Right to hold public office) :—নাগরিকগণের সরকারী চাকুরি করিবার অধিকার থাকিবে। ইহার তাৎপর্য হইতেছে সরকারী কাজের জন্য লোক মনোনয়নে প্রার্থী হইবার সমান অধিকার সব নাগরিকেরই আছে। বিদেশীগণ কোনও রাষ্ট্রে সরকারী চাকুরি পাইবার অধিকারী হইবে না। তবে কোন রাষ্ট্রে সরকারের বিশেষ সম্মতিতে এবং বিদেশীর নিজস্ব রাষ্ট্রের অনুমতিতে এই অধিকার কোন বিদেশীকে সাময়িকভাবে দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু, বিদেশী নাগরিকতা অর্জন করে না।

৫। আবেদন করিবার অধিকার (Right of Petition) :—নাগরিকদের যদি সরকারের বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ অথবা ক্ষোভের কারণ থাকে তবে তাহা দূর করিবার জন্য নাগরিকগণ সরকারের নিকট আবেদন করিবার অধিকার লাভ করে।

৬। স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করিবার অধিকার (Right of resistance) :—প্রতিরোধ করিবার অধিকার বলিয়া কোন একটি বিশেষ অধিকার আছে কিনা ইহা লইয়া সন্দেহের কারণ ঘটিতে পারে। তবে এই অধিকারের তাৎপর্য হইতেছে যদি সরকার কখনও অন্যায়ভাবে নাগরিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করে তবে তাহা প্রতিরোধ করিবার অধিকার নাগরিকদের থাকে। সাধারণতঃ, সভানুষ্ঠান করিয়া, শোভাযাত্রা করিয়া এবং সংবাদপত্রের মারফত অথবা আইনসভার ভিতরে সরকারের কঠোর সমালোচনা করিয়া নাগরিক স্বাধীনতায় অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করা যাইতে পারে। ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকদের যে মৌলিক অধিকার প্রদান করা হইয়াছে তাহাতে একটি হইতেছে সংবিধানিক প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা (Right to constitutional remedies)।

বিভিন্ন দেশে অধিকার রক্ষার সর্ত (System of guaranteeing these rights in different countries) :

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্রে নাগরিকদের বিভিন্ন পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারগুলি সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এইগুলিকে মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) বলা হয়। অন্যান্য অধিকার হইতে এই অধিকারগুলি সম্পূর্ণ পৃথক এবং এইগুলি যদি রাষ্ট্র পালন না করে তবে

নাগরিকগণ সংবিধানিক অধিকারের সাহায্যে ইহার প্রতিকার করিতে পারে। সোভিয়েট ইউনিয়নেও লিখিতভাবে নাগরিকদের বিভিন্ন অধিকার বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু সেদেশে নাগরিকগণ সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অধীন থাকায় এই অধিকারগুলির উপর যতটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত, ততটা গুরুত্ব তাহারা দিতে পারে না। আমেরিকা এবং ভারতবর্ষে বিচার বিভাগীয় ব্যাখ্যা এবং সিদ্ধান্ত অনেক পরিমাণে নাগরিক অধিকারগুলির নিরাপত্তা রক্ষা করে। ইংলণ্ডে লিখিত শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে নাগরিক অধিকারের নিরাপত্তার ব্যবস্থা না থাকিলেও নাগরিকগণ সম্পূর্ণভাবে নিজেদের পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে। ইহা সম্ভবপর হইয়াছে ইংলণ্ডের আইনের নিয়ম (Rule of law) এবং প্রচলিত আইনগুলির (Ccnventions) সাহায্যে। ইংলণ্ডের বিচার বিভাগও এই প্রচলিত আইনগুলিকে প্রকৃত আইনের মর্যাদা দিয়াছে এবং নাগরিকদের বিভিন্ন পৌর ও রাজনৈতিক জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নাগরিক অধিকার রক্ষার প্রধান উপায় হইতেছে নাগরিকগণের সদা সচেতনতা।

অর্থনৈতিক অধিকার (Economic Rights) :

আধুনিক লেখকগণের মতে অর্থনৈতিক অধিকার না থাকিলে পৌর এবং রাজনৈতিক অধিকারগুলি নিরর্থক হইয়া পড়ে। অর্থনৈতিক অধিকারগুলির মধ্যে অন্যতম হইতেছে চাকুরি পাইবার অধিকার। একমাত্র সোভিয়েট ইউনিয়ন ছাড়া অন্যান্য দেশে রাষ্ট্র নাগরিকদের এই অধিকার সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করিয়া লয় নাই। দেশে যাহাতে বেকার-সমস্যার সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিবার দায়িত্ব হইতেছে রাষ্ট্রের। শুধু চাকুরি পাইবার অধিকার নহে, নিজের পছন্দমত জীবিকা অর্জনের অধিকারও নাগরিকগণ দাবী করিতে পারে। তাহা ছাড়া, নাগরিকগণ নিজের চেষ্টায় ধনবৃদ্ধি অথবা সম্পত্তিবৃদ্ধির চেষ্টা করিতে পারে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে নূতন শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা করাও একটি অর্থনৈতিক অধিকার। শ্রমিকগণ কতক্ষণ কারখানায় কাজ করিবে এবং তাহারা ন্যায্য মজুরী পাইল কিনা এ বিষয়ে রাষ্ট্রের দৃষ্টি থাকা উচিত। কারণ, কাজের সময় স্থির করিয়া লওয়া এবং ন্যায্য মজুরী পাওয়া নাগরিকদের একটি মৌলিক অর্থনৈতিক অধিকার। স্বাধীনভাবে নিজেদের অর্থ বিনিয়োগ করাও নাগরিকদের আর একটি অর্থনৈতিক অধিকার।

নাগরিকদের মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights of a Citizen)

নাগরিকগণ যে সকল পৌর এবং রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে,

সেগুলির মধ্যে কতিপয় অধিকার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কোন কোন দেশের শাসনতন্ত্র লিখিতভাবে নাগরিকদের এই অধিকারগুলি প্রদান করিয়াছে। তাহাতে এই অধিকারগুলিকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করিয়া অপরাপর অধিকা হইতে পৃথক করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, নাগরিকগণ নিজেদের দেশের শাসনতন্ত্র হইতেই এই অধিকারগুলি পায় বলিয়া সরকারের ক্ষমতা নাই এই অধিকারগুলি স্বীকার না করিয়া লওয়া। তবে দেশে যদি জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হয় তখন রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য সাময়িকভাবে এই অধিকারগুলির কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রিত করা যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণ সময়ে রাষ্ট্র নাগরিকদের এই অধিকারগুলি নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করে, তবে নাগরিকগণ বিচার বিভাগের কাছে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারে।

আধুনিক কালে নাগরিকগণ যে সকল অধিক গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার ভোগ করে, সেইগুলি হইতেছে—(১) জীবনের অধিকার (Right to life), (২) কাজ করিবার অধিকার (Right to work), (৩) সম্পত্তি রক্ষার অধিকার (Right to property), (৪) যুক্তিসংগত মজুরী ও নির্দিষ্ট কার্যকাল পাইবার অধিকার (Right to reasonable wages and hours of work), (৫) শিক্ষার অধিকার (Right to education), (৬) ধর্মাচরণের স্বাধীনতা (Freedom of worship and conscience), (৭) বাক্ স্বাধীনতা (Freedom of speech), (৮) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা (Freedom of the Press), (৯) সভা ও সমিতি গঠনের স্বাধীনতা (Right of association), (১০) ভোট প্রদান করিবার ক্ষমতা (Right to vote), (১১) সরকারী চাকুরি করিবার ক্ষমতা (Right to hold public offices), (১২) সরকারের অনুসৃত নীতির সমালোচনা করা এবং স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করা (Right of resistance) এবং (১৩) রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা ভোগের অধিকার (Right to Political Power)।

প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক অধিকার (Natural Rights)

প্রাচীনকালের গ্রীক দার্শনিকগণ এবং সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমর্থকগণের মতে মানুষের কতিপয় প্রাকৃতিক অধিকার আছে। এই অধিকারগুলি সমাজসৃষ্টির পূর্বে প্রকৃতির রাজত্বে মানুষ উপভোগ করিত। সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমর্থকগণ মনে করিতেন যে সমাজ সৃষ্টির আগে ছিল প্রকৃতির রাজত্ব। তখন মানুষ সব ব্যাপারেই অবাধ স্বাধীনতা লাভ করিত। হব্সের মতে মানুষের নিজের ইচ্ছাকে অপরের প্রতি প্রয়োগ করিবার একটি স্বাভাবিক অধিকার আছে। লকের মতে সমাজ গঠিত হইবার পরেও মানুষের

প্রাকৃতিক অধিকারগুলি লোপ পায় নাই। জীবন ধারণের অধিকার, সম্পত্তি ভোগের অধিকার এবং স্বাধীনতার অধিকার প্রভৃতি প্রকৃতির রাজত্বে বিরাজ করিত। রাষ্ট্র এই অধিকারগুলি স্বীকার করিল কিনা তাহার উপর এই অধিকারগুলি নির্ভর করে না। হব্‌স্‌, লক এবং রুশোর মতে মানুষের স্বাভাবিক অধিকারগুলি প্রাক্‌-রাষ্ট্র যুগে বিরাজ করিত। এই অধিকারগুলি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের অধীন নহে।

কিন্তু, বেন্থাম (Bentham) মনে করেন, মানুষের অধিকারগুলি সৃষ্ট হইয়াছে রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের পর। তাঁহার মতে অধিকারের সৃষ্টি হইতে পারে তখনই যখন রাষ্ট্র নিজের শক্তির সাহায্যে নাগরিকদের এই অধিকারগুলি রক্ষা করিতে এবং কার্যকরী করিতে পারে। এক কথায়, বেন্থাম এবং তাঁহার সমর্থকগণের মতে অধিকার হইতেছে রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট ("Rights are the creation of the State.")। রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে মানুষের অধিকার সৃষ্ট হয় নাই। সুতরাং প্রাকৃতিক অধিকার বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। বেন্থামের মতে কোনও কর্তব্যের সহিত সংশ্লিষ্ট না হইলে যে কোন অধিকার নিরর্থক হইয়া পড়ে। তবে নিজের কল্যাণ এবং সুখের জন্য চেষ্টা করা যে কোন মানুষেরই একটি মৌলিক এবং স্বাভাবিক অধিকার, বেন্থাম এই কথা স্বীকার করিয়াছিলেন। হার্বার্ট স্পেন্‌সারের (Herbert Spencer) মতে প্রধান মৌলিক ও স্বাভাবিক অধিকাব হইতেছে মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের অধিকার; ভল্টেয়ারের মতে স্বাধীনতা, সম্পত্তি ভোগ এবং আইনের সমান সুযোগ লাভ করা মানুষের স্বাভাবিক অধিকার। অধ্যাপক গ্রীণের (Prof. Green) মতে স্বাভাবিক অধিকার মানুষের এবং সমাজের আদিম প্রকৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট নহে,—মানুষ ভবিষ্যতে কোন্‌ পর্যায়ে উন্নীত হইতে পারে অর্থাৎ, ভবিষ্যতে মানব-চরিত্রের শ্রেষ্ঠ উপাদানগুলির কিভাবে বিকাশলাভ হইতে পারে সেইদিকে দৃষ্টি রাখিয়াই স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্ব আলোচনা করা উচিত। অধ্যাপক লাস্কি মনে করেন বাক্‌-স্বাধীনতা, সংঘ প্রতিষ্ঠা করা, ন্যায় মজুরী লাভ করা, প্রকৃত শিক্ষা, স্বায়ত্তশাসন, উপযুক্ত চাকুরি এবং কোন সামাজিক প্রচেষ্টায় একত্রিত হওয়া নাগরিকদের স্বাভাবিক অধিকার। "এই অধিকারগুলি স্বাভাবিক অধিকার এজন্য যে এইগুলি ছাড়া রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে" ("These are natural rights in the sense that without them the purpose of the state cannot be fulfilled."—Laski)। এই অধিকারগুলি রাষ্ট্র কখনও অস্বীকার করিতে পারে না। আধুনিক কালের সমাজবিজ্ঞানীগণ এই মতবাদের নূতন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গিডিংসের (Giddings) মতে প্রাকৃতিক অধিকার বলিতে

আমরা বুঝি এমন কতিপয় অধিকার যেগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম হিসাবেই সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় অধিকার, এবং শেষ পর্যন্ত নাগরিকদের আইনানুমোদিত অধিকারগুলিকেও স্থায়িত্ব লাভের জন্য এই অধিকারের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে হয়। সুতরাং এই অধিকারগুলিকে আমরা চিরন্তন অধিকার বলিতে পারি না। সামাজিক জীবনে নাগরিকদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রেই এই অধিকারগুলি প্রয়োগ করা চলে।

সমালোচনা :—'প্রাকৃতিক অধিকার', তত্ত্বটির তীব্র সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, "প্রাকৃতিক" অথবা "স্বাভাবিক" এই শব্দগুলির কোনও সর্বজনগ্রাহ্য তাৎপর্য নাই। বিভিন্ন লেখক প্রাকৃতিক অধিকার বলিতে বিভিন্ন অভিমত পোষণ করেন। দ্বিতীয়তঃ, 'প্রাকৃতিক' অথবা 'স্বাভাবিক' শব্দগুলির সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞার অবর্তমানে মানুষের কোন্ অধিকারগুলিকে আমরা প্রাকৃতিক অধিকার বলিতে পারি তাহাও স্পষ্ট নহে। ইহা সত্য যে মানুষের কতিপয় জন্মগত অধিকার থাকে; কিন্তু সেইগুলি প্রকৃতপক্ষে সহজাত ক্ষমতারূপে মনে করা উচিত। সমাজ-জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনের তাগিদে এই সহজাত ক্ষমতাগুলি অধিকারে রূপান্তরিত হয়। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রের পূর্বে যখন "প্রকৃতির রাজ্য" ছিল, তখন যুক্তি-বিজ্ঞানের দিক হইতে অধিকারের অস্তিত্ব থাকা সম্ভবপর নহে। সমাজবিহীন এবং রাষ্ট্রবিহীন "প্রকৃতির রাজ্যে" অধিকারের মর্ম কেহই বুঝিতে পারে না। যখন মানুষের অবাধ স্বাধীনতা কতিপয় নিয়মের মাধ্যমে রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয় এবং সকলের স্বার্থ ও সকলেরই উপকারের জন্য নিয়ন্ত্রিত হয়, তখনই সেই অবাধ স্বাধীনতা অধিকারে রূপান্তরিত হয়। রাষ্ট্রকে বাদ দিয়া মানুষের অধিকার থাকা অযৌক্তিক; কেননা, রাষ্ট্রই মানুষকে অধিকার দান করে। সমাজ-জীবনে শৃংখলা থাকে এবং এখানে মানুষ নিজের খেয়ালখুশীমত চলিতে পারে না। প্রত্যেকেই যদি নিজের খেয়ালখুশিমত চলিতে থাকে, তবে মানুষের সমষ্টিগত স্বার্থ ক্ষুন্ন হয় এবং অধিকারের কোন সার্থকতা থাকে না। সমাজের পরিবর্তনের সংগে মানুষের অধিকারেরও পরিবর্তন ঘটিতেছে। কতকগুলি অধিকার আছে যেগুলি রাষ্ট্র সৃষ্টি করে না, অথচ যে সামাজিক পরিবেশে মানুষ এই অধিকারগুলি ভোগ করে তাহা সৃষ্টি এবং নিয়ন্ত্রণ করিবার দায়িত্ব হইতেছে রাষ্ট্রের হাতে। এই অধিকারগুলিকে আমরা তখনই স্বাভাবিক অধিকার বলিতে পারি যখন ইহা মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে। এই অধিকারগুলির সহিত রাষ্ট্রের আদর্শের সংগতি থাকা চাই। অধ্যাপক গ্রীণের মতে প্রত্যেক নাগরিকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রয়োজনীয় উপাদান হিসাবে রাষ্ট্রের উচিত নাগরিকগণকে এই অধিকারগুলি সম্বন্ধে নিশ্চয়তা প্রদান করা।

অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক (Relation between Rights and Duties) : নাগরিকদের অধিকার এবং কর্তব্যের মধ্যে ঘনিষ্ট যোগাযোগ আছে। নাগরিক অধিকার কখনই অবাধ অথবা অসীম নহে। সমাজ-জীবনে নাগরিকের অধিকার ভোগ করার একটি গণ্ডী আছে এবং সেই গণ্ডীর সীমারেখা অন্যান্য নাগরিকদের অধিকারের উপর নির্ভর করে। কারণ, প্রত্যেক নাগরিকই রাষ্ট্রের নিকট হইতে ভিন্ন অধিকার পাইয়া থাকে এবং প্রত্যেকেই সমানভাবে সেই অধিকারগুলি ভোগ করে বলিয়া কেহ কাহারও অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। সমাজ-জীবনে শৃংখলা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যখন মানুষের ধারণা জন্মায় তখনই তাহার কর্তব্যবোধের উন্মেষ হয়। প্রকৃতির রাজ্যে কর্তব্য এবং অধিকারের মধ্যে এই সম্পর্ক নাই; কারণ সেখানে মানুষের সামাজিক সচেতনতা থাকে না। সামাজিক কল্যাণের জন্যই রাষ্ট্র নাগরিকদের বিভিন্ন অধিকার প্রদান করিয়া থাকে এবং যাহাতে নাগরিকগণ সকলেই এই অধিকারগুলি ভোগ করিতে পারে রাষ্ট্রেরও সেইদিকে দৃষ্টি রাখিবার দায়িত্ব আছে।

নাগরিকদের পরস্পরের অধিকার এবং কর্তব্যের মধ্যে খুব ঘনিষ্ট সম্পর্ক থাকে। আমার একটি অধিকার যুগপৎ রাষ্ট্র এবং অন্যান্য নাগরিকদের নিকট বাধ্যবাধকতার সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল আমি যাহাতে এই অধিকার ঠিকভাবে ভোগ করিতে পারি সেদিকে দৃষ্টি রাখা, এবং অন্যান্য নাগরিকদের কর্তব্য হইল আমার অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা। কিন্তু, আমারও এক্ষেত্রে দুইটি কর্তব্য আছে। প্রথমতঃ, আমাকে দেখিতে হইবে যেন আমারও অধিকার পালনের মধ্য দিয়া আমি অন্যান্য নাগরিকদের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করি। দ্বিতীয়তঃ, আমার কর্তব্য হইতেছে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা। অন্যান্য নাগরিকদের অধিকারে আমি হস্তক্ষেপ করিতে পারি না যেমন অন্যান্য নাগরিকগণ আমার অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। অন্যান্য নাগরিকগণ এবং আমি আমাদের কর্তব্য হইতে বিচ্যুত হইতেছি কিনা সেইদিকে লক্ষ্য রাখিবার দায়িত্ব হইল রাষ্ট্রের। আমার বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আছে। অন্যান্য নাগরিকদের পক্ষে কর্তব্য হইতেছে আমার জীবনের কোনও ক্ষতি না করা। আবার আমার স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার আছে, এ ক্ষেত্রে আমার কর্তব্য হইতেছে অপরের বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ না করা। অন্য নাগরিকদেরও অধিকার আছে তাহাদের বাড়ীতে কাহাকেও অনধিকার প্রবেশ করিতে না দেওয়া। আমার ভোটদানের অধিকার আছে; সেক্ষেত্রে আমার কর্তব্য হইল ঠিকভাবে ভোট প্রদান করা। দেখা যাইতেছে, আমার অধিকারের

ফলে অন্য নাগরিকের উপর যেমন কর্তব্যের দায়িত্ব চাপিয়াছে, সেই প্রকার আমার নিজের উপরেও কতিপয় কর্তব্যের দায়িত্ব পড়িয়াছে। অধিকার এবং কর্তব্যের এই পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ইহারা একই আদর্শের দুইটি বিভিন্ন দিক ("Rights and duties are the two aspects of the same thing.")। অধিকার এবং কর্তব্য,—উভয়ই চূড়ান্ত লক্ষ্য হইতেছে সমাজের কল্যাণ করা, সামাজিক জীবনের পরিবেশ সুন্দর করা এবং শৃংখলার সৃষ্টি করা। আমার অধিকারের অর্থ হইতেছে অপরের কর্তব্য এবং অপরের অধিকারের অর্থ হইতেছে আমার কর্তব্য,—ইহাতে আমার এবং অপর সকলেরই স্বাধীনতা বজায় থাকিবে। নাগরিকদের সব রকম অধিকার রক্ষা করিবার দায়িত্ব হইতেছে রাষ্ট্রের। রাষ্ট্রের লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন নাগরিকগণ নিজেদের অধিকারগুলি ভোগ করিবার সময় কর্তব্যের কথা বিস্মৃত না হয়। আবার, সব নাগরিকেরই নিজ নিজ অধিকার ভোগ এবং কর্তব্য পালনের সময় রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা উচিত। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিয়া, সময়মত কর প্রদান করিয়া এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষায় সাহায্য করিয়া নাগরিকগণ নিজেদেরই অধিকারের নিরাপত্তা বজায় রাখিতে সাহায্য করে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইলে নাগরিকদের সেনাবাহিনীতে যোগদান করা কর্তব্য। নাগরিকগণ রাষ্ট্রের নিকট হইতে বিভিন্ন রাজনৈতিক অধিকার পাইয়া থাকে। এই অধিকারগুলি কাজে লাগাইতে তাহাদের কখনই উদাসীন হওয়া উচিত নয়। অধিকার কখনও ফাঁকা কথা নয়,—প্রতিটি অধিকার কর্তব্যবোধের সহিত বিশেষভাবে জড়িত থাকে। অধিকার ও কর্তব্য অংগাংগী ভাবে জড়িত।

সংক্ষিপ্তসার

১। নাগরিক ও বিদেশীর মধ্যে পার্থক্য আছে। বিদেশী সবরকম পৌর স্বাধীনতা এবং সামাজিক স্বাধীনতা পাইতে পারে, কিন্তু, রাজনৈতিক স্বাধীনতা পায় না। বিদেশী হইতেছে ভিন্ন রাষ্ট্রের অধিবাসী। তাহাকে বিধি নিষেধ ভংগ করার অপরাধে অথবা অসদাচরণের জন্য রাষ্ট্র হইতে বহিষ্কৃত করা যাইতে পারে কিন্তু জোর করিয়া তাহাকে সেনাবাহিনীতে যোগদান করানো যায় না।

২। নাগরিকতা অর্জন জন্মসূত্রে অথবা অর্জনের দ্বারা হইতে পারে। জন্মাধিকার রক্তগত (Jus Sanguinis) এবং জন্মভূমিগত (Jus Suli) হইতে পারে। অর্জনের দ্বারা যে নাগরিকতা লাভ করা যায় তাহাকে অর্জিত নাগরিকতা (Naturalized Citizenship) বলা হয়। যখন রক্তগত

অধিকারের ভিত্তিতে নাগরিকতার মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হয় না, তখন ইহাকে আমরা সম্পূর্ণভাবে অর্জিত নাগরিকতা বলি। যখন এই দুই প্রকার নাগরিকের মধ্যে তারতম্য করা হয়, তখন ইহাকে আমরা অসম্পূর্ণভাবে অর্জিত নাগরিকতা বলি।

৩। লর্ড ব্রাইসের মতে সুনাগরিকতার অন্তরায় হইতেছে উদাসীনতা, ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি এবং দলগত স্বার্থবুদ্ধি। নাগরিকতাকে সার্থকতার পথে লইয়া যাইবার জন্য ভোট-দান প্রথার পরিবর্তন, বাধ্যতামূলকভাবে ভোট প্রদান করার প্রথা প্রবর্তন, গণ-নির্দেশ এবং গণভোট প্রথার প্রবর্তন এবং নাগরিকদের শিল্পব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন।

৪। নাগরিকদের অধিকারগুলিকে নৈতিক অধিকার এবং আইনগত অধিকার এই দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। আইনগত অধিকারগুলি পুনরায় পৌর অধিকার এবং রাজনৈতিক অধিকারে বিভক্ত করা হয়। তাহা ছাড়া নাগরিকদের কতিপয় অর্থনৈতিক অধিকারও আছে। নাগরিকদের পৌর অধিকারগুলি হইতেছে,—জীবনরক্ষার অধিকার, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবার অধিকার, কাজ করিবার এবং সম্পত্তি রক্ষার অধিকার, স্বাধীনভাবে আইনসংগত চুক্তি করিবার অধিকার, বাক্-স্বাধীনতার অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সভাসমিতি গঠনের স্বাধীনতা, পরিবার গঠনের স্বাধীনতা, ধর্মাচরণ ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং শিক্ষার অধিকার। নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকারগুলি হইতেছে বাসস্থানের অধিকার, বিদেশে থাকাকালীন জীবন-রক্ষার অধিকার, ভোট প্রদান করিবার অধিকার, সরকারী চাকুরি করিবার অধিকার, আবেদন করিবার অধিকার, স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করিবার অধিকার। ভারতবর্ষ, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকগণের কতিপয় মৌলিক অধিকার আছে। ইংলণ্ডের নাগরিকগণও আইনের নিয়ম এবং প্রথাগত বিধান অনুযায়ী বিভিন্ন অধিকার ভোগ করে। পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারের ন্যায় নাগরিকদের কতিপয় অর্থনৈতিক অধিকারও থাকে। চাকুরি পাইবার অধিকার, ব্যক্তিগত উদ্যোগে নূতনশিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা করিবার অধিকার এবং ন্যায্য মজুরী পাইবার অধিকার,—প্রভৃতি হইতেছে নাগরিকদের অর্থনৈতিক অধিকার। ইহাছাড়া, মানুষের কতিপয় প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক অধিকার আছে। নাগরিকদের পরস্পরের অধিকার এবং কর্তব্যের মধ্যে খুব ঘনিষ্ট সম্পর্ক থাকে।

Exercises

1. Citizenship has been defined as "the contibution of

one's instructed judgment to the public good." (Laski). Examine the statement. Describe the different methods of acquiring citizenship. (১২৩-২৪ ; ১২৫-২৮ পৃষ্ঠা)

2. Distinguish between (a) a citizen and an alien and (b) a natural citizen and a naturalised citizen. (১২৪-২৬ পৃষ্ঠা)

3. How is citizenship lost ? (১২৮-১২৯ পৃষ্ঠা)

4. What are the hindrances to good citizenship ? What measures do you suggest for removing these hindrances ?
(১২৯-১৩১ পৃষ্ঠা)

5. Differentiate between People. Citizen, Subjects and Electors. (১৩১-১৩২ পৃষ্ঠা)

6. Define Rights. Distinguish between Civil and Political Rights. How are Civil Rights guaranteed in (a) England, (b) U. S. A., and (c) India ? (১৩২-১৩৯)

7. Write a brief note on the Economic Rights enjoyed by a citizen in a modern democratic state. (১৩৯ পৃষ্ঠা)

8. Enumerate the more important Fundamental Rights which a citizen in a modern state enjoys. (১৩০-১৪০ পৃষ্ঠা)

9. Critically discuss the doctrine of Natural Rights. Is there any element of truth in it ? (১৪০-১৪২ পৃষ্ঠা)

10. "Rights and Duties are correlative." —Explain and illustrate. (১৪৩-১৪৪ পৃষ্ঠা)

নবম অধ্যায়

সরকারের শ্রেণীবিভাগ
(Classification of Government)

সরকারের শ্রেণীবিভাগ

বিভিন্ন দেশে আমা বিভিন্ন ধরণের সরকার দেখিতে পাই। গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল শাসন পরিচালকদের সংখ্যার ভিত্তি অনুযায়ী সরকারের শ্রেণীবিভাগ করেন। এরিস্টটলের মতে সরকার দুই প্রকারের হইতে পারে,—স্বাভাবিক (normal) অথবা বিকৃত (Perverted)। যে সকল সরকার জনকল্যাণের আদর্শে পরিচালিত, সেইগুলিকে এরিস্টটল স্বাভাবিক সরকার আখ্যা দিয়াছিলেন। আর যে সকল সরকার শুধু শাসন পরিচালকদের নিজেদের স্বার্থের জন্য পরিচালিত হয়, সেইগুলিকে এরিস্টটল বিকৃত আখ্যা দিয়াছিলেন। নিম্নলিখিতভাবে এরিস্টটল কর্তৃক সরকারের শ্রেণীবিভাগ দেখান যাইতে পারে :—

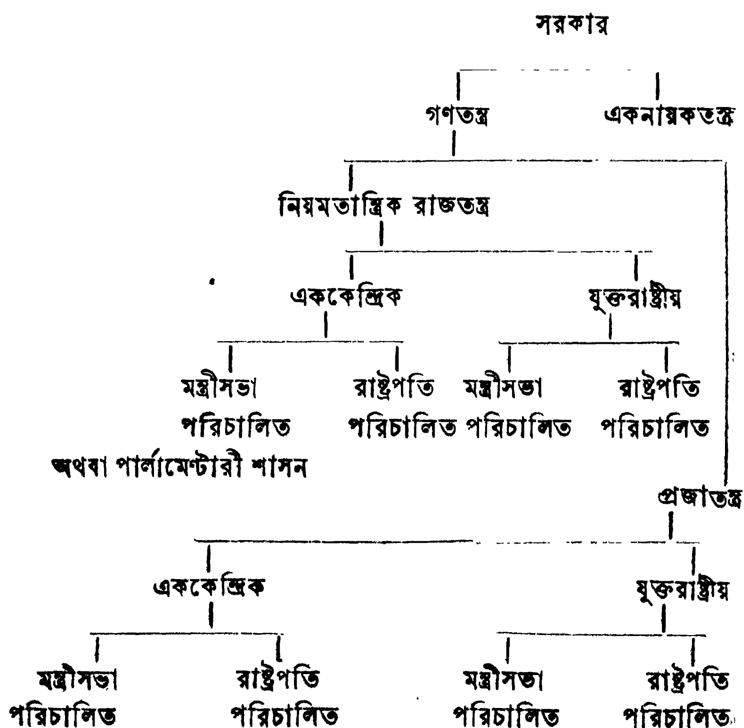
শাসন পরিচালকের সংখ্যা	সরকারের স্বাভাবিক রূপ	সরকারের বিকৃত রূপ
এক ব্যক্তি	রাজতন্ত্র (Monarchy)	স্বৈরাচার (Tyranny)
অল্প কতিপয় ব্যক্তি	অভিজাততন্ত্র (Aristocracy)	ধনিকতন্ত্র (Oligarchy)
বহুব্যক্তি	গণতন্ত্র (Polity)	বিকৃত গণতন্ত্র (Democracy)

এরিস্টটলের মতে শাসন পরিচালকের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে। কিন্তু, আমরা সরকারেব এই প্রকার শ্রেণীবিভাগের সমালোচনা করিতে পারি। প্রথমতঃ, শুধু শাসন-পরিচালকের সংখ্যানুযায়ী সরকারের শ্রেণীবিভাগ করা উচিত নয়। দ্বিতীয়তঃ, এযুগে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এক অথবা অল্প কতিপয় ব্যক্তি হইতে পারে না। সরকারের নৈতিক ভিত্তি থাকা অবশ্য বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু, আধুনিককালে সরকারগুলির শ্রেণীবিভাগ উপরোক্ত নিয়ম অনুযায়ী করা উচিত নয়।

আধুনিককালে আমরা নিম্নলিখিত বিভিন্ন ধরণের সরকার দেখিতে পাই :—(ক) রাজতন্ত্র (Monorchy), (খ) অভিজাততন্ত্র (Aristocracy), (গ) গণতন্ত্র (Democracy), (ঘ) একনায়কতন্ত্র (Dictatorship), এবং

(ঙ) আমলাতন্ত্র (Bureaucracy)। এরিস্টটলের আমলে গণতন্ত্র ছিল প্রত্যক্ষ (Direct); কিন্তু বর্তমানে আমরা পরোক্ষ গণতন্ত্র দেখিতে পাই।

গণতন্ত্র আবার দুই প্রকারের হইতে পারে,—ইহা রাষ্ট্রপতি-শাসিত একটি প্রজাতন্ত্র হইতে পারে অথবা ইহা মন্ত্রীসভা কর্তৃক শাসিত হইতে পারে। কোনও দেশে অবশ্য ইহা যুগপৎ দুইপ্রকারের হইয়াছে; যেমন, ভারতের ক্ষেত্রে হইয়াছে। রাজতন্ত্র ইংলণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের রাজতন্ত্রকে আমরা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (Constitutional Monarchy) বলিতে পারি। গণতান্ত্রিক সরকারগুলি আবার কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federal) অথবা এককেন্দ্রিক (Unitary) হইতে পারে। ডক্টর লিকক্ (Dr. Leacock) নিম্নলিখিতভাবে আধুনিক সরকারগুলির শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছেন :—



রাজতন্ত্র (Monarchy)—রাজতন্ত্র দুই প্রকারের হইতে পারে; যথা, অবাধ রাজতন্ত্র (Absolute Monarchy) এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (Constitutional Monarchy)। রাজা চতুর্দশ লুইয়ের আমলে ফ্রান্সে অবাধ রাজতন্ত্র ছিল। চতুর্দশ লুই বলিতেন, "I am the State." তাঁহাকে "Grand Monarch" বলা হইত। আজকাল অবাধ রাজতন্ত্র সাধারণতঃ দেখা যায় না। তবে, সৌদী আরব, ইথিওপিয়া, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে রাজতন্ত্র বিশেষ শক্তিশালী। কিছুদিন আগেও মিশরের রাজা ফারুক অবাধ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে আমরা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র দেখিতে পাই। অবাধ রাজতন্ত্র গণ-স্বাধীনতার পরিপন্থী। রাজা সেইক্ষেত্রে যাহা খুশী তাহাই করিতে পারেন। অবশ্য রাজা যদি ভাল লোক অথবা ভাল শাসক হন তবে হয়ত রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা উন্নত হইতে পারে;—যেমন এশিয়ায় ফ্রেডারিক দি গ্রেট্ এবং অস্ট্রিয়ায় দ্বিতীয় যোসেপ (Joshep II) কল্যাণকারক স্বৈরতন্ত্র (Benevolent Despotism) প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে অবাধ রাজতন্ত্র হইতেছে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ধরণের সরকার। শুধু অবাধ রাজতন্ত্রই নহে, নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রেও আমরা কতিপয় ত্রুটি দেখিতে পাই। অধ্যাপক জন্ স্টুয়ার্ট মিলের মতে, ভাল সরকার কখনই স্বায়ত্ত-শাসনের পরিবর্তী নয় ("Good government is no substitute for self-government")। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রেও নাগরিকদের রাজনৈতিক শিক্ষা ব্যাহত হয়। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে সরকারের যতই সংস্কার করা হোক না কেন, সরকার মূলতঃ রাজতন্ত্রই থাকিয়া যায়। যদি জনমতের কাজ না হয় অথবা জনগণ যদি অংশ গ্রহণ না করে, কোন প্রকার সংস্কারই ভাল ফল দিতে পারে না। ("No reform can produce real good unless it is the work of public opinion, and unless the people themselves take the initiative." Buckle) তাহা ছাড়া, রাজতন্ত্র যে কোন সময়েই স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হইতে পারে। রাজতন্ত্রে প্রত্যেক রাজাই যে সুদক্ষ শাসক হইবেন, ইহার কোনও নিশ্চয়তা নাই। রাজার দিক্ হইতে বিবেচনা করিলেও নিয়মতান্ত্রীক রাজতন্ত্র বাঞ্ছনীয় নহে। কারণ, এই ধরণের শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রীসভাই শাসনকাজ পরিচালনা করেন। রাজা শুধু একজন "আড়ম্বরপূর্ণ অপদার্থের" ("magnificent cipher") ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে রাজত্বই করেন, শাসন করেন না। ("He reigns, but does not govern.")

অভিজাততন্ত্র (Aristocracy)—গ্রীক ভাষায় "aristos" কথাটির

অর্থ হইতেছে "সর্বশ্রেষ্ঠ"। দেশের শাসন ব্যবস্থা যখন শিক্ষিত গুণী ব্যক্তিদের পরিচালনাধীন থাকে তখনই তাহাকে অভিজাততন্ত্র বলা হয়। গুণীব্যক্তির সংখ্যা সাধারণতঃ অল্প থাকে; সেইজন্য অভিজাততন্ত্রে শাসকের সংখ্যাও অল্প। কিন্তু যখনই এই ধরণের সরকারে শাসকগণ নিজেদের স্বার্থবুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করিতে আরম্ভ করেন, তখনই ইহা ধনিকতন্ত্রে (oligarchy) পরিণত হয়। এই শাসনব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইতেছে, জনসাধারণ শাসনকাজে অংশগ্রহণ করিবার এবং রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ পায় না। তাহা ছাড়া, শিক্ষিত, জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির সন্ধান লাভ করাও খুবই কঠিন। সেইজন্য অভিজাততন্ত্রে সরকার যে সর্বদাই খুব ভাল হইবে, তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু, যদি প্রকৃতই সৎশাসক দেশে বিরল না হয়, তবে অভিজাততন্ত্র যে একটি উন্নত ধরণের শাসনব্যবস্থা সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই শাসনব্যবস্থা শাসকের সংখ্যার উপরে নহে, গুণের উপরেই গুরুত্ব আরোপ করে। ইহা গণতন্ত্রের উন্মাদনা এবং অবাধ রাজতন্ত্র প্রসূত স্বৈরাচারের সম্ভাবনা প্রতিরোধ করে। ("Aristocracy acts as a tempering and as restraining element. It curbs the passions of democracy and holds in check the absolute tendencies of monarchy.")। মন্টেস্কুর (Montesquieu) মতে "The very soul of it is modernation founded on virtue." আধুনিককালে অভিজাততন্ত্রের স্থান নাই; অভিজাততন্ত্রের স্থান গ্রহণ করিয়াছে গণতন্ত্র। কিন্তু, একথা ঠিক, তথাকথিত গণতন্ত্রে যেখানে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মন্ত্রী দেশের সমগ্র শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন, সেখানে অভিজাততন্ত্রের রেশ খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

গণতন্ত্রের অর্থ (Meaning of Democracy as an ideal)

গণতান্ত্রিক সরকার ও 'গণতন্ত্র' বলিতে একই জিনিষ বুঝায় না। 'গণতন্ত্র' হইতেছে একটি আদর্শ। আদর্শ হিসাবে গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা খুবই ব্যাপক।

গণতন্ত্র বলিতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি জনগণের সরকার। গ্রীক শব্দ "Demos" হইতে "Domocracy" কথাটি আসিয়াছে। "Demos" কথাটির অর্থ হইল, জনসমূহ। সেইজন্য গণতন্ত্র বলিতে আমরা বুঝি, 'জনগণের সরকার, জনগণ কর্তৃক গঠিত সরকার এবং জনগণের জন্য সরকার।' ("Government of the People, by the People and for the People.") কিন্তু, গণতন্ত্র সম্বন্ধে বিভিন্ন চিন্তানায়ক বিভিন্ন রকমের ধারণা পোষণ করিয়াছেন।

অধ্যাপক সিলির (Prof. Seely) মতে গণতন্ত্র হইতেছে এমন একটি সরকার যেখানে প্রত্যেকেরই একটি অংশ আছে ("Government in which everyone has share.")। অধ্যাপক ডাইসির (Prof. Dicey) মতে গণতান্ত্রিক সরকারে শাসকগণ তুলনামূলকভাবে সমগ্র লোকসংখ্যার একটি বিরাট অংশ ("one in which the governing body is a comparatively large fraction of the total population")। লর্ড ব্রাইসের (Lord Bryce) মতে গণতান্ত্রিক সরকারে শাসন কর্তৃত্বের ভার কোন বিশেষ শ্রেণীকে দেওয়া হয় না,—ইহা দেওয়া হয় সামগ্রিকভাবে সমাজের সদস্যদের (…"a form of government in which the ruling power is largely vested not in any one particular class or classes but in the members of the community as a whole.")। উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলি গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা করে। কিন্তু, গণতন্ত্র শুধু এক প্রকার সরকার নয়,—ইহা একটি বিশেষ ধরণের সমাজ-ব্যবস্থা। গণতন্ত্র কোন দেশের অর্থ ব্যবস্থাকেও গঠন করিতে পারে।

গণতান্ত্রিক সরকার বলিতে আমরা বুঝি এমন একটি সরকার যেখানে প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সরকার গঠনে এবং পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে। প্রাচীনকালে গ্রীসে শহর-রাষ্ট্রগুলি প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের (direct democracy) ভিত্তিতে পরিচালিত হইত। বর্তমানে সুইজারল্যাণ্ডে আংশিকভাবে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র আমরা দেখিতে পাই। অন্যান্য সব গণতান্ত্রিক দেশই পরোক্ষ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকগণ দেশের সাধারণ নির্বাচনে ভোট প্রদান করিয়া এবং সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে নিজেদের মতামত প্রকাশ করিয়া সরকার গঠনে ও পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করে। প্রকৃত গণতন্ত্রে জনগণের ইচ্ছা এবং জনমতই দেশের ভাগ্য নির্ধারণ করে; কোনও সরকারই জনসাধারণের ইচ্ছাকে অবহেলা করিতে পারে না। গণতান্ত্রিক সরকারে সকলেরই সমান সুযোগ সুবিধা থাকে এবং প্রত্যেকেই নিজেদের বিচার বুদ্ধি অনুযায়ী সরকার গঠনে ও পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু গণতান্ত্রিক দেশে জনগণের মধ্যে যে সামর্থ্যের পার্থক্য থাকিবে না, তাহা নহে। গণতান্ত্রিক সরকার সকলকেই সমান সুযোগ সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করে যাহাতে নাগরিকদের কর্ম-নৈপুণ্যের বৈষম্য যথাযথ ক্ষেত্রে প্রতিভাত হয়। অধ্যাপক বার্ণসের (Prof. Burns) মতে আদর্শ হিসাবে গণতন্ত্র একই ধরণের লোক লইয়া গঠিত সমাজ নয়,—গণতন্ত্র গঠিত হয় এমন লোক লইয়া যাহারা সকলেই সমান সুযোগ সুবিধার অধিকারী,—যাহাদের প্রত্যেকেই সমাজের

অবিচ্ছেদ্য এবং একান্ত প্রয়োজনীয় অংশ। ("...a society, not of similar persons but of equals, in the sense that each is an integral and irreplaceable part of the whole."—Burns)। সমাজ-জীবন, অর্থনৈতিক জীবন এবং রাজনৈতিক জীবনে সব লোকেরই সমান অধিকার।

অধ্যাপক বার্নস্ গণতন্ত্রের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা অনুধাবন করিলে আমরা শুধু রাজনৈতিক গণতন্ত্রই নয়, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক গণতন্ত্রেরও তাৎপর্য বুঝিতে পারি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন সব নাগরিকেরই সমান অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধা থাকে, সামাজিক ক্ষেত্রেও সেই প্রকার জন্ম এবং অর্থের ভিত্তিতে নাগরিকদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয় না, অথবা তাহাদের মধ্যে সেইজন্য সুযোগ-সুবিধার তারতম্য থাকে না। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলিতে পারি, ভারতবর্ষে অস্পৃশ্যতা আইনতঃ অপরাধ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে এবং ধনী-নির্ধনের মধ্যেও বিভিন্ন সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রে কোন প্রকার তারতম্য করা হইতেছে না। রাজনৈতিক গণতন্ত্র সাধারণতঃ নাগরিকদের সর্বজনীন ভোটাধিকার, আইনের চক্ষে সকলের সমান অধিকার, রাজনৈতিক মতবাদ প্রকাশের সমান স্বাধীনতা, এবং সরকারী কাজে অংশ গ্রহণ করিবার সমান অধিকার,—ইত্যাদি বিষয়ের সহিত জড়িত থাকে। অর্থনৈতিক গণতন্ত্রে সকলেরই অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করিবার সমান অধিকার থাকে। গণতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় শ্রমিক সংগঠনগুলির হাতেই শিল্প পরিচালনার ভার থাকে যাহাতে স্বাধীন, বেসরকারী শিল্প প্রয়াসে (free private enterprise) কোনপ্রকার গোলযোগ অথবা শিল্প বিরোধের (industrial disputes) কারণগুলি দূর করা যায়। কোন কোন চিন্তা-নায়কের মতে অর্থনৈতিক গণতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (economic planning) পরস্পর-বিরোধী কর্মসূচী। অস্ট্রিয়ান অর্থনীতিবিদ্ অধ্যাপক হায়েক (Prof. Hayek) বলেন, "Economic planning is a road to serfdom." কিন্তু ভারতবর্ষে গণতন্ত্রসম্মত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (Democratic Planning) চালু করা হইয়াছে এবং আশা করা যায়, ইহা সফল হইবে। এই তিন প্রকারে গণতন্ত্র পরস্পর নির্ভরশীল। অধ্যাপক জোয়াড়ের (Prof. Joad) মতে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকিলে রাজনৈতিক গণতন্ত্র কখনই সফল হয় না।

আগেই বলা হইয়াছে, আধুনিককালে আমরা পরোক্ষ গণতন্ত্র দেখিতে পাই। পরোক্ষ গণতন্ত্রে প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকগণ ভোট প্রদান করিয়া আইন-সভায় তাঁহাদের প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করেন। প্রতিনিধিগণ বিভিন্ন

রাজনৈতিক দলের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন। নাগরিকগণ যে রাজনৈতিক দলের কর্মপন্থায় আস্থা রাখেন, সেই রাজনৈতিক দলের মনোনীত প্রার্থীর অনুকূলে ভোট প্রদান করেন। নির্বাচন শেষ হইলে যে রাজনৈতিক দল আইন সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বলিয়া বিবেচিত হয়, সেই রাজনৈতিক দলের নেতা মন্ত্রিসভা গঠন করেন। মন্ত্রীসভাকে ইহার কাজের জন্য আইনসভার সদস্যদের নিকট দায়ী থাকিতে হয়। রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে রাষ্ট্রপতি (সাধারণতঃ পরোক্ষভাবে) নাগরিকগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। কোনও রাষ্ট্র প্রকৃতই গণতান্ত্রিক কিনা তাহা বিচার করিবার উপায় আছে। প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকার স্বাধীন মত প্রচারের, বিরোধী দল গঠনের এবং নাগরিকদের সরকারী কাজের সমালোচনা করিবার অধিকার স্বীকার করে। প্রকৃত গণতন্ত্রে জনসাধারণ যে কোন নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে গণতান্ত্রিক সরকারের পরিবর্তন করিতে পারে, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নাগরিকদের সমান সুযোগ-সুবিধা থাকে এবং রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্যপালন সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকেরই ব্যক্তি-স্বাধীনতা সুরক্ষিত থাকে।

ব্যাপক অর্থে গণতন্ত্র হইতেছে একটি রাজনৈতিক পর্দ (a political status), একটি নৈতিক ধারণা (an ethical concept) এবং একটি সামাজিক অবস্থা (a social condition)। গণতন্ত্রে সব লোকেরই সমান অধিকার,—কিন্তু সেইজন্য প্রত্যেকেই সমান নহে—প্রত্যেককে সমান অধিকার প্রদান করিয়া যাহারা শ্রেষ্ঠ তাহাদের খুঁজিয়া লওয়া হয়। ("Democracy in practice is the hypothesis that all men are equal which is used in order to discover who are the best."—C. D. Burns)। তাহা ছাড়া গণতন্ত্রের একটি নৈতিক মূল্য আছে। জনসাধারণের আস্থাভাজন হইয়া সরকারকে কাজ করিতে হয়। গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য "সকলের তরে সকলে আমরা" এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া নাগরিকদের কাজ করিতে হয়। সরকার যদি প্রকৃতই গণতান্ত্রিক হয়, তবে শাসনব্যবস্থার নৈতিক মান অনেক উন্নত হয়।

গণতন্ত্রের গুণ (Merits of Democracy) :

গণতন্ত্র সর্বশ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা বলিয়া পরিগণিত হয়। তাহার প্রধান কারণ হইল, গণতান্ত্রিক সরকারকে সর্বদাই ইহার ক্রিয়াকলাপের জন্য জনসাধারণের নিকট দায়ী থাকিতে হয়। দায়িত্ব না থাকিলে কোন সরকারই উৎকৃষ্ট সরকার বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। গণতন্ত্রে স্বৈরাচারের সম্ভাবনা থাকে না এবং জনগণ কর্তৃক জনগণের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, গণতান্ত্রিক সরকারে জনসাধারণের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হয়। কোন সরকারের উপযোগিতা নির্ভর করে সেই সরকার কতটা ইহার লক্ষ্যে পৌছিতে পারে তাহার উপর। গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধান লক্ষ্য হইতেছে জনসাধারণের সর্বাধিক কল্যাণ করা। গণতন্ত্রের সমর্থকগণ দাবী করেন যে জনসাধারণের সর্বাধিক কল্যাণ একমাত্র গণতান্ত্রিক সরকারই সাধন করিতে পারে। এই প্রকার শাসন ব্যবস্থায় জনসাধারণই সেইগুলি রক্ষণের জন্য সতর্ক থাকে। গণতন্ত্রে প্রত্যেক নাগরিকই তাহার ন্যায্য অধিকার রক্ষা করিবার সুযোগ পায়।

তৃতীয়তঃ, গণতন্ত্রে প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাতে নাগরিকদের রাজনৈতিক শিক্ষা এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশ ক্রমে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিই তখন রাষ্ট্রের একটি একান্ত প্রয়োজনীয় অংশ বলিয়া বিবেচিত হয়। এই মনোভাব নাগরিকদের রাজনৈতিক চেতনা বাড়াইয়া দেয় এবং দেশের শাসনব্যবস্থা উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয়।

চতুর্থতঃ, গণতন্ত্র নাগরিকদের স্বাধীনতা এবং সাম্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে অপরিহার্য। সমাজ হইতে শ্রেণী-সংগ্রাম দূর করা সম্ভবপর হইতে পারে যদি গণতন্ত্রের আদর্শ সম্পূর্ণভাবে লোকে বুঝিতে পারে। সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সব নাগরিককেই সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিয়া গণতান্ত্রিক সরকার মানুষের মধ্যে সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শ সুদৃঢ় করিতে পারে। কোনও বিশেষ দল অথবা শ্রেণী নিজের স্বার্থে গণতন্ত্রে কখনই স্থায়ীভাবে শাসনকাজ চালাইয়া যাইতে পারে না। গণতান্ত্রিক সরকারের অস্তিত্ব নির্ভর করে জনসাধারণের আস্থার উপর।

পঞ্চমতঃ, গণতান্ত্রিক সরকার ব্যক্তি ও সমষ্টি, উভয়ের পক্ষেই কল্যাণ-কারক। নাগরিকগণ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় কর্তব্যবোধে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হয়। এইদিক হইতে বিবেচনা করিলে গণতন্ত্রের বিশেষ শিক্ষামূলক মূল্য আছে। গণতন্ত্র জনসাধারণকে শিক্ষিত করে, তাহাদের মানসিক বৃত্তিগুলি উন্নত করে, সরকারী কাজে তাহাদের উৎসাহ বাড়াইয়া দেয় এবং শাসনকাজে তাহাদের অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ দিয়া স্বদেশপ্রেম বাড়াইয়া দেয়। রাজনৈতিক ভোটাধিকার লাভ করিলে মানুষের মনুষ্যত্ব বিশেষভাবে সম্মানিত হয়,—কারণ, এই অধিকারের ফলে তাহার উপর যে কর্তব্য আরোপ করা হয়, ইহা তাহাকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করে। ("The manhood of the individual is dignified by his political enfranchisement and he is usually raised to a higher level

by the sense of duty which it throws upon him."—Lord Bryce.) সব রকম সরকারই মানুষের শিক্ষার বাহক; কিন্তু শ্রেষ্ঠ শিক্ষা হইতেছে নিজেকে শিক্ষিত করা। সেইজন্য শ্রেষ্ঠ সরকার হইতেছে নিজের পরিচালিত সরকার এবং তাহাই গণতন্ত্র। ("All government is a method of education, but the best education is self-education; therefore, the best government is self-government which is democracy."—C. D. Burns.)

ষষ্ঠতঃ, গণতন্ত্র বৈপ্লবিক গোলযোগ হইতে অনেক পরিমাণে মুক্ত থাকে। কারণ, জনসাধারণ জানে, সরকার তাহাদের নিজেদেরই সৃষ্টি এবং মন্ত্রীমণ্ডলী ও সরকারী কর্মচারীগণ জনসাধারণের সেবকমাত্র। সেইজন্য গণতন্ত্রে আইন ও শৃংখলা বজায় থাকে। জনপ্রিয় সরকারে এমন ব্যবস্থা থাকে যাহার ফলে জনসাধারণের ইচ্ছা ও আশা আকাংখা সরকার জানিতে পারে এবং সেইভাবে নিজের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। ইহাই জনপ্রিয় সরকারের সার্থকতা এবং এইজন্যই জনপ্রিয় সরকার হিসাবে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে আমরা শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা বলিতে পারি। জনপ্রিয় সরকারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ইহার দায়িত্বশীলতা। এই দায়িত্বশীলতার জন্যই গণতন্ত্র শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা। ("The value of popular government is that it provides the means through which the wishes of the people may be known and felt, and that thus the conduct of a state may be brought into conformity thereto.")

গণতন্ত্রের দোষ (Demerits of Democracy):

গণতন্ত্রের সমালোচনা করিয়া বলা হয় যে ইহা অযোগ্যতার পরিচালনাধীন। ("Democracy is the cult of incompetence.) এরিস্টটল গণতন্ত্রকে বিকৃত শাসনব্যবস্থারূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন। Ausburg'-এর একটি রূপক-চিত্রে গণতন্ত্রকে এক হল্লাকরী জনতা কর্তৃক পরিবৃত মাতাল, Cleon-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। Cleon ছিলেন প্রাচীন এথেন্সের একজন জননেতা। এই চিত্রাংকণ খুবই অতিরঞ্জিত সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা অস্বীকার করা যায় না যে গণতন্ত্রে অনেক নাগরিকই খুব বেশী উৎসাহ বোধ করে না। গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রধান সমালোচনা হইল, ইহা একদল অজ্ঞ এবং অযোগ্য ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত হয়। কিন্তু এই সমালোচনা যে সর্বদাই সত্য তাহা নহে। গণতন্ত্রের পরিচালনভার বর্তমানকালে প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং তাহাদের মধ্য হইতে গঠিত মন্ত্রীসভার উপর ন্যস্ত হয়।

তাহারা প্রত্যেকেই যে অযোগ্য এবং অজ্ঞ তাহা নহে। যদি গণতন্ত্র অযোগ্য ব্যক্তি কর্তৃক শাসিত হইত, তবে ইংলণ্ড, আমেরিকা এবং ভারতবর্ষে আমরা গণতন্ত্রের সাফল্য দেখিতে পাইতাম না। গণতন্ত্র মানুষের ব্যক্তিত্ব-বিকাশ এবং রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধির সহায়ক,—প্রত্যেকেই যেখানে বিভিন্ন সমান অধিকার ভোগ করে, সেখানে যোগ্যতার সমাদর হইবেই। গণতন্ত্রের আর একটি দোষ হইতেছে, ইহা শাসকের গুণ অপেক্ষা সংখ্যার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে। ("Democracy is a government by the poorest, the most ignorant, the most incapable, who are necessarily tbe most numerous.)"

দ্বিতীয়তঃ, মেইন প্রমুখ রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণ মনে করেন, গণতন্ত্রে স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। অনেক সময়েই গণতান্ত্রিক সরকারকে জনসাধারণের বিপ্লবাত্মক ক্রিয়াকলাপের ফলে ক্ষমতাচ্যুত হইতে দেখা গিয়াছে।

তৃতীয়তঃ, গণতান্ত্রিক সরকারের কর্মদক্ষতাও যে খুব বেশী থাকে তাহা নহে। গণতন্ত্র উৎকৃষ্টতর সরকার অথবা অধিকতর স্বাধীনতা কোনটিই প্রতিষ্ঠা করে না। ("Democracy insures neither better government, nor greater liberty.")। গণতান্ত্রিক সরকারের অজ্ঞ ভোটারগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। সর্বদাই যে উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচিত হন, তাহা নহে। তাহা ছাড়া, মুষ্টিমেয় কয়েকজন নির্বাচিত প্রতিনিধিই (সাধারণতঃ, মন্ত্রীসভা) পার্লামেণ্টারী শাসন-ব্যবস্থায় প্রকৃত শাসন ক্ষমতা কার্যকরী করেন। আইনসভার ভিতরেও সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সংখ্যাধিক্যের জোরে সংখ্যালঘুদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অনেক আইন প্রণয়ন করিতে পারে। ইহাতে দেশের জনসাধারণের একটি অংশের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়।

চতুর্থতঃ, গণতন্ত্রে শাসকগণ যে সর্বদাই শাসিতের নিকট প্রকৃতপক্ষে দায়ী থাকেন তাহা নহে। যদিও শাসন ব্যবস্থা অনুযায়ী পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রে মন্ত্রীসভা নিজের কাজের জন্য আইনসভার সদস্যগণের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে জনসাধারণের কাছে দায়ী, তবুও শুধুমাত্র দলীয় রাজনীতি-প্রসূত সংখ্যাধিক্যের জোরে মন্ত্রীগণ এই দায়িত্বের সম্পূর্ণ মর্যাদা অনেকক্ষেত্রেই দেন না। এই দায়িত্বশীলতা সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী করিবার মত উপযুক্ত পন্থারও অভাব দেখা যায়।

পঞ্চমতঃ, অধ্যাপক মেইন, লেকি প্রমুখ চিন্তানায়কগণের মতে গণতন্ত্র সাংস্কৃতিক উন্নতির এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার অগ্রগতির প্রতিবন্ধক। কলা,

সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের দিকে গণতান্ত্রিক সরকারগুলি প্রায়ই উদাসীন। ("Democracies are indifferent, if not hostile, to the growth of art, literature and science")। সাধারণ লোক লইয়াই গণতন্ত্র গঠিত হয়। এই রকম বলা হয় যে সাধারণ লোকের ত্রুটিগুলি সমস্ত সামাজিক জীবনকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে এবং অসাধারণ ব্যক্তিদের গুণগুলি বিনাশ করে। ("Common man's defects corrupt all social life and destroy the excellences of the exceptional.")। গণতন্ত্রে সভ্যতার স্তর খুবই সাধারণ।

ষষ্ঠতঃ, গণতান্ত্রিক সরকারের ব্যয় বাহুল্য খুবই বেশী। গণতান্ত্রিক সরকারের অর্থ আসে অনির্দিষ্ট জনমণ্ডলীর নিকট হইতে, এবং সেক্ষেত্রে ব্যয় সংকোচনের জন্ম কেহই চেষ্টা করে না। তাহা ছাড়া, গণতন্ত্রে জনসাধারণের নিয়মানুবর্তিতাও অল্প থাকে।

সপ্তমতঃ, অধ্যাপক লাস্কি মনে করেন, গণতান্ত্রিক সরকার মূলতঃ ধনতান্ত্রিক। কারণ, যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় শাসক প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক সরকারের পরিচালনা করিয়া থাকেন, তাহারা সর্বদাই নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থ দ্বারা প্রণোদিত হইয়া আইন প্রণয়ন করিয়া থাকেন। যে সমাজে রাষ্ট্র একটি বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত হয় এবং যে রাষ্ট্রে জনসাধারণের মধ্যে থাকে অর্থনৈতিক অসাম্য,—সেই সমাজে রাজনৈতিক সাম্যের কোনই সার্থকতা নাই। তাহা ছাড়া, শুধু প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার প্রথাটিও যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ। একজন লোক কখনই অপরের প্রতিনিধি হিসাবে ঠিকভাবে কাজ করিতে পারে না।

সর্বশেষে, গণতান্ত্রিক সরকারের আইন সভায় আমরা কমিটি প্রথা (committee system) দেখিতে পাই। কোন আইন প্রণীত হইবার পূর্বে বিভিন্ন কমিটি একটি বিলের খুঁটিনাটি বিষয় ও গুরুত্ব পর্যালোচনা করে। তাহাতে আইন প্রণীত হইতে যথেষ্ট দেরী হয় এবং বিশেষতঃ, রাষ্ট্রে জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হইলে ইহা বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করে।

গণতান্ত্রিক সরকারের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু গণতন্ত্রের সমালোচকগণ যেরূপ কঠোরভাবে গণতন্ত্রের সমালোচনা করিয়াছেন তাহা কখনই সমর্থনযোগ্য নহে। এখনও গণতন্ত্রই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা। বিভিন্ন দেশে (যেমন, মিশর, ইরাক ইত্যাদি) রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ হইয়াছে। অবশ্য ইহাদের সব রাষ্ট্রই যে গণতান্ত্রিক তাহা নহে। তবে জনসাধারণের হাতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা অর্পণ করা উচিত, গণতন্ত্রের এই মূলনীতিকে সব রাষ্ট্রই সম্মান করে। তবুও একথা ঠিক, বর্তমানে বিশ্বে কোন রাষ্ট্রই

সম্পূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক নহে। বিংশ শতাব্দীতে গণতন্ত্রের নিরাপত্তার জন্ম দুইটি বিশ্বযুদ্ধ হইয়া গেল, কিন্তু, কোন দেশেই প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল না। প্রকৃতভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা খুব কঠিন। জনসাধারণের যদি উপযুক্ত বুদ্ধি, কর্মোদ্যোগ এবং রাজনৈতিক সচেতনতা না থাকে, তবে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় না। ("It is the most rational in principle, but the most difficult in practice. Just as it seeks to achieve the greatest good, so it demands of the people the largest amount of intelligence, tact, initiative and political consciousness.")

গণতন্ত্রের সাফল্যের উপায় (conditions of the success of Democracy)—অধ্যাপক জন্ স্টুয়ার্ট মিলের মতে জনসাধারণের রাজনৈতিক সচেতনতা, বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতার উপর গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে। তিনি মনে করেন, যদি গণতন্ত্রকে সফল করিতে হয় তবে "(১) জনসাধারণের গণতন্ত্রকে গ্রহণ করিবার মত ইচ্ছা ও ক্ষমতা রাখিতে হইবে; (২) তাহাদিগকে গণতন্ত্র বজায় রাখিবার জন্ম সংগ্রাম করিতে হইবে এবং (৩) তাহাদিগকে নিজেদের কর্তব্য পালনের ইচ্ছা ও ক্ষমতা রাখিতে হইবে এবং যদি তাহাদের অধিকারগুলি বিপদের সম্মুখীন হয় তবে সেইগুলি রক্ষা করিতে হইবে।"

উপরোক্ত সর্তগুলি ছাড়া গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্ম নিম্নলিখিত সর্তগুলি থাকা উচিত। প্রথমতঃ, জনমতকে সর্বদাই সতর্ক থাকিতে হইবে। চিরন্তন সতর্কতাই স্বাধীনতার মূল্য। জনমত যে শুধু সতর্কই থাকিবে তাহা নহে। জনমত খুব দৃঢ় হওয়া চাই যাহাতে ইহা সরকারের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, জনসাধারণের নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ থাকিতে হইবে। নাগরিকদের আলস্য এবং উদাসীনতা গণতান্ত্রিক জীবনের বিকাশের প্রতিবন্ধক। তৃতীয়তঃ, সংখ্যালঘুদের ন্যায়-সংগত দাবীগুলি যেমন সংখ্যাগরিষ্ঠদের মানিয়া লইতে হইবে, সেইপ্রকার সংখ্যালঘুদেরও উচিত আইনসভায় সংখ্যাধিক্যের অভিমত অনুযায়ী প্রণীত আইন ও বিধি-নিষেধগুলি পালন করা। চতুর্থতঃ, অর্থনৈতিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা না হইলে কখনই গণতন্ত্র সফল হয় না। জনসাধারণের মধ্যে আয় ও ধনের বৈষম্য ক্রমশঃ কমাইয়া ফেলা উচিত এবং সকলকেই সমান অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা দেওয়া উচিত,—তবেই প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইবে। জনসাধারণের যাহা কিছু ভাল এবং সুন্দর তাহার যাহাতে উপযুক্ত বিকাশ হয়, সেইদিকে সরকারের লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

একনায়কতন্ত্র (Dictatorship) :

একনায়কতন্ত্রে একজন নেতার হাতে দেশের শাসন ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়। একনায়কতন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্র এক জিনিষ নহে। একনায়কতন্ত্রে শুধুমাত্র একজন নায়কের উপর দেশের শাসনভার ন্যস্ত থাকে, তাহাই নহে,—এই প্রকার শাসন ব্যবস্থায় সাধারণতঃ একজাতি ও একরাষ্ট্র থাকে। একনায়কতন্ত্রে রাজনৈতিক দল মাত্র একটিই থাকে এবং সেই দলের নেতাই নায়ক নির্বাচিত হন। একজাতি, একরাষ্ট্র এবং একনেতা লইয়া গঠিত রাষ্ট্রকেই "Totalitarian State" বলা হয়। বর্তমানে সংযুক্ত আরব যুক্তরাষ্ট্রে আমরা আরবজাতিকে কর্ণেল নাসেরের একক নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লইতে দেখিতেছি। স্পেন এবং পর্তুগালেও আমরা একনায়কতন্ত্র দেখিতে পাই। হিটলারের আমলে জার্মানী এবং মুসোলিনীর আমলে ইটালী একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অধীন ছিল। একনায়কতন্ত্র মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র সর্বশক্তিমান এবং রাষ্ট্রের যিনি প্রধান, তিনিই রাষ্ট্রের সব রকম শক্তি প্রয়োগ করেন এবং নিজের ইচ্ছাকেই সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য একনায়কতন্ত্রে দলের নেতা নাগরিক জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ন্ত্রিত করেন।

একনায়কতন্ত্রে শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের সহযোগিতা এবং সক্রিয় ভূমিকা থাকে না। জনসাধারণের পক্ষ হইতে একনায়কই নিজের ইচ্ছানুযায়ী শাসন কাজ পরিচালনা করেন। একনায়কতন্ত্রের বিশেষ গুণ হইতেছে তিনটি। প্রথমতঃ, গণতন্ত্র অপেক্ষা একনায়কতন্ত্র অনেক বেশী কর্মকুশল। একনায়কের ইচ্ছার উপরেই সব কিছু নির্ভর করে বলিয়া তিনি সহজেই শাসননীতি নির্ধারণ করিয়া তাহা কার্যকরী করিতে পারেন। বহুজনের মতামত প্রয়োজন হয় না বলিয়া সরকারের বিভিন্ন নীতি সুদৃঢ়ভাবে কার্যকরী করা একনায়কের পক্ষে সম্ভবপর। দ্বিতীয়তঃ, একনায়কতন্ত্রে সরকারী কাজ অতি দ্রুত সম্পন্ন হয়। ইহাতে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণও অত্যন্ত অল্প। তৃতীয়তঃ, গণতন্ত্রে সাধারণ মানুষ সরকারী কাজে অংশ গ্রহণ করিলেও সরকারী কাজের বিভিন্ন দিক্ সম্বন্ধে খুবই অজ্ঞ। একনায়কতন্ত্রে সাধারণ লোকের শাসনকাজে কোনও হাত থাকে না। যদি একনায়কের উদ্দেশ্য সাধু হয় এবং তিনি যদি বিশেষ কর্মক্ষম থাকেন তবে দেশের শাসনব্যবস্থা ভালভাবেই পরিচালিত হয়। একনায়কতন্ত্রে জাতীয় স্বার্থসংরক্ষণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করা হয়। ইতিহাসের দিকে তাকাইলে আমরা দেখিতে পাই একনায়কতন্ত্রে যে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ থাকে না তাহা নহে। রাশিয়ায় একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছে। কিন্তু, সেখানে একনায়ক উত্তরাধিকারসূত্রে নির্বাচিত হন না, দলীয় নেতাই একনায়ক হন। আধুনিককালের গণতন্ত্রেও সরকার পক্ষের দলীয় নেতার নির্দেশেই সব কিছু পরিচালিত হয়। একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রধান সমালোচনা হইল, ইহা নাগরিকদের বুদ্ধি-বৃত্তি বিকাশের পক্ষে প্রধান অন্তরায়। নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব-বিকাশ প্রতিরোধ করিয়া একনায়কতন্ত্র ব্যক্তি-স্বাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত করে। দ্বিতীয়তঃ, একনায়কতন্ত্রে উগ্র জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয়। উগ্র জাতীয়তাবাদই একটি রাষ্ট্রকে অপর রাষ্ট্রের উপর কর্তৃত্ব করিতে প্রণোদিত করে। ইহাতে আন্তর্জাতিক শান্তি বিনষ্ট হয়। ইটালী এবং জার্মানীর উগ্র জাতীয়তাবাদের ইহা একটি প্রধান দোষ ছিল এবং এই কারণেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অনিবার্য হইয়া পড়ে। তৃতীয়তঃ, দেশের নাগরিকদের বিভিন্ন ধরণের স্বার্থ যে একনায়ক সর্বদা বুঝিতে পারেন, তাহা নহে। তাহাছাড়া, গণতন্ত্র যে সর্বদাই একনায়কতন্ত্র অপেক্ষা কম কর্মকুশল তাহা নহে।

গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের পার্থক্য (Distinction between Democracy and Dictatotship) : গণতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্রের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। গণতন্ত্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে বিশ্বাসী,—কিন্তু, একনায়কতন্ত্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বিশ্বাস করে না। একনায়কতন্ত্র সমগ্র জাতি এবং রাষ্ট্রকে একদৃষ্টিতে দেখেনা। রাষ্ট্রের অধিনায়কই সর্বেসর্বা। দ্বিতীয়তঃ, একনায়কতন্ত্রে সংখ্যালঘুগণ কখনই নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ করিতে পারে না। গণতন্ত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থাকে এবং প্রত্যেক দলই সরকার গঠন করিবার চেষ্টা করিতে পারে। গণতন্ত্রে বিরোধী দলগুলির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিরোধী দলগুলি সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের সমালোচনা করিয়া দেশের শাসনব্যবস্থা যাহাতে সুন্দরভাবে পরিচালিত হয় সেইজন্য চেষ্টা করিতে পারে। কিন্তু, একনায়কতন্ত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থাকে না,—শুধু একটি দলই থাকে। একনায়কতন্ত্রে শুধু মাত্র একজন ব্যক্তির শাসনব্যবস্থা হইতে পারে ; যেমন, হিটলারের আমলে জার্মাণীতে হইয়াছিল। আবার, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে আমরা একদলীয় একনায়কতন্ত্র দেখিতে পাই। কোন কোন দেশে সামরিক নেতৃত্বে একনায়কতন্ত্র দেখা যায় ; যেমন, আমরা কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত পাকিস্থানে দেখিয়াছিলাম। সরকারের সমালোচনা করিবার কাহারও অধিকার থাকে না বলিয়া জনসাধারণের মতের বিরুদ্ধেও সরকার নিজের নীতি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। গণতন্ত্রে শাসনব্যবস্থায় প্রত্যেকেরই প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে কিছু কিছু অবদান থাকে এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়েই দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। কিন্তু, একনায়কতন্ত্রে খুব কঠোরভাবে

দেশের শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এজন্য জনমতকে অনেকক্ষেত্রে পদদলিত করা হয়। গণতন্ত্রেও যে মন্ত্রীসভার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় না তাহা নহে। কিন্তু, গণতন্ত্রে দেশের শাসকগণকে আইনসভায় জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের কাছে নিজেদের কাজের জন্য দায়ী থাকিতে হয়। দায়িত্বশীলতাই সরকারের উৎকর্ষতা সূচিত করে। একনায়কতান্ত্রিক সরকারকে কাহারও নিকট নিজের কাজের জন্য জবাবদিহি করিতে হয় না। কর্মকুশলতার দিক হইতে বিচার করিলে একনায়কতন্ত্র অধিকতর কর্মকুশল হইতে পারে যদি একনায়কের উদ্দেশ্য সর্বদাই সাধু হয়। সরকারের ভাল-মন্দ পরিচয় নির্ভর করে ইহা কতটা রাষ্ট্রের প্রকৃত লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারে তাহার উপর। জনসাধারণের সর্বাধিক কল্যাণ যাহাতে অর্জিত করা যায় সেজন্য আপ্রাণ চেষ্টা করাই উৎকৃষ্ট সরকারের লক্ষণ। সেইদিক হইতে বিচার করিলে গণতন্ত্রের মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক শাসন (constitutional rule) একনায়কতন্ত্র অপেক্ষা অধিকতর ভাল।

গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ (Future of Democracy) :

প্রথম মহাযুদ্ধের পর যখন জার্মানীতে ফ্যাসীবাদ এবং ইটালীতে নাৎসীবাদের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন হইতেই সাধারণ মানুষ গণতন্ত্রের উপর আস্থা হারাইতে থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যদিও ফ্যাসীবাদ এবং নাৎসীবাদের ধ্বংস হইয়াছে, তবুও যুদ্ধোত্তরকালে সাম্যবাদী একনায়কতন্ত্রের প্রসার ঘটিয়াছে। এইজন্য স্বভাবতঃই একটি প্রশ্ন জাগে, গণতন্ত্র টিঁকিয়া থাকিবে কিনা। তাহা ছাড়া, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের একনায়কতন্ত্র অনেকদিন হইতেই জনস্বার্থের অনুকূল হওয়ায় সাধারণ মানুষেরও একনায়কতন্ত্রের কর্মকুশলতা সম্বন্ধে ভাল ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। বর্তমানে আমরা সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের (United Arab Republic) এবং নবগঠিত ইরাক রাষ্ট্রে সামরিক একনায়কতন্ত্রের অভ্যুদয় দেখিতে পাইতেছি। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই যে চিরকাল টিঁকিয়া থাকিবে এরকম কোনও নিশ্চয়তা নাই বলিয়াই বর্তমানে সকলে ধারণা করিতেছে।

কিন্তু, একথা মনে রাখিতে হইবে, একনায়কতন্ত্র একটি সাময়িক শাসন ব্যবস্থা মাত্র। জার্মানী এবং ইটালিতে একনায়কতন্ত্র চিরস্থায়ী হয় নাই। গণতন্ত্রের অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি থাকিতে পারে। কিন্তু, সেইগুলি অনতিক্রমণীয় নহে। গণতন্ত্রই হয়ত শ্রেষ্ঠ সরকার নহে। কিন্তু, অতীতের দিকে তাকাইলে আমরা দেখিতে পাই, গণতন্ত্রের একটি স্থায়ী মূল্য আছে। আজ আমরা গণতন্ত্রের সে সকল ত্রুটি বিচ্যুতি দেখিতে পাই, অতীতে ইহা অপেক্ষা

অনেক বেশী ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল। ("In comparison with Governments in the past, Democracy has justified itself. Things may be bad to day; but they were worse yesterday"). একনায়কতন্ত্রে বাহিরের চাপে মানুষ পরিচালিত হয়, কিন্তু মানুষ গণতন্ত্রে নিজের বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী চলাফেরা করিবার সুযোগ পায়। গণতন্ত্র কথনই একনায়কতন্ত্রের বিকল্প সরকার নয়। গণতন্ত্রে সাধারণ মানুষ ভুল করিলেও নিজেই চলার পথে অগ্রসর হয়। কিন্তু, একনায়কতন্ত্রে তাহাকে চালনা করিতে হয় এবং তাহা করিবার দায়িত্ব একনায়কের। ("The common man in a Democracy may go wrong, but he goes; the subservient in an authoritarian rule waits to be pushed")। একনায়কতন্ত্রে শুধু যে ব্যক্তিস্বাধীনতাই ক্ষুণ্ণ হয় তাহা নহে, শাসকও ক্ষমতা-মদে মত্ত হইয়া দেশের শাসনব্যবস্থাকে পদদলিত পূর্ণ করে। ইতিহাসের পাতায় আমরা দেখিতে পাই, গণতন্ত্রের হয়ত সাময়িক বিলুপ্তি ঘটিয়াছে, কিন্তু ইহার পুনরুজ্জীবনও ঘটিয়াছে। একনায়কতন্ত্রের যতই কর্মকুশলতা থাকুক না কেন, দায়িত্বশীল গণতান্ত্রিক সরকারই যে সকলের কাম্য, সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। একমাত্র গণতন্ত্রই মানুষের স্বাধীনতা বজায় রাখিবার একমাত্র সরকার, সেজন্য গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার নহে। পূর্বে ধারণা ছিল, সমাজতান্ত্রিক দেশ হইলেই একনায়কতন্ত্র অনুযায়ী সরকার গঠিত হইবে। কিন্তু, বর্তমানে এই ধারণার কিছু পরিবর্তন হইয়াছে। ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র (democratic socialism) প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা চলিতেছে। ইহা হইতেই বুঝা যায়, অধিকাংশ রাষ্ট্রই আজকাল গণতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য দেখাইবার চেষ্টা করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্র আজকাল একটি নৈতিক ধারণায় (ethical concept) পরিণত হইয়াছে। যাহা কিছু অগণতান্ত্রিক তাহাই জনসাধারণ পরিত্যাগ করিতে চায়। সুতরাং গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ তমসাবৃত নহে।

মন্ত্রীসভা-চালিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারের পার্থক্য

(Distinction between Cabinet or Parliamentary form of Government and the Presidential or Non-Parliamentary form of Government):

মন্ত্রীসভা-চালিত সরকারে শাসনবিভাগের সব ক্ষমতা আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল একটি মন্ত্রীসভার উপর ন্যস্ত থাকে। এই প্রকার সরকারের একজন নামেমাত্র প্রধান (Titular head) থাকেন। ইংলণ্ডের রানী বর্তমানে এইরূপ

একটি সরকারের শাসনবিভাগের প্রধান (executive head)। আবার, কোনও কোনও ক্ষেত্রে মন্ত্রীসভা চালিত সরকারে শাসনবিভাগের প্রধান একজন রাষ্ট্রপতি হইতে পারেন; যেমন ভারতবর্ষে রাষ্ট্রপতিই শাসনবিভাগের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। আইনের দিক হইতে শাসনবিভাগের যিনি নামেমাত্র প্রধান তিনিই সমুদয় ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু, তাঁহার পক্ষে মন্ত্রীসভাই সমুদয় কাজ করে। আইনসভায় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে যাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ দল গঠন করেন তাঁহাদের নেতাকেই রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য আমন্ত্রণ করেন। তিনি নিজের দলের সহকর্মীদের মধ্য হইতে অথবা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে একই রাজনৈতিক মত পোষণ করে এই রকম অন্য কোনও দলের সদস্যদের মধ্য হইতে নিজের মন্ত্রীসভা গঠন করেন। এই মন্ত্রীসভা ইহার সমুদয় কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকে এবং আইনসভার সদস্যগণ মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করিলে মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করে। মন্ত্রীসভা-চালিত সরকারকে এইজন্য দায়িত্বশীল সরকার বলা হয়। মন্ত্রীসভা-চালিত সরকারের আইনসভা এবং মন্ত্রীসভা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে কমন্সসভা মন্ত্রীসভার সৃষ্টি করে; কিন্তু মন্ত্রীসভাও কমন্সসভা ভাংগিয়া দিতে পারে। ("The British House of Commons makes the ministry, but the ministry can unmake the House)"। এই প্রকার সরকারে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ (Separation of Powers) করা হয় না। পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের পশ্চাতে এই ধরনের শাসনব্যবস্থায় প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রীসভার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ("Cabinet dictatorship thrives behind Parliamentary Democracy)। পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থার ইদানীংকালে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাইতেছে। তাহা হইতেছে সরকারের এককেন্দ্রিকতার দিকে ক্রমবর্ধমান ঝোঁক। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে আমরা এককেন্দ্রিক সরকার দেখিতে পাই। ভারতবর্ষে সরকারের কাঠামোর দিক হইতে বিচার করিলে যদিও ইহা যুক্তরাষ্ট্রীয়, তবুও কর্মক্ষেত্রে ইহার এককেন্দ্রিকতার দিকে একটি ঝোঁক দেখা যাইতেছে।

অপরপক্ষে রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারে বংশানুক্রমে কেহই রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে থাকেন না। এই ধরনের সরকারে রাষ্ট্রপতি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হয়। এইপ্রকার শাসনব্যবস্থায় লিখিত শাসনতন্ত্র থাকে এবং শাসনতন্ত্র অনুযায়ী শাসনবিভাগ (executive) আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল অথবা ইহার কর্তৃত্বাধীন নহে। আমেরিকায় আমরা এই ধরনের শাসনব্যবস্থা দেখিতে পাই। এই ধরণের শাসনব্যবস্থায় সরকারের বিভিন্ন ক্ষমতার

স্বাতন্ত্র্যবিধান করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি চারি বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন এবং তিনি নিজের ইচ্ছানুযায়ী একটি মন্ত্রীসভা গঠন করিয়া শাসনবিভাগের কাজ চালান।

এই ধরণের শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রীসভার সভ্যগণ আইনসভার (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেস) সদস্য নহেন এবং ইহার নিকট নিজেদের কাজের জন্য দায়ী নহেন। রাষ্ট্রপতি তাঁহাদের নিয়োগ করেন এবং প্রয়োজন হইলে তাঁহাদের বরখাস্ত করিতে পারেন। মন্ত্রীসভা নিজের কাজের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছেই দায়ী থাকে। যদিও রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা হয়, তবুও শাসনবিভাগ ও আইনসভা পরস্পর হইতে বিভিন্ন নহে। যেমন, সরকারের শাসনবিভাগ যে বাজেট অনুযায়ী টাকা খরচ করে সেই বাজেট অনুমোদন করিবার ক্ষমতা হইতেছে আইনসভার। রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারগুলির অধিকাংশই যুক্তরাষ্ট্রীয়। এইগুলির লিখিত শাসনতন্ত্র থাকে। এবং ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা হয়। রাষ্ট্রের প্রধান যদি শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী মারাত্মক অপরাধ করেন এবং শাসনতন্ত্র অমান্য করেন, তবে একটি বিচারব্যবস্থার সাহায্যে তাঁহাকে রাষ্ট্রপতি পদ হইতে সরাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। এই ধরনের শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি শুধু নামেমাত্র রাষ্ট্রের প্রধান নহেন। রাষ্ট্রের প্রধান জনগণই নির্বাচিত করেন এবং তিনি প্রকৃতই দেশের শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেন। কিন্তু, রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারে একনায়কতন্ত্র অপেক্ষা গণতন্ত্রকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি (Nature of federal state) :

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রে আমরা জাতির ঐক্য ও সার্বভৌমত্ব এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির মধ্যে একটি সংহতির প্রচেষ্টা দেখিতে পাই। ("A federal constitution attempts to reconcile the apparently irreconcilable claims of national sovereignty and state sovereignty.") ভৌগোলিক অবস্থান, রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ এবং জাতীয়তাবোধ হয়ত কয়েকটি রাষ্ট্রের সংঘ করিবার অনুকূল হয়। কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে নিজের সত্তা বিসর্জন দিতে রাজী নাও থাকিতে পারে। এইরকম ব্যবস্থায় বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে একটি বৃহত্তর সংঘ (Union) গঠন করিবার প্রেরণা আসিতে পারে। এই বৃহত্তর সংঘে প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে, অথচ সার্বভৌম ক্ষমতা একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের হাতে অর্পণ করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সরকারের বিভিন্ন ক্ষমতা দুইভাগে বিভক্ত হয়। প্রত্যেকটি রাজ্যই (যেগুলি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে) নিজের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের সহিত জড়িত বিষয়গুলি

রা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত হয়। প্রত্যেক রাজ্যের এবং কারের ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় একটি লিখিত এবং সাধারণতঃ অনমনীয় শাসনতন্ত্রের প্রয়োজন হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কাঠামোর মূল ভিত্তি হইতেছে এই লিখিত শাসনতন্ত্র। সেজন্য এই ধরনের শাসনব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক রাজ্য সরকারকে স্থানীয় শাসন ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়ায় এবং দেশের সামগ্রিক স্বার্থের সহিত জড়িত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত সম্পূর্ণ ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে প্রদান করায় একদিকে যেমন জাতীয় ঐক্য বজায় থাকে, অপরদিকে তেমন সমগ্র রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা ও জাতীয় ঐক্য দৃঢ় ও সংহত করিবার পক্ষে ইহা বিশেষ অনুকূল হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা লিখিত শাসনতন্ত্রই নির্ধারণ করে। দেশের সামগ্রিক ঐক্য এই জাতীয় শাসনব্যবস্থায় সম্পূর্ণ অটুট থাকে। প্রত্যেক নাগরিকই সাধারণতঃ (ভারতের ক্ষেত্রে নহে) দ্বৈত নাগরিকতা লাভ করিয়া থাকে। অর্থাৎ, প্রথমতঃ, তিনি নিজের স্থানীয় রাজ্যের নাগরিক এবং দ্বিতীয়তঃ, তিনি সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। প্রত্যেক নাগরিকই (তিনি যে কোন রাজ্যের অধিবাসী হউন না কেন) সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের অপরিহার্য অংশরূপে বিবেচিত হওয়ায় এবং প্রত্যেক রাজ্যের যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার উচ্চতর কক্ষে (আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে) সমান প্রতিনিধিত্ব থাকায় জাতীয় ঐক্য বজায় থাকে। যদিও ভারতের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার উচ্চতর কক্ষে বিভিন্ন রাজ্যের সমান প্রতিনিধিত্ব নাই, তবু ভারতের ক্ষেত্রে জাতীয় ঐক্যের পথ মোটেই সংকুচিত হয় নাই, বরং প্রশস্ত হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের সাহায্যে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে ঐক্যবোধ প্রসারিত হয়। অথচ যুক্তরাষ্ট্রে দেশের সার্বভৌম ক্ষমতার কোনও বাঁটোয়ারা হয় না। যুক্ত-রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব লিখিত শাসনতন্ত্র অনুযায়ী অটুট থাকে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক স্বার্থে ইহার সার্বভৌমত্ব সবগুলি রাজ্যসরকারই স্বীকার করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যুক্তরাষ্ট্র হইতেছে জাতীয় ঐক্য ও ক্ষমতা এবং রাষ্ট্রীয় অধিকারের মধ্যে মিলন ঘটাইবার প্রয়াসে একটি রাজনৈতিক কৌশল। ("A federal state is a political contrivance intended to reconcile national unity and power with the maintenance of state rights.")। যদি কখনও বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে কোন সংঘাতের সৃষ্টি হয়, তবে ইহার মীমাংসা করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে একটি স্বাধীন বিচার-ব্যবস্থা থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of a federal state) :

যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে আমরা ইহার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিতে পাই :—

প্রথমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় একসংগে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলির সহাবস্থান (co-existence of governments) থাকে। উভয় সরকারই শাসনতন্ত্র হইতে ইহাদের ক্ষমতা লাভ করিয়া থাকে এবং উভয়েরই কাজের পরিধি শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের মধ্যে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। দেশের সামগ্রিক স্বার্থের সহিত জড়িত বিষয়গুলি সম্পর্কিত সমুদয় ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রদান করা হয়। স্থানীয় শাসন ব্যাপারে এবং স্থানীয় স্বার্থের সহিত জড়িত বিষয়গুলি সম্পর্কিত সমুদয় ক্ষমতা রাজ্যসরকারগুলিকে প্রদান করা হয়।

তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র লিখিত এবং অনমনীয় থাকে। শুধু তাহাই নহে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রের প্রাধান্যই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র অনমনীয় থাকে যাহাতে কেন্দ্রীয় সরকার অথবা কোন রাজ্যসরকার নিজের ইচ্ছানুযায়ী সহজে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করিয়া নিজের কর্ম-পরিধির পরিবর্তন করিতে না পারে।

চতুর্থতঃ, যুক্তরাষ্ট্রে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা (existence of an independent and impartial judiciary) থাকে। শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য রক্ষা করিবার জন্য এই ধরনের বিচারব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। যুক্তরাষ্ট্রে যাহাতে নাগরিকদের বিভিন্ন মৌলিক অধিকার কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ না হয় অথবা রাজ্যসরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে নিজেদের ক্ষমতা লইয়া সংঘাতের সৃষ্টি না হয়, সেজন্যই বিচার-ব্যবস্থাকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এই ক্ষমতার বলে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচার ব্যবস্থা শাসনতান্ত্রিক আইনগুলির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়া শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য বজায় রাখে এবং অনেক ক্ষেত্রে শাসন-বিভাগ ও আইন-বিভাগের বিভিন্ন নির্দেশ বে-আইনী ঘোষণা করিতে পারে। সেজন্য যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থাকে শাসনতন্ত্রের রক্ষক (Guardian of the constitution) বলা হয়।

পঞ্চমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিনাগরিকতা (Double citizenship) থাকে। অর্থাৎ, যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকদের কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকার উভয়েরই আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে দ্বি-নাগরিকতা চালু করা হয়

নাই। ভারতের নাগরিকগণ শুধু ভারতেরই নাগরিক। রাজ্যসরকারের নিকট হইতে কাহাকেও নাগরিকতা লাভ করিতে হয় না।

ষষ্ঠতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-সরকারের মধ্যে রাজস্ব বণ্টন করা হয়। রাজ্যসরকারগুলি ইহাদের নির্ধারিত রাজস্ব দ্বারা যথাসম্ভব নিজেদের শাসনকার্যের ব্যয় নির্বাহ করে। তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইহারা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে দেশের মোট রাজস্বের একটি অংশ পাইয়া থাকে।

সর্বশেষে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় প্রত্যেক রাজ্যসরকারকেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়। কোনও রাজ্যসরকার (সোভিয়েট ইউনিয়নের শাসনব্যবস্থা ব্যতীত) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার হইতে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্ক ছেদ করিয়া আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। অবশ্য সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন মূল রাষ্ট্র আলাদাভাবে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং ইহারা যে কোনও সময়েই শাসনতন্ত্র অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র হইতে আলাদা হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু, মনে রাখিতে হইবে, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে বাস্তবে এইপ্রকার ব্যবচ্ছেদের (secession) কোনও প্রকার সম্ভাবনা নাই। কারণ, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় একই রাজনৈতিক দল কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলি পরিচালনা করিয়া থাকে। সেইদেশে দ্বিতীয় কোনও রাজনৈতিক দল না থাকায় এবং প্রত্যেকটি রাষ্ট্র একই রাজনৈতিক আদর্শে পরিচালিত হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র হইতে কোনও রাজ্যের ব্যবচ্ছেদের কোনও সম্ভাবনা নাই।

যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজনীয় সর্ত (conditions essential to the formation of a federal union) :

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় আমরা দেখিতে পাই দুইটি বিপরীতমুখী ভাবের সমন্বয়। ইহার মধ্যে একটি ভাব যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন মূলরাষ্ট্রকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া একটি সংঘবদ্ধ জাতিতে পরিণত করে। এই ভাবকে আমরা কেন্দ্রমুখীন ভাব (centripetal tendency) বলিতে পারি। অপর ভাবটি বিভিন্ন মূলরাষ্ট্রের মধ্যে নিজেদের স্বাতন্ত্র্যবোধ টিকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে। উহাকে আমরা বিকেন্দ্রীভাব (centrifugal tendency) বলিতে পারি। পরস্পরবিরোধী এই দুইটি ভাবের সমন্বয়েই যুক্তরাষ্ট্র স্থায়িত্ব লাভ করিয়া থাকে। যুক্তরাষ্ট্র গঠনে কয়েকটি শর্ত বিশেষ প্রয়োজনীয়।

প্রথমতঃ, যুক্তরাষ্ট্র গঠন এবং ইহার সাফল্যের জন্য প্রয়োজন যুক্তরাষ্ট্রের

বিভিন্ন মূলরাষ্ট্রগুলির মধ্যে ভৌগোলিক যোগসূত্র (Geographical contiguity)। ভৌগোলিক যোগসূত্র থাকিলেই বিভিন্ন মূলরাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্যবোধ আসে। যদি ইহাদের মধ্যে ভৌগোলিক যোগসূত্র না থাকে, তবে একটি সাধারণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা খুবই কঠিন হইয়া পড়ে। তাহাছাড়া, যদি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশ ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন থাকে, তবে ইহাদের মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণে ভাবের আদানপ্রদান হইতে পারে না এবং ইহাতে জাতীয়তাবোধ গড়িয়া উঠিবার পথে বাধাপ্রাপ্ত হয়। নবগঠিত পাকিস্থান রাষ্ট্রের দুইটি বৃহৎ অংশের মধ্যে ভৌগোলিক যোগসূত্র নাই। ইহার ফলে পাকিস্তানের জাতীয় ঐক্য বহুল পরিমাণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং শাসনব্যবস্থায় অনেক জটিলসমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে।

ভৌগোলিক যোগসূত্র

দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্য নির্ভর করে ইহার বিভিন্ন মূলরাষ্ট্রের অধিবাসিগণের জাতীয়তাবোধের উপর। যুক্তরাষ্ট্রে ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির বিভিন্নতা হয়ত থাকিতে পারে। কিন্তু, তবুও দেশের জনসাধারণ যদি গভীর জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়, তবে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। যদি মূলরাষ্ট্রগুলির বিকৃত জাতীয়তাবোধ (perverted nationalism) দেখা দেয় এবং যদি ইহাদের পারস্পারিক সংঘাত সর্বদা লাগিয়াই থাকে, তবে যুক্তরাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। এজন্য প্রধান প্রয়োজন হইতেছে, মূলরাষ্ট্রগুলির মধ্যে একটি ভাবগত ঐক্যের।

জাতীয়তাবোধ

তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন মূলরাষ্ট্রগুলির মধ্যে আয়তন, সংগতি ও সম্পদ এবং প্রধানতঃ রাজনৈতিক অধিকারের সমতা না থাকিলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা সফল হয় না। মূলরাষ্ট্রগুলির আয়তন এবং সম্পদের বৈষম্য কিছু না কিছু থাকিবেই। কিন্তু, যাহা একেবারে অপরিহার্য, তাহা হইতেছে ইহাদের রাজনৈতিক সমতা। জাতীয় ব্যাপারে প্রত্যেকটি মূলরাষ্ট্রেরই সমান ভূমিকা থাকা চাই যাহাতে একটি রাষ্ট্র বিশেষ রাজনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়া অপর রাষ্ট্রের উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করিতে না পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে প্রত্যেকটি মূলরাষ্ট্রেরই রাজনৈতিক সমতা স্বীকৃত হইয়াছে। কানাডার সিনেট সভাও প্রত্যেক প্রদেশ হইতে ছয়জন প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। ইহার ফলে কোনও মূলরাষ্ট্র সংখ্যাধিক্যের সুযোগ লইয়া অন্যান্য রাষ্ট্রকে নিজের অধীনে আনিতে পারে না।

মূলরাজ্যগুলির মধ্যে সমতা

চতুর্থতঃ, শুধু রাজনৈতিক সমতাই নহে, সমান অর্থনৈতিক স্বার্থও সাফল্যজনকভাবে যুক্তরাষ্ট্র গঠনে বিশেষ সহায়তা করে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সময় প্রত্যেক মূলরাষ্ট্রের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সমান গুরুত্ব দেওয়া উচিত। প্রসংগত বলা যাইতে পারে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইতেছে আঞ্চলিক বৈষম্য (regional disparities) দূর করার প্রচেষ্টা।

আঞ্চলিক স্বার্থের সংরক্ষণ

পঞ্চমতঃ, একটি উচ্চতর আদর্শের প্রেরণায় একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়, এই আদর্শ হইতেছে ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন করা। জাতীয় ঐক্যবোধ এবং আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যবোধের সমন্বয়েই যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। নাগরিকদের উপযুক্ত শিক্ষা, কর্মকুশলতা এবং রাজনৈতিক সচেতনতা না থাকিলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা কখনই সফল হয় না। সদাসচেতন জনমত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার ভিত্তি সুদৃঢ় করে।

যুক্তরাষ্ট্রে একটি লিখিত শাসনতন্ত্র থাকা একেবারে অপরিহার্য। তাহার প্রধান কারণ হইতেছে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সরকারের সমুদয় ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। প্রথমে শাসনতন্ত্র কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা নির্দেশ করে। ইহার পর সমুদয় ক্ষমতা (residuary powers) বিভিন্ন মূলরাষ্ট্র অথবা রাজ্যসরকারের হাতে আসে। যাহাতে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারের মধ্যে এবং বিভিন্ন রাজ্যসরকারের পরস্পরের মধ্যে শাসনক্ষমতা সম্পর্কে কোনও প্রকার বিরোধ অথবা সংঘাতের সৃষ্টি না হয় সেজন্য শাসনতন্ত্রে প্রত্যেকটি সরকারেরই বিভিন্ন ক্ষমতা লিখিত থাকে। এই ব্যবস্থা না থাকিলে মূলরাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক বিরোধের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হইত। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলিও লিখিত থাকিবার বিশেষ প্রয়োজন হয়। সেজন্যই একটি লিখিত শাসনতন্ত্রের প্রয়োজন হয়। তাহা ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা নির্ধারণ করে ইহার শাসনতন্ত্র। কোন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব নির্ধারণ করিতে হইলে শাসনতন্ত্রটিকে লিখিত হইতেই হইবে। তাহা না হইলে শাসনব্যবস্থায় ইহার প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। বর্তমানে প্রত্যেকটি যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রই লিখিত।

যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের অন্যতম উপাদান ভৌগোলিক যোগসূত্র ভারতে আছে। অবশ্য ত্রিপুরা রাজ্য ভারতের অন্যান্য অংশ হইতে আংশিক বিচ্ছিন্ন। কিন্তু, ইহা খুবই উপেক্ষণীয়। ভৌগোলিক যোগসূত্র থাকায় ভারতে একটি সাধারণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও গড়িয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ভারতের অধিবাসিগণ একই জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ। ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির বৈষম্য

থাকা সত্ত্বেও ভারতের অধিবাসিগণের মধ্য হইতে একজাতীয়তাবোধের বিলুপ্তি ঘটে নাই। ভারতের বিভিন্ন জাতি এবং রাজ্য যদিও মিলন চায়, তবুও তাহারা সম্পূর্ণ আত্মবিলুপ্তি চায় না। সাধারণ প্রতিরক্ষা এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন রাজ্যগুলি পরস্পর মিলিত হইয়াই থাকিতে চায়। তৃতীয়তঃ, ভারতের বিভিন্ন মূলরাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা প্রায় একই প্রকার। অবশ্য তাহাদের মধ্যে যে আঞ্চলিক বৈষম্য নাই, তাহা নহে। উপরোক্ত কারণগুলির জন্য ভারতে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সমুদয় সর্তই অল্পবিস্তর বিদ্যমান। কিন্তু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে আইনসভায় বিভিন্ন মূলরাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব লোকসংখ্যার ভিত্তিতে হইয়াছে,—রাজনৈতিক সমতার ভিত্তিতে নহে। ভারতে দ্বি-নাগরিকতা প্রথাও নাই এবং সরকারের ক্রিয়াকলাপ অনুধাবন করিলে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ ক্ষমতাই কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতে ক্রমশঃই এককেন্দ্রিক সরকারের (Unitary Government) দিকে একটা ঝোঁক দেখা যাইতেছে।

যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সাম্প্রতিক ঝোঁক

সম্প্রতি বিভিন্ন দেশে আমরা যুক্তরাষ্ট্র গঠনের একটা ঝোঁক দেখিতে পাইতেছি। কিছুদিন পূর্বে মিশর, সিরিয়া ও ইয়েমেন রাজ্য "সম্মিলিত আরব প্রজাতন্ত্র" (United Arab Republic) নামে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিয়াছিল। তাহাদের দেখাদেখি ইরাক ও জর্ডনও সম্মিলিত আরব যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে। ১৯৫৮ সালের জুলাই মাসে ইরাকের রাজা ফয়জলের পতনের পর অবশ্য এই যুক্তরাষ্ট্র ভাংগিয়া গিয়াছে।

আমাদের দেখিতে হইবে, যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পিছনে প্রধান প্রেরণা কোথা হইতে আসে। অধ্যাপক জন স্টুয়ার্ট মিলের মত আত্মরক্ষার প্রেরণাই বিভিন্ন রাষ্ট্রকে যুক্তরাষ্ট্র গঠনে অনুপ্রাণিত করে। সাম্রাজ্যবাদীদের কর্তৃত্ব হইতে নিজেদের মুক্ত রাখিবার জন্য এবং আরব জাতীয়তাবাদের বিকাশের পথ উন্মুক্ত করিবার জন্যই মিশর-সিরিয়া-ইয়েমেন যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। ইরাক জর্ডন যুক্তরাষ্ট্রও অনুরূপ বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে নিজেদের রক্ষা করিবার জন্যই গঠিত হইয়াছিল (যদিও ইহার পিছনে বাগদাদ চুক্তির দেশগুলির যথেষ্ট উস্কানি ছিল)। দেখা যাইতেছে, বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে বিভিন্ন রাষ্ট্র যাহাতে নিজেদের রক্ষা করিতে পারে সেজন্য অনেক সময় তাহারা যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে। দ্বিতীয়তঃ, বর্তমান পৃথিবীতে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক, কারণও অনেক সময়ে যুক্তরাষ্ট্র গঠনে সহায়তা করে। ইরাক

ও জর্ডনের যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পক্ষে এই যুক্তি খাটে। সম্প্রতি ইরান ও পাকিস্তানের মধ্যে যে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সম্ভাবনা দেখা গিয়াছিল, তাহার কারণও ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক এবং কুটনৈতিক। তৃতীয়তঃ, যদি কোন কোন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক স্বার্থ একপ্রকার হয়, এবং তাহাদের একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থাকে, তবে তাহারা যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিতে পারে। চতুর্থতঃ, একই জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ রাষ্ট্রগুলি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিতে অনুপ্রাণিত হয়। মিশর, সিরিয়া একই ইয়েমেন এবং আরব জাতীয়তা-বোধে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। পঞ্চমতঃ, যুক্তরাষ্ট্র গঠনের যে সকল সুবিধা সেগুলি সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করিবার জন্যও বিভিন্ন রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান সুবিধা, নিজেদের সত্তা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও বিভিন্ন রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র হইতে কতিপয় সুযোগ সুবিধা লাভ করিয়া থাকে। যে সকল রাষ্ট্র বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে চায়, তাহারা বিশ্বাস করে, যুক্তরাষ্ট্র গঠন বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠার বিশেষ সহায়ক। এজন্য অনেকে আজকাল বিশ্ব-যুক্তরাষ্ট্র (World federation) গঠনের পক্ষপাতী। বিংশ শতাব্দীতে দুইটি মহাযুদ্ধের পর বিশ্বের জনমত বুঝিতে পারিয়াছে যে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ সকলকে শুধু ধ্বংসেরই পথে লইয়া যাইবে। এই সংকট হইতে মুক্ত হইবার উপায় হইতেছে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মিলনের সেতু সৃষ্টি করা এবং এই কাজের প্রথম ধাপ হইতেছে যুক্তরাষ্ট্র গঠন।

সে সকল রাষ্ট্রের মধ্যে ভৌগোলিক যোগসূত্র (geographical contiguity) থাকে, সেগুলি অনেক সময়েই বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য সাধারণ প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। আধুনিককালে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছে। গণতান্ত্রিক আদর্শ কার্যকরী করিবার অন্যতম উপায় হইতেছে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রবর্তন। অনেকগুলি রাষ্ট্র যখন একত্রিত হইবার তাগিদ অনুভব করে, তখন তাহাদের এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন না করিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার কারণ হইল নিজেদের স্বায়ত্ত-শাসন বজায় রাখিয়া গণতান্ত্রিক আদর্শ কার্যকরী করা। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় শাসনকার্যের বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয়।

এইসব কারণে আজকাল বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিবার একটা ঝোঁক দেখা যাইতেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের গুণ (Strength of a federal Government):

ঐক্য এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। যুক্তরাষ্ট্রে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং আত্ম-

নিয়ন্ত্রণাধিকারের সংগে জাতীয় ঐক্যের একটি যোগসূত্র স্থাপিত হয়। ("It furnishes the means of maintaining an equilibrium between the centrifugal and centripetal forces in a state of widely different tendencies.")। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত মূলরাষ্ট্রগুলি কয়েকটি বিষয়ে সাধারণ রাষ্ট্রের সুবিধাদি ভোগ করিতে চায়, অথচ নিজেদের স্বায়ত্তশাসনও বজায় রাখিতে চায়। শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই বিভিন্ন মূলরাষ্ট্র এই সুবিধা পাইয়া থাকে। সাধারণ স্বার্থের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রে একই ধরনের আইন প্রণীত হয়। আবার বিশেষ আঞ্চলিক স্বার্থের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পক্ষে প্রয়োজনীয় আইন যুক্তরাষ্ট্রে প্রণয়ন করা সম্ভব। এইভাবে ইহা জাতীয় ঐক্য এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে।

দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন মূলরাষ্ট্রে লোকেরা যুক্তরাষ্ট্রে নিজেদের আশা-আকাংক্ষা অনুযায়ী আপন আপন শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকারী, এবং তাহা যুক্তরাষ্ট্রেই সম্ভবপর। কেন্দ্রীয় সরকার সর্বদাই আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে না, কারণ কেন্দ্রীয় সরকার অপেক্ষা স্থানীয় লোকেরা তাহাদের নিজেদের শাসনব্যবস্থা পরিচালন সম্বন্ধে অধিকতর উপযোগী। সেজন্য যুক্তরাষ্ট্র বড় বড় এলাকার অন্তর্গত বিভিন্ন রাজ্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

তৃতীয়তঃ, অধ্যাপক ব্রাইস বলেন, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের স্বৈরাচারী কেন্দ্রীয় শাসনের উদ্ভবের সম্ভাবনা খুবই কম। জনসাধারণের স্বাধীনতা এবং বিভিন্ন মৌলিক অধিকারের সংরক্ষণের পক্ষে ইহা খুবই উপযোগী। চতুর্থতঃ, বড় বড় বহুজাতি সমন্বিত দেশগুলির পক্ষে অথবা ভৌগোলিক, বংশগত অথবা অন্যান্য ব্যবধানের জন্য বিশেষভাবে পৃথক বিভিন্ন ধরনের অধিবাসীদের লইয়া গঠিত দেশগুলির জন্য যুক্তরাষ্ট্র খুবই উপযোগী। এই দেশগুলিকে যদি আংশিক স্থানীয় স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তবেই ইহারা খুবই নিজেদের স্বার্থে ঐক্য বজায় রাখিতে সচেষ্ট হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোর ভিতরে পরস্পরের সহিত মিলিত হয়। সর্বশেষে, যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থায় শাসনবিভাগের কাজ বিশেষ উন্নত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার এবং আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন হওয়ায় শাসনকাজে অনেকক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় সরকার ভারমুক্ত হইয়া জাতীয় উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক বুনিয়াদ দৃঢ় করিবার দিকে মনোনিবেশ করিতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের অপগুণ (Demerits of federal Government)

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের উপরোক্ত গুণগুলি থাকা সত্ত্বেও কতিপয় অপগুণ আছে। প্রথমতঃ, শাসন ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার এবং আঞ্চলিক সরকার-

গুলির মধ্যে বণ্টিত হওয়ায় শাসনব্যবস্থা প্রায়ই তাহাদের সম্পত্তির উপর অধিকারের দাবীতে এবং কতিপয় ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন করিবার অধিকারের দাবীতে নিজেদের সন্ধি-সর্তগুলি কার্যকরী করিতে জাতীয় সরকারকে বাধ্য করিয়া ইহাকে বিব্রত করিতে পারে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ইহা ঘটিয়াছে। ("The members of the federal union, beacuse of their rights over persons and property and their right to legislate in certain matters, may seriously embarrass the national government in enforcing its treaty obligations. The experience of the U. S. bears witness to this difficulty." Gettel)

দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য বিভিন্ন শাসনব্যবস্থা থাকার দরুন সামগ্রিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা ব্যয়সংকুল হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক এই দুইপ্রকার সরকার থাকায় সরকারে ক্রিয়াকলাপে অনেক ক্ষেত্রেই বিলম্ব ঘটিয়া থাকে।

তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রে কয়েকটি বৃহৎ মূলরাষ্ট্র মিলিত হইয়া শক্তিশালী একটি দল গঠন করিয়া জাতীয় কাজে বাধার সৃষ্টি করিতে পারে। অপরপক্ষে বলা যায়, বিভিন্ন মূলরাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিরোধেরও যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। আবার, অনেক ক্ষেত্রে মূলরাষ্ট্রগুলি পৃথক হইয়া স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিবার প্রয়াসীও হইতে পারে।

চতুর্থতঃ, কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের কতিপয় অসুবিধা আছে। অনেক বিষয়েই হয়ত সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে একই ধরনের আইন প্রণীত হওয়া উচিত; কিন্তু এই বিষয়গুলি সম্পর্কিত আইন প্রণয়নের ক্ষমতা যদি আঞ্চলিক সরকারগুলির হাতে থাকে, তবে সমগ্রদেশে একই ধরনের আইন না হইয়া সেক্ষেত্রে আইনের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকিতে পারে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষা-ব্যবস্থা একপ্রকার নহে। কেরালা ও পশ্চিমবংগের দিকে তাকাইলে ইহা আমরা দেখিতে পাই। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতাবণ্টনের প্রশ্ন লইয়া বিরোধের সৃষ্টিও বিরল নহে। আমেরিকায় আমরা ইহা দেখিয়াছি। বর্তমানে অনেক দেশেই শিল্প-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের এই ত্রুটিটি অনুভূত হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় উপরোক্ত অপগুণগুলি থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে এই প্রকার শাসনব্যবস্থা খুবই জনপ্রিয় হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন মূলরাষ্ট্রগুলির বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার দৃষ্টান্ত বর্তমানে খুবই বিরল। বরং বর্তমানে বিভিন্নদেশে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের দিকে একটি ঝোঁক দেখা যাইতেছে।

মিশর, সিরিয়া ও ইয়েমেনের সম্মিলিত আরব যুক্তরাষ্ট্র গঠনই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত না হইলে সেই দেশগুলি এত উন্নত হইতে পারিত না। ভারতেও যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় জাতীয় ঐক্য বজায় আছে। সুইজারল্যাণ্ডে যদি উনিশটি ক্যাণ্টন এবং ছয়টি অর্ধ-ক্যাণ্টন সম্মিলিতভাবে টিকিয়া না থাকিত তবে ইউরোপের শান্তি অনেকবার নষ্ট হইয়া যাইবার কারণ ঘটিত। কানাডায় যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইংরাজ এবং ফরাসী জাতির মধ্যে সম্মিলিতভাবে বাস করা সম্ভবপর হইয়াছে। সম্মিলিত আরব যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হওয়ায় আরব জাতীয়তাবাদ আজ বিশেষভাবে ঐক্যের মহত্তর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এবং রাষ্ট্র-সমবায়ের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between a federal union and a confederation)

একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রের সহযোগিতায় রাষ্ট্র-সমবায় (confederation) গঠিত হয়। ' সদস্য-রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে রাষ্ট্র-সমবায় গঠিত হয়। সাধারণতঃ প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা অথবা একই ধরনের পররাষ্ট্রনীতি সুদৃঢ় করিবার জন্য রাষ্ট্র-সমবায় গঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা রাষ্ট্র-সমবায় অনেক বেশী নমনীয় (flexible)। অনেকক্ষেত্রে রাষ্ট্র-সমবায়ে বিভিন্ন সদস্য-রাষ্ট্রগুলি প্রতিনিধিদের একটি পরিষদ থাকে। সুইজারল্যাণ্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রাথমিকভাবে একটি রাষ্ট্র-সমবায় ছিল। পরে ইহারা যুক্তরাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়। সেজন্য অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র-সমবায়কে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রাথমিক স্তর বলা হয়। যুক্তরাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র-সমবায়ের মধ্যে আমরা নিম্নলিখিত পার্থক্য দেখিতে পাই।

প্রথমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রের মূলরাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমত্ব থাকে না। মূলরাষ্ট্রগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় নিজেদের সার্বভৌম সত্তা সম্পূর্ণভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কাছে সমর্পণ করে। কিন্তু, রাষ্ট্রে-সমবায়ের সদস্য-রাষ্ট্রগুলি নিজেদের সার্বভৌম সত্তা বিসর্জন দেয় না। রাষ্ট্র-সমবায়ের সদস্যরাষ্ট্রগুলি সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন এবং সার্বভৌম; যে কোন সময়েই ইহারা রাষ্ট্র-সমবায়ের সদস্যপদ বাতিল করিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রে অনেক জাতি ও মূলরাষ্ট্রের সম্মিলনে নূতন ঐক্যানুভূতি সৃষ্টি হয়, এবং তাহাতে একটি নূতন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্র-সমবায়ে বিভিন্ন জাতি এবং সদস্যরাষ্ট্রগুলির সত্তা সম্পূর্ণভাবে বজায় থাকে বলিয়া এবং সদস্যরাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না বলিয়া নূতন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইবার কোন প্রশ্ন উঠে না।

তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের একটি নির্দিষ্ট ভূভাগ, নির্দিষ্ট জনসমষ্টি এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচার-ব্যবস্থা থাকে। রাষ্ট্র-সমবায়ের কোন নির্দিষ্ট ভূভাগ অথবা জনসমষ্টি নাই, এবং ইহার এমন কোন বিচারব্যবস্থা নাই যাহা মূলরাষ্ট্রগুলির শাসনব্যবস্থার সহিত যুক্ত থাকিতে পারে। তাহা ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রে যেমন কেন্দ্রীয় সরকার প্রণীত আইন সমগ্র দেশের প্রতি প্রযুক্ত হয়, রাষ্ট্র-সমবায়ের কেন্দ্রীয় পরিষদের এই রকম আইন প্রণয়ন করিবার কোনও ক্ষমতা নাই। ইহাদের শুধু সদস্যরাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে কতিপর সাধারণ নীতি নির্ধারণ করিবার ক্ষমতা আছে এবং সেগুলির অস্তিত্বও সদস্যরাষ্ট্রগুলির অনুমোদনের উপর নির্ভর করে।

চতুর্থতঃ, যুক্তরাষ্ট্রে একটি লিখিত শাসনতন্ত্র থাকে এবং ইহা সাধারণতঃ অনমনীয় থাকে। শুধু তাহাই নহে, এই লিখিত শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বিভিন্ন ক্ষমতায় কিছু না কিছু স্বাতন্ত্র্য বিধান (separation of powers) করা হয়। অপরকে রাষ্ট্র-সমবায় বিভিন্ন স্বাধীন এবং সার্বভৌম সদস্যরাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্র-সমবায়ে একটি পূর্ণাংগ সরকার অথবা ইহার ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধানের কোন প্রশ্নই উঠে না। সরকারের শাসনক্ষমতার বিভাজন হয় বলিয়া যুক্তরাষ্ট্রে একটি উচ্চ বিচারালয়ের প্রয়োজনীয়তা থাকে। কিন্তু, রাষ্ট্র-সমবাযে কোনপ্রকার উচ্চ বিচারালয়ের অস্তিত্ব থাকে না।

পঞ্চমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের দ্বৈত নাগরিকতা থাকে। সেজন্য প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারেরই খাস নাগরিক থাকে। কিন্তু রাষ্ট্র-সমবায়ে আলাদা-ভাবে নাগরিকতার প্রশ্ন থাকে না। সদস্যরাষ্ট্রগুলির নাগরিকেরাই রাষ্ট্র-সমবায়ের নাগরিক।

ষষ্ঠতঃ যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত মূলরাষ্ট্রগুলি যুক্তরাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইহারা যুক্তরাষ্ট্র হইতে কখনও (রাশিয়া ব্যতীত) বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। রাশিয়ায়ও একদলীয় শাসনব্যবস্থা চালু থাকায় মূলরাষ্ট্রগুলির যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু, রাষ্ট্র-সমবায়ের সদস্যরাষ্ট্রগুলি যে কোন সময়েই রাষ্ট্র-সমবায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে। সেজন্য রাষ্ট্র-সমবায় সর্বদাই অস্থায়ী। কতিপয় সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন সদস্যরাষ্ট্র পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে রাষ্ট্র-সমবায় গঠন করিয়া থাকে। প্রয়োজন শেষ হইয়া গেলেই সদস্যরাষ্ট্রগুলি নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী রাষ্ট্র-সমবায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। জার্মানভাষায় যুক্তরাষ্ট্র হইতেছে সম্মিলিত রাষ্ট্র অথবা Bundestaat এবং রাষ্ট্র-সমবায় হইতেছে রাষ্ট্রের সম্মিলন অথবা Staatenbund.

যুক্তরাষ্ট্র এবং এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য—(Distinction between a federal state and a unitary state) : যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক এবং সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার বিভাগ করা হয়। কিন্তু, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, ইহাতে ক্ষমতা শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই থাকে। আঞ্চলিক সরকার বলিয়া এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে কোন প্রকার সরকার নাই। সুতরাং সেক্ষেত্রে শাসনক্ষমতা বিভাগের কোনও প্রশ্ন উঠে না। ভারতবর্ষ, রাশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে আমরা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা দেখিতে পাই। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সে আমরা এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা দেখিতে পাই। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় যে স্থানীয় শাসন বিভাগ (local administration) থাকে না, তাহা নহে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে মূলরাষ্ট্রগুলিকে যেমন স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা প্রদান করা হয়, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুরূপ ক্ষমতা প্রদান করা হয় না। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় শুধু যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক স্বার্থের সহিত জড়িত বিষয়গুলি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার আইন প্রণয়ন করিয়া থাকে; আঞ্চলিক স্বার্থের সহিত জড়িত বিষয়গুলি সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা আঞ্চলিক সরকারগুলিকে দেওয়া হয়। কিন্তু, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন প্রকার স্বার্থের সহিত জড়িত সমুদয় বিষয় সম্পর্কেই ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার ক্ষমতা একমাত্র এককেন্দ্রিক সরকারের।

দ্বিতীয়তঃ, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারই সর্বেসর্বা। শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের উপর স্থানীয় শাসনপ্রতিষ্ঠানগুলির কোন প্রকার ক্ষমতা থাকে না। অপরপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক সরকারগুলির বিভিন্ন ক্ষমতা শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকে।

তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় শাসনতন্ত্র সর্বদাই লিখিত এবং অনমনীয় থাকে। কিন্তু, এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র লিখিত অথবা অলিখিত, নমনীয় অথবা অনমনীয় হইতে পারে। ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র অলিখিত এবং নমনীয়। কিন্তু, ফ্রান্সের শাসনতন্ত্র লিখিত। তাহা ছাড়া, ইহা ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রের মত খুব নমনীয় নয়।

সর্বশেষে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রই কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য-সরকারগুলির বিভিন্ন ক্ষমতার উৎস। সেজন্য যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য সর্বদা পরিলক্ষিত হয় না। তাহা ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র ব্যাখ্যা করিবার জন্য অথবা মূলরাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক বিবাদ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের

সহিত কোন মূলরাষ্ট্রের বিবাদের মীমাংসা করিবার জন্ম যেমন একটি স্বাধীন ও উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিচারালয় নাই।

এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র যে সর্বদাই কেন্দ্রীভূত এবং যুক্তরাষ্ট্র যে সর্বদাই বিকেন্দ্রীভূত থাকিবে, এই রকম কোন নিশ্চয়তা নাই। ইংলণ্ডে অনেক সময়েই স্থানীয় শাসন-প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্থানীয় স্বার্থের সহিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়। আবার লাটিন আমেরিকান রাষ্ট্রগুলিতে অনেক ক্ষেত্রেই স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা অনেক সময়েই কম প্রদান করা হয়।

এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার গুণ—(Merits of a Unitary form of government): এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার প্রধান গুণ হইল সমগ্র দেশে একই প্রকার আইন প্রণীত হয় এবং একই শাসননীতি অনুসৃত হয়। ছোট ছোট দেশ যেগুলির মধ্যে ভৌগোলিক যোগসূত্র থাকে, সেইগুলির জন্ম এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ। তাহা ছাড়া, যে সকল দেশের জনসাধারণের রাজনৈতিক সচেতনতা অল্প এবং যে সকল দেশ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের জন্ম উপযুক্ত হয় নাই, সেই দেশগুলির জন্ম এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা বিশেষ উপযোগী। যুদ্ধের সময় পররাষ্ট্র-নীতি এবং প্রতিরক্ষা-নীতি সুদৃঢ় করার ব্যাপারেও এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা বিশেষ উপযোগী। আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যাপারেও কেন্দ্রীয় সরকারকে কোন সময়েই আঞ্চলিক সরকারগুলির মতামতের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয় না। সেইজন্ম জরুরী ব্যাপারগুলিতে দ্রুত সিদ্ধান্ত অবলম্বনের দিক হইতে সামগ্রিকভাবে শাসনব্যবস্থার ব্যয়-সংকোচনের দিক হইতে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার কতিপয় বিশেষ সুবিধা আছে। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে ক্ষমতা লইয়া দ্বন্দ্বের অবকাশ থাকে না, দায়িত্ব সম্পর্কেও অস্পষ্টতা থাকে না, এবং একই কাজ দুইবার করিতে হয় না। সরকারের সমুদয় ক্ষমতা একই কর্তৃপক্ষের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে, ইহাতে সরকারের কর্মকুশলতা অনেক বাড়িয়া যায়। ("There can be no conflict of authority, no confusion regarding responsibility, no duplication of work, and no overlapping of jurisdiction".—Gettel.)।

এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার অপগুণ (Demerits of a Unitary form of government): বর্তমানে গণতন্ত্রের যুগে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার সার্থকতা অনেক অংশে কমিয়া গিয়াছে। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় প্রধান ত্রুটি হইল ইহাতে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের ব্যবস্থা নাই। অনেক ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় সরকার দূর হইতে স্থানীয় অধিবাসীদের বিভিন্ন স্বার্থ অনুযায়ী কাজ

করিতে পারে না। হয়ত কেন্দ্রীয় সরকার এমন কতিপয় আইন করিতে পারে যেগুলি মাত্র একটি বিশেষ অঞ্চলের স্বার্থের সহিত জড়িত; অথচ ইহা সমগ্র দেশের প্রতিই প্রযুক্ত হয়। তাহা ছাড়া, যাঁহাদের রাজনৈতিক সচেতনতা খুবই বেশী এবং যাঁহারা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন নীতির প্রতি শ্রদ্ধাবান-তাঁহারা কখনই এই ধরণের সরকারকে সমর্থন করেন না। তবে ইংরাজদের রাজনৈতিক সচেতনতা খুব বেশী থাকা সত্ত্বেও যে সেইদেশে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত, তাহার প্রধান কারণ হইল, ইংরাজদের জাতীয় চরিত্রে সংরক্ষণশীলতার প্রভাব খুবই বেশী। সংরক্ষণশীলতার প্রভাবে তাঁহারা রাজতন্ত্র বজায় রাখিতে চাহেন। তদুপরি দেশ হিসাবেও ইংলণ্ড খুবই ছোট। রাজতন্ত্র বজায় রাখিবার আগ্রহে এবং দেশের ক্ষুদ্র আয়তন থাকার দরুণ ইংরাজদের পক্ষে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা বজায় রাখা সম্ভবপর হইয়াছে।

এককেন্দ্রিক সরকারের একটি প্রধান ক্রটি হইতেছে, ইহা সরকারী কাজে স্থানীয় উৎসাহ প্রতিরোধ করে। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে একটি কেন্দ্রীভূত আমলাতন্ত্রের সৃষ্টি হয়, এবং এই ধরনের শাসনব্যবস্থায় সরকারের কাজকর্মে স্থানীয় স্বার্থের সহিত সংগতি রাখিয়া পরিবর্তনশীল সামঞ্জস্যবিধানের অবকাশ খুব অল্প থাকে। ("The unitary system tends to discourage popular interest in public affairs and to repress local initiative. It tends to develop a centralized bureaucracy which follows routine methods instead of making flexible adjustments."—Gettel.)।

সংক্ষিপ্তসার

এরিস্টটল কর্তৃক সরকারের শ্রেণীবিভাগ ঃ এরিষ্টটলের মতে সরকার দুইপ্রকারের হইতে পারে; স্বাভাবিক (normal) অথবা বিকৃত (Perverted), তাহা ছাড়া, শাসন পরিচালকের সংখ্যাও বিবেচনা করিতে হয়। শাসন পরিচালক যদি মাত্র একজন হন, তবে সরকারের স্বাভাবিক রূপ হইবে রাজতন্ত্র এবং বিকৃতরূপ হইবে স্বৈরাচার। অল্প কতিপয় ব্যক্তি শাসন পরিচালনা করিলে সরকারের স্বাভাবিক রূপ হয় অভিজাততন্ত্র এবং বিকৃতরূপ হয় ধনিকতন্ত্র। আবার বহু ব্যক্তি শাসন পরিচালনা করিলে সরকারের স্বাভাবিক রূপ হয় গণতন্ত্র (Polity) এবং বিকৃত রূপ হয় বিকৃত গণতন্ত্র (Democracy)।

বিভিন্ন ধরণের সরকার : রাজতন্ত্র দুইপ্রকার হইতে পারে ; যথা, অবাধ রাজতন্ত্র (Absolute monarchy) এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (Constitutional monarchy)। চতুর্দশ লুইয়ের আমলে ফ্রান্সে অবাধ রাজতন্ত্র ছিল। ইংলণ্ডে আমরা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র দেখিতে পাই। দেশের শাসন ব্যবস্থা যখন শিক্ষিত গুণী ব্যক্তিদের পরিচালনাধীন থাকে, তখনই তাহাকে অভিজাততন্ত্র বলা হয়। কিন্তু, যখনই এই ধরণের শাসকগণ নিজেদের স্বার্থবুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করেন, তখনই ইহা ধনিকতন্ত্রে পরিণত হয়। গণতন্ত্র কথাটি "Demos" হইতে আসিয়াছে। 'গণতন্ত্র' কথাটিকে একটি রাজনৈতিক তত্ত্ব এবং রাজনৈতিক আদর্শ, উভয় অর্থে ব্যবহার করা যাইতে পারে। বার্ণসের মতে আদর্শ হিসাবে গণতন্ত্র গঠিত হয় এমন লোক লইয়া যাহারা একই ধরণের লোক না, অথচ যাহারা সকলেই সমান সুযোগ সুবিধার অধিকারী। গণতন্ত্র শুধু রাজনৈতিক নয়, সামাজিক এবং অর্থনৈতিকও হইতে পারে। ব্যাপক অর্থে গণতন্ত্র হইতেছে একটি রাজনৈতিক বাদ, একটি নৈতিক ধারণা এবং একটি সামাজিক অবস্থা। গণতন্ত্রে জনসাধারণের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে শাসনকাজে অংশগ্রহণ করিয়া থাকে। নাগরিকদের স্বাধীনতা এবং সাম্য—প্রতিষ্ঠার পক্ষে গণতন্ত্র অপরিহার্য। গণতান্ত্রিক সরকার ব্যক্তি ও সমষ্টি, উভয়ের পক্ষেই কল্যাণ কারক। তাহা ছাড়া বৈপ্লবিক গোলযোগ হইতে গণতন্ত্র অনেক পরিমাণে মুক্ত থাকে। আবার গণতন্ত্রের কতিপয় দোষও আছে। ইহা অযোগ্যতার পরিচালনাধীন, গণতন্ত্র শাসকের গুণ অপেক্ষা সংখ্যার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে। গণতান্ত্রিক সরকারের কর্মদক্ষতাও যে খুব বেশী থাকে তাহা নহে। গণতান্ত্রিক সরকারের ব্যয়বাহুল্য খুব বেশী। ত্রুটিবিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও গণতন্ত্র একটি আদর্শ রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা। একনায়কতন্ত্রে একজন নেতার হাতে দেশের শাসন ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়। একনায়কতন্ত্র একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের (যেমন সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র) অথবা কোন সামরিক কর্তৃপক্ষের হইতে পারে। এই ধরণের শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের সহযোগিতা এবং সক্রিয় ভূমিকা থাকে না। কিন্তু, এই শাসনব্যবস্থার গুণ হইতেছে ইহা গণতন্ত্র অপেক্ষা বেশী কর্মকুশল এবং ইহা সরকারী কাজ খুব দ্রুত সম্পন্ন হয়। গণতান্ত্রিক সরকার আবার মন্ত্রীসভা-চালিত সরকার অথবা রাষ্ট্রপতি চালিত সরকার হইতে পারে। ইংলণ্ডে আমরা মন্ত্রীসভা-চালিত সরকার দেখিতে পাই ; আবার আমেরিকায় আমরা রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকার দেখিতে পাই।

যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য (Features of a Federal Government)—

যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে আমরা ইহার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিতে পাই :—প্রথমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় একসংগে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলি সহাবস্থান থাকে। উভয় সরকারই শাসনতন্ত্র হইতে ইহাদের ক্ষমতা লাভ করিয়া থাকে এবং উভয়েরই কাজের পরিধি শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র লিখিত এবং অনমনীয় থাকে। শুধু তাহাই নহে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রে প্রাধান্যই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। চতুর্থতঃ, যুক্তরাষ্ট্রের একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবসা থাকে। শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য রক্ষা করিবার জন্য এই ধরণের বিচার-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। যুক্তরাষ্ট্রে যাহাতে নাগরিকদের বিভিন্ন মৌলিক অধিকার কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ না হয় অথবা রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে নিজেদের ক্ষমতা লইয়া সংঘাতের সৃষ্টি না হয়, সেইজন্যই বিচার-ব্যবস্থাকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থাকে শাসনতন্ত্রের রক্ষক (Guardian of the Constitution) বলা হয়। পঞ্চমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রে আমরা দ্বি-নাগরিকতা (Double citizenship) দেখিতে পাই। অর্থাৎ, নাগরিকগণ মূলরাষ্ট্রের এবং যুক্তরাষ্ট্র উভয়েরই নাগরিকতা অর্জন করে। ষষ্ঠতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের মধ্যে রাজস্ব বণ্টন করা হয়। সর্বশেষে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় প্রত্যেক মূল রাষ্ট্রকেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিতে হয়।

যুক্তরাষ্ট্র গঠনে সাফল্যের উপায় (Conditions essential for the success in the formation of a federation)—প্রথমতঃ যুক্তরাষ্ট্র গঠন এবং ইহার সাফল্যের জন্য প্রয়োজন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন মূলরাষ্ট্রগুলির মধ্যে ভৌগোলিক যোগসূত্র (Geographical contiguity)।

দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্য নির্ভর করে ইহার বিভিন্ন মূলরাষ্ট্রের অধিবাসীগণের জাতীয়তাবোধের উপর। যুক্তরাষ্ট্রের ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির বিভিন্নতা হয়ত থাকিতে পারে। কিন্তু, তবুও দেশের জনসাধারণ যদি গভীর জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়, তবে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার ভিত্তি সুদৃঢ় হয়।

তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন মূলরাষ্ট্রের মধ্যে আয়তন, সংগতি ও সম্পদ এবং প্রধানতঃ রাজনৈতিক অধিকারের সমতা না থাকিলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা সফল হয় না।

চতুর্থতঃ, শুধু রাজনৈতিক সমতাই নহে, সমান অর্থনৈতিক স্বার্থও সাফল্যজনকভাবে যুক্তরাষ্ট্র গঠনে বিশেষ সহায়তা করে।

পঞ্চমতঃ, যুক্তরাষ্ট্র গঠনের জন্য এবং উহার সাফল্যের জন্য একটি লিখিত শাসনতন্ত্র অপরিহার্য।

যুক্তরাষ্ট্রের গুণ (Merits of a Federal Government)—যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রধান সুবিধা হইতেছে এই যে সমগ্র দেশের সাধারণ স্বার্থের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রে একই ধরণের আইন প্রণীত হয়, আবার বিশেষ আঞ্চলিক স্বার্থের ক্ষেত্রেও আইন প্রণয়ন করা যুক্তরাষ্ট্রে সম্ভব হয়। এইভাবে ইহা জাতীয় ঐক্য এবং স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে। দ্বিতীয়তঃ, বড় বড় দেশের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ উপযোগী, কারণ, সেই ক্ষেত্রে আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয়। তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের স্বৈরাচারী কেন্দ্রীয় শাসনের সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা খুবই কম।

সবশেষে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় শাসনবিভাগের কাজ বিশেষ উন্নত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের অপগুণ (Demerits of a Federal Government)—যুক্তরাষ্ট্রে সরকারের উপরি-উক্ত গুণগুলি থাকা সত্ত্বেও কতিপয় অপগুণ আছে। প্রথমতঃ, শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার এবং আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে বণ্টিত হওয়ায় বিভিন্ন শাসনব্যবস্থা প্রায়ই তাহাদের সম্পত্তির উপর অধিকারের দাবীতে এবং কতিপয় ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন করিবার অধিকারের দাবীতে নিজেদের সন্ধির সর্তগুলি কার্যকরী করিবার জন্য জাতীয় সরকারকে বাধ্য করিয়া ইহাকে বিব্রত করিতে পারে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ইহা ঘটিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য বিভিন্ন শাসনব্যবস্থা থাকার দরুণ সামগ্রিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা ব্যয়সংকুল হইয়া পড়ে।

তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রে কয়েকটি বৃহৎ মূলরাষ্ট্র মিলিত হইয়া শক্তিশালী একটি দল গঠন করিয়া জাতীয় কাজে বাধার সৃষ্টি করিতে পারে। অপরপক্ষে বলা যায়, বিভিন্ন মূলরাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিরোধেরও যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।

চতুর্থতঃ, কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের কতিপয় অসুবিধা আছে। অনেক বিষয়েই হয়ত সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে একই ধরণের আইন প্রণীত হওয়া উচিত; কিন্তু এই বিষয়গুলির সম্পর্কিত আইন প্রণয়নের ক্ষমতা যদি আঞ্চলিক সরকারগুলি হাতে থাকে, সমগ্র দেশে একই ধরণের আইন না হইয়া সেক্ষেত্রে আইনের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকিতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের এই ত্রুটিগুলি থাকা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার খুবই জনপ্রিয়। সেজন্য আধুনিককালে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের দিকে একটি ঝোঁক দেখা যাইতেছে।

এই ঝোঁকের প্রথম কারণ হইল দেশরক্ষার প্রয়োজনীয়তা। অধ্যাপক জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে আত্মরক্ষার প্রেরণাই বিভিন্ন রাষ্ট্রকে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রেরণা দেয়। তাহার পিছনেও আমরা দেখিতে পাই সাম্রাজ্যবাদীদের কবল হইতে নিজেদের রক্ষা করার তাগিদ।

এককেন্দ্রিক সরকারের বৈশিষ্ট্য (Features of a Unitary Government)—এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে ইহাতে ক্ষমতা শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই থাকে। আঞ্চলিক সরকার বলিয়া এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে কোনপ্রকার সরকার নাই; সুতরাং সেক্ষেত্রে শাসনক্ষমতা বিভাগের কোন প্রশ্ন উঠে না। দ্বিতীয়তঃ, এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারই সর্বেসর্বা। শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের উপর স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির কোনপ্রকার ক্ষমতা থাকে না। তৃতীয়তঃ, এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র লিখিত অথবা অলিখিত, নমনীয় অথবা অনমনীয় হইতে পারে। ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র অলিখিত ও অনমনীয়। যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের ন্যায় হইয়া যে সর্বদাই লিখিত অথবা নমনীয় হইবে, তাহা নহে। তাহা ছাড়া, এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যর্বস্থায় সাধারণতঃ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ও স্বাধীন বিচারালয় থাকে না।

এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার গুণ (Merits of a Unitary Form of Government)—এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রধান গুণ হইল সমগ্র দেশে একই প্রকার শাসননীতি অনুসৃত হয়। ছোট ছোট দেশগুলির মধ্যে ভৌগোলিক যোগসূত্র থাকে, সেইগুলির জন্য এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ। যুদ্ধের সময় পররাষ্ট্র নীতি এবং প্রতিরক্ষা নীতি সুদৃঢ় করার ব্যাপারেও এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা বিশেষ উপযোগী। আভ্যন্তরীণ শাসনব্যাপারেও কেন্দ্রীয় সরকারকে কোন সময়েই আঞ্চলিক সরকারগুলির মতামতের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয় না। সেইজন্য জরুরী ব্যাপারগুলিতে দ্রুত সিদ্ধান্ত অবলম্বনের দিক হইতে, এবং সামগ্রিকভাবে শাসনব্যবস্থার ব্যয়সংকোচনের দিক হইতে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার কতিপয় বিশেষ সুবিধা আছে। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় ও কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে লইয়া দ্বন্দ্বের অবকাশ থাকে না, দায়িত্ব সম্পর্কেও অস্পষ্টতা থাকে না, এবং একই কাজ দুইবার করিতে হয় না। সরকারের সমুদয় ক্ষমতা একই কর্তৃপক্ষের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে; ইহাতে সরকারের কর্মকুশলতা অনেক বাড়িয়া যায়।

এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার অপগুণ (Demerits of a Unitary Form of Government)—বর্তমানে গণতন্ত্রের যুগে এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থার সার্থকতা অনেক অংশে কমিয়া গিয়াছে। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার

প্রধান ত্রুটি হইল ইহাতে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের ব্যবস্থা নাই। হয়ত কেন্দ্রীয় সরকার এমন কতিপয় আইন করিতে পারে যেগুলি মাত্র একটি বিশেষ অঞ্চলের স্বার্থের সহিত জড়িত; অথচ ইহা সমগ্র দেশের প্রতিই প্রযুক্ত হয়। তাহা ছাড়া, যাঁহাদের রাজনৈতিক সচেতনতা খুব বেশী এবং যাঁহারা স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন নীতির প্রতি শ্রদ্ধাবান, তাঁহারা কখনই এই ধরণের সরকারকে সমর্থন করেন না। তবে ইংরাজগণ সংরক্ষণশীলতার প্রভাবে রাজতন্ত্র বজায় রাখিতে চাহেন। তদুপরি দেশ হিসাবেও ইংলণ্ড খুবই ছোট। রাজতন্ত্র বজায় রাখিবার আগ্রহে এবং দেশের ক্ষুদ্র আয়তন থাকার দরুণ, ইংরাজদের পক্ষে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা বজায় রাখা সম্ভবপর হইয়াছে।

এককেন্দ্রিক সরকারের একটি প্রধান ত্রুটি হইতেছে, ইহা সরকারী কাজে স্থানীয় উৎসাহ প্রতিরোধ করে।

Exercises

1. How would you classify the forms of Government ? (১৪৭-৪৮ পৃষ্ঠা)

2. Write notes on Monarchy and Aristocracy. (১৪৯-৫০ পৃষ্ঠা)

3. Discuss the meaning of Democracy. (১৫০-৫৩ পৃষ্ঠা)

4. "Democracy as an ideal is a society not of similar persons but of equals, in the sense that each is an integral and irreplaceable part of the whole." (C. D. Burns)—Discuss the statement. (১৫০-৫৩ পৃষ্ঠা)

5. Estimate the strength and weakness of modern Democracy as a form of Government. (১৫৩-৫৮ পৃষ্ঠা)

6. "Democracy is the best form of Government." "Democracy means government by the ignorant and unfit." —Comment on the statements. (১৫৩-৫৮ পৃষ্ঠা)

7. Discuss the value and limitations of Democracy. Under what conditions is Democracy successful ? (১৫৩-৫৮ পৃষ্ঠা)

8. Discuss the aims and ideals of totalitarian States. How far do these ideals differ from those of democratic States ? (১৫৯-৬০ পৃষ্ঠা)

9. Distinguish between Democracy and Dictatorship. Will Democracy survive? (১৬০-৬২ পৃষ্ঠা)

10. Illustrate the distinction between Parliamentary and Non-Parliamentary executive from Great Britain and the United States of America. (১৬২-৬৪ পৃষ্ঠা)

11. "A Federal State is a political contrivance intended to reconcile national unity and power with the maintenance of State rights." Discuss the statement. (১৬৪-৬৭ পৃষ্ঠা)

12. Discuss the nature and characteristics of a Federal Union. (১৬৪-৬৭ পৃষ্ঠা)

13. "Federalism means the distribution of the force of the State among a number of co-ordinate bodies each originating and controlled by the constitution." —Discuss the statement and point out the salient features of a federal State.

(১৬৪-৬৭ পৃষ্ঠা)

14. What are the conditions essential to the formation of a Federal Union? Explain the necessity of a written constitution for a Federal Union. How far do the conditions essential to the formation of a Federal Union exist in India?

(১৬৭-৭০ পৃষ্ঠা)

15. Account for the recent tendencies towards a federal state. (১৭০-৭২ পৃষ্ঠা)

16. Discuss the strength and weakness of Federation.

(১৭১-৭৪ পৃষ্ঠা)

17. Discuss the characteristics of a true Federal Union as contradistinguiseed from (a) Confederation and (b) Unitary State. Illustrate your answer. (১৭৪-৭৭ পৃষ্ঠা)

18. "The usual belief that a Unitary State is always centralized and that a federal state is invariably decentralized as not necessarily true."—Discuss the statement.

(১৭৬-৭৭ পৃষ্ঠা)

19. Estimate the strength and weakness of a Unitary form of Government. (১৭৭-৭৮ পৃষ্ঠা)

দশম অধ্যায়

রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র
(Constitution of the State)

শাসনতন্ত্রের সংজ্ঞা (Definition of a Constitution) :

প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই একটি শাসনকর্তা থাকে। শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সরকার রাষ্ট্রের কার্য পরিচালনা করিয়া থাকে। অস্টিনের মতে শাসনতন্ত্র "সর্বোচ্চ সরকারের কাঠামো স্থির করে" ("that which fixes the structure of the supreme government.") সরকার কিভাবে রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনা করিবে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতা এবং তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কি হইবে অথবা নাগরিকদের সংগে রাষ্ট্রের কি সম্পর্ক থাকিবে,—সবই শাসনতন্ত্র স্থির করিয়া দেয়। সেইজন্য অধ্যাপক ডাইসির মতে শাসনতন্ত্র হইতেছে সমুদয় নিয়মের সমষ্টি যেগুলি প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের ভিতরে সার্বভৌম শক্তির বণ্টন অথবা কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে। ("A constitution is a product of all rules which directly or indirectly affect the distribution or the exercise of the sovereign powers in the state."—Dicey.)—সুতরাং দেখা যাইতেছে, শাসনতন্ত্র সরকারের পক্ষে একটি মৌলিক নিয়ন্ত্রণী শক্তি, সরকারের ক্ষমতা ও ক্রিয়াকলাপ সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, শাসক এবং শাসিতের মধ্যে সম্পর্ক, সরকারের স্বরূপ, ইত্যাদি সবই কতিপয় লিখিত অথবা অলিখিত আইনের সমষ্টি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় এবং সেই লিখিত ও অলিখিত আইনের সমষ্টি হইতেছে শাসনতন্ত্র।

শাসনতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Constitutions) :

শাসনতন্ত্রকে প্রধানতঃ লিখিত (written) এবং অলিখিত (unwritten) এই দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। লিখিত শাসনতন্ত্রে সমুদয় বিধান একটি অথবা কয়েকটি দলিলের মধ্যে লিপিবদ্ধ থাকে। শাসনতন্ত্রের যখন যেরূপ সংশোধন করা হয়, তাহাও সেভাবে লিপিবদ্ধ হয়। এই জাতীয় শাসনতন্ত্র পূর্ব হইতেই একটি প্রতিনিধি সংসদ দ্বারা রচিত হয়। সোভিয়েট ইউনিয়ন, ভারতবর্ষ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে আমরা লিখিত শাসনতন্ত্র দেখিতে পাই। অলিখিত শাসনতন্ত্র পূর্ব হইতেই কোন প্রতিনিধি সংসদ দ্বারা রচিত হয় না। এই শাসনতন্ত্র বিভিন্ন প্রথা ও প্রচলিত নিয়ম এবং

আদালতের সিদ্ধান্তের ভিত্তির উপর ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। ইংলণ্ডে আমরা অলিখিত শাসনতন্ত্র দেখিতে পাই। কিন্তু, মনে রাখিতে হইবে, লিখিত শাসনতন্ত্রের মধ্যেও প্রচলিত প্রথা ও নিয়মের ভিত্তিতে কতিপয় অলিখিত অংশ গড়িয়া উঠিতে পারে, এবং অলিখিত শাসনতন্ত্রেও আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন অথবা শাসক ও শাসিতের মধ্যে কোন চুক্তি লিখিত ভাবে থাকিতে পারে। ইংলণ্ডে ১২১৫ সালের মহাসনদ এবং ১৬৮৯ সালের বিল্ অব্ রাইটস্ (Bill of Rights) ইত্যাদি লিখিতভাবে শাসনতন্ত্রে স্থান পাইয়াছে। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে মন্ত্রীসভার কোন ব্যবস্থা নাই। অথচ সরকারের বিভিন্ন বিভাগের প্রধান কর্মসচিবগণ (Secretaries) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া মন্ত্রীসভার ন্যায় কাজ করিতেছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে লিখিত শাসনতন্ত্রেও অলিখিত অংশ থাকিতে পারে। সুতরাং লিখিত ও অলিখিত শাসনতন্ত্রের পার্থক্যকে আমরা মূলগত পার্থক্য বলিতে পারি না। আবার, লিখিত শাসনতন্ত্র থাকিলেই যে সুপ্রীম কোর্ট আইনসভা-রচিত আইনকে শাসনতন্ত্র বিরোধী বলিয়া বে-আইনীরূপে বাতিল করিতে পারে তাহা নহে। যদিও আমেরিকায় তাহা সম্ভবপর, ফ্রান্সে তাহা সম্ভবপর নয়। ফ্রান্সের উচ্চ আদালত আইনসভা রচিত আইনকে বে-আইনী বলিয়া বাতিল করিতে পারে না। অনেকে মনে করেন, লিখিত শাসনতন্ত্রে নাগরিকদের সব অধিকার এবং রাষ্ট্রের সহিত নাগরিকদের সম্পর্ক লিপিবদ্ধ থাকে বলিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা অধিকতর সুরক্ষিত হয়। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। ব্রিটেনের শাসনতন্ত্র অলিখিত ; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ব্রিটিশ জাতি পৃথিবীর যে কোন জাতি অপেক্ষা অধিকতর স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগ করে।

কোন শাসনতন্ত্রই সম্পূর্ণভাবে লিখিত অথবা অলিখিত হওয়া উচিত নহে। তাহাতে জাতীয় অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। জাতীয় জীবন-ধারার পরিবর্তন হইলে তাহা দেশের শাসনতন্ত্রে রূপ পাওয়া উচিত যাহাতে শাসনতন্ত্র দেশের জনগণের আশা-আকাংখার মূর্ত প্রতীক হইতে পারে।

শাসনতন্ত্রকে আবার নমনীয় (Flexible) এবং অনমনীয় (Rigid) এই দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। অতি সহজেই যে শাসনতন্ত্রের সংশোধন করা যায়, তাহাকে নমনীয় শাসনতন্ত্র বলে। আবার, যে শাসনতন্ত্রের সংশোধন করা খুব সহজসাধ্য নহে এবং যথেষ্ট জটিল, তাহাকে অনমনীয় শাসনতন্ত্র বলে। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র খুবই নমনীয়। যেভাবে সাধারণ আইন পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত হয়, সেভাবেই শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন বিধানের সংশোধন এবং পরিবর্তন করা যায়। এইজন্য কোন বিশেষ পদ্ধতির

আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। কিন্তু, আমেরিকার শাসনতন্ত্র অনমনীয়, এবং ইহার সংশোধন করিতে হইলে একটি বিশেষ পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কংগ্রেস সভার দুই পক্ষের মোট সদস্যদের ⅔ অংশকে শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের কোন প্রস্তাব সমর্থন করিতে হইবে, অথবা বিকল্পে আটচল্লিশটি রাজ্যের দুই-তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ বত্রিশটি রাজ্য দ্বারা এই পরিবর্তনের জন্য বিশেষ একটি সভা (Convention) আহ্বান করিয়া প্রস্তাবটি সমর্থন করাইতে হইবে। এইরূপে সমর্থিত পরিবর্তনের প্রস্তাব ছত্রিশটি রাজ্যের আইনসভা অথবা—আহূত সভায় উপস্থিত ¾ সংখ্যক সদস্য দ্বারা সমর্থিত হইলে শাসনতন্ত্র পরিবর্তিত হইবে। এই পদ্ধতি ইংলণ্ডে অনুসৃত পদ্ধতি অপেক্ষা অনেক জটিল। ইংলণ্ডে সাধারণ আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতির মাধ্যমে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা হয়।

বিভিন্ন দেশের শাসনতন্ত্র কতটা নমনীয় অথবা অনমনীয়

শাসনতন্ত্রের শ্রেণী-বিভাগ আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই ব্রিটেনের শাসনতন্ত্র নমনীয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র অনমনীয়। কারণ, সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রের সংশোধন অথবা পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের সংশোধন অথবা পরিবর্তন করিতে হইলে অধিকতর জটিল পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু, এই জটিল পদ্ধতি ছাড়াও অন্য একটি উপায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করা যায়। এমনিতে এই পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের খুব অল্প পরিমাণ, সর্বসমেত মাত্র ২২টি নিয়মতান্ত্রিক সংশোধন করা হইয়াছে। কিন্তু তবুও শাসনতন্ত্রের অনেক পরিবর্তন আমরা দেখিতে পাই এবং তাহা সম্ভবপর হইয়াছে আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্তের দ্বারা। যখনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সরকার নিজেদের ক্রিয়া-কলাপে শাসনতান্ত্রিক বিধি-নিষেধের সম্মুখীন হয়, তখনই সুপ্রীম কোর্টের নিকট হইতে শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন বিধানের ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হয়। তখন সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত অথবা ব্যাখ্যা অনুযায়ী শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা যাইতে পারে এবং সেই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত সংশোধনের জটিল পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয় না। অপরদিকে, ইংলণ্ডে উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন হয় না বলিয়া সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে শাসনতন্ত্রের সংশোধন করিতে হয়। কিন্তু, তাহা সহজ পদ্ধতি হইলেও সময়সাপেক্ষ। পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষেই সংশোধনী বিলটি পাস করাইয়া লইতে হয়। অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্তের

মাধ্যমে খুবই অল্পসময়ে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা যায় এবং সেক্ষেত্রে কংগ্রেসের অথবা রাজ্য-আইনসভাগুলির সম্মতির প্রয়োজন হয় না। এই দিক হইতে বিবেচনা করিয়া বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র অপেক্ষাও নমনীয়। অবশ্য শাসনতান্ত্রিক বিধানের দিক হইতে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র নমনীয় এবং মার্কিন শাসনতন্ত্র অনমনীয়। আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ট কোন আইনের কার্যক্ষেত্রে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া কার্যতঃ সংশোধনের কাজ করিতে পারে। কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট কোন সংবিধানের কোন ধারা বাতিল করিতে পারে না; অথচ সংশোধনের মাধ্যমে কোন ধারা বাতিল করিয়া দেওয়া যায়। মার্কিন শাসনতন্ত্রের অনমনীয়তা কখনই শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের প্রয়োজন হইলে কোনরকম বাধার সৃষ্টি করে নাই।

ভারতের শাসনতন্ত্র খুব নমনীয় অথবা খুব অনমনীয় নহে। ভারতীয় শাসনতন্ত্রের কোন সংশোধন করিতে হইলে ঐ সংশোধন প্রস্তাবটিকে একটি বিলের আকারে পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত করিতে হয়। পার্লামেণ্ট সভার উভয় পরিষদের অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশের ভোটাধিক্যে বিল গৃহীত হইতে-হইবে। কিন্তু এই দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য আবার পার্লামেণ্টের উপস্থিত ও অনুপস্থিত সব সদস্যসংখ্যার অর্ধেকের অধিক হওয়া চাই। এইভাবে আইনসভা কর্তৃক বিলটি অনুমোদিত হইবার পর রাষ্ট্রপতির সম্মতির প্রয়োজন হয়। রাষ্ট্রপতি শাসনতন্ত্র সংশোধনের জন্য এই অনুমোদিত বিলটিতে সম্মতি প্রদান করিবার পর শাসনতন্ত্র সংশোধিত হয়। অনমনীয় শাসনতন্ত্রের প্রধান গুণ হইতেছে ইহার স্থায়িত্ব (Permanence)। এই প্রকার শাসনতন্ত্রের বিধানগুলি লিখিত এবং স্পষ্ট। এইগুলিকে আমরা সহজে পরিবর্তন করিতে পারি না। জনগণের মৌলিক অধিকার এবং স্বার্থ অনমনীয় শাসনতন্ত্রে সুরক্ষিত হয় এবং জনগণেরও শাসনতন্ত্রের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা ও আস্থা থাকে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সাধারণতঃ অনমনীয় শাসনতন্ত্র দেখা যায়; কারণ বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণে অনমনীয় শাসনতন্ত্রই বিশেষ উপযোগী। অবশ্য ভারতীয় শাসনতন্ত্র খুব নমনীয় অথবা খুব অনমনীয় নয়। অনমনীয় শাসনতন্ত্রে শাসকগণ নিজেদের স্বার্থে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করিতে পারেন না। কিন্তু অনমনীয় শাসনতন্ত্রের প্রধান ত্রুটি হইল এই যে জাতীয় প্রগতির স্বার্থে বিশেষ প্রয়োজনীয় হইলেও শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা যায় না। তাহাতে প্রগতিশীল জনগণের মনে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। জাতীয় জীবনের স্বার্থের সহিত যদি শাসনতন্ত্রের প্রকৃত সমন্বয় না থাকে, তবে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

কিন্তু, একদিক হইতে বিচার করিলে অনমনীয় এবং নমনীয় শাসনতন্ত্রের খুব পার্থক্য নাই। অনমনীয় শাসনতন্ত্রে প্রচলিত প্রথা গড়িয়া উঠিতে পারে এবং তাহা শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনের সামিল হইতে পারে। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী একটি মন্ত্রীসভা গড়িয়া উঠিয়াছে যদিও শাসনতন্ত্রে মন্ত্রীসভা গঠনের কোন ব্যবস্থা নাই। যদি শাসনতন্ত্রের সংশোধন করিয়া মন্ত্রীসভার সৃষ্টি করিতে হইত, তবে ইহা একরূপ অসম্ভব হইত। আবার আদালতের সিদ্ধান্তের সাহায্যেও শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিবার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনেক নূতন আইনের সৃষ্টি হইতে পারে এবং সেইজন্য প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী শাসনতন্ত্র সংশোধন করিবার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং কাঠামোর দিক হইতে অনমনীয় এবং নমনীয় শাসনতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট নহে। তবে সুবিধা-অসুবিধার দিক হইতে বিবেচনা করিলে নমনীয় এবং অনমনীয় শাসনতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য আছে।

লিখিত এবং অলিখিত শাসনতন্ত্রের সুবিধা এবং অসুবিধা—

শাসনতন্ত্রগুলিকে সাধারণতঃ লিখিত ও অলিখিত এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। লিখিত শাসনতন্ত্রের প্রধান গুণ হইতেছে, ইহা শাসক এবং শাসিতের মধ্যে সম্পর্ক অথবা সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্পষ্টভাবে লিখিয়া দেয়। ইহাতে সরকারের ক্রিয়াকলাপের বিশেষ সুবিধা হয় এবং জনসাধারণও নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন থাকে। তাহা ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের পক্ষে লিখিত শাসনতন্ত্র অপরিহার্য। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্রই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ক্ষমতা এবং কাজের সীমারেখা নির্ধারণ করে। কিন্তু, লিখিত শাসনতন্ত্র যদি অনমনীয় হয় তবে ইহার প্রধান দোষ হইল এই যে, অবস্থার পরিবর্তনের সংগে অথবা জাতীয় প্রগতির স্বার্থের ইহার দ্রুত পরিবর্তন সম্ভব নয়। তাহাতে দেশে শাসনতান্ত্রিক গোলযোগের (constitutional crisis) আশংকা থাকে।

অলিখিত শাসনতন্ত্রের প্রধান গুণ হইতেছে এই যে, অবস্থার পরিবর্তনের সংগে এবং জাতীয় প্রগতির স্বার্থে এই প্রকার শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা যায়। জাতীয় জীবনের পরিবর্তনের সংগে শাসনতন্ত্রের সমন্বয় ঘটিলে জাতীয় প্রগতির পথ সুগম হয়। ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে। কিন্তু, অলিখিত শাসনতন্ত্রের একটি দোষ আছে। তাহা হইতেছে, এই প্রকার শাসনতন্ত্রকে খুব সহজেই পরিবর্তন করা যায় বলিয়া ইহার সর্বদা স্থায়িত্ব (stability) নাও

থাকিতে পারে। সরকার নিজের স্বার্থে অথবা জনমতের দাবীতে যখন খুশী তখনই শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করিতে পারেন। তাহাতে শাসনতন্ত্রের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা এবং আস্থা কমিয়া যায় এবং শাসনতন্ত্রেরও প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইয়া যায়। অলিখিত শাসনতন্ত্রগুলি প্রধানতঃ প্রচলিত বিধানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে বলিয়া ইহার বিভিন্ন বিধান কখনই সুস্পষ্ট হয় না। তাহাতে বিধি-নিষেধের অনেকরকম ব্যাখ্যা হইতে পারে এবং জনগণের স্বার্থ কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা (unitary system of government) অ-লিখিত শাসনতন্ত্র কর্তৃক চালিত হইতে পারে,—যেমন ইংলণ্ডে ইহা হইয়াছে। কিন্তু, যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে অলিখিত শাসনতন্ত্র খুবই অনুপযোগী। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকারের মধ্যে সম্পর্ক শাসনতন্ত্রে সুস্পষ্টভাবে লিখিত থাকা উচিত।

সংক্ষিপ্তসার

শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রত্যেক দেশের সরকার রাষ্ট্রের বিভিন্ন কাজ পরিচালনা করিয়া থাকে। সরকার কিভাবে রাষ্ট্রীয় কাজ পরিচালন; করিবে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতা এবং তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কি হইবে অথবা নাগরিকদের সংগে রাষ্ট্রের কি সম্পর্ক থাকিবে, তাহা শাসনতন্ত্র স্থির করে। শাসনতন্ত্র লিখিত অথবা অলিখিত হইতে পারে। বৃটেনের শাসনতন্ত্র অলিখিত, কিন্তু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসমতন্ত্র লিখিত। আবার, শাসনতন্ত্র কঠোর অথবা নমনীয় হইতে পারে। ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র নমনীয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র কঠোর। লিখিত এবং অলিখিত, নমনীয় এবং অনমনীয়, সব রকমের শাসনতন্ত্রে দোষ গুণ আছে। তবে কোন শাসনতন্ত্রই সম্পূর্ণভাবে লিখিত অথবা অলিখিত হওয়া উচিত নহে। ভারতের শাসনতন্ত্র লিখিত, অথচ খুব কঠোর বা খুব নমনীয় নহে। অলিখিত শাসনতন্ত্রের গুণ হইতেছে এই যে অবস্থার পরিবর্তনের সংগে এবং জাতীয় প্রগতির স্বার্থে ইহার পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু, অলিখিত শাসনতন্ত্রে সর্বদা স্থায়িত্ব থাকে না, লিখিত শাসনতন্ত্রের প্রধান গুণ হইতেছে, ইহা শাসক এবং শাসিতের মধ্যে সম্পর্ক অথবা সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্পষ্টভাবে লিখিয়া দেয়। কিন্তু, লিখিত.শাসনতন্ত্র যদি অনমনীয় হয় তবে ইহার প্রধান দোষ হইল এই যে, অবস্থার পরিবর্তনের সংগে অথবা জাতীয় প্রগতির স্বার্থে ইহার দ্রুত পরিবর্তন সম্ভব নয়।

Exercises

1. Define a constitution. Classify the different constitutions. (১৮৫-৮৭ পৃষ্ঠা)

2. "The distinction between states with written and those with unwritten constitutions is an illusory basis of division."—Discuss the statement. (১৮৫-৮৭ পৃষ্ঠা)

3. "Distinction between a written constitution and an unwritten constitution is not well-marked." Discuss. (১৮৫-৮৭ পৃষ্ঠা)

4. An American writer has said that the constitution of the U. S. A. is more flexible than the British one. How would you justify this view point ? (১৮৭-৮০ পৃষ্ঠা)

5. Discus the relative merits and demerits of written and unwritten constitutions. Are the constitutions of (a) U. S. A., (b) England and (c) India, rigid or flexible ? Give reasons for your answer. (১৮৫-৮৯ পৃষ্ঠা)

———

একাদশ অধ্যায় | ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি (Theory of Separation of Powers)

ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি (Theory of Separation of Powers):

সরকারের ক্ষমতাগুলি তিনভাগে বিভক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অতি প্রাচীনকালের লেখকগণও অনুভব করিয়াছিলেন। গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল সরকারের বিভিন্ন বিভাগকে গণ-পরিষদ (Public Assembly), ম্যাজিস্ট্রেট্স্ (Magistrates) এবং বিচার বিভাগ (Judiciary) এই তিনভাগে বিভক্ত করেন। পলিবিয়াস (Polybius) এবং সিসারো (Cicero) সরকারের ক্ষমতার "প্রতিষেধক এবং ভারসাম্য"কেই (checks and balances) রোম প্রজাতন্ত্রের শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষতার কারণ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

চতুর্দশ শতাব্দীতে মার্সিগ্লিও (Marsiglio of Padua) সরকারের আইন প্রণয়ন এবং শাসন পরিচালনার কাজের মধ্যে একটি সীমারেখা টানিয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে জঁ্যা বোডিন (Jean Bodin) রাজার হাতে বিচার বিভাগের ক্ষমতা প্রদান করিবার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী করিয়াছিলেন এবং স্বাধীন ম্যাজিস্ট্রেটদের হাতে বিচার বিভাগের কাজ ন্যস্ত করিবার জন্য সুপরিকল্পনা করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে পিউরিটান বিপ্লবের সময় আইন প্রণয়ন এবং শাসন পরিচালন বিভাগের কাজের স্বাতন্ত্র্য বিধানের উপর যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া হয়। জেম্স্ হ্যারিংটন (James Harrington) আইন প্রণয়ন এবং পরিচালন বিভাগে ক্ষমতার সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যবিধানের সুপারিশ করেন। জন্ লক্ (John Locke) সরকারের ক্ষমতাগুলি আইন প্রণয়ন, পরিচালন এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় এই তিনভাগে বিভক্ত করেন। সরকারের যুক্তরাষ্ট্রীয় বিভাগ বলিতে রাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্কের উৎস বুঝায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান তত্ত্বটিকে মূলনীতি হিসাবে প্রথম বিবেচনা করেন মণ্টেস্কু (Montesquieu)। বৃটিশ সরকারের গঠন বিবেচনা করিয়া মণ্টেস্কু এই অভিমত প্রকাশ করেন যে সরকারের ক্ষমতাগুলির তিনটি বিভাগ আছে—আইন প্রণয়ন, শাসন পরিচালন এবং বিচার ব্যবস্থা। যদি এই ক্ষমতাগুলি এবং এইগুলির যে কোনও দুইটি শুধুমাত্র একজনের হাতে ন্যস্ত থাকে, তবে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। সেইজন্য তিনি

সরকারের ক্ষমতাগুলিকে বিভিন্ন স্বাধীন বিভাগের হাতে অর্পণ করিবার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। ইংলণ্ডে যদিও মণ্টেস্কুর সুপারিশ অনুযায়ী সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা হয় নাই, কিন্তু, তাঁহার তত্ত্বের মূলনীতিগুলি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে আমেরিকান এবং ফরাসী বিপ্লবের সময় এই তত্ত্বটি রাষ্ট্র-দর্শনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭৬৫ সালে ব্ল্যাকস্টোন তাঁহার "Commentaries on the laws of England" বইয়ে বলেন যে একই ব্যক্তি যদি যুগপৎ আইন প্রণয়ন বিভাগ এবং পরিচালন বিভাগের ক্ষমতা লাভ করেন, তবে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়।

ম্যাডিসনও (Madison) বলেন যে একই হাতে আইন প্রণয়ন, পরিচালন এবং বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা ন্যস্ত হওয়াই হইল স্বৈরতন্ত্রের প্রকৃত সংজ্ঞা।

ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্য-বিধানের পক্ষে যুক্তি

ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধানের পক্ষে প্রধান যুক্তি হইল, ইহাতে নাগরিকদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে, এবং সরকারের শাসনপরিচালন বিভাগ যথেচ্ছভাবে শাসনকাজ চালাইতে পারে না। তাহা ছাড়া, যদি সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান সম্পূর্ণভাবে করা হয়, তবে সরকারের কর্মকুশলতাও বাড়িয়া যায়। কিন্তু, বর্তমানকালের লেখকদের মতে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হইতেছে সচেতন জনমত, সরকারী ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নহে। বর্তমানকালে সরকারের কর্মপরিধি এত বাড়িয়া গিয়াছে যে ক্ষমতার সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যবিধান করা সম্ভবপরও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। সরকারের বিভিন্ন বিভাগ পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত। বিশেষতঃ, আইন প্রণয়ন বিভাগ এবং শাসন পরিচালন-বিভাগকে পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। নাগরিকদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা উচিত, এই যুক্তির কোনও সার্থকতা নাই। গণতান্ত্রিক সরকারের যে বিভাগ জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে, সেই বিভাগের হাতে যদি সমুদয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়, তবে সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করিলে যতটা নাগরিকদের স্বাধীনতা রক্ষিত হয় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী স্বাধীনতা সেক্ষেত্রে অর্জিত ও রক্ষিত হয়।

("In a democratic state, concentration of authority in the organ most directly representing the people may secure greater liberty than divided powers granted to independent and irresponsible organs"—Gettel.)

গ্রেট বৃটেনে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করিয়া সরকারের তিনটি প্রধান বিভাগের কাজ পরিচালিত হয়, মণ্টেস্কু এই প্রকার অনুমান করিয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই গ্রেট বৃটেনে সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি খুবই অল্প অনুসৃত হইয়াছে। মন্ত্রীসভার সকলেই আইনসভার সদস্য এবং আইন প্রণয়নে তাঁহাদের পূর্ণ ক্ষমতা আছে। মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী রাজা সব কাজ করেন এবং মন্ত্রীসভাই প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের শাসনপরিচালন বিভাগের সর্বেসর্বা। লর্ডসভা বৃটিশ আইনসভার উচ্চতর কক্ষ; কিন্তু, ইহার কিছু কিছু বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা আছে। ইহাকেই ইংলণ্ডের বিচার বিভাগের প্রধান কর্তৃপক্ষ বলা হয়। ইংলণ্ডের রাজা একাধারে রাষ্ট্রের প্রধান এবং শাসন বিভাগের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ। কিন্তু, তিনি আইনসভার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইংলণ্ডের যিনি লর্ড চ্যান্সেলার তিনি একাধারে লর্ডসভার সভাপতি, মন্ত্রীসভার সদস্য এবং ইংলণ্ডের প্রধান বিচারালয়ের বিচারপতি। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইংলণ্ডে সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি কখনই কার্যকরী হয় নাই।

গ্রেট বৃটেনে এই নীতি কার্যকরী নয়

আমেরিকার শাসনতন্ত্রে সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান যথেষ্ট পরিমাণে কার্যকরী হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইন প্রণয়ন বিভাগ, শাসনবিভাগ এবং বিচার বিভাগ পরস্পর হইতে পৃথক। রাষ্ট্রপতি শাসন বিভাগ পরিচালনা করেন এবং তাঁহাকে শাসনকাজে সাহায্য করিবার জন্য তিনি কয়েকজন সচিব (secretaries) নিযুক্ত করেন। এই সচিব-মণ্ডলীকে মন্ত্রীসভা বলা হয়। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি এবং সচিবমণ্ডলীর সদস্যগণ আইনসভার সদস্য নহেন এবং আইনসভার নিকট নিজেদের কাজের জন্য দায়ী নহেন। আইনসভাও অনাস্থা প্রস্তাব করিয়া সচিবমণ্ডলীকে পদচ্যুত করিতে পারে না। আইনসভা ও বিচারবিভাগও পরস্পরের নিকট হইতে পৃথক। কিন্তু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী হয় নাই। অধ্যাপক লাস্কি বলেন, "Unaided by the senate, the American President is a sailor on an uncharted ocean." প্রথমতঃ, সরকারের শাসন বিভাগ যে টাকা খরচ করে, তাহা মঞ্জুর করিবার দায়িত্ব হইতেছে আইনসভার। সিনেটের সম্মতি ব্যতীত রাষ্ট্রপতি কোনও সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে পারেন না। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রপতি যে সকল সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করেন, সেগুলি আইনসভার উচ্চ পরিষদ বা সিনেট কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া চাই। অপরদিকে আইনসভা যে আইন প্রণয়ন

আমেরিকায় কিছু পরিমাণে কার্যকরী, সম্পূর্ণভাবে নয়

করে, তাহাতে রাষ্ট্রপতির সম্মতি থাকা চাই। অবশ্য রাষ্ট্রপতি যদি কোনও বিল আইনে পরিণত হইবার সময় তাঁহার অসম্মতি জ্ঞাপন করেন, আইনসভা সেক্ষেত্রে বিলটি দ্বিতীয়বার অনুমোদন করিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করিতে পারে এবং সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি বড়জোর ১৪ দিন পর্যন্ত তাঁহার সম্মতি প্রদান করা হইতে বিরত থাকিতে পারেন। ইহার পর এই বিলটি অবশ্যই আইনে পরিণত হইবে। রাষ্ট্রপতি আবার অনেক সময় আইনসভায় বক্তৃতা প্রদান করিতে অথবা বাণী প্রেরণ করিতে পারেন। ইহাতেও আইনসভার সদস্যগণ শাসনবিভাগ কর্তৃক কিছু পরিমাণে প্রভাবিত হন। রাষ্ট্রপতি বিচারপতিগণকে নিযুক্ত করেন, কিন্তু তাঁহাদের বিতাড়িত করিতে পারেন না, এবং বিচারপতিগণও রাষ্ট্রপতির নির্দেশ বাতিল করিতে পারেন। আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন বাতিল করিয়া দিবার (অবশ্য যদি ইহা শাসনতন্ত্রের বিরোধী হয়) অধিকার বিচারবিভাগের আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আমেরিকার শাসনতন্ত্রেও সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধানের নীতি সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী হয় নাই।

ভারতের শাসনতন্ত্রেও সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি বিশেষ অনুসৃত হয় নাই। জরুরীকালে রাষ্ট্রপতির অর্ডিন্যান্স জারী করিবার ক্ষমতা আছে এবং মন্ত্রীসভার সদস্যগণও আইনসভার সদস্য। সুতরাং আইন প্রণয়ন বিভাগ এবং শাসন বিভাগের মধ্যে যোগসূত্র আমরা ভারতীয় শাসনতন্ত্রে দেখিতে পাই। শাসন বিভাগের কাজের জন্য মন্ত্রীসভা আইনসভার নিকট দায়ী, এবং আইনসভা কোনও অনাস্থা প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করিতে পারে। অপরপক্ষে মন্ত্রীসভার পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি যে কোনও সময়েই আইনসভা ভাংগিয়া দিতে পারেন। আইনসভা আহ্বান করা এবং আইনসভার অধিবেশন বজায় রাখার ক্ষমতাও রাষ্ট্রপতির আছে। ভারতের জেলা শাসনের দিকে তাকাইলে আমরা দেখিতে পাই, জেলাশাসকের হাতে শাসনবিভাগীয় এবং বিচারবিভাগীয় উভয়প্রকার ক্ষমতাই অর্পিত হইয়াছে। জেলাশাসক একাধারে জেলার শাসনকর্তা এবং অপরদিকে ফৌজদারী মামলার বিচারপতি। ভারতের শাসনতন্ত্রের নির্দেশাত্মক নীতিতে (Directive Principles of State Policy) বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। কিন্তু, কার্যক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, রাষ্ট্রপতি বিচারপতিদের নিয়োগ করেন, এবং প্রাণদণ্ড-মকুব প্রভৃতি কতিপয় বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা তিনি ভোগ করিয়া থাকেন। তবে রাষ্ট্রপতি সাধারণক্ষেত্রে বিচারপতিগণকে

ভারতের শাসনতন্ত্রে ইহা কার্যকরী নয়

পদচ্যুত করিতে পারেন না, এবং শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত তাহাদের বেতন ও বিভিন্ন ভাতার পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা আইনসভা অথবা রাষ্ট্রপতির (জরুরী অর্থসংকট অবস্থা ব্যতীত) নাই। অযোগ্যতা এবং অসদাচরণের অপরাধ ব্যতীত অন্য কোন কারণে রাষ্ট্রপতি বিচারপতিগণকে পদচ্যুত করিতে পারেন না। কিন্তু, বিচারপতিদের অযোগ্যতা এবং অসদাচরণের অপরাধ পার্লামেণ্ট সভার প্রতি কক্ষের এক বিশেষ সংখ্যাধিক্যের প্রস্তাবে প্রমাণিত হইতে হইবে।

দেখা যাইতেছে সরকারী ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান ইংলণ্ড, আমেরিকা অথবা ভারত, কোনও দেশেই সম্পূর্ণভাবে সম্ভবপর হয় নাই।

সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতির সমালোচনা (Criticisms of the theory of Separation of Powers) :

সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধানের পক্ষে সর্বপ্রধান যুক্তি হইল, ইহাতে নাগরিকদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে এবং সরকারের শাসন পরিচালন বিভাগ কখনই স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে না। তাহা ছাড়া, যদি সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতার সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যবিধান করা হয়, তবে সরকারের কর্মকুশলতা অনেক বাড়িয়া যাইবে। ("In the actual conduct of public affairs, a certain degree of separation of powers moves towards efficient government.")। আমরা এই উভয় যুক্তিরই সমালোচনা করিতে পারি। প্রথমতঃ জনসাধারণের স্বাধীনতা কখনই সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করিয়া অর্জিত অথবা রক্ষিত হয় না। নাগরিক স্বাধীনতা বজায় রাখিবার জন্য প্রথমতঃ চাই একটি জনমত। তাহা ছাড়া শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত মৌলিক অধিকারগুলি যাহাতে সর্বদাই সরকার কর্তৃক প্রদত্ত হয় সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করিলেই যে সরকারের কর্মকুশলতা বাড়িয়া যাইবে তাহা নহে। বরং, যদি সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র বজায় থাকে এবং যদি এই বিভাগগুলি পারস্পারিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে একটি সুসমঞ্জস নীতি অনুসরণ করে, তবে সরকারের সব বিভাগেরই কর্মকুশলতা অনেক বাড়িয়া যাইবে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় আইনসভা এবং শাসনবিভাগের মধ্যে যোগাযোগ খুবই বেশী। সেইজন্য বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে সরকারের এই দুইটি বিভাগের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা থাকা উচিত। ইংলণ্ডে

সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার প্রয়োজনীয়তা

সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা হয় নাই, কিন্তু বরাবরই ব্রিটিশ সরকারের ন্যায় কর্মকুশল সরকার খুব অল্পই দেখা গিয়াছে। তাহা ছাড়া, ইংলণ্ডে নাগরিকগণ যে অনুপাতে স্বাধীনতা ভোগ করেন, অন্য কোনও গণ-তান্ত্রিক দেশের নাগরিকগণ ইহা অপেক্ষা বেশী স্বাধীনতা ভোগ করেন না। ভারতেও সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা হয় নাই। কিন্তু ভারতেও এজন্য নাগরিক স্বাধীনতা মোটেই ক্ষুণ্ণ হয় নাই এবং সরকারের কর্মকুশলতাও কমিয়া যায় নাই। সুতরাং নাগরিকদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা উচিত, এই যুক্তির কোনও সার্থকতা নাই। সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করিলে নাগরিকদের যতটা স্বাধীনতা রক্ষিত হয়, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী স্বাধীনতা অর্জিত ও রক্ষিত হয় যখন সরকারের সমুদয় ক্ষমতা জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে এই প্রকার বিভাগের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। সরকার হইতেছে রাষ্ট্রের সুনির্দিষ্ট নীতি প্রকাশ করিবার এবং ইহা কার্যকরী করিবার একটি উপায় এবং সেজন্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে কিছু যোগাযোগ এবং সামঞ্জস্য বজায় রাখা রাষ্ট্রের সামগ্রিক স্বার্থের দিক হইতে খুবই প্রয়োজনীয়। ("The government of each state is a unit, engaged in expressing and executing the will of the state, and a certain degree of harmony among the various organs, no matter how extensively differentiated, is essential."—Gettel)। যদি চূড়ান্তভাবে সরকারের সমুদয় ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা হয়, তবে ইহা ভাল সরকার গঠনের পক্ষে প্রবল অন্তরায় হয়। অপরপক্ষে, একটি বিভাগের ক্ষমতাকে যদি অপর বিভাগের অন্য ক্ষমতার সাহায্যে প্রতিরোধ করিয়া ভারসাম্য বজায় রাখা হয়, তবে তাহাতে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে গোলযোগ এবং সংহতির অভাব ক্রমেই বাড়িয়া যায়। তাহাতে সরকারের কর্মকুশলতা অনেক কমিয়া যায়। আমেরিকার শাসনতন্ত্র প্রণয়নকালে জেম্‌স্ ম্যাডিসন্ (James Madison) বলিয়াছেন, "The powers properly belonging to one department ought not to be directly and completely administered by either of the other departments and no department ought to possess, directly or indirectly, an overruling influence over the others in the administration of their respective powers." এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতিটি খুবই নমনীয় (flexible) এবং ইহার বাস্তব উপযোগিতাও অনেক কম।

সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা শুধু অবাঞ্ছনীয়, তাহাই নহে, বাস্তবে ইহা কার্যকরী করার মধ্যে অনেক অসুবিধাও আছে। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কাজ বিভিন্ন হইলেও উদ্দেশ্য একই থাকে, প্রত্যেকেই নিজের নিজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজ করিয়া থাকে এবং অনেক সময় কোন বিভাগকে অপর কোন বিভাগের উপর নির্ভর করিতে হয়। এই বিভাগগুলির মধ্যে সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্য-বিধান করা সম্ভবপর নহে। সরকারের যে শুধু তিনটিই বিভাগ, এই যুক্তিতে সব রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদগণ একমত নহেন। অনেকের মতে সরকারের পাঁচটি বিভাগ; যথা, নির্বাচকমণ্ডলী, আইনসভা, শাসন পরিচালন বিভাগের প্রধানগণ অথবা মন্ত্রীসভা, সরকারের বাঁধাধরা কাজ করিবার জন্য শাসনবিভাগের কর্মচারী অথবা কর্মপরিষদ (administrative officials or bodies) এবং বিচার বিভাগ; এককভাবে এই পাঁচটি বিভাগের ক্রিয়াকলাপ কখনই সম্পাদিত হয় না। প্রত্যেকটি বিভাগ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং সরকারের কর্মকুশলতার দিক হইতে চিন্তা করিলে এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতা একান্ত আবশ্যক।

ইহা কার্যকরী করার অসুবিধা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিছু পরিমাণে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা হইলেও সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা সম্ভবপর হয় নাই। ইংলণ্ডে এবং ভারতেও ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি অনুসরণ করা সম্ভবপর হয় নাই।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতাগুলির স্বাতন্ত্র্যবিধান করা যে শুধু অবাঞ্ছনীয়, তাহাই নহে,—ইহা অসম্ভবও বটে। সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত করিতে হইলে আইন-সভাই হউক অথবা শাসনবিভাগই হউক, যে কোন একটি বিভাগকে অতিরিক্ত কিছু ক্ষমতা দিতেই হইবে।

বর্তমানকালে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান বলিতে সরকারী বিভিন্ন বিভাগকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা বুঝায় না। ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান বলিতে বর্তমানে দুইটি জিনিস বুঝায়। প্রথমতঃ, আইনসভা, শাসন বিভাগ অথবা বিচার বিভাগ ইত্যাদির বিভিন্ন ক্ষমতা আংশিকভাবে স্বতন্ত্র করা। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন বিভাগের ক্রিয়াকলাপগুলির স্বাতন্ত্র্যবিধান করা। মণ্টেস্কু (Montesquieu) যে অর্থে সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলির ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্য-বিধান করিবার সুপারিশ করিয়াছিলেন, সেই নীতি বর্তমানে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে ন্যায়ের দিক হইতে চিন্তা করিলে বিচার বিভাগের ক্রিয়াকলাপ শাসন বিভাগ এবং আইন সভার ক্রিয়াকলাপ হইতে কিছু পরিমাণে স্বতন্ত্র করিয়া দেওয়া উচিত যাহাতে বিচার বিভাগ ইহার নিরপেক্ষতা বজায় রাখিতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার

সরকারের ক্ষমতাগুলিকে তিনভাগে বিভক্ত করার প্রয়োজনীয়তা প্রাচীন কালের লেখকগণও অনুভব করিয়াছিলেন। ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান তত্ত্বটিকে মূলনীতি হিসাবে প্রথম বিবেচনা করেন মন্টেস্কু (Montesquieu)। ম্যাডিসনও বলেন যে একই হাতে আইন প্রণয়ন, পরিচালন, এবং বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা ন্যস্ত হওয়াই হইল স্বৈরতন্ত্রের প্রকৃত সংজ্ঞা। ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্য-বিধানের পক্ষে প্রধান যুক্তি হইল, ইহাতে নাগরিকদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে এবং সরকারের কর্মকুশলতাও বাড়িয়া যায়। গ্রেট বৃটেনে এই নীতি কার্যকরী হয় নাই। আমেরিকায় কিছু পরিমাণে সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি কার্যকরী হইয়াছে; সম্পূর্ণ পরিমাণে হয় নাই। ভারতের শাসনতন্ত্রেও সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি কার্যকরী হয় নাই। সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতির বিপক্ষে বলা যাইতে পারে যে ইহাতে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া থাকে না। অথচ, শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে কাজ করিতে হইলে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। তাহা ছাড়া, ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান না হইলে যে ব্যক্তিস্বাধীনতা সুরক্ষিত থাকিবে না, তাহা নহে। বৃটেনের শাসন-তন্ত্রে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান হয় নাই, অথচ বৃটেনের নাগরিকগণ পৃথিবীর যে কোন দেশের নাগরিকগণ অপেক্ষা বেশী স্বাধীনতা ভোগ করেন। তবে বিচার বিভাগের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা দরকার। শাসন পরিচালন বিভাগ এবং আইন প্রণয়ন বিভাগের উপর বিচার বিভাগকে কখনই নির্ভরশীল করিয়া রাখা উচিত নয়।

Exercises

1. Explain the theory of separation of Powers. How for has this theory been translated into practice in Great Britain, India and the U. S. A. (১২২-২৬ পৃষ্ঠা)

2. Explain carefully the statement that the system of "Separation of Powers" and "check and balance" prevent chaos of authority and unify governmental powers. Discuss the statement with reference to the political system of the U. S. A. (১২২-২৩ পৃষ্ঠা; ১২৪-২৫ পৃষ্ঠা)

3. "The strict separation of powers is not only impracticable as a working principle of government, but it is not one to be desired in practice."—Discuss.

(১৯২-৯৩ পৃষ্ঠা ; ১৯৬-৯৮ পৃষ্ঠা)

4. Discuss the value and limitations of the doctrine of separation of powers. (১৯২-৯৩ পৃষ্ঠা ; ১৯৬-৯৮ পৃষ্ঠা)

দ্বাদশ অধ্যায়

আইন পরিষদ
(The Legislature)

আইন পরিষদের কাজ (Functions of the Legislature) :

সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে আইনসভার গুরুত্ব খুবই বেশী। আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনের উপর ভিত্তি করিয়া শাসনবিভাগ এবং বিচারবিভাগ তাহাদের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করিয়া থাকে। আইন পরিষদের প্রধান কাজ হইতেছে আইন প্রণয়ন করা। বিভিন্ন রাষ্ট্রে আইনপরিষদগুলির আইন প্রণয়ন পদ্ধতি বিভিন্ন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে সরকারের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইতেছে আইন প্রণয়ন করা যাহাতে দেশের শাসনকাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। দ্বিতীয়তঃ, আইনপরিষদ অনেকক্ষেত্রেই গণপরিষদের ভূমিকা অবলম্বন করিয়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন অথবা শাসনতন্ত্রের সংশোধন করিয়া থাকে। স্বাধীনতার পূর্বে ভারতবর্ষে ১৯৪৬ সালের ৯ই ডিসেম্বর হইতে আরম্ভ করিয়া স্বাধীনতার পরেও আড়াই বছর পর্যন্ত আইনসভাই গণপরিষদের কাজ নির্বাহ করিত। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র সংশোধনের প্রস্তাব কংগ্রেসের উভয় পরিষদের সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত হইতে পারে। কিন্তু, ইংলণ্ডের আইনপরিষদের পক্ষে শাসনতন্ত্র সংশোধন করা খুবই সহজ। তৃতীয়তঃ, অনেক সময় আইন পরিষদ একটি নির্বাচনী সংস্থায় (electoral college) পরিণত হইয়া রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করিতে পারে। ভারতে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আইনপরিষদের উভয় কক্ষ এবং রাজ্য সরকারগুলির আইনপরিষদের নিম্নকক্ষগুলি নির্বাচনী সংস্থা গঠন করিয়া থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে কিনা তাহা নির্ধারণ করিবার দায়িত্ব মার্কিন কংগ্রেসের। চতুর্থতঃ, আইনপরিষদ জনস্বার্থ সম্পর্কিত সরকারের বিবিধ ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান চালাইবার জন্য কমিটি অথবা কমিশন নিযুক্ত করিতে পারে। পঞ্চমতঃ, সরকারের আয়ব্যয় সম্পর্কিত বিভিন্ন বিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত অন্যান্য রাষ্ট্রে আইনপরিষদের নিম্নকক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হয়। কিন্তু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইনপরিষদের উচ্চকক্ষ অথবা সিনেট—সরকারের আয়ব্যয় সম্পর্কিত বিভিন্ন বিল আলোচনা, সমালোচনা, পরিবর্তন এবং অনুমোদন করিতে পারে। ভারতে আইনপরিষদের উচ্চকক্ষ অথবা রাজ্যসভা

(Council of States) সরকারের আয়ব্যয় সম্পর্কিত বিল সম্বন্ধে আলোচনা অথবা সমালোচনা করিতে পারে ; কিন্তু ইহা পরিবর্তন অথবা অনুমোদন করিতে পারে না। ষষ্ঠতঃ, মন্ত্রীসভা চালিত সরকারে আইনপরিষদ সরকারের শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। মন্ত্রীগণকে আইনপরিষদের সদস্য হইতে হয় এবং নিজেদের কাজের জন্য আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকিতে হয়। আইন পরিষদ মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়া মন্ত্রীসভাকে পদচ্যুত করিতে পারে। কিন্তু, বর্তমানে অতিমাত্রায় নিয়মতান্ত্রিক শাসন প্রচলিত হওয়ায় আইনপরিষদ যে পরিমাণে মন্ত্রীসভাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, মন্ত্রীসভা আইনপরিষদকে তাহা অপেক্ষা বেশী পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। সপ্তমতঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইন পরিষদের উচ্চকক্ষ দুইটি বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। মার্কিন রাষ্ট্রপতি যেসকল উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করেন, তাঁহাদের নিয়োগ অনুমোদন করিয়া থাকে সিনেট। তাহা ছাড়া, সিনেটের সম্মতি ব্যতীত মার্কিন রাষ্ট্রপতি কোন সন্ধিপত্র অথবা পররাষ্ট্রের সহিত সম্পাদিত চুক্তিতে স্বাক্ষর প্রদান করিতে পারেন না। অষ্টমতঃ, আইনসভা অনেকক্ষেত্রে কিছু বিচারবিভাগীয় কাজও সম্পন্ন করিয়া থাকে। সুইজারল্যাণ্ড এবং সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে বিচারপতিগণ আইনপরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ইংলণ্ডে লর্ডসভা বিচারবিভাগের একটি প্রধান অংগ বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রায় অনেক আইনপরিষদই রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের (যেমন ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি) শাসনতন্ত্র লংঘন অথবা অসদাচরণের অভিযোগে অভিযুক্ত ((impeached)) করিতে পারে। সর্বশেষে, আইনপরিষদে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থাকে (একমাত্র সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত) বলিয়া রাজনৈতিক দলগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়া সরকার গঠনের চেষ্টা করে। আইনপরিষদে সরকারবিরোধী দলের ভূমিকা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এক-কক্ষ বনাম দ্বি-কক্ষ আইনসভা : (Unicameral vs Bicameral Legislature)

অধিকাংশ রাষ্ট্রই আইন পরিষদে দুইটি কক্ষ রাখিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছে। ইংলণ্ডের আইনপরিষদের দুইটি কক্ষ ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং জার্মান সাম্রাজ্যে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনপরিষদ জাতীয় স্বার্থ এবং রাষ্ট্র-সমবায় স্বার্থের (confederate interests) সমন্বয় ঘটাইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করিয়াছিল।

আইনপরিষদ এক-কক্ষ বিশিষ্ট হইবে অথবা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট হইবে, এই সম্বন্ধে রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদগণের মধ্যে বিশেষ মতভেদ আছে। লেকি (Lecky) তাঁহার "Democracy and Liberty" বইয়ে এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ গঠনের নীতিকে নিকৃষ্টতম বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার মতে উচ্চতর কক্ষ নিম্ন কক্ষ কর্তৃক দ্রুত আইনগুলি অভিনিবেশসহকারে পরীক্ষা করিয়া সেগুলির সংশোধন ও পরিবর্তন করিতে পারে, এবং নিম্নকক্ষের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার প্রতিরোধ করিতে পারে। নিম্নকক্ষ হইতে উচ্চতর কক্ষে বিল প্রেরণ করা এবং অনুমোদিত হওয়া সময়সাপেক্ষ। সুতরাং এই সময়ের মধ্যে কোন বিল সম্বন্ধে আলোচনা করা এবং খুঁটিনাটি বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করার যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়। সেইজন্য লেকি বলেন, "The necessity of a Second Chamber to exercise a controlling, modifying retarding influence, has acquired almost the position of an axiom." আমরা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদের পক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদান করিতে পারি।

দ্বি-কক্ষ আইন সভার পক্ষে যুক্তি

প্রথমতঃ, আইনপরিষদে দুইটি কক্ষ থাকিলে আইন প্রণয়নের ব্যাপারে যথেষ্ট বিবেচনা করা এবং সতর্কতা অবলম্বন করা সম্ভবপর হয়। এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইনপরিষদ অনেক ক্ষেত্রেই দ্রুত আইন প্রণয়ন করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়ে এবং সেক্ষেত্রে সদস্যগণ অনেক সময় ভাবাবেগে পরিচালিত হন। তাহাতে আইনপরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইনগুলি প্রায়ই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। আইনপরিষদে দুইটি কক্ষ থাকিলে ইহাদের মধ্যে প্রীতিপূর্ণ প্রতিযোগিতা হয় এবং একটি কক্ষ কর্তৃক অবলম্বিত ব্যবস্থাগুলি অপর কক্ষ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সুযোগ পায়। অধ্যাপক গেটেলের ভাষায় "Between two houses there is likely to be healthy rivalry, causing each to subject the measures of the other to careful scrutiny and resulting in more careful analysis of principles and needs than would be the case if the contest were between a majority and a minority in the single house only."

দ্বিতীয়তঃ, আইন পরিষদে দুইটি কক্ষের অস্তিত্ব থাকিলে গণ-সার্বভৌমের ইচ্ছা বিশ্লেষণ করা সহজ হয়। যদি উভয় কক্ষের সদস্যগণ একই সময়ে নির্বাচিত হইয়া বিভিন্ন সময়ে জনগণ কর্তৃক নির্বচিত হন, তবে যে কোনও একটি কক্ষের সদস্যগণের পক্ষে সর্বদা জনমতের ঘনিষ্ট সংস্পর্শে থাকা সম্ভবপর হয়।

তৃতীয়তঃ, দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনপরিষদের পক্ষে বলা হয় যে ইহা ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষক। যদি আইন পরিষদে মাত্র একটি কক্ষ থাকে, তবে ইহা যে কোন সময়েই স্বেচ্ছাচারী হইয়া যাইতে পারে এবং ইহাতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবার আশংকা থাকে। অপরপক্ষে আইনপরিষদে দুইটি কক্ষ থাকিলে এক কক্ষ অপর কক্ষের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার প্রতিবন্ধক হইতে পারে এবং স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করিতে পারে। অধ্যাপক ব্রাইস মনে করেন যে কোনও একটি পরিষদ থাকিলে ইহার স্বাভাবিক ঝোঁক থাকে স্বেচ্ছাচারিতা এবং দুর্নীতির দিকে, সেইজন্য সম-ক্ষমতাসম্পন্ন অপর কোনও পরিষদ থাকা উচিত যাহা ইহাকে প্রতিরোধ করিতে পারে। এজন্যই আইনপরিষদে দুইটি কক্ষের বিশেষ প্রয়োজন। ("The necessity of two chambers is based on the belief that the innate tendency of an assembly is to become hateful, tyrannical and corrupt, and needs to be checked by the existence of another house of equal authority".—Bryce) কিন্তু এক্ষেত্রে অধ্যাপক জন্ স্টুয়ার্ট মিলের যুক্তি অনুধাবনযোগ্য। মিল দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনপরিষদের যৌক্তিকতা স্বীকার করেন। কিন্তু শুধু স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই যে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনপরিষদের প্রয়োজন, তিনি ইহা স্বীকার করেন না। মিল্ বলেন, "I see little value on any check which a second chamber can apply to a democracy otherwise unchecked." নিম্নকক্ষের স্বৈরাচার বন্ধ করিতে হইলে নির্বাচকমণ্ডলীকে সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে এবং সেভাবে জনমত গঠন করিতে হইবে।

অধ্যাপক ব্রাইস ও জন স্টুয়ার্ট মিলের অভিমত

চতুর্থতঃ, দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনপরিষদের একটি বিশেষ সুবিধা হইল, ইহা রাষ্ট্রের বিভিন্ন শ্রেণীকে আইনপরিষদে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ প্রদান করে। দুগুইটের (Duguit) মতে শ্রেষ্ঠ আইনপরিষদ হইতেছে তাহা যেখানে একটি কক্ষ রাষ্ট্রের সমগ্র জনসমষ্টির প্রতিনিধিত্ব করিবে এবং অপর কক্ষ সমগ্র জনসমষ্টির বিভিন্ন দলের এবং বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিত্ব করিবে। এই সুবিধাটি যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষভাবে অনুভূত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি মূলরাষ্ট্র সিনেটে সমান মর্যাদা লাভের সুযোগ পাইয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে আইনপরিষদে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে একটি কক্ষের সংরক্ষণশীল দৃষ্টিভংগী এবং অপেক্ষাকৃত জনপ্রিয় কক্ষের উদারনৈতিক মতবাদের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে। ("The Conservative attitude of one

chamber may curb the radicalism of the more popular chamber."—Gettel)।

পঞ্চমতঃ, দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদে যোগ্যতর ব্যক্তিগণ আইনপরিষদের উচ্চতর কক্ষে প্রবেশ করিয়া নিজেদের কর্ম-প্রতিভা, যোগ্যতা এবং রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিবার সুযোগ লাভ করেন। তাঁহাদের পরামর্শে আইনসভার কার্যাবলীর মান অনেক উন্নত হয় এবং শাসন-ব্যবস্থারও অনেক সংস্কার সাধিত হয়। আইনপরিষদের প্রধান কাজ শুধু আইন প্রণয়ন করাই নহে, প্রণীত আইনগুলি যাহাতে সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করিতে পারে, সেদিকেও আইনপরিষদের লক্ষ্য রাখিতে হয়। যদি আইনপরিষদে যোগ্যতর ব্যক্তির স্থান থাকে, তবেই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। এজন্য উচ্চতর পরিষদে অধ্যাপক, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এবং রাজনীতিবিদ্, ব্যবহারজীবী, প্রভৃতির প্রবেশের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

সর্বশেষে, দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনপরিষদের পক্ষে আর একটি যুক্তি হইতেছে, ইহা শাসন বিভাগের ক্ষমতা অনেক পরিমাণে বাড়াইয়া দেয়। যদি আইন পরিষদে শুধু একটি কক্ষ থাকে, তবে ইহা সর্বদাই শাসন বিভাগের উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করিতে সচেষ্ট থাকে। কিন্তু, যদি আইন পরিষদে সম-ক্ষমতাসম্পন্ন দুইটি কক্ষ থাকে তবে কাহারও পক্ষেই শাসন বিভাগের উপর নিজের কর্তৃত্ব বিস্তার করা সম্ভবপর নহে। যদি, কখনও দুইটি কক্ষের মধ্যে কোন ব্যাপারে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়, তবে শাসনবিভাগের পক্ষে নিজের ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া কাজ করিবার অবস্থা অনুকূল হয়। ("Where two houses of nearly equal strength are found, the executive cannot be made responsible to both ; hence, in checking each other, the two branches of the legislative organ permit to executive a greater degree of freedom of action and responsibility."—Gettel)

উভয় কক্ষের সমান ক্ষমতাসম্পন্ন হইবার প্রয়োজনীয়তা

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কোন কোন লেখক এক কক্ষবিশিষ্ট আইনপরিষদের সমর্থক ছিলেন। আমেরিকায় বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন (Benjamin Franklin) এবং ইংলণ্ডে বেন্থাম্ (Bentham) মনে করিতেন যে আইনপরিষদে জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে শুধু এমন একটি কক্ষ থাকা উচিত এবং রাষ্ট্রের অবিভাজ্য সার্বভৌমত্ব ইহাতে ন্যস্ত করা উচিত যাহাতে ইহার মধ্যে সেই জনগণের আশা-আকাংখা বাস্তব রূপ পায়। কিন্তু পরবর্তীকালে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনপরিষদ গঠন করিবার নীতি

জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বর্তমানে এক-কক্ষ-বিশিষ্ট আইনপরিষদ গঠন করিবার নীতি কোন কোন রাষ্ট্র অনুসরণ করিয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর প্রতিষ্ঠিত অনেক নূতন রাষ্ট্রের যেমন আধুনিক গ্রীস, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, পানামা, ডমিনিকান প্রজাতন্ত্র, কস্‌টা রিকা (Costa Rica), হণ্ডুরাশ (Honduras), স্যালভাডর (Salvador) প্রভৃতি শাসনতন্ত্রে এক-কক্ষবিশিষ্ট আইনপরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক রাষ্ট্রনীতিবিদের মতে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনপরিষদ গঠনের নীতি রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের মধ্যে একটি সাময়িক নীতি মাত্র। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রগুলিতেও দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনপরিষদ জাতীয় কেন্দ্রিকতার (national centralization) গতি প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইনপরিষদের পক্ষে আমরা নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদান করিতে পারি।

এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার বিপক্ষে যুক্তি

প্রথমতঃ, যদি আইনপরিষদের মাত্র একটি কক্ষ থাকে, তবে, আইন প্রণয়ন ব্যবস্থা অনেক সরল হয়, শাসনবিভাগের দায়িত্ব কোথায় থাকিবে তাহা ঠিকভাবে নির্ধারণ করা সহজ হয় এবং নির্বাচকমণ্ডলীও একটি প্রত্যক্ষ এবং প্রামাণ্য প্রতিনিধিত্ব হয়। ("It is simple, it definitely locates responsibility and it furnishes a means for a direct, authoritative representation of the electorate.")

দ্বিতীয়তঃ, লাস্কি প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন প্রণয়নের জন্য মাত্র একটি আইনপরিষদই যথেষ্ট; উচ্চ পরিষদের প্রয়োজন আইন-প্রণয়নে খুব বেশী অনুভূত হয় না। অবশ্য মার্কিন সিনেট ব্যতীত কোন রাষ্ট্রের আইনপরিষদের উচ্চতর কক্ষ আইন প্রণয়ন ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করে না। ফরাসী লেখক আবে সিঁয়ে (Abbe Seieyes) বলিয়াছিলেন যে উচ্চ পরিষদ যদি আইন প্রণয়নের ব্যাপারে নিম্ন পরিষদের সহিত একমত হয়, তবে ইহা বাহুল্য মাত্র, আর যদি ইহা নিম্ন পরিষদের সহিত একমত না হয়, তবে ইহা বিপজ্জনক। সুতরাং, দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনপরিষদের কোন প্রয়োজন নাই। ("Of what use will a second chamber be ? If it agrees with the Respresentative House, it will be superfluous, if it disagrees, mischievous.")

তৃতীয়তঃ, আইনপরিষদের দুইটি কক্ষ থাকিলে উচ্চতর কক্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের মনোনয়ন করা যায় বটে ; কিন্তু, মনোনয়ন ব্যবস্থাকে কখনই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলিয়া অভিহিত করা যায় না।

চতুর্থতঃ, বর্তমানে নিম্নপরিষদে আইন প্রণয়ন করিবার সময় যে সব

ব্যবস্থাই দ্রুত অবলম্বিত হয়, তাহা নহে। আইনসভা বিভিন্ন কমিটির সাহায্যে যে কোনও আইন প্রণয়নের জন্য যে কোন প্রস্তাবেরই খুঁটিনাটি বিষয় পর্যালোচনা করিয়া থাকে এবং সেইগুলির উপরে যথেষ্ট বিতর্ক হয়। তাহা ছাড়া, নিম্নপরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইন যে উচ্চ পরিষদ খুব বেশী সংশোধন অথবা আংশিক বাতিল (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের ক্ষেত্রে নহে) করিতে পারে তাহা নহে। সেইজন্য অধ্যাপক লাস্কির মতে আইন প্রণয়নের জন্য একটি পরিষদই যথেষ্ট। আধুনিক আইনপরিষদের নিম্ন কক্ষে যথাসম্ভব বিতর্ক এবং বিচার-বিবেচনার পর আইন প্রণীত হয়। সুতরাং উচ্চ কক্ষের প্রয়োজনীয়তা আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে খুবই কম।

পঞ্চমতঃ, আইনপরিষদে দুইটি কক্ষ থাকিলে সরকারের খরচ অনেক বাড়িয়া যায়। ব্যয়-সংকোচনের দিক হইতে চিন্তা করিলে আইন পরিষদে একটি কক্ষ থাকা উচিত।

ষষ্ঠতঃ, উচ্চ পরিষদ সর্বদাই আঞ্চলিক সরকারগুলির স্বার্থসংরক্ষণ করিয়া থাকে, তাহা নহে। আঞ্চলিক সরকারগুলির স্বার্থসংরক্ষণ করিয়া থাকে শাসনতন্ত্র এবং স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার-বিভাগ।

সর্বশেষে, আইনপরিষদে উচ্চ কক্ষের অস্তিত্ব অনেক ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নে অহেতুক বিলম্ব ঘটাইয়া থাকে। ইংলণ্ডের লর্ডসভা এবং অন্যান্য দেশের আইনপরিষদের উচ্চ কক্ষের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে আইনপরিষদের উচ্চকক্ষ একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত অন্য কোনও দেশেই নিম্নকক্ষের দ্রুত এবং অবিবেচনা-প্রসূত আইনের প্রতিবিধান করিতে পারে না, এবং ইহার অস্তিত্ব অনেক ক্ষেত্রেই গোলযোগের সৃষ্টি করে এবং প্রত্যেক কক্ষেরই প্রকৃত দায়িত্ব কমাইয়া দেয়। ("Experience has shown that second chambers seldom provide an effective check on hasty and ill-condsidered legislation, but that they frequently result in deadlocks, in logrolling practices between the two houses, and in lack of real responsibility on the part of either house."—Gettel.)

আজকাল বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রের আইনপরিষদে আমরা উচ্চকক্ষ দেখিতে পাই। ইহার নিশ্চয়ই উপকারিতা আছে। কারণ, আঞ্চলিক সরকারগুলির সমমর্যাদা রাখিবার জন্য এবং সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থ যাহাতে আইনপরিষদে প্রতিনিধিত্ব পায় সেইজন্য ইহার গুরুত্ব খুবই বেশী। কিন্তু, সেইজন্য ইহা একেবারে অপরিহার্য নহে।

সার্বভৌম এবং অ-সার্বভৌম আইনপরিষদ (Sovereign & Non-sovereign Law-making Bodies)—আইন প্রণয়নের ব্যাপারে বিভিন্ন আইনপরিষদের যে পরিমাণ ক্ষমতা থাকে, ইহার ভিত্তিতে আইন-পরিষদগুলিকে সার্বভৌম এবং অ-সার্বভৌম আইনপরিষদ এই দুইভাগে বিভক্ত করা যায়।

সার্বভৌম আইন পরিষদ বলিতে আমরা বুঝি এমন একটি আইনপরিষদ যাহার আইন প্রণয়ন করিবার আদিম ক্ষমতা আছে এবং যাহা আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অন্য কোনও উপরের কর্তৃপক্ষ হইতে পায় নাই। দ্বিতীয়তঃ, এমন কোনও আইন রাষ্ট্রে থাকিতে পারে না যাহা প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা সার্বভৌম আইনপরিষদের নাই। তৃতীয়তঃ, এমন কোন আইন নাই যাহা ইহা সংশোধন অথবা বাতিল করিতে পারে না। সর্বশেষে কেহই সার্বভৌম আইনপরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইনের বৈধতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিতে পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আইন প্রণয়নের ব্যাপারে সার্বভৌম আইনপরিষদের ক্ষমতা অসীম। বৃটেনের রাজা-সমেত পার্লামেণ্ট (King-in-Parliament) একটি সার্বভৌম আইনপরিষদ। বৃটিশ পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা অন্য কোনও উপরের আইনপরিষদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হয় নাই। তাহা ছাড়া, উক্ত পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত আইনের বৈধতা সম্পর্কেও কেহ কোন প্রশ্ন করিতে পারে না।

অপরপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস একটি অ-সার্বভৌম আইনপরিষদ। ইহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কারণ, শাসনতন্ত্রের নিয়মানুসারে ইহাকে কাজ করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, ইহার আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস কর্তৃক প্রণীত আইনের সহিত শাসনতন্ত্রের কোনও বিধানের সামঞ্জস্য না থাকে, তবে সুপ্রীম কোর্ট ইহা বাতিল করিয়া দিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত কোনও বিলের বিরুদ্ধে ভিটো প্রয়োগ করিতে পারেন। সর্বশেষে শাসনতন্ত্র হইতে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে মূলরাষ্ট্রের আইনপরিষদগুলি যে আইন প্রণয়ন করে, সেইগুলিতে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের নাই।

সংক্ষিপ্তসার

আইন পরিষদের কাজ—আইন পরিষদের প্রধান কাজ হইতেছে আইন প্রণয়ন করা। দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন ক্ষেত্রে আইন পরিষদ শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিতে অথবা সংশোধন করিতে পারে। তৃতীয়তঃ, অনেক সময় আইন

পরিষদ একটি নির্বাচনী সংস্থায় পরিণত হইয়া রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করিতে পারে। চতুর্থতঃ, আইন পরিষদ সরকারের জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিবিধ ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান চালাইবার জন্য কমিটি অথবা কমিশন নিযুক্ত করিতে পারে। পঞ্চমতঃ, সরকারের আয় ব্যয় সম্পর্কিত বিল আইন সভা এবং বিশেষ ক্ষেত্রে আইন পরিষদের নিম্ন কক্ষ (যে সকল রাষ্ট্রে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ আছে) অনুমোদন করিয়া থাকে। ষষ্ঠতঃ, মন্ত্রীসভা চালিত সরকারে আইন পরিষদ সরকারের শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। সপ্তমতঃ, আইন-সভা কোন কোন ক্ষেত্রে (যেমন মার্কিন সিনেট) কিছু পরিমাণে শাসনবিভাগীয় ক্ষমতাও ভোগ করে। সর্বশেষে, আইন সভা কোন কোন ক্ষেত্রে বিচার-বিভাগীয় কাজও করিয়া থাকে (যেমন, ইংলণ্ডে হাউস্ অফ্ লর্ডস্) এবং দেশের শাসনকর্তা যদি শাসনতন্ত্র লংঘন করেন, তবে তাহাকে অপসারণ (impeached) করিতে পারে।

এক কক্ষ বনাম দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা—দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভার পক্ষে যুক্তি হইতেছে যে ইহাতে (১) উচ্চকক্ষ নিম্নকক্ষের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা প্রতিরোধ করিতে পারে; (২) নিম্নকক্ষ কর্তৃক দ্রুত অনুমোদিত আইনগুলি উচ্চ কক্ষ খুঁটিনাটি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে এবং দরকার হইলে সংশোধন করিতে পারে; (৩) আইন পরিষদে দুইটি কক্ষ থাকিলে নিম্ন কক্ষে গণ-সার্বভৌমের ইচ্ছা বিশ্লেষণ করা সহজ হয় এবং উচ্চ কক্ষে রাষ্ট্রের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দেওয়া যায় এবং (৪) উচ্চকক্ষে যোগ্যতর ব্যক্তিগণ প্রবেশ করিয়া নিজেদের যোগ্যতা, কর্মপ্রতিভা এবং রাজ-নৈতিক জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিতে পারেন। দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার বিপক্ষে এবং এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার পক্ষে যুক্তি হইতেছে এই যে (১) ইহাতে আইন প্রণয়ন ব্যবস্থা অনেক সরল হয় এবং নির্বাচকমণ্ডলীরও একটি প্রত্যক্ষ এবং প্রামাণ্য প্রতিনিধিত্ব হয়। (২) লাস্কি প্রমুখ রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীদের মতে আইন প্রণয়নের জন্য একটি কক্ষই যথেষ্ট; উচ্চকক্ষ থাকিলে উহাতে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের মনোনয়ন করা যায় বটে, কিন্তু মনোনয়ন ব্যবস্থা কখনই গণতান্ত্রিক নয়। (৩) দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ ব্যয় বহুল। (৪) দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদে যে সর্বদাই আঞ্চলিক সরকারগুলির স্বার্থ সংরক্ষণ করিয়া থাকে, তাহা নহে।

Exercises

1. Describe the functions of a modern legislature.
(২০১-২০২ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the position and utility of second chambers in modern states. (২০২-২০৫ পৃষ্ঠা)

3. Discuss the case for and against a single-chamber legislature. (২০৫-২০৭ পৃষ্ঠা)

4. "If a second chamber dissents from the first, it is mischievous, if it agrees with it, it is superfluous."—Examine this statement. (২০২-২০৫ পৃষ্ঠা)

5. How will you distinguish a non-sovereign law-making body from a sovereign law-making body? Give reasons for your answer. (২০৮ পৃষ্ঠা)

———

ত্রয়োদশ অধ্যায় | নির্বাচকমণ্ডলী (The Electorate)

আঞ্চলিক বনাম বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্ব (Territorial vs. Functional Representation) : আধুনিক গণতন্ত্রে সাধারণতঃ আঞ্চলিক-ভিত্তিতেই আইনপরিষদে প্রতিনিধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কোনও একটি নির্দিষ্ট এলাকাই নির্বাচনের কেন্দ্র (constituency) হিসাবে গণ্য করা হয় এবং সেই এলাকার ভোটাধিকারসম্পন্ন নাগরিকগণ ভোট দিয়া স্থানীয় প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। ইহাকে আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব (Territorial Representation) বলা হয়। কোনও অঞ্চলের অধিবাসীদের স্বার্থ সাধারণতঃ এক প্রকার। কোনও একটি বিশেষ অঞ্চলে হয়ত বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বাস করে। কিন্তু তাঁহারা সমস্বার্থসম্পন্ন হওয়ায় নিজেদের একজন আঞ্চলিক প্রতিনিধি নির্বাচিত করেন এবং সেই নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করেন। যাঁহারা এই ধরণের আঞ্চলিক নির্বাচন সমর্থন করেন, তাঁহাদের মতে একই অঞ্চলের অধিবাসী বিভিন্ন লোকদের স্বার্থ প্রায় একপ্রকার হওয়ায় এলাকার ভিত্তিতে তাঁহাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার অধিকার প্রদান করা উচিত এবং নিজেদের রাজনৈতিক মত প্রকাশের স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। আঞ্চলিক স্বার্থ জনমতকে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করে। কিন্তু, অধ্যাপক কোল্ প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ এই মতবাদ সমর্থন করেন না। তাঁহাদের মতে বিভিন্ন মানুষ একই অঞ্চলের অধিধাসী হইলেই যে তাহাদের রাজনৈতিক মতামত একপ্রকার হইবে অথবা তাহাদের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ একপ্রকার হইবে, এই প্রকার কোনও নিশ্চয়তা নাই। যদি একই অঞ্চলের অধিবাসীদের স্বার্থ একপ্রকার হইত, তবে আমরা দেশে শিল্প-বিরোধ, জমিদার ও প্রজার মধ্যে বিরোধ এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও কেরানীদের মধ্যে বিরোধ দেখিতে পাইতাম না। জীবন-সংগ্রাম বর্তমানকালে এত কঠোর হইয়াছে যে মানুষের মধ্যে সমস্বার্থ কল্পনা করাও সহজ নয়। সেজন্য আধুনিককালের আইন-পরিষদের বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্বের (functional representation) দাবী দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক বৃত্তির জন্য যদি পৃথক নির্বাচনকেন্দ্র থাকে, তবে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের রাজনৈতিক মতামতের পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব আইনপরিষদে হইবে। গণতান্ত্রিক আদর্শ যাহাতে উপযুক্ত মর্যাদা পায় সেজন্য বৃত্তিগত নির্বাচনকেন্দ্রের ব্যবস্থা থাকা উচিত। আমাদের দেশে রাজ্য-

বিধানমণ্ডলীর উচ্চকক্ষে বৃত্তিগত নির্বাচনকেন্দ্র আছে, যেমন শিক্ষককেন্দ্র (Teachers' constituency)। যদি আইনপরিষদে প্রত্যেকশ্রেণীর লোকেরাই নিজেদের স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করিতে এবং বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে নিজেদের মতামত প্রকাশ করিতে পারে, তবেই প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। ("Real democracy is to be found not in a single omnicompetent assembly, but in a system of co-ordinated functional representative bodies"). কিন্তু বৃত্তিগত নির্বাচনপ্রথার বিরুদ্ধবাদীগণ বলেন, এই নীতি জাতীয় সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী। কারণ ইহাতে সমাজের কতিপয় বিশেষশ্রেণীর লোকদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হয়।

ভোটাধিকারের ভিত্তি (Basis of Suffrage) :

মধ্যযুগে যখন নির্বাচনপদ্ধতি সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে তখন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ সামাজিক শ্রেণী ও মর্যাদা অথবা সম্পত্তির ভিত্তিতে নির্বাচকগণকে ভোট প্রদান করিবার অধিকার প্রদানের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু গণতন্ত্রের বিকাশের সংগে সংগে এবং শ্রেণী-বৈষম্যের অবসান হওয়ার সংগে সংগে মানবিক সাম্য এবং গণ-সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন উঠে এবং বয়সের ভিত্তিতে ভোটাধিকার প্রদান করিবার দাবী গৃহীত হইতে থাকে। অনেকের মতে আবার শিক্ষাই ভোটাধিকারের ভিত্তি হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে, সম্পত্তি, কর প্রদান, এবং শিক্ষা কোনটিই ভোট প্রদান করিবার অধিকার লাভের প্রকৃত ভিত্তি হইতে পারে না। যাহার সম্পত্তি আছে এবং যিনি কর প্রদান করেন, তাহার হয়ত প্রকৃত রাজনৈতিক সচেতনতা নাই অথবা রাজনৈতিক শিক্ষা নাই। আবার যাহাদের পুঁথিগত বিদ্যা নাই অথবা সরকারের দৃষ্টিতে যাঁহারা শিক্ষিত নহেন, তাঁহাদের মধ্যেও হয়ত অনেক ব্যক্তি থাকিতে পারেন যাঁহারা প্রকৃতই রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন এবং সরকারের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন। তাহা ছাড়া, সম্পত্তি, কর প্রদান এবং শিক্ষার ভিত্তিতে নাগরিকদের ভোটাধিকার প্রদান করিলে তাহাদের মধ্যে বৈষম্য আরও বাড়াইয়া দেওয়া হইবে এবং ইহাতে গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। গণতন্ত্রে প্রত্যেকেরই সমান অধিকার থাকা উচিত এবং সেক্ষেত্রে ধনী এবং গরীবের মধ্যে রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে কোনও প্রকার তারতম্য করা উচিত নহে। এমন অনেক গরীব ব্যক্তি আছেন যাঁহাদের রাজনৈতিক জ্ঞান এবং শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করিবার ক্ষমতা খুবই বেশী এবং যাঁহাদের সাহায্যে রাষ্ট্র বিশেষভাবে উপকৃত হইতে পারে তাঁহাদের নির্বাচিত হইবার অধিকার প্রদান করা উচিত। সেজন্য

সর্বজনীন ভোটাধিকারের পক্ষে যুক্তি

অনেকে বলেন, প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক মাত্রেরই ভোট প্রদান করিবার অধিকার থাকা উচিত। ইহাকেই সর্বজনীন ভোটাধিকারনীতি (Universal Suffrage) বলে। এই নীতির সমর্থনে বলা হয়, "যাহা সকলকে স্পর্শ করে, তাহা সকলের দ্বারাই নির্ধারিত হওয়া উচিত" ("What toucheth all, should be decided by all.")। সুতরাং প্রত্যেকেরই রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার আছে এবং সেই অধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যেককেই শাসক নির্বাচনে ভোট প্রদান করিবার অধিকার দেওয়া উচিত। কোন ব্যক্তিকে বা দলকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার অর্থ হইতেছে গণতন্ত্রের অমর্যাদা করা, কেননা, সেক্ষেত্রে অন্যান্য শ্রেণীর সমপর্যায়ে সেই ব্যক্তি অথবা দলকে উন্নীত করা হয় না। অধ্যাপক জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে, যদি সমাজের কোনও একটি শ্রেণীকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়, তবে সেই শ্রেণীর স্বার্থ আইনপরিষদে অবহেলিত হয়।

সর্বজনীন ভোটাধিকারের অর্থ এই নয় যে সমাজের সকলেরই ভোট প্রদান করিবার অধিকার থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের এই নীতি অনুযায়ী ভোট প্রদান করিবার অধিকার দেওয়া হয়। আবার প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের মধ্যে যদি কেহ উন্মাদ, দেউলিয়া অথবা ফৌজদারী আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযুক্ত হয়, তাহাদের ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইতে পারে। রাশিয়ায় ১৮ বৎসর বয়সে, ইংলণ্ড, ভারতবর্ষ এবং আমেরিকায় ২১ বৎসর বয়সে এবং নরওয়েতে ২৩ বৎসর বয়সে নাগরিকগণকে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ভোট প্রদান করিবার অধিকার দেওয়া হয়।

কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সর্বজনীন ভোটাধিকার নীতি সমর্থন করেন না। তাঁহাদের মতে অনেক দেশেই নির্বাচকমণ্ডলীর একটি বিরাট অংশ (যেমন ভারতের ক্ষেত্রে) অশিক্ষিত এবং অজ্ঞ থাকে। সেক্ষেত্রে তাঁহাদের রাজনৈতিক সচেতনতাও কম হইবার সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। যাহারা কল্যাণকারক রাষ্ট্রগঠনে নিজেদের শিক্ষা অনুযায়ী ভোটাধিকারের সদ্ব্যবহার করিতে সক্ষম, শুধু তাহাদেরই ভোট প্রদান করিবার অধিকার প্রদান করা উচিত।

সর্বজনীন ভোটাধিকারের আগে সর্বজনীন শিক্ষার প্রয়োজন

জনসাধারণের যোগ্যতম প্রার্থী নির্বাচনে কতটা বিবেচনাশক্তি আছে সেবিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। কিন্তু আমরা এই অভিমত সর্বদা গ্রহণযোগ্য মনে করি না। অবশ্য জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে "সর্বজনীন ভোটাধিকারের আগে সর্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত" ("Universal education must precede universal enfranchisement"—Mill)। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে আমরা

দেখিতেছি, সর্বজনীন শিক্ষা না থাকিলেও সর্বজনীন ভোটাধিকারের উদ্দেশ্য মোটেই ব্যর্থ হয় নাই। রাষ্ট্রেরই উচিত, নাগরিকগণকে সুশিক্ষিত করিয়া তোলা। শুধু সম্পত্তিশালী ব্যক্তিগণকে ভোটাধিকার প্রদান করিলে সমাজে ধনী কর্তৃক গরীবদের শোষণ ক্রমেই বাড়িয়া চলিবে এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের হাতে সমাজের অর্থনৈতিক শক্তি কেন্দ্রীভূত হইবে। সুতরাং সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রদান ব্যতীত গণতান্ত্রিক আদর্শ কখনই সার্থক হইতে পারে না।

স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার (Woman suffrage) :

অধ্যাপক জন স্টুয়ার্ট মিল প্রথম স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার সমর্থনে কতিপয় যুক্তির অবতারণা করেন। বহুদিন পর্যন্ত স্ত্রীলোকেরা এই অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার প্রদান করিবার জন্য বিভিন্ন দেশে আন্দোলন আরম্ভ হয়। বর্তমানে প্রত্যেক গণতান্ত্রিক দেশেই স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে।

অধ্যাপক মিলের মতে ভোট প্রদান করিবার অধিকার মানুষের জন্মগত ; শুধু পুরুষেরাই এই অধিকার লাভ করে না, স্ত্রীলোকেরাও ভোট প্রদান করিবার অধিকারের জন্য দাবী করিতে পারে। কেবলমাত্র স্ত্রীলোক হইবার অপরাধে এবং শারীরিক দুর্বলতার জন্য স্ত্রীলোককে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করা কোনক্রমেই সমর্থন করা যায় না। যাঁহারা স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার সমর্থন করেন না, তাঁহাদের মতে স্ত্রীজাতি ভোটদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইলে অনেক সময় স্বামী ও স্ত্রী, পিতা ও কন্যা এবং ভ্রাতা ও ভগিনীর মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হইতে পারে এবং ইহাতে গার্হস্থ্য-জীবনের প্রীতিপূর্ণ পরিবেশ ও সুখশান্তি নষ্ট হইতে পারে। তাহা ছাড়া, এই যুক্তি অনুযায়ী স্ত্রীজাতি যদি অত্যধিক পরিমাণে রাজনৈতিক-চেতনাসম্পন্ন হইয়া যায়, তবে সাংসারিক জীবনে তাঁহাদের অনেক কর্তব্যই অবহেলিত হইবে। নিজেদের নিরাপত্তার জন্য স্ত্রীজাতিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষের মুখাপেক্ষী হইতে হয়, সুতরাং কোনক্রমেই তাঁহাদের ভোটাধিকার প্রদান করা যায় না। আবার অনেকের মতে প্রয়োজন হইলে যুদ্ধে যোগদান করিবার সামর্থ্যই যদি ভোটাধিকার লাভের সর্ত হয়, তবে স্ত্রীলোকেরা কখনই ভোটাধিকার লাভ করিতে পারে না। স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার প্রদানের যুক্তির বিরুদ্ধে এই কথাও বলা হয় যে অনেক স্ত্রীলোকই ভোটাধিকার চায় না, সুতরাং ইহার কোন প্রয়োজন নাই।

কিন্তু অধ্যাপক মিলের মতে স্ত্রীলোক হওয়ার অপরাধে মানবসমাজের একটি বিরাট অংশকে সামাজিক জীবনের এই দুর্লভ অধিকার হইতে বঞ্চিত করা কোন প্রকারেই সমর্থনযোগ্য নহে। মিল মনে করেন, স্ত্রীজাতিকে ভোটাধিকার প্রদান করিলেই যে তাহাদের স্ত্রীসুলভ সুকুমার বৃত্তিগুলি নষ্ট হইয়া যাইবে, তাহা নহে। স্ত্রীলোকদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্য শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করা উচিত এবং সেই প্রচেষ্টায় প্রথম পদক্ষেপ হইতেছে ভোটাধিকার লাভ। স্ত্রীলোকেরা যদি ভোটাধিকার নাও চায়, তবুও তাহাদের সেই অধিকার প্রদান করা উচিত। স্ত্রীলোকেরা ভোটাধিকার লাভ করিলে নিজেদের পরিবারে তাঁহাদের মর্যাদা অনেক বাড়িয়া যায় এবং ইহা তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে। স্ত্রীলোককে সমস্ত রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলে সরকার গণতান্ত্রিক আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইবে এবং স্ত্রীলোকের মৌলিক অধিকার খর্ব করিবে। স্ত্রীলোকেরা যুদ্ধে যোগদান করিতে সক্ষম নয় বলিয়া তাঁহাদের ভোটাধিকার প্রদান করা উচিত নয়, এই যুক্তি আমরা কখনই সমর্থন করিতে পারি না। স্ত্রীজাতি হয়ত যুদ্ধে সৈনিকের ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে না, কিন্তু সেবিকার ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে। বর্তমানে যখন মানুষের দৈনন্দিন জীবন অর্থনৈতিক চাপে বিপর্যস্ত হইতেছে, স্ত্রীলোকেরাও ঘরের আশ্রয় ছাড়িয়া বাহিরের আহ্বানে বিভিন্নকর্মে যোগদান করিতেছে। শুধু তাহাই নহে, বিভিন্ন পেশায় স্ত্রীলোকেরা পুরুষের সমান যোগ্যতার পরিচয় দিতেছে। সুতরাং দৈহিক বা মানসিক অক্ষমতার অজুহাতে স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা উচিত নহে। মিলের মতে স্ত্রীলোককে ভোটের অধিকার দিলে শাসনব্যবস্থার নৈতিক মান উন্নত হইবে। ১৯১৮ সালে ইংলণ্ডে স্ত্রীজাতির ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সমান অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে।

স্ত্রীলোকের ভোটাধিকারের পক্ষে মিলের যুক্তি

একাধিক ভোটদান (Plural or Weighted voting):

যখন একই ব্যক্তিকে একাধিক ভোটদান করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়, অর্থাৎ, যখন কোন নাগরিক নিজের যোগ্যতার জন্য দুইটি বা ইহার বেশী ভোট প্রদান করিবার অধিকার লাভ করে তখন ইহাকে একাধিক ভোট প্রদান ব্যবস্থা বলে। আমাদের দেশে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকই ভোটাধিকার লাভ করিয়াছে। কিন্তু, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক অথবা স্কুল-কলেজের শিক্ষকগণের স্নাতককেন্দ্রে অথবা শিক্ষাকেন্দ্রে ভোট প্রদান করিবার অধিকার

আছে। একাধিক ভোটদানের আর একটি প্রকারভেদ আছে,—ইহাতে কোন কোন নাগরিকের ভোট দানের উপর বিশেষ গুরুত্ব (weighted voting) আরোপ করা হয়। যেমন, কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত শিক্ষক এবং সম্পত্তির অধিকারীদের ভোটপ্রদান অশিক্ষিত এবং নির্ধনের ভোট প্রদান অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত এবং সম্পত্তিশালী ও নির্ধনের মধ্যে তারতম্য করিবার জন্যই প্রথম শ্রেণীর লোকদের একাধিক ভোটাধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে অগণতান্ত্রিক এবং বিশেষ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র ব্যতীত ইহা সমর্থনযোগ্য নহে।

এই পদ্ধতির সমর্থনকারীদের মতে শিক্ষিত ব্যক্তিদের যোগ্যতা অশিক্ষিত ব্যক্তিদের অপেক্ষা অনেক বেশী। কিন্তু, এই যুক্তি যে সর্বদাই খাটে তাহা নহে। শিক্ষিত এবং অজ্ঞের মধ্যে তারতম্য যদিও বা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মানিয়া লওয়া যায়, ভোট প্রদান ব্যবস্থায় সম্পত্তিশালী এবং নির্ধনের মধ্যে তারতম্য কোন অবস্থায়ই মানিয়া লওয়া যায় না। অবশ্য যাঁহারা এই তারতম্য সমর্থন করেন, তাঁহাদের মতে সম্পত্তিশালীদের স্বার্থ যাহাতে সম্পত্তিবিহীনদের সংখ্যাধিক্যের জোরে আইন পরিষদে অবহেলিত না হয় সেজন্যই তাহাদের একাধিক ভোটাধিকার প্রদান করা উচিত। কিন্তু গণতান্ত্রিক দেশে এই আশংকা সম্পূর্ণ অমূলক। গণতন্ত্রে সকলেরই সমান অধিকার থাকে এবং থাকা উচিত। সেখানে নাগরিকদের মধ্যে কোনও প্রকার তারতম্য করিলেই গণতন্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। তাহা ছাড়া, অশিক্ষিত এবং শিক্ষিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এমন কোন গ্রহণযোগ্য মাপকাঠি নাই যাহাতে তাহাদের রাজনৈতিক সচেতনতা এবং যোগ্যতার পরিমাপ করা যাইতে পারে।

প্রকাশ্য এবং গোপন ভোট (Public and Secret voting) **:**

ভোটদান প্রকাশ্যে অথবা গোপনে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত—এই সম্বন্ধে পূর্বে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ ছিল। বর্তমানে গোপন ভোটদান ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নাই। প্রকাশ্যে ভোটদান করিবার নীতির সমর্থনে বলা যায়, ভোটদাতাগণ যদি সকলের সামনেই বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ভোট দান করে, তবে ইহা তাহাদের সৎসাহসের পরিচায়ক হইবে। ভোট প্রদান করা প্রত্যেক নাগরিকেরই কর্তব্য এবং ইহা সর্বসমক্ষেই হওয়া উচিত। কিন্তু, এই ব্যবস্থা যে সর্বদাই সমাজের পক্ষে কল্যাণকারক হয়, তাহা নহে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্বাচনপ্রার্থীগণ ভোটদাতাগণকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। যদি কোনও কেন্দ্রে একাধিক নির্বাচন-

প্রার্থী থাকে, তখন কোন ভোটদাতার পক্ষে প্রকাশ্যে ভোট প্রদান করা কঠিন হইয়া পড়ে। কেননা, এজন্য তাহাকে এক পক্ষের নিন্দা এবং অপরপক্ষের স্তুতি কুড়াইতে হইবে। অনেক ক্ষেত্রে ভোটদাতা ভয়ে অথবা কাহারও প্রতি বাধ্যবাধকতার ফলে নিজের বিবেকের নির্দেশে ভোট প্রদান করিতে পারে না। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলই বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করিয়া ভোট আদায়ের চেষ্টা করিয়া থাকে। দল-নিরপেক্ষ ভোটদাতার পক্ষে সেক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন করা প্রকাশ্য অপেক্ষা গোপনে করাই সহজ। গোপনে ভোটদাতা যখনই ভোট প্রদান করিবে তখন কোন রাজনৈতিক দলই জানিতে পারিবে না সে কাহাকে ভোট দিয়াছে। সেক্ষেত্রে নির্বাচনের মর্যাদাও উপযুক্তভাবে রক্ষিত হয় এবং ভোটদাতাও নিজের বিবেকের নির্দেশ অনুযায়ী ভোট প্রদান করিতে পারে। যদি রাষ্ট্র কখনও ভোটদাতাকে প্রকাশ্যে ভোট প্রদান করিবার ফলস্বরূপ উৎপীড়নের হাত হইতে রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি দিতে পারে, তবেই প্রকাশ্য ভোট প্রদান করিবার নীতি চালু করা সম্ভব গণতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করিতে হইলে প্রত্যেক ভোটদাতাকেই তাহার নিজের ইচ্ছানুযায়ী প্রার্থী নির্বাচন করিবার অধিকার দেওয়া উচিত এবং ইহা গোপন ভোট প্রদানের ব্যবস্থার মাধ্যমেই সম্ভবপর হইতে পারে।

(c) **সীমাবদ্ধ ভোট** (Limited voting)

আইনপরিষদে সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার একটি উপায় হইতেছে সীমাবদ্ধ ভোট প্রদান করিবার ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী কোন নির্বাচনকেন্দ্র হইতে একাধিক প্রার্থী নির্বাচিত হইতে পারে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠদের সীমাবদ্ধ প্রতিনিধি নির্বাচিত করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয় যাহাতে সংখ্যালঘুগণও নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যদি কোনও কেন্দ্রে সাতটি আসন থাকে, তবে সেক্ষেত্রে কোনও ভোটারকেই চারজনের বেশী প্রার্থীর পক্ষে ভোট প্রদান করিবার অধিকার দেওয়া হইবে না। সেক্ষেত্রে সংখ্যাগুরুগণ বড় জোর চারজন প্রতিনিধি নির্বাচিত করিতে পারে। অপর তিনজন প্রতিনিধি স্বাভাবিকভাবেই সংখ্যালঘুগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন।

(d) **নির্বাচনকেন্দ্র** (Constituency)

যখন কোনও নির্দিষ্ট এলাকার নাগরিকগণ আইনপরিষদে এক বা একাধিক প্রতিনিধি নির্বাচন করে, তখন সেই এলাকাকে নির্বাচনকেন্দ্র (Constituency) বলা হয়। নির্বাচনকেন্দ্র যখন একটি নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকে, তখন ইহাকে স্থানগত নির্বাচনকেন্দ্র (Territorial constituency) বলে।

আবার যখন নির্বাচনকেন্দ্র একটি নির্দিষ্ট বৃত্তিকে কেন্দ্র করিয়া সংগঠিত হয়, তখন ইহাকে বৃত্তিগত নির্বাচনকেন্দ্র বলে। যেমন, পশ্চিমবংগের বিধান-মণ্ডলীর উচ্চকক্ষের জন্য স্নাতকদের একটি নির্বাচনকেন্দ্র আছে। স্থানগত নির্বাচনকেন্দ্র সাধারণতঃ নির্দিষ্ট এলাকার লোকসংখ্যার ভিত্তিতে সংগঠিত হয়। যখন প্রতি নির্বাচনকেন্দ্র হইতে আইন-পরিষদে মাত্র একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন, তখন ইহাকে একজন সদস্য-সমন্বিত নির্বাচনকেন্দ্র (single member constituency) বলে। যখন প্রতি নির্বাচনকেন্দ্র হইতে আইন-পরিষদে একাধিক প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় তখন ইহাকে বহুসদস্য-সমন্বিত নির্বাচনকেন্দ্র (Multiple member constituency) বলে।

সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতিনিধিত্ব (Representation of the Minorities): গণতান্ত্রিক সরকারে আইনপরিষদে যে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা থাকে, সেই দলই সরকার গঠন করিয়া থাকে। যদি সংখ্যালঘু-সম্প্রদায়ের লোকদের আইনসভায় কোন প্রতিনিধিত্ব না থাকে, তবে প্রতিপদেই তাহাদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হইবার আশংকা থাকে। কিন্তু, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করিলেও যাহাতে সংখ্যালঘিষ্ঠ দলগুলির স্বার্থ উপেক্ষিত না হয়, সেজন্য অধ্যাপক জন স্টুয়ার্ট মিল সমগ্র জনসাধারণের সরকারকে শুধু মাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠদের সরকারে পরিণত হওয়ার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। তাঁহার মতে শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠদের লইয়া সরকার গঠন করা এবং সংখ্যা-লঘিষ্ঠদের সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা অগণতান্ত্রিক ও অন্যায়; গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করিবে। ("It is an essential part of Democracy that minorities should be adequately represented."—Mill). সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতিনিধিত্ব ব্যতীত গণতন্ত্র কখনই সার্থক হয় না। মিলের মতে সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতিনিধিত্ব যাহাতে তাহাদের সংখ্যার অনুপাতে হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আবার, আজ যে দল আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ, ভবিষ্যতে হয়ত সেই রাজনৈতিক দল সংখ্যালঘিষ্ঠে পরিণত হইতে পারে, সুতরাং আইনসভায় সংখ্যালঘিষ্ঠদের সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব উপেক্ষণীয় নহে।

সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতিনিধিত্বের পক্ষে যুক্তি

কিন্তু যাঁহারা আইনপরিষদে সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতিনিধিত্বের দাবী স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে ইহাতে জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত হয়। কেননা আইনসভায় প্রতিটি সংখ্যালঘিষ্ঠ দল ইহার সংকীর্ণ দৃষ্টি হইতে জাতীয় সমস্যাবলীর আলোচনা করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ইহা আইনপরিষদের নির্বাচনে জটিলতার সৃষ্টি করে এবং শাসনব্যবস্থাকে দুর্বল করে। তৃতীয়তঃ,

সংখ্যালঘিষ্ঠদের সমানুপাতিক নির্বাচন প্রথা চালু করিলে নির্বাচকমণ্ডলী গঠন এবং নির্বাচনপদ্ধতি লইয়া জটিলতার সৃষ্টি হয়। চতুর্থতঃ, প্রতিটি সংখ্যালঘিষ্ঠদলই যদি সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব চায়, তবে আইনপরিষদ কতিপয় বিরোধী দলের পারস্পরিক কলহের ক্ষেত্রে পরিণত হইবে। প্রতিটি দলই তখন অন্যান্য দলের সহযোগিতায় সরকার গঠনের চেষ্টা করিবে এবং মন্ত্রীসভার ভিত্তি অনেক দুর্বল হইয়া পড়িবে। সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতিনিধিত্বের এই সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও আমরা ইহার গুরুত্ব অস্বীকার করিতে পারি না। সংখ্যালঘিষ্ঠদের যদি প্রতিনিধিত্বের কোনও সুযোগই দেওয়া না হয়, তবে গণতন্ত্র ইহার মূল আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইবে।

সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্বের নিম্নলিখিত বিভিন্ন প্রণালী আমরা দেখিতে পাই :—

সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation) : সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নিয়ম দুই প্রকার। প্রথমটিকে একক হস্তান্তর-যোগ্য ভোটে (single transferable vote) নির্বাচন-পদ্ধতি বলা হয়। এই নিয়মটি খুবই জটিল। ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অথবা সম্প্রদায়ের নির্বাচক-সংখ্যা এবং মোট প্রতিনিধিসংখ্যার মধ্যে অনুপাত বজায় রাখিয়া সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতিনিধি-সংখ্যা নির্বাচন করা। যেমন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নির্বাচক-সংখ্যা যদি মোট নির্বাচক-মণ্ডলীর এক-তৃতীয়াংশ হয়, তবে তাহারা আইনপরিষদের এক-তৃতীয়াংশ আসন পাইবে। এই নিয়ম অনুযায়ী ভোটের সংখ্যা আসন-সংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল অনুযায়ী যে সংখ্যা পাওয়া যায় সেই সংখ্যক ভোট নির্বাচনের জন্য আবশ্যক বলিয়া গণ্য করা হয়। ইহাকে 'কোটা' (quota) বলে।

প্রত্যেক নির্বাচনপ্রার্থীর নামের পাশে ভোটদাতা ১, ২, ৩, ইত্যাদি সংখ্যাদ্বারা তাহার প্রথম মনোনয়ন, দ্বিতীয় মনোনয়ন ইত্যাদি প্রকাশ করে। যে নির্বাচনপ্রার্থী প্রথম মনোনয়ন সর্বাপেক্ষা বেশী পান, তাঁহাকে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করা হয়। নির্বাচিত ব্যক্তি তাঁহার প্রথম মনোনয়নের ভোট 'কোটা' অপেক্ষা যতগুলি বেশী পান, সেগুলি যে যে প্রার্থীরা দ্বিতীয় মনোনয়ন পাইয়াছেন, তাঁহাদের হিসাবে জমা দেওয়া হয়। এইরূপে নির্দিষ্টসংখ্যক ভোট পাইয়া আরও কয়েকজন নির্বাচিত হন। যতক্ষণ পর্যন্ত নির্দিষ্ট আসনগুলি পূর্ণ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত মনোনয়নের ভিত্তিতে এইভাবে গণনা চলিতে থাকে। এই নিয়মে ভোটদাতার প্রথম পছন্দ অথবা প্রথম মনোনয়ন কার্যকরী না হইলেও একটি ভোট অন্ততঃ কার্যকরী হইবে। ১৮৫৭ সালে টমাস্ হেয়ার

(Thomas Hare) নামে একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই নিয়মের প্রবর্তন করেন। সেজন্য এই নিয়মটিকে হেয়ার পরিকল্পনা (Hare scheme) বলা হয়। এই নিয়মটি খুব জটিল বলিয়া সর্বজনীনভাবে গৃহীত হয় নাই। বিশেষতঃ, যে দেশে নির্বাচকমণ্ডলীর অধিকাংশই অজ্ঞ অথবা অল্পশিক্ষিত, সে দেশে এই প্রথা সফল হইবে না।

সমানুপাতিক নির্বাচনের আর একটি প্রণালী আছে; ইহাকে তালিকা-প্রথায় সমানুপাতিক নির্বাচন (Proportional representation by the list system) বলা হয়। এই প্রথায় প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল তাহাদের মনোনীত প্রার্থীদের একটি list or panel গঠন করে। নির্বাচন-প্রার্থীর সংখ্যা মোট আসন-সংখ্যার সমান হওয়া চাই। নির্বাচনকেন্দ্রে যতগুলি আসন থাকিবে ভোটদাতা ততগুলি ভোটপ্রদান করিতে পারিবে। এই নিয়মটির বৈশিষ্ট্য হইতেছে, যখনই ভোটদাতা ভোট প্রদান করিবে, তখন তাহাকে প্রার্থী হিসাবে ভোট প্রদান না করিয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মনোনীত তালিকা অনুযায়ী ভোট প্রদান করিতে হইবে। প্রত্যেক তালিকার উপর যতগুলি ভোট প্রদত্ত হইবে, সেই মোট ভোটসংখ্যার 'কোটা' দিয়া ভাগ করিলে যে ভোটসংখ্যা পাওয়া যাইবে, সেই সংখ্যক প্রতিনিধি উক্ত তালিকা হইতে নির্বাচিত হইল বলিয়া ঘোষণা করা হইবে। এক্ষেত্রে 'কোটা' নির্ধারিত হয় মোট ভোটসংখ্যা এবং মোট আসন-সংখ্যার ভাগফল দ্বারা।

তালিকা প্রথায় সমানুপাতিক নির্বাচন

এই নিয়মটিও যে খুব সরল তাহা নহে। তবে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট প্রদান করিবার নিয়মের মত ইহা তত জটিল নয়। এই নিয়মটির একটি বিশেষ সুবিধা হইতেছে এই যে ইহাতে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় এবং প্রত্যেকটি দলই নিজেদের সংখ্যার অনুপাতে আইনপরিষদে প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার সুযোগ পায়। হেয়ার পরিকল্পনার ন্যায় এই নিয়মটি ব্যয়সাধ্য নহে। তবে এই ব্যবস্থার একটি ত্রুটি হইতেছে এই যে ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে নির্বাচন-প্রার্থীর যোগ্যতা অপেক্ষা সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের স্বার্থ এবং প্রভাবই ভোটদাতার কাছে বড় হইয়া দাঁড়ায়।

স্তূপীকৃতভাবে ভোট প্রদান পদ্ধতি (Cumulative Vote System)—এই নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচনকেন্দ্রে যতগুলি আসন আছে ভোট প্রদানকারী ততগুলি ভোট দিবার অধিকার পায় এবং কোন্ প্রার্থীকে কয়টি ভোট দিবে তাহাও ভোটদাতার উপর নির্ভর করে। যদি কোনও কেন্দ্রে চারিটি আসন থাকে, তবে ভোটদাতা চারিটি আসনই কোন প্রার্থীকে দিতে

পারে, অথবা তিনটি ভোট একজনকে দিতে পারে অর্থাৎ, নিজের ইচ্ছানুসারে ভোটদাতা ভোটগুলি প্রার্থীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে পারে। সংখ্যালঘুগণ এই নিয়ম অনুযায়ী আইনপরিষদে তাহাদের প্রার্থী নির্বাচনের একটি বিশেষ সুযোগ পায়। যখন সমুদয় ভোট একজনকেই দেওয়া হয়, তখন ইহাকে Plumping বলা হয়। এই নিয়মের একটি প্রধান ত্রুটি হইল, ইহাতে অনেক ভোট নষ্ট হইয়া যায়। একজন জনপ্রিয় প্রার্থী হয়ত তাঁহার প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনেক ভোট পাইতে পারেন, কিন্তু অন্য একজন অপেক্ষাকৃত কম জনপ্রিয় অথচ বেশী উপযুক্ত প্রার্থী হয়ত কম ভোট পাইতে পারেন।

দ্বিতীয়বার ভোট গ্রহণ (Second Ballot System)—কোন নির্বাচনকেন্দ্র হইতে নির্বাচনপ্রার্থী যাহাতে নিরংকুশ সংখ্যাধিক্য অর্জন করিতে পারেন, সেজন্য অনেক সময় দ্বিতীয়বার ভোট গ্রহণ করা হয়। ধরা যাক, কোন নির্বাচনকেন্দ্রে বার হাজার ভোট দেওয়া হইয়াছে এবং তিনজন প্রার্থীর মধ্যে একজন চার হাজার, একজন তিন হাজার এবং একজন পাঁচ হাজার ভোট পাইয়াছেন। অর্ধেকের বেশী কেহই পান নাই বলিয়া কাহারও পক্ষেই নিরংকুশ সংখ্যাধিক্য অর্জন করা সম্ভব হয় নাই। তখন যে দুইজন যথাক্রমে চার হাজার ভোট এবং পাঁচ হাজার ভোট পাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে পুনরায় নির্বাচন হইবে এবং এইভাবে একজনকে নিরংকুশ সংখ্যাধিক্য অর্জন করিতে দেওয়া হইবে। এই পদ্ধতিটি নীতিগতভাবে খুব খারাপ নয়। কিন্তু, কার্যক্ষেত্রে এই নীতি অনুসরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। কেননা, এই ব্যবস্থায় প্রার্থী-নির্বাচনে বিশেষ বিলম্ব ঘটে এবং নির্বাচনের খরচও অনেক বাড়িয়া যায়।

প্রত্যক্ষ নির্বাচনের সুবিধা ও অসুবিধা (Merits and demerits of direct election) :

নির্বাচনের দুইটি পদ্ধতি আছে, একটি প্রত্যক্ষ এবং অপরটি পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ নির্বাচনে নির্বাচকগণ সরাসরি নিজেদের প্রার্থী নির্বাচিত করে। আমাদের দেশের বিধানমণ্ডলীর নিম্নকক্ষের জন্য অথবা পার্লামেণ্টের লোক-সভার জন্য প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা দেখিতে পাই। প্রত্যক্ষ নির্বাচনের প্রধান গুণ হইতেছে, ইহাতে নির্বাচকগণ সরাসরি নিজেরা প্রার্থী নির্বাচন করিবার সুযোগ পায়, এবং তাহাদের রাজনৈতিক চেতনা অনেক বাড়িয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, ভোটদাতাদের রাষ্ট্রনৈতিক দায়িত্বও অনেক বাড়িয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যক্ষ নির্বাচন নির্বাচকগণের রাজনৈতিক সহায়ক।

এই ব্যবস্থায় জনসাধারণই রাষ্ট্র-কর্ণধারগণকে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচন করে বলিয়া নির্বাচনের ভাল-মন্দ উভয় দিক সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান অনেক বাড়িয়া যায়। সুতরাং রাজনৈতিক শিক্ষা-বিস্তারে এবং সুদৃঢ় জনমত গঠনে প্রত্যক্ষ নির্বাচন-পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তৃতীয়তঃ, প্রত্যক্ষ নির্বাচন-প্রথায় শাসক এবং শাসিতের মধ্যে সহযোগিতার সৃষ্টি হয়। যাঁহারা শাসক, তাঁহারা সর্বদাই নিজেদের কাজের মধ্য দিয়া নির্বাচকমণ্ডলীকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য চেষ্টা করেন। বিশেষতঃ, নির্বাচনকালে ভোটদাতাগণের নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিগুলি যাহাতে বাস্তবে রূপায়িত হয় সেজন্য তাঁহারা চেষ্টা করেন। ইহার ফলে শাসনব্যবস্থার নৈতিক মান উন্নত হয়। সর্বশেষে, প্রত্যক্ষ নির্বাচন-প্রথায় দুর্নীতিমূলক প্রভাবের সম্ভাবনা বেশী থাকে না, কারণ নির্বাচনপ্রার্থীর পক্ষে বিরাট নির্বাচক-মণ্ডলীকে টাকা খরচ করিয়া অথবা অন্য কোনও প্রকার অন্যায়ভাবে প্রভাবিত করা সম্ভবপর নহে।

প্রত্যক্ষ নির্বাচনের গুণ

কিন্তু, প্রত্যক্ষ নির্বাচন-প্রথার কয়েকটি ত্রুটি আছে। যদি নির্বাচকমণ্ডলীর অধিকাংশ সভ্যই অজ্ঞ এবং অশিক্ষিত হয়, তবে তাহারা উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে না। আধুনিক গণতন্ত্রে আমরা যে প্রত্যক্ষ নির্বাচন প্রথা দেখিতে পাই, ইহাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিনিধি-নির্বাচনে ভোটদাতাগণের সতর্কতা ও বুদ্ধির অভাব দৃষ্ট হয়। চতুর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অনেক ক্ষেত্রেই আবেগময়ী বক্তৃতার সাহায্যে জন-চিত্ত জয় করিতে পারেন এবং জনগণও প্রতিনিধি-নির্বাচনে বিভিন্ন দিকের ভাল-মন্দ পরীক্ষা করিয়াও দেখিবার অবকাশ পায় না।

ইহার ত্রুটি

পরোক্ষ নির্বাচনের সুবিধা ও অসুবিধা (Merits and demerits of Indirect election)—পরোক্ষ নির্বাচনে প্রাথমিক ভোটদাতাগণ মধ্যবর্তী ভোটদাতাগণকে নির্বাচন করে এবং মধ্যবর্তী ভোটদাতাগণ, প্রতিনিধি এবং নির্বাচকগণের মধ্যে সম্পর্ক পরোক্ষ হয়। এই ব্যবস্থার প্রধান সুবিধা হইতেছে, ইহাতে সর্বাধিক প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ত্রুটি-বিচ্যুতি-গুলি দূর হয়। সকলেই প্রতিনিধি নির্বাচনে সমান দক্ষ নয়। পরোক্ষ নির্বাচনে যোগ্যতর প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবার সম্ভাবনা থাকে। প্রতিনিধিগণ মধ্যবর্তী ভোটদাতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন বলিয়া আসল প্রতিনিধি নির্বাচনে অল্পসংখ্যক নির্বাচক থাকে। এই নির্বাচকগণ সাধারণতঃ প্রাথমিক নির্বাচকগণ অপেক্ষা অধিকতর দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন হয়। তাহা ছাড়া, চূড়ান্ত নির্বাচনে ভোটদাতার সংখ্যা অল্প থাকে বলিয়া নির্বাচনজনিত উত্তেজনা, দুর্নীতি এবং গোলযোগের সম্ভাবনা কম থাকে।

পরোক্ষ নির্বাচনের পক্ষে যুক্তি

কিন্তু, পরোক্ষ নির্বাচনের বিপক্ষে অনেক যুক্তি আছে। প্রথমতঃ ইহা গণতন্ত্রবিরোধী। নির্বাচক এবং প্রতিনিধির মধ্যে দূরত্ব যতই বেশী হইবে, নির্বাচকদের রাজনৈতিক চেতনা ততই কমিয়া যাইবে। চূড়ান্ত নির্বাচনে প্রাথমিক নির্বাচকদের কোনও ভূমিকা নাই বলিয়া দেশের রাজনৈতিক ঘটনা-প্রবাহ সম্বন্ধে তাহারা নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে। রাজনৈতিক শিক্ষা-প্রসারের এবং রাজনৈতিক চেতনা-বৃদ্ধির পরিপন্থী বলিয়া আধুনিককালের অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী পরোক্ষ নির্বাচন-প্রথা সমর্থন করেন না। তবে এখন অনেক ক্ষেত্রেই পরোক্ষ নির্বাচন-প্রথা অনুসরণ করা হয়। ভারতের এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি পরোক্ষ নির্বাচন-প্রথায় নির্বাচিত হন। অবশ্য যখন নির্বাচকদের সংখ্যা অতিরিক্তভাবে বেশী, তখন পরোক্ষ নির্বাচন প্রথার একটি মূল্য আছে। কিন্তু যদি মনে করা হয়, মধ্যবর্তী নির্বাচকগণ প্রাথমিক নির্বাচকদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর, তবে ইহা ভুল মনে করা হয়। কারণ, যাহাদের প্রাথমিকভাবে মধ্যবর্তী নির্বাচকদের মনোনয়ন করিবার যোগ্যতা আছে, তাহাদের চূড়ান্ত প্রতিনিধি নির্বাচনের যোগ্যতা না থাকিবার কোন যুক্তিসংগত কারণ নাই। সর্বশেষে, পরোক্ষ নির্বাচনে দুর্নীতির প্রসারের সম্ভাবনা থাকে।

ইহার ত্রুটি

ভোটদাতা এবং প্রতিনিধির মধ্যে সম্পর্ক (Relation between the voter and the representative) :

ভোটদাতার সহিত নির্বাচিত প্রতিনিধির কিরূপ সম্পর্ক হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে দুই প্রকার মতবাদ দেখা যায়। কেহ কেহ মনে করেন, নির্বাচিত প্রতিনিধির ভোটদাতার নির্দেশের বাহিরে কিছু করা উচিত নয়; কারণ তিনি ভোটদাতাদের প্রতিভূ। আবার কেহ কেহ মনে করেন, নির্বাচিত প্রতিনিধিকে যে সর্বদাই ভোটদাতার নির্দেশ অনুযায়ী চলিতে হইবে, এরকম কোনও কথা নাই। কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁহাকে নিজের স্বাধীন মতামত প্রকাশ করিবার সুযোগ দেওয়া উচিত। অধিকতর রাজনৈতিক জ্ঞান এবং দূরদৃষ্টির অধিকারী বলিয়াই নির্বাচিত প্রতিনিধি নির্বাচকদের ভোট পান। সুতরাং বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁহার নিজের জ্ঞান এবং রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিকে কাজে লাগান উচিত। ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে আইনপরিষদের সদস্যগণকে সমগ্রজাতির প্রতিনিধি হিসাবে বিবেচনা করা হয়, কোনও অঞ্চলের বিশেষ নির্দেশ তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। নির্বাচিত প্রতিনিধি শুধু নির্বাচকদের প্রতিভূ—এই মতবাদকে লাইবার (Lieber) তীব্র সমালোচনা করিয়া বলেন যে, ইহা "অযুক্তিযুক্ত, অসঙ্গত এবং অনিয়মতান্ত্রিক" ("unwarranted, inconsistent and

unconstitutional.")। দ্বিতীয়তঃ, যদি তর্কের খাতিরে ধরিয়া লওয়া যায়, নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সর্বদাই ভোটদাতাদের নির্দেশে নিজেদের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিবেন, তখনই প্রশ্ন উঠে, কিভাবে এই নির্দেশ দেওয়া হইবে। দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে নির্বাচিত প্রতিনিধির পক্ষে সর্বদা ৬০।৭০ হাজার নির্বাচকের মতামত গ্রহণ করা সম্ভবপর নহে। তৃতীয়তঃ, নির্বাচিত প্রতিনিধিকে তাঁহার মতামত স্বাধীনভাবে প্রকাশ করিবার সুযোগ না দিলে অথবা তাঁহার ক্রিয়াকলাপকে ভোটদাতাদের বিধি-নিষেধ হইতে মুক্ত না করিলে আইনপরিষদে তাঁহার যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় না। তখন, কোনও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিই আইনপরিষদের সদস্য থাকিতে চাহিবেন না। চতুর্থতঃ, যদিও ইহা খুবই স্বাভাবিক যে ভোট দিবার সময় ভোটদাতাগণ নির্বাচনপ্রার্থীর ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে কিছু জানিবার অধিকারী, তবুও নির্বাচন-প্রার্থী প্রতিনিধির পক্ষে নির্বাচনের সময়েই তাঁহার ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের একটি খুঁটিনাটি বিবরণী ভোটদাতার সামনে তুলিয়া ধরা সব সময়েই সম্ভবপর নয়। কারণ, রাজনৈতিক ঘটনা-প্রবাহ চিরপরিবর্তনশীল এবং সেজন্য মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে সঠিক প্রতিশ্রুতি পূর্বে দেওয়া সম্ভবপর নয়। তবে মোটামুটিভাবে নির্বাচন-প্রার্থী আইনপরিষদের সদস্য হইয়া, কিভাবে দেশবাসীর সেবা করিতে চাহেন সে সম্বন্ধে কতিপয় সাধারণ নীতি ভোটদাতাগণের কাছে বর্ণনা করা উচিত এবং যতদূর সম্ভবপর নিজের কাজকর্মের মধ্য দিয়া সেই নীতিগুলি পালন করা উচিত। আইনপরিষদে প্রবেশ করিবার পর নির্বাচিত প্রতিনিধি যদি মনে করেন, দেশের বৃহত্তর স্বার্থে তাঁহার কতিপয় নীতির পরিবর্তন অথবা সংশোধন করা উচিত, তবে তাহা করিবার স্বাধীনতা নির্বাচিত প্রতিনিধিকে দেওয়া উচিত। একথা মনে রাখিতে হইবে নির্বাচক অপেক্ষা নির্বাচিত প্রতিনিধির রাজনৈতিক জ্ঞান, দূরদর্শিতা এবং রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বেশী। তাহা ছাড়া, প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ে নির্বাচিত প্রতিনিধির পক্ষে ভোটদাতার নির্দেশ গ্রহণ করা সম্ভবপর নহে।

তবে বর্তমানে রাজনৈতিক দলের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া নির্বাচিত প্রতিনিধিকে সর্বদাই ব্যক্তিগতভাবে নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট দায়ী না করিয়া তিনি যে রাজনৈতিক দলের সদস্য সেই দলেরই নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট দায়ী থাকা উচিত। যদি কোনও রাজনৈতিক দলের ক্রিয়াকলাপ নির্বাচক-মণ্ডলীকে সন্তুষ্ট না করিতে পারে, তবে ইহা খুবই স্বাভাবিক যে নির্বাচনকালে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিকদল ভোটদাতাগণের সহানুভূতি হারাইবে। গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে কয়েক বৎসর পর পর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তখন

নির্বাচকমণ্ডলী নির্বাচনপ্রার্থী লোকদের রাজনৈতিকদল সম্বন্ধে নিজের রায় প্রদান করিতে পারে। কিন্তু, এক্ষেত্রে অধ্যাপক লাস্কির (Prof. Laski) অভিমত প্রণিধানযোগ্য। অধ্যাপক লাস্কি মনে করেন, নির্বাচিত প্রতিনিধির কখনই নিজের দলের ভৃত্য হইয়া থাকা উচিত নহে। তাহাকে নির্বাচিত করা হয় যাহাতে তিনি নিজের বিবেক-বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার পক্ষে যাহা কিছু করা সম্ভবপর তাহা তিনি উৎকৃষ্টভাবে করিতে পারেন। তিনি যদি সর্বদাই স্থানীয় রাজনৈতিক সভ্য নির্বাচক সমিতির নির্দেশেই পরিচালিত হন, তবে তাঁহার নৈতিক মেরুদণ্ড অথবা ব্যক্তিত্ব কোনটিই থাকিবে না। ("A member is not the servant of a party in the majority in his constituency. He is elected to do the best he can in the light of his intelligence and his conscience. Were he merely a delegate instructed by a local caucus, he would cease to have either morals or personality."—Laski). নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার অধিকার ভোটদাতাগণের নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু, সেজন্য নির্বাচিত প্রতিনিধি ভোটদাতাদের ভৃত্য নহেন। যদি জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজন হয়, তবে তিনি ভোটদাতাগণের নির্দেশ না লইয়াই বিভিন্ন কাজ করিতে পারেন।

নির্বাচকমণ্ডলীর কার্য (Functions of the electorate):

গণতান্ত্রিক সরকারে নির্বাচকমণ্ডলীর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্বৈরতন্ত্রে নির্বাচকমণ্ডলীর নিষ্ক্রিয় দর্শক হওয়া ছাড়া অন্য কোনও ভূমিকা নাই; কারণ, সেক্ষেত্রে ভোটদাতাগণ শাসককে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন না। নির্বাচকগণের প্রধান কাজ হইল ভোটাধিকারের সদ্ব্যবহার করা। দ্বিতীয়তঃ, যাহাতে যোগ্যতম প্রার্থী নির্বাচিত হইতে পারে, সেদিকে নির্বাচকমণ্ডলীর লক্ষ্য রাখা উচিত। তৃতীয়তঃ, নির্বাচকমণ্ডলীর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইতেছে শাসনকর্তৃপক্ষের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা। এজন্য নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে একটি সুদৃঢ় জনমত থাকা চাই। প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রধান উপায় হইল নির্দেশিত প্রতিনিধিত্বের (instructed representation) প্রবর্তন করা। এই নীতি অনুযায়ী প্রতিনিধি ভোটদাতাগণের প্রতিভূ এবং তাহাদের নির্দেশ ব্যতীত তিনি কিছুই করিতে পারিবেন না। কিন্তু এই নীতি গ্রহণযোগ্য নহে। প্রতিনিধিদের আইনপরিষদে নিজেদের মতামত প্রকাশের এবং কাজকর্মের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত। অধ্যাপক লাস্কি নির্দেশিত প্রতিনিধিত্বের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। বর্তমান রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এত জটিল হইয়া পড়িয়াছে যে প্রতিনিধিদের সর্বদাই

ভোটদাতাগণের প্রতিভূ হইয়া তাহাদের নির্দেশের অপেক্ষায় থাকা সম্ভবপর নহে। কারণ, নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ মূলতঃ সমগ্র দেশের প্রতিনিধি,—কোন স্থানীয় অঞ্চল অথবা রাজনৈতিক দলবিশেষের নহে। নির্বাচকগণ যদি দৃঢ় জনমত গঠন করিতে পারে, তবে তাঁহারা পরোক্ষভাবে প্রতিনিধিদের ক্রিয়াকলাপ জনমতের প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। তাহা ছাড়া, ঘন ঘন নির্বাচন (frequent election), পদচ্যুতি (Recall), গণভোট (Referendum), গণ-উদ্যোগ (Initiative),—এইগুলির সাহায্যে নির্বাচকমণ্ডলী প্রতিনিধিদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন। কিন্তু, পদচ্যুতি গণভোট এবং গণউদ্যোগের ব্যবস্থা সব গণতান্ত্রিক দেশে নাই। সুইজারল্যাণ্ডে আমরা এই ধরনের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র কিছু পরিমাণে দেখিতে পাই।

সভাসমিতি, শোভাযাত্রা, সংবাদপত্র এবং রাজনৈতিক দলের ক্রিয়াকলাপ,—এইগুলিই নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে সুদৃঢ় জনমত গঠন করে। সুতরাং নির্বাচকদের কাজ হইল জনমত গঠনের এই উপায়গুলির প্রকৃত সদ্ব্যবহার করা এবং এইগুলির মাধ্যমে প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রিত করা। সুতরাং গণতন্ত্রে নির্বাচকগণ কখনই নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে না।

গণভোট (Referendum)—"গণভোট" পদ্ধতি অনুযায়ী আইনসভা যদি কোনও আইন প্রণয়ন করে, তবে ইহা জনগণের অনুমোদনের জন্য ভোটদাতাগণের নিকট প্রেরণ করা হয়। যদি অধিকাংশ ভোটদাতা এই আইন অনুমোদন করে, তবেই ইহা আইনের মর্যাদা লাভ করে। গণভোট অনেক সময়ে আবশ্যিক (compulsory) হয়; আবার কোন কোন সময় ইহা সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক (optional) হয়। আবশ্যিক গণভোটে দেশের সমুদয় আইন, এমনকি সংবিধানিক আইনগুলিও জনগণের অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হয়। ঐচ্ছিক গণভোটে নির্বাচকদের অথবা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একটি বিশেষ অংশ কোনও একটি বিশেষ আইনের ক্ষেত্রে জনগণের অনুমোদনের জন্য দাবী জানাইলে, ইহা নির্বাচকদের নিকট প্রেরণ করা হয়। সুইজারল্যাণ্ডের ক্যাণ্টনগুলিতে সমুদয় আইন গণভোটের জন্য প্রেরিত হয়। আমেরিকার কতিপয় মূল রাষ্ট্রে সংবিধানের সংশোধন অথবা পরিবর্তনের সহিত জড়িত আইনগুলিকে গণভোটের মাধ্যমে জনগণের অনুমোদন অর্জন করিতে হয়। ভারতবর্ষে দেশবিভাগের সময় পূর্ববংগ ও আসামের সীমান্তে অঞ্চলবিশেষের ভারত অথবা পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে গণভোটের অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

পদচ্যুতি (Recall)—কোনও নির্বাচিত প্রতিনিধি যখন ভোটদাতাগণের নির্দেশ অমান্য করিয়া রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ চালাইয়া যান, তখন নির্দিষ্ট

সময় অতিবাহিত হইবার আগেই "পদচ্যুতির" সাহায্যে তাহাকে অপসারণ করা চলে।

গণ-উদ্যোগ (Initiative)—গণ-উদ্যোগ পদ্ধতি অনুযায়ী ভোটদাতাগণের একটি নির্দিষ্ট অংশ কোনও আইনের খসড়া তৈয়ার করিয়া সেই খসড়া আইনকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় আইনের মর্যাদা দিবার জন্য আইনপরিষদের নিকট দাবী জানাইতে পারে। সুইস্ ক্যান্টনগুলিতে এবং আমেরিকার কোন কোন মূলরাষ্ট্রে সকল প্রকার আইনের ক্ষেত্রে গণ-উদ্যোগ পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রে এবং আমেরিকার মূলরাষ্ট্রগুলিতে শাসনতন্ত্রের সংশোধনী বিল গণ-উদ্যোগের মাধ্যমে আইনপরিষদে উত্থাপিত হইতে পারে।

নির্বিশেষ গণভোট (Plebiscite)—গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাগুলির জন্য আজকাল অনেক রাষ্ট্রে নির্বিশেষ গণভোট পদ্ধতির (Plebiscite) প্রয়োগ করা হয়। ইহাতে শুধু তথাকথিত ভোটদাতাগণই নহে, জনসাধারণের সকলেই কোনও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানে নিজেদের মতামত সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করিতে পারে।

গণভোট বনাম দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনপরিষদ (Referendum vs., Bicameral lagislature)—যাঁহারা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনপরিষদের সমর্থক, তাঁহাদের মতে আইনপরিষদের উচ্চকক্ষ নিম্নকক্ষের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা প্রতিরোধ করিতে পারে এবং নিম্নকক্ষ কর্তৃক প্রণীত সমুদয় আইন যাহাতে জনগণের বিশেষ একটি অংশের স্বার্থ-বিরোধী না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে পারে। গণভোটের মাধ্যমেও এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। আইনপরিষদের নিম্নকক্ষ যে আইন প্রণয়ন করে, গণভোটের মাধ্যমে যদি তাহা জনস্বার্থসম্মত কিনা যাচাই করিয়া লওয়া হয়, তবে ইহা নিশ্চয়ই নিম্নকক্ষের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা অথবা স্বৈরাচার প্রতিরোধ করিতে পারে। আইনপরিষদের উচ্চকক্ষ একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য দেশে প্রকৃতপক্ষে নিম্নকক্ষের স্বৈরাচার বন্ধ করিতে পারে না। সেদিক হইতে বিচার করিলে গণভোট ব্যবস্থা চালু করিলে নিম্নকক্ষের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার প্রতিরোধে ইহা যে উচ্চকক্ষ হইতে অধিকতর কার্যকরী হয়, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, বড় বড় রাষ্ট্রে যে সকল আইন প্রণীত হয়, সেগুলির মধ্যে অনেক আইন দেশের সামগ্রিক স্বার্থের সহিত জড়িত এবং সেক্ষেত্রে সমগ্রদেশ জুড়িয়া গণভোটের ব্যবস্থা করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভারতবর্ষ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি বড় বড় রাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়নের সময় সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক

গণভোটের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নহে এবং তাহা সম্ভবপর হইলেও যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনপরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ নির্বাচনকেন্দ্রে ভোটদাতা-গণকে নিজেদের মতের অনুকূলে লইয়া আসিবার চেষ্টা করিতে পারেন। ইহাতে গণভোটের প্রকৃত উদ্দেশ্য কতটা সিদ্ধ হইবে সন্দেহের বিষয়। তাহা ছাড়া, গণভোটের সাহায্যে যদি আইনপরিষদের নিম্নকক্ষের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা প্রতিরোধ করিতে হয়, তাহা মাত্র কয়েকটি বিশেষ আইনের ক্ষেত্রে হইতে পারে,—সকল প্রকার আইনের ক্ষেত্রেই গণভোটের ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে। কিন্তু, বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে যদি আইনপরিষদে উচ্চকক্ষ থাকে, তবে ইহা সর্বদাই এবং বিশেষতঃ সকল প্রকার আইন প্রণীত হইবার সময় নিম্নকক্ষের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার প্রতিরোধকারী হিসাবে থাকিতে পারে।

ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রে গণভোটের সাহায্যে আইনপরিষদের নিম্ন-কক্ষগুলির ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিহত করা যায়। কিন্তু বড় বড় রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে গণভোট ব্যবস্থা পরিচালন করা অসুবিধাজনক হয় বলিয়া আইন-পরিষদের উচ্চকক্ষের সাহায্যেই নিম্নকক্ষের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার প্রতিরোধ করিতে হয়। তাহা ছাড়া, ছোট ছোট রাষ্ট্রেও সব সময়েই গণভোটের অনুষ্ঠান করা সম্ভবপর হয় না। সেজন্য আইনপরিষদে উচ্চকক্ষের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা থাকিয়া যায়। বরাবরের জন্য গণভোট অপেক্ষা আইন-পরিষদের উচ্চকক্ষই নিম্নকক্ষের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা অথবা স্বৈরাচার প্রতিরোধ করিবার পক্ষে অধিকতর উপযোগী। তবে সেক্ষেত্রে উচ্চকক্ষের গঠন সংশোধিত হওয়া উচিত এবং ইহাকে যথেষ্ট পরিমাণে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া উচিত। কিন্তু কতিপয় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যখন উচ্চকক্ষ কিছুতেই নিম্নকক্ষের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা প্রতিহত করিতে পারে না, তখন গণভোটের অনুষ্ঠান করিতে পারিলে নিম্নকক্ষের স্বৈরাচার প্রতিহত করার পক্ষে ইহা আইনপরিষদের উচ্চকক্ষ অপেক্ষা অধিকতর কার্যকরী হয়। দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সংকটের সমাধানকল্পে যদি গণভোট অনুষ্ঠিত হয়, তবে ইহা জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার এবং রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়, তাহাতে জনমত সুদৃঢ় ভাবে গঠিত হইতে পারে। জনমত যদি সুদৃঢ় সুসংগঠিত থাকে, তবে তাহাই আইনপরিষদের নিম্নকক্ষের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা প্রতিরোধ করিতে পারে।

Exercises

1. Explain briefly the claims of (a) functional and (b) territorial representation in the modern state. Which of them do you recommend and why? (২১১-২১২ পৃষ্ঠা)

2. Examine the different views regarding the basis of suffrage. Do you support universal suffrage? Give reasons for your answer. (২১২-২১৪ পৃষ্ঠা)

3. State the case for and aga'nst woman suffrage. (২১৪-২১৫ পৃষ্ঠা)

4. Write notes on :—

(a) Plural or weighted voting, (b) Public and secret voting, (c) Limited Voting and (d) Constituency. (২১৫-২১৭ পৃষ্ঠা)

5. Describe the different methods that have been suggested for the representation of minorities in the legislature. (২১৮-২২১ পৃষ্ঠা)

6. Discuss the merits and demerits of direct and indirect elections respectively. (২২১-২২৩ পৃষ্ঠা)

7. What should be the proper relation between the representative and his constitucency in a democratic state? Should he be bound by the instruction of his constituents? (২২৩-২২৫ পৃষ্ঠা)

8. Discuss the functions of the electorate. (২২৫-২২৬ পৃষ্ঠা)

9. Write notes on : (a) Referendum, (b) Recall, (c) Intiative and (d) Plebiscite. (২২৬-২২৭ পৃষ্ঠা)

10. Which is a better check on a popularly elected legislative body in a mdern state, a Referendum or a Second Chamber? Give reasons for your answer. (২২৭-২২৮ পৃষ্ঠা)

11. What are the different methods by which the electorate can exercise control over this representatives in modern democracies? (২২৭-২২৮ পৃষ্ঠা) (C. U. B. A. patr, 1962)

———

চতুর্দশ অধ্যায়

শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগ (Executive and Judiciary)

শাসনবিভাগের কাজ (Functions of the executive) :

ব্যাপকভাবে চিন্তা করিলে আইনপ্রণয়ন এবং বিচার ছাড়া সরকারের সমুদয় ক্রিয়াকলাপ শাসনবিভাগের অন্তর্ভুক্ত। আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্রে যে ইচ্ছা প্রকাশিত এবং প্রতিফলিত হয়, তাহা কার্যকরী করিবার কর্তৃপক্ষ শাসনবিভাগ বলিয়া পরিচিত। সুতরাং শাসনবিভাগের কর্তৃপক্ষ বলিতে আমরা বুঝি, (১) শাসনবিভাগের প্রধান (Executive Head)—তিনি রাজা অথবা রাষ্ট্রপতি হইতে পারেন, (২) শাসনপরিষদ (Executive council), (৩) মন্ত্রীমণ্ডলী (Ministry) এবং (৪) সরকারী কর্মচারিবৃন্দ (Civil servants)।

সাধারণতঃ শাসনবিভাগের পাঁচপ্রকার কাজ থাকিতে পারে,—(১) শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা (administrative power) অনুযায়ী কাজ, (২) কূটনৈতিক ক্রিয়াকলাপ (diplomatic activities), (৩) সামরিক ক্ষমতা (military power) অনুযায়ী বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ, (৪) আইনপ্রণয়ন ক্ষমতা (legislative power) অনুযায়ী কাজ এবং (৫) বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা (judicial power) অনুযায়ী কাজ। এই পাঁচটি কাজকে আমরা তিনটি পর্যায়ে আলোচনা করিতে পারি ; যথা, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, শাসনবিভাগীয় ক্রিয়াকলাপ এবং আইনপ্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা অনুযায়ী ক্রিয়াকলাপ।

রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ (Political functions)—শাসনবিভাগের কর্তৃপক্ষ দলীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার গঠন করিয়া থাকেন। যিনি প্রধানমন্ত্রী হন, তাঁহার প্রথম এবং প্রধান কাজ হইল সুষ্ঠু সরকার গঠন করা। যিনি রাষ্ট্রের প্রধান অথবা রাষ্ট্রপতি, তিনি প্রথমেই শাসনবিভাগের কাজের জন্য বিভিন্ন সচিব নিযুক্ত করিবেন। সরকার স্থায়ী রাখিবার জন্য শাসনবিভাগের কর্তৃপক্ষকে দলীয় রাজনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। উপরোক্ত কাজ ছাড়া প্রত্যেক রাষ্ট্রের শাসনবিভাগকে অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক (diplomatic relations) বজায় রাখিতে হয়। এক রাষ্ট্রের সহিত অপর রাষ্ট্রগুলির কি সম্পর্ক হইবে তাহা স্থির করিবার দায়িত্ব হইতেছে

শাসনবিভাগের। শাসনবিভাগের কর্তৃপক্ষ বৈদেশিক দূত নিয়োগ করে এবং বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির দূত বিনিময় করে এবং প্রয়োজন হইলে বিভিন্ন প্রকার সন্ধি ও চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। শাসনবিভাগের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কাজ হইতেছে নির্দিষ্ট কয়েক বৎসর পর পর দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা।

শাসনসংক্রান্ত কাজ (Administrative functions)—শাসনবিভাগের প্রধান কাজ হইতেছে আইনসভা প্রণীত আইনগুলিকে প্রকৃতভাবে কার্যকরী করা যাহাতে দেশে আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে। শাসনবিভাগের কাজ হইতেছে রাষ্ট্রীয় আইনগুলি কার্যকরী করা এবং জনসাধারণকে সেগুলি পালন করিবার জন্য বাধ্য করা। দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে এই রকম উপাদান দূর করিয়া রাষ্ট্রীয় আইনগুলি কার্যকরী করিবার জন্য শাসনবিভাগ চেষ্টা করে এবং সেই চেষ্টাকে সফল করিবার জন্য শাসনবিভাগ পুলিশবাহিনী পরিচালনা করে, আইন ভংগকারীদের শাস্তির ব্যবস্থা করে এবং জনসাধারণকে শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করে।

শাসন-বিভাগের কিছু পরিমাণে সামরিক এবং বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা

শাসনবিভাগীয় কাজগুলিকে সফল করিবার জন্য শাসনকর্তৃপক্ষকে কিছু পরিমাণে সামরিক ক্ষমতা এবং বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা প্রদান করা হয়। পররাষ্ট্রের আক্রমণ হইতে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য শাসনবিভাগ স্থলবাহিনী, নৌ-বাহিনী এবং বিমান বাহিনী গঠন করিয়া সেইগুলি যাহাতে উপযুক্তভাবে পরিচালিত হয় সেই ব্যবস্থা করে। তবে কোন কোন রাষ্ট্রে (যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) যুদ্ধ ঘোষণা করা অথবা সন্ধি চুক্তি করার জন্য শাসনবিভাগকে আইনপরিষদের অনুমোদন অর্জন করিতে হয়। শুধু সামরিক ক্ষমতাই নহে, শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতাকে সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী করিবার জন্য শাসনবিভাগের কিছু কিছু বিচার বিষয়ক ক্ষমতা থাকে। অধিকাংশ দেশে উচ্চ বিচারালয়ে বিচারপতিগণকে রাষ্ট্রের যিনি প্রধান তিনি নিযুক্ত করেন। রাষ্ট্রের যিনি প্রধান তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ড হইতে রেহাই দিতে পারেন। ভারতের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণকে জেলার ভিতরে ফৌজদারী মামলাগুলির বিচার করিতে দেওয়া হয়। রাষ্ট্রের শাসনবিভাগকে কিছু পারমাণে বিচার বিষয়ক ক্ষমতা দেওয়ায় সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ইহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে।

আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ (Legislative Functions): যদিও রাষ্ট্রে আইন প্রণয়ন করিবার জন্য আলাদা আইনপরিষদ থাকে, তবুও শাসন-

বিভাগে কতিপয় ক্ষেত্রে সাধারণ ও জরুরী আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা দেওয়া হয়। যখন আইনপরিষদের অধিবেশন বন্ধ থাকে তখন প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্রপতি অথবা প্রধান শাসনকর্তৃপক্ষ অর্ডিন্যান্স জারী করিতে পারেন; পরে ইহাকে আইনপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত করাইয়া লইতে হয়। সাধারণতঃ জরুরী অবস্থায় শাসনবিভাগ এই কাজ করিয়া থাকে। সাধারণ ক্ষেত্রে আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত আইনগুলিতে শাসনকর্তৃপক্ষের সম্মতি পাওয়া গেলে সেগুলি প্রকৃত আইনের মর্যাদা পায়। ভারতে রাষ্ট্রপতিই আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করেন এবং সেই অধিবেশন স্থায়ী রাখা অথবা ভাংগিয়া দেওয়া সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি তাঁহার কাজের মধ্য দিয়া পরোক্ষভাবে আইনপরিষদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। কোন কোন ক্ষেত্রে শাসনবিভাগ রাষ্ট্রের আইনপরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইনকে কার্যকরী করা হইতে সাময়িকভাবে বিরত থাকিতে পারে।

একক শাসনকর্তৃপক্ষ (Single Executive);

যখন শাসনবিভাগের শীর্ষে মাত্র একজন ব্যক্তিই সর্বাধিনায়ক থাকেন, তখন ইহাকে একক শাসনকর্তৃপক্ষ বলা হয়। একনায়কতন্ত্রে এবং রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসনব্যবস্থায় শাসনবিভাগের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হইলেন একজন ব্যক্তি। তাঁহার কাজের সহায়তার জন্য তিনি সহকারী অথবা সচিবমণ্ডলী নিযুক্ত করিতে পারেন। এই ব্যবস্থার একটি প্রধান সুবিধা হইতেছে এই যে রাষ্ট্রের যিনি প্রধান তিনি শাসন কাজ সম্পর্কে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু, এই ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইতেছে এই যে একক শাসনকর্তৃপক্ষ থাকায় যে কোন সময় দেশে স্বৈরাচারের সূচনা হইতে পারে।

সমষ্টিগত শাসনকর্তৃপক্ষ (Plural Executive) :

যখন শাসন পরিষদ একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক গঠিত হয়, তখন ইহাকে সমষ্টিগত শাসনকর্তৃপক্ষ বলা হয়। এই প্রকার শাসনকর্তৃপক্ষের প্রকৃত উদাহরণ হইতেছে সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পরিষদ (Federal Council)। সাতজন সমান ক্ষমতাবিশিষ্ট ব্যক্তি লইয়া ইহা গঠিত। এই সাতজনের মধ্য হইতে প্রতি বৎসর একজন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ক্ষমতার দিক হইতে বিচার করিলে তিনি অপর ছয়জন হইতে অধিকতর ক্ষমতা ভোগ করেন না। এই ব্যবস্থার প্রধান গুণ হইল এই যে শাসনকর্তৃপক্ষের শীর্ষে অবস্থিত সকলের সমবেত রাজনৈতিক জ্ঞান ও

অভিজ্ঞতা অনুযায়ী দেশের শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়া দেশের শাসন-কর্তৃপক্ষের শাসনবিভাগের কর্মকুশলতা বাড়িয়া যায় এবং স্বৈরাচারের সম্ভাবনা কমিয়া যায়। কিন্তু, এই ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইল এই যে একাধিক ব্যক্তি শাসনবিভাগের শীর্ষে থাকায় সকলের একমত হইয়া শাসনকাজ সম্বন্ধে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে অযথা বিলম্ব ঘটিতে পারে। ক্ষমতা ও দায়িত্ব যদি একাধিক ব্যক্তির মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হয়, তবে ইহার ফলে সরকারের শাসনবিভাগের কর্মকুশলতা কিছু পরিমাণে কমিবেই। দায়িত্বে ভাগাভাগি হইলেই শাসনকর্তৃপক্ষ দুর্বল হইয়া পড়িবে এবং দেশের শাসনকাজ সম্বন্ধে কোনও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রায়ই অসুবিধাজনক হইবে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা (Independence of the Judiciary) : বিচারকগণের পবিত্র দায়িত্ব হইতেছে, যে কোন প্রকার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ন্যায় বিচার করিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং দেশে আইনের মর্যাদা বজায় রাখা। এইজন্য বিচার-বিভাগকে সর্বদাই স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হইতে হয়। যদি বিচারবিভাগ স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে আইনের প্রয়োগ না করেন, তবে অনেক ক্ষেত্রে নির্দোষ ব্যক্তির শাস্তি হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, শাসনবিভাগ যাহাতে কোনও সময়েই স্বৈরাচারের প্রশ্রয় না দেয় এবং নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ না করে সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিচার-বিভাগকে ইহার কাজ-কর্ম করিতে হয়। বিচার-বিভাগ হইতেছে শাসনতন্ত্রের রক্ষক। নাগরিকদের মৌলিক অধিকার শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত হয় এবং তাহা রক্ষা করিবার পবিত্র ও গুরুদায়িত্ব হইতেছে বিচার-বিভাগের। বিচার-বিভাগ যাহাতে এই দায়িত্ব পালনে সমর্থ হইতে পারে সেজন্য ইহাকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হইতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সহিত আঞ্চলিক সরকারগুলির যদি কোনও সময়ে বিরোধের সৃষ্টি হয় অথবা শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা লইয়া মতান্তর হয়, তবে ইহার মীমাংসা করিবার দায়িত্ব হইতেছে বিচার-বিভাগের। এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে হইলে বিচার-বিভাগকে পক্ষপাতদুষ্ট হইলে চলিবে না।

বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখা যায় তিনটি উপায়ের সাহায্যে। প্রথমতঃ, বিচারকদের নিয়োগ করিবার নীতি এরূপ হওয়া উচিত যে বিচারকগণ যদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের সুচিন্তিত, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মতামত প্রদান করেন, তবে শাসনবিভাগ অথবা আইনপরিষদ ইহাদের কোনও প্রকার ক্ষতি করিতে পারিবে না এবং ইহাদের কর্মচ্যুতির সম্ভাবনা

অথবা কর্মোন্নতির কোন প্রকার বাধার সৃষ্টি হইবে না। অধ্যাপক লাস্কির মতে বিচারপতি নিয়োগ করার যতগুলি পদ্ধতি আছে, তন্মধ্যে বিচারপতি নির্বাচন করিবার পদ্ধতিটি সর্বাপেক্ষা খারাপ। কারণ, ইহাতে বিচারপতিদের নিরপেক্ষতা বজায় থাকে না, তাঁহাদের দলীয় স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হইবার আশংকা থাকে। যদি বিচারকদের নিয়োগপদ্ধতির যথাসম্ভব বিভিন্ন সর্ত হইতে মুক্ত রাখা হয়, তবেই বিচারকগণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, বিচারকদের কার্যকাল শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোনও অবস্থায়ই তাঁহাদের অপসারণ করিবার ব্যবস্থা থাকা উচিত নহে। অবশ্য বিচারকগণ অন্যায় এবং দুর্নীতির আশ্রয় লইলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা যাইতে পারে। কিন্তু, সাধারণ ক্ষেত্রে বিচারকদের কখনই অন্য কোনও কারণে অপসারণ করিবার ব্যবস্থা থাকা উচিত নহে। তবেই তাঁহারা স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচার-বিভাগের সমুদয় কাজ নির্বাহ করিতে পারেন। তৃতীয়তঃ, বিচারকদের বেতন এবং অন্যান্য ভাতার পরিমাণ বেশী দিতে হইবে যাহাতে বিচারকগণের প্রতি উপযুক্ত মর্যাদা প্রদর্শিত হয় এবং তাঁহারাও অর্থের প্রলোভনে নিজেদের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নীতি বিসর্জন দিতে না পারেন।

বিচার বিভাগের কাজ (Functions of the Judiciary) :

কোন দেশের শাসন বিভাগের উৎকর্ষতা বহুল পরিমাণে ইহার বিচার বিভাগের উৎকর্ষতার উপর নির্ভর করে। বিচার বিভাগ বিভিন্ন মামলার বিচার করিবার সময় রাষ্ট্রীয় আইনগুলি প্রয়োগ করে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সেগুলি ব্যাখ্যা করে। অনেক ক্ষেত্রে এইভাবে বিচার বিভাগ নূতন আইনের সৃষ্টি করে। আমেরিকায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচারকদের প্রদত্ত রায় আইনের মর্যাদা লাভ করিয়া থাকে। আমেরিকার শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্তনীয় নয়; কিন্তু বিচার বিভাগের সিদ্ধান্তের দ্বারা শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা যায়।

যদিও বিচার বিভাগের প্রধান কাজ নাগরিকদের মধ্যে পারস্পরিক কলহ, রাষ্ট্রের সহিত নাগরিকদের বিবাদ, ফৌজদারী মামলার, অথবা যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে মূলরাষ্ট্রগুলির সহিত যুক্তরাষ্ট্রের বিবাদ এবং মূলরাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিবাদের বিচার করা, তবুও বিচার বিভাগ এমন কতিপয় কাজ নির্বাহ করে যেগুলিকে প্রকৃতপক্ষে বিচারবিভাগীয় কাজ বলা যায় না, যেমন, কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে কর্মচারী নিয়োগ করা, লাইসেন্স অনুমোদন করা, মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারের ব্যবস্থা করা, নাবালকের অভিভাবক নিয়োগ করা এবং পতনোন্মুখ প্রতিষ্ঠানে ট্রাষ্টি অথবা প্রাপক (Riceiver) নিয়োগ করা।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইন্‌জাংসন জারী করাও বিচার বিভাগের অন্যতম কাজ। অনেক দেশে বিচার বিভাগ আইনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে ঘোষণাপত্রের সাহায্যে কোন জিনিসের বিচার করতে পারে। ইহাকে "ঘোষণামূলক বিচার" (declaratory Judgment) বলে। বিচার বিভাগের আদিম ক্ষমতায় (original powers) বিচারকগণ তাহাদের ক্ষমতা অনুযায়ী বিভিন্ন মামলার বিচার করেন। তাহা ছাড়া, নিম্ন আদালত হইতে উচ্চ আদালতে কোন কোন মামলার রায় সম্বন্ধে পুনর্বিচারের জন্য আপীল করা যায়। তাহা ছাড়া বিচারকগণ কোন কোন ক্ষেত্রে আইনপরিষদ ও শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইলে রাষ্ট্রীয় আইনের তাৎপর্য সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত প্রদান করিয়া থাকেন।

আইন পরিষদের সহিত বিচার বিভাগের সম্পর্ক এই যে আইনপরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করিবার দায়িত্ব হইতেছে বিচার বিভাগের। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট অনেক সময় মার্কিন কংগ্রেস কর্তৃক প্রণীত আইনকে অবৈধ ঘোষণা করিতে পারে। কিন্তু, গ্রেটবৃটেন অথবা ফ্রান্সের বিচার বিভাগ এই ক্ষমতার অধিকারী নহে। গ্রেটবৃটেনের লর্ড সভা আপীল মামলার প্রধান বিচারালয়।

বিচারপতিগণ যাহাতে বিচার কাজে স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখিতে পারেন, সেজন্য তাহাদিগকে শাসন কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ হইতে যথাসম্ভব মুক্ত রাখা হয়। অনুরূপভাবে শাসন কর্তৃপক্ষের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদেরও বিচার বিভাগের নিয়ন্ত্রণ হইতে যথাসম্ভব মুক্ত রাখা হয়। আমেরিকা এবং ভারতের রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণকে নিযুক্ত করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিতে পারেন না। অনেক ক্ষেত্রে শাসনকর্তৃপক্ষের যিনি প্রধান তিনি কোন কোন অপরাধীর প্রাণদণ্ড মকুব করার মত বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা ভোগ করিয়া থাকেন। আবার বিচারপতিগণও অনেক ক্ষেত্রে (যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) কোন বিশেষ আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বাড়াইতে অথবা কমাইতে পারেন।

বিচারপতিদের যোগ্যতা (Qualifications of the Judiciary) : বিচার বিভাগের প্রধানগণের নিজেদের পদমর্যাদা অনুযায়ী কতিপয় যোগ্যতা থাকা চাই। প্রথমতঃ, বিচারপতিগণের আইন শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য থাকা উচিত যাহাতে তাঁহারা বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় আইনের যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, বিচারপতিগণকে সর্বদাই রাজনৈতিক দল-

নিরপেক্ষ হইতে হইবে যাহাতে বিভিন্ন মামলার বিচার করিবার সময় কোন রকম রাজনৈতিক মতবাদ অথবা ধারণার বশবর্তী তাঁহারা না হন।

তৃতীয়তঃ, শাসনতন্ত্রের রক্ষক এবং ভাষ্যকার হিসাবে বিচারপতিগণকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করিতে হয় বলিয়া তাঁহাদের সর্বদাই বিভিন্ন দেশের শাসনতন্ত্র এবং রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ সম্বন্ধে অবহিত থাকিতে হয়।

সংক্ষিপ্তসার

শাসনবিভাগের কাজ—

সাধারণতঃ শাসনবিভাগের পাঁচ প্রকার কাজ থাকিতে পারে,—(১) শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা (Administrative power) অনুযায়ী কাজ; (২) কূটনৈতিক ক্রিয়াকলাপ (Diplomatic activities), (৩) সামরিক ক্ষমতা (Military power) অনুযায়ী বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ, (৪) আইন প্রণয়ন ক্ষমতা (Legislative power) অনুযায়ী কাজ এবং (৫) বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা (Judicial power) অনুযায়ী কাজ।

শাসনবিভাগের কর্তৃপক্ষ দলীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার গঠন করিয়া থাকেন। যিনি প্রধানমন্ত্রী হন, তাঁহার প্রথম এবং প্রধান কাজ হইল সুষ্ঠু সরকার গঠন করা। যিনি রাষ্ট্রের প্রধান অথবা রাষ্ট্রপতি, তিনি প্রথমেই শাসনবিভাগের কাজের জন্য বিভিন্ন সচিব নিযুক্ত করিবেন। সরকার স্থায়ী রাখিবার জন্য শাসনবিভাগের কর্তৃপক্ষকে দলীয় রাজনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এক রাষ্ট্রের সহিত অপর রাষ্ট্রগুলির কি সম্পর্ক হইবে তাহা স্থির করিবার দায়িত্ব হইতেছে শাসনবিভাগের। শাসনবিভাগের কর্তৃপক্ষ বৈদেশিক দূত নিয়োগ করেন এবং বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির সহিত দূত বিনিময় করেন এবং প্রয়োজন হইলে বিভিন্ন প্রকার সন্ধি ও চুক্তিতে আবদ্ধ হন। শাসনবিভাগের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কাজ হইতেছে নির্দিষ্ট কয়েক বৎসর পর পর দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা।

শাসনবিভাগের প্রধান কাজ হইতেছে আইনসভা প্রণীত আইনগুলিকে প্রকৃতভাবে কার্যকরী করা যাহাতে দেশে আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃংখলা বজায় থাকে এবং জনসাধারণকে সেইগুলি পালন করিবার জন্য বাধ্য করা। এইজন্য শাসনবিভাগ পুলিশ বাহিনী পরিচালনা করিয়া আইন-ভংগকারীদের শাস্তির ব্যবস্থা করে এবং জনসাধারণকে শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখিবার জন্য প্রণোদিত করে।

শাসনবিভাগীয় কাজগুলিকে সফল করিবার জন্য শাসন কর্তৃপক্ষকে কিছু পরিমাণে সামরিক ক্ষমতা এবং বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা প্রদান করা হয়। যদিও রাষ্ট্রে আইন প্রণয়ন করিবার জন্য আলাদা আইনপরিষদ থাকে, তবুও শাসনবিভাগে কতিপয় ক্ষেত্রে সাধারণ ও জরুরী আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা দেওয়া হয়। যখন আইন পরিষদের অধিবেশন বন্ধ থাকে তখন প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্রপতি অথবা প্রধান শাসন কর্তৃপক্ষ অর্ডিন্যান্স জারী করিতে পারেন; পরে ইহাকে আইনপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত করাইয়া লইতে হয়। সাধারণতঃ জরুরী অবস্থায় শাসনবিভাগ এই কাজ করিয়া থাকেন।

বিচার বিভাগের কাজ—কোন দেশের শাসন বিভাগের উৎকর্ষতা বহুল পরিমাণে ইহার বিচার বিভাগের উৎকর্ষতার উপর নির্ভর করে। বিচার বিভাগ বিভিন্ন মামলার বিচার করিবার সময় রাষ্ট্রীয় আইনগুলি প্রয়োগ করে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সেগুলি ব্যাখ্যা করে। অনেক ক্ষেত্রে এইভাবে বিচার বিভাগ নূতন আইনের সৃষ্টি করে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচারকদের প্রদত্ত রায় আইনের মর্যাদা লাভ করিয়া থাকে। এই কাজগুলি ছাড়াও বিচার বিভাগ এমন কতিপয় কাজ নির্বাহ করে যেগুলিকে প্রকৃতপক্ষে বিচার বিভাগীয় কাজ বলা যায় না, যেমন, কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে কর্মচারী নিয়োগ করা, লাইসেন্স অনুমোদন করা, মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারের ব্যবস্থা করা, নাবালকের অভিভাবক নিয়োগকরা এবং পতনোন্মুখ প্রতিষ্ঠানের ট্রাষ্টি অথবা প্রাপক (Receiver) নিয়োগ করা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইন্‌জাংসন জারী করাও বিচার বিভাগের অন্যতম কাজ। অনেক দেশে বিচার বিভাগ আইনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে ঘোষণাপত্রের সাহায্যে কোন জিনিষের বিচার করিতে পারে। ইহাকে "ঘোষণামূলক বিচার" (Declaratory judgment") বলে। বিচার বিভাগের আদিম ক্ষমতায় (Original powers) বিচারকগণ তাহাদের ক্ষমতা অনুযায়ী বিভিন্ন মামলার বিচার করেন। তাহা ছাড়া, নিম্ন আদালত হইতে উচ্চ আদালতে কোন কোন মামলার রায় সম্বন্ধে পুনর্বিচারের জন্য আপীল করা যায়। বিচারকগণ কোন কোন ক্ষেত্রে আইন-পরিষদ ও শাসন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইলে রাষ্ট্রীয় আইনের তাৎপর্য সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত প্রদান করিয়া থাকেন।

আইন পরিষদের সহিত বিচার বিভাগের সম্পর্ক এই যে আইন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করিবার দায়িত্ব হইতেছে বিচার বিভাগের। সুষ্ঠু বিচার কাজের জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বজায় থাকা উচিত।

Exercises

1. State the functions of the Executive. (২৩০-২৩২ পৃষ্ঠা)

2. What are the political, and administrative and legislative functions of the Executive ? (২৩০-২৩২ পৃষ্ঠা)

3. Write notes on (a) Single Executive and (b) Plural Executive. (২৩২-২৩৩ পৃষ্ঠা)

4. What do you understand by the term, "Independence of the Judiciary" ? Why is it necessary that the Judiciary skould be independent ? What should be their functions and Qualifications ? (২৩৩-২৩৬ পৃষ্ঠা)

5. Discuss the functions of the Judicairy. What should be the qualifications of Judges ? (২৩৪-২৩৬ পৃষ্ঠা)

6. Discuss the principles of organization of the Judiciary in modern states. (২৩৪-২৩৬ পৃষ্ঠা) (C. U. B. A. Part I 1962)

———

পঞ্চদশ অধ্যায়

রাজনৈতিক দল এবং জনমত (Political Party and Public Opinion)

রাজনৈতিক দল (Political Party) :

রাজনৈতিক দল বলিতে বুঝায় একদল জনসমষ্টি, যাহারা একটি বিশেষ নীতিতে একমত হইয়া এবং ইহাদের বশবর্তী হইয়া যৌথভাবে জাতীয় স্বার্থের উন্নতির জন্য একত্রিত ও সচেষ্ট হয়। এই জনসমষ্টি একটি রাজনৈতিক সংস্থার মাধ্যমে একত্রিত হয় এবং নিজেদের ভোটাধিকার সাহায্যে সরকার নিয়ন্ত্রিত করিতে এবং নিজেদের কতিপয় সাধারণ নীতি কার্যকরী করিতে চেষ্টা করে। রাজনৈতিক দল গঠন করিবার জন্য নিম্নলিখিত উপদানগুলির একান্ত আবশ্যক।

দলগঠনের উপাদান

প্রথমতঃ, যাহারা দল গঠন করিবে, তাহাদের দলের কার্যসূচী এবং মূলনীতি সম্বন্ধে একমত হওয়া চাই। দ্বিতীয়তঃ, রাজনৈতিক দলের সদস্যগণকে সর্বদাই ঐক্যবদ্ধ থাকিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে দলের সদস্যগণ তাহাদের কার্যসূচী বাস্তবে রূপায়িত করিতে চেষ্টা করিবে। এজন্য তাহাদের প্রধান লক্ষ্য হইতেছে সরকার গঠন করা। চতুর্থতঃ, জাতীয় স্বার্থের উন্নতি সাধনের জন্য প্রত্যেকেই চেষ্টা করিবে। রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন সদস্যের প্রতি আনুগত্য বিভিন্ন কারণে হইতে পারে। কিন্তু, প্রত্যেকেই যে সরকার গঠন করিয়া অথবা সরকার নিয়ন্ত্রণ করিয়া দলের কতিপয় সাধারণ মূলনীতিকে কার্যকরী করিতে সচেষ্ট থাকে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

রাজনৈতিকদলের সদস্যগণের মধ্যে যখন দলের মূলনীতি ও কর্মপন্থা লইয়া বিভেদের সৃষ্টি হয় এবং প্রত্যেকেই নিজেদের স্বার্থরক্ষায় ব্যস্ত হইয়া পড়ে তখন ইহাকে কুচক্রীদল অথবা "faction" বলা হয়।

গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের কাজ (Functions of Political Parties in a Democracy) :

রাজনৈতিক দলের প্রথম কাজ হইল দলীয় সংগঠন দৃঢ় করা এবং দলীয় মূলনীতি ও সেই নীতি কার্যকরী করিবার জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচী নির্ধারণ করা।

দলীয় সংগঠন দৃঢ় করা

দলীয় সংগঠন দৃঢ় করিবার জন্য দলের সদস্যগণ একজন দলীয় নেতা ও একটি কেন্দ্রীয় পরিষদ নির্বাচন করেন। রাজনৈতিক দলের মূলনীতি নির্ধারণ এবং সেই নীতি অনুযায়ী কর্মসূচী গ্রহণের সময় জাতীয় সমস্যাবলীকে বিশেষ বিবেচনার সহিত

আলোচনা করিতে হয় এবং সেগুলির সমাধানের জন্য সঠিক উপায়ে নির্দেশ দিতে হয়।

প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই সরকার গঠনের চেষ্টা করে। এজন্য দেশের সাধারণ নির্বাচনের সময় ইহা আইনসভার সদস্য হইবার জন্য যোগ্য দলীয় প্রতিনিধিগণকে মনোনয়ন করে। সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভের জন্য প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই সচেষ্ট হয় এবং নিজের কার্যসূচীর সাহায্যে জনমতকে নিজের পক্ষে প্রভাবিত করিতে চেষ্টা করে। যদি রাজনৈতিক দল আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে তবে পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা অথবা মন্ত্রীসভা চালিত গণতন্ত্রে ইহা মন্ত্রীসভা গঠন করে এবং আইনসভায় নির্বাচিত দলীয় নেতা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। সরকার গঠন করিলে গনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের কাজ হইল নির্বাচনকালীন কর্মসূচী অনুযায়ী দলীয় নীতিগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করা, আইনসভার মাধ্যমে নিজের কাজের জন্য দেশবাসীর কাছে পরোক্ষভাবে দায়ী থাকা, এবং জাতীয় স্বার্থের উন্নতির জন্য দলীয় নীতির সহিত সংগতি রাখিয়া দেশের আইনব্যবস্থার সংস্কার করা এবং দরকার হইলে নূতন আইনপ্রণয়ন করা। কোন রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করিলে সরকারকে দেশের শাসনতন্ত্র মানিয়া চলিতে হয়।

সরকার গঠন করা

সরকার গঠন না করিতে পারিলেও গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা মোটেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যদি কোন রাজনৈতিক দল আইনসভায় সংখ্যাধিক্য অর্জন না করিতে পারে তবে ইহা বিরোধী দলের ভূমিকা গ্রহণ করে। গণতান্ত্রিক সরকারে বিরোধী দলের ভূমিকা সরকারী দলের মতই গুরুত্বপূর্ণ। আইনপরিষদে বিরোধী দলের ভূমিকা একটি নিছক স্তোকবাক্য ("idle phrase") নয়। সরকারের উপর ইহার একটি সক্রিয় প্রভাব আছে। আইনপরিষদে বিরোধী দল হিসাবে রাজনৈতিক দলগুলি সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের গঠনমূলক সমালোচনা করে এবং প্রয়োজন হইলে বিকল্প সরকার গঠন করিতে প্রস্তুত থাকিবার জন্য সচেষ্ট থাকে। আইনসভায় নিজেদের কাজকর্মের দ্বারা রাজনৈতিক দলগুলি জনমতকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। যদি জনমত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের (সরকার পক্ষীয় অথবা সরকার বিরোধী, যে কোন দলের) ক্রিয়াকলাপের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়, তবে বিভিন্ন দল বিপুল জনমতকে কয়েকটি বিশেষ বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ করিতে পারে এবং বড় বড় দেশগুলিতেও গণতন্ত্রকে সার্থক করিতে পারে। (…"Political parties serve as the motive force in crystallizing public opinion, and

বিরোধী দলের ভূমিকা

the unifying agency that makes democracy workable over large areas.'—Gettel)

সরকার গঠন করিবার পর সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল সর্বদা সরকার স্থায়ী রাখিতে চেষ্টা করে। এজন্য আইন সভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল হুইপ্ (whip) নির্বাচিত করে। তাহাদের কাজ হইল আইনসভার ভিতরে দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখা। অনেক সময় প্রয়োজন হইলে একাধিক রাজনৈতিক দল যৌথভাবে সরকার গঠন করিতে পারে। এইগুলিকে "Coalition Government" বলা হয়। ফ্রান্স এবং যে সমস্ত দেশে অনেকগুলি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকে সেগুলিতে প্রায়ই কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। ইংলণ্ডে জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হইলে সবগুলি দলের সহযোগিতায় জাতীয় কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। জনমতকে প্রভাবিত করিবার জন্য আইনসভার বাহিরেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়া থাকে। জনমতকে প্রভাবিত করিবার প্রধান উপায় হইল দলীয় নীতি বিশেষভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা। এজন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল শোভাযাত্রা, সভা-সমিতির অনুষ্ঠান, সংবাদপত্র এবং পুস্তিকা প্রকাশ, ইত্যাদির সাহায্য লইয়া থাকে।

সরকার স্থায়ী রাখার চেষ্টা করা

কোনও দেশেই রাজনৈতিক দলগুলি শাসনতন্ত্র কর্তৃক স্বীকৃত হয় না। তবে কোনও রাজনৈতিক দল যদি সরকার গঠন করে, তখন সেই সরকারকে শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন বিধান মানিয়া চলিতে হয়। প্রত্যেক দেশের রাজনৈতিক দলগুলির ক্রিয়াকলাপ শাসনতন্ত্র-বহির্ভূত (extra-legal) এলাকায় সীমাবদ্ধ। দলীয় সংগঠন কঠোর অথবা নমনীয় হইতে পারে। ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় দলীয় রাজনীতি খুব উন্নত ধরণের এবং প্রত্যেকটি দলের সংগঠন খুব অনমনীয় (rigid)। কিন্তু, ফ্রান্সে অনেকগুলি দল থাকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সংগঠন খুব নমনীয় (flexible)।

বর্তমানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের একটি অর্থনৈতিক কার্যসূচী থাকে। রাজনৈতিক কর্মসূচী হইতে অর্থনৈতিক কার্যসূচী বর্তমান কালের রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর সমাধানের উপায় সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়, তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই দলীয় রাজনীতি গড়িয়া উঠে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইংলণ্ডে রক্ষণশীল দল (Conservative party) কোনও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করিবার পক্ষপাতী নহে। কিন্তু শ্রমিক দল (Labour party) অত্যাবশ্যক বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে জাতীয়করণ করিবার

রাজনৈতিক দলের অর্থনৈতিক কার্যসূচী থাকে

পক্ষপাতী। অবশ্য ধর্মের ভিত্তিতেও কোন কোন দেশে রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়; যেমন, ভারতে মুস্‌লিম লীগ এবং হিন্দুমহাসভার সৃষ্টি ধর্মের ভিত্তিতে হইয়াছিল।

গণতন্ত্রের সার্থকতার জন্য রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার অবদান অপরীসীম। অধ্যাপক লাস্কি বলেন, "সদাসচেতনতাই স্বাধীনতা রক্ষার মূল।" ("Eternal vigilance is the price of Liberty,")। জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসারণ এবং রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি করার ব্যাপারে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গণতান্ত্রিক সরকার জনগণেরই সরকার। জনগণ রাজনৈতিক দলের মাধ্যমেই সরকার গঠন করিবার চেষ্টা করে। শুধু তাহাই নহে, গণতন্ত্র যাহাতে দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, সেজন্য প্রত্যেক গণতান্ত্রিক দলই সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করে।

যে সকল দেশে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানে শুধু একটি রাজনৈতিক দলেরই অস্তিত্ব থাকে। শুধু একটি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকিলে আমরা উহাকে দলীয় ব্যবস্থা বলিতে পারি না। যদি দেশে একাধিক দল না থাকে তবে গণতন্ত্র বিপন্ন হইয়া পড়ে, কেননা, সেক্ষেত্রে সরকার গঠনকারী দলের ক্রিয়াকলাপের গঠনমূলক সমালোচনা হয় না এবং সরকার স্বৈরাচারী হইয়া পড়ে। সোভিয়েট ইউনিয়নে আমরা একদলীয় রাজনীতি দেখিতে পাই, সেজন্য সে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। আবার দলের সংখ্যা যদি খুব বেশী হয় তাহাও গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক। কেননা, সেক্ষেত্রে স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না (যেমন ফ্রান্স ও পাকিস্তানের ক্ষেত্রে হইয়াছে)।

দেশে যদি সরকারের বিভিন্ন ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা হয়, তবে, রাজনৈতিক দল সেখানে ঐক্যবোধের সৃষ্টি করে এবং সরকারের বিভিন্ন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া একটি সুসমঞ্জস শাসনব্যবস্থা ও শাসননীতির ক্ষেত্র রচনা করে।

দলীয় শাসনের সুবিধা (Advantages of party government):

রাজনৈতিক দলগুলি জনমতকে সুসংগঠিত এবং সুদৃঢ় করে বলিয়া জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করিতে এবং তাহাদের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধিতে দলীয় শাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। দলীয় শাসনের একটি প্রধান সুবিধা হইল সরকার সাধারণতঃ স্বৈরাচারী হইতে পারে না। কারণ,

সরকার স্বৈরাচারী হইতে পারে না

অন্যান্য রাজনৈতিক দল, বিশেষতঃ আইনসভায় সরকার-বিরোধী দলগুলি সরকারকে কখনই স্বৈরাচারী হইতে দেয় না। এই দলগুলি সর্বদাই সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করে এবং প্রয়োজন হইলে বিকল্প সরকার গঠনের জন্য প্রস্তুত

থাকে। জনসাধারণেরও ইহাতে নিজেদের বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা হয়। দলীয় শাসনে সরকার গঠনকারী দলকে সর্বদাই সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয় বলিয়া আইনসভায় প্রত্যেক দলই যথাসম্ভব দলীয় শৃংখলা বজায় রাখিবার চেষ্টা করে। সংখ্যা-লঘিষ্ঠ দলের সমালোচনা সহ্য করিয়া সরকারপক্ষ কখন নিজের দলীয় স্বার্থে জনস্বার্থ-বিরোধী কাজকর্ম করিতে চায় না।

সরকারের সহিত জনগণের সম্পর্ক সহজ হয়।

দলীয় শাসনের আর একটি সুবিধা হইল, রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে সরকারের সহিত জনসাধারণের পরোক্ষ সূত্র স্থাপিত হয়। অধ্যাপক বার্কার (Prof. Barker) বলেন, "No longer we think in terms of man vs. the state but in terms of the group vs. the state." দেশের প্রত্যেকটি লোকের সংগে সরকারের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখা কখনই সম্ভবপর নয়। যে সকল লোক বিভিন্ন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সমস্যাবলী সম্বন্ধে একই অভিমত পোষণ করেন, তাঁহারা সর্বদাই নিজেদের মতামত রাজনৈতিক দলের মারফত আইনপরিষদে এবং আইনপরিষদের বাহিরে সরকারের নিকট উপস্থাপিত করিতে পারেন। শাসনকর্তৃপক্ষ এবং আইনপরিষদের মধ্যে যে যোগসূত্র আমরা আধুনিক গণতন্ত্রে দেখিতে পাই, তাহা শুধু দলীয় শাসনেই সম্ভব।

রাজনৈতিক শিক্ষার সুবিধা

দলীয় শাসন জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার সাধন করে এবং নাগরিকতাবোধ বাড়াইয়া দেয়। শুধু তাহাই নহে, দলীয় শাসন যেমন জনসাধারণকে নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে, সেই প্রকার ইহা তাহাদের কর্তব্যবোধেও উদ্বুদ্ধ করে।

দলীয় শাসনের অসুবিধা (Disadvantages of the party system)

গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য দলীয় শাসনের খুব প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও ইহা অনেক ক্ষেত্রেই ত্রুটিপূর্ণ থাকে। রাজনৈতিক দল-ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইল ইহা দলীয় মতবিভেদের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে কৃত্রিম কলহ, তিক্ততা, বিদ্বেষ এবং দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। দলের প্রাধান্য বজায় রাখাই যে কোন রাজনৈতিক দলের সদস্যদের প্রধান উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন রাজনৈতিক দল যে কোন প্রকার মিথ্যা এবং অন্যায় আচরণের আশ্রয় লইতে পারে। দলের প্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্য দলের সদস্যদের সর্বদাই দলীয় নেতার অনুশাসন পালন করিতে হয়। বীর

দলীয় মতভেদ, বীরপূজা, দলীয় স্বার্থ সরকারের সংহতি নষ্ট করে।

পূজার (hero worship) চাপে দলীয় সদস্যদের ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রায়ই ক্ষুণ্ণ হয়। অনেক সময় দলীয় নেতার আদেশে সদস্যগণকে নিজেদের বিবেকবুদ্ধি বিসর্জন দিয়া দলের নীতিকে বড় করিয়া তুলিতে হয়। এজন্য অনেক সময় সদস্যগণ দলীয় নেতা অথবা রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় পরিষদের হাতে ক্রীড়নক হইয়া পড়েন। সদস্যদের রাজনৈতিক দলের আদর্শের অন্ধ অনুকরণ এবং ইহার প্রতি দ্বিধাহীন আনুগত্য জন-স্বার্থ অপেক্ষা দলীয় স্বার্থকে বড় করিয়া ফেলে। গণতন্ত্রে দলীয় শাসনের ইহাই প্রধান অপগুণ। তাহা ছাড়া, দেশের সাধারণ নির্বাচনে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই আইনপরিষদে সংখ্যা-গরিষ্ঠতা অর্জন করিতে চাহে বলিয়া ফাঁকি দিয়াই হোক অথবা অন্য যে কোন প্রকারেই হোক্, ভোট সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করে। ইহাতে দলীয় শাসনের নৈতিক মানের অবনতি হয়। দলীয় শাসন ব্যবস্থায় সরকার পক্ষের দুর্নীতির পরিমাণও কম হয় না। নিজের দলের শক্তি ও শৃংখলা বজায় রাখিবার জন্য অনেক সময়ই মন্ত্রীগণ দলের সদস্যদের সরকারী চাকুরী অথবা সরকারী সাহায্য বিতরণ করেন। এমনকি অনেক সময় সরকারের পক্ষ হইতে কাহাকেও সম্মান প্রদর্শন করিবার সময়েও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যোগ্যতাই বড় প্রশ্ন হইয়া দাঁড়ায় না,—সেখানেও দলীয় স্বার্থকেই বড় করিয়া দেখা যায়। দল রাখিবার জন্য অনেক সময় দলের কতিপয় অযোগ্য এবং অনভিপ্রেত সদস্যগণকেও মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিতে হয়। দলীয় শাসনে আইনপরিষদের ক্রিয়াকলাপেও আমরা কতিপয় ত্রুটি দেখিতে পাই। অনেক সময় সরকার-বিরোধী দলগুলি সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা না করিয়া কেবল ইহার কাজের দোষ অনুসন্ধান করিতে থাকে। সর্বদাই সরকারী কাজে বাধার সৃষ্টি করিলে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। বিশেষতঃ, যে সমস্ত দেশে অনেকগুলি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকে (যেমন ফ্রান্স অথবা পাকিস্তান) সেগুলিতে সরকার কখনই স্থায়িভাবে গঠিত হইতে পারে না। ইহাতে জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয় এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাতীয় অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

দলীয় স্বার্থে উপযুক্ত ব্যক্তি উপেক্ষিত হইতে পারে।

দলীয় শাসনের আর একটি ত্রুটি হইতেছে এই যে আত্মকলহের ফলে যদি দলের সদস্যগণের মতে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয় এবং রাজনৈতিক দল যদি কুচক্রী দলে (faction) পরিণত হয়, তবে মুষ্টিমেয় কতিপয় দলীয় নেতা ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে দলীয় স্বার্থকে বিসর্জন দিতে দ্বিধা বোধ করে না।

দলীয় শাসনের বিকল্প ব্যবস্থা আছে কিনা,—দলীয় শাসনের ত্রুটি দূর করিবার ব্যবস্থা—দলীয় শাসন ব্যবস্থার উপরোক্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকার ফলে অনেকে মনে করেন দলীয় শাসনের অবসান হওয়া উচিত। কিন্তু এই

যুক্তি কখনই সমর্থনযোগ্য নহে। যদি দলীয় শাসনের অবসান হয় তবে সব মানুষের কাছে ব্যক্তিগত স্বার্থই বড় হইয়া দেখা দিবে এবং জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য অনুপ্রাণিত হইয়া সকলকে একযোগে কাজ করিতে বাধ্য করিবার জন্য কোনও সংঘ অথবা প্রতিষ্ঠান থাকিবে না। দলীয় শাসনের অবর্তমানে বিভিন্ন মানুষের ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগত কোনও ইচ্ছাই বাস্তবে রূপায়িত হইবার সুযোগ পাইবে না। নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব-বিকাশে, জনমত গঠনে সরকারের কাজের নৈতিক মান উন্নয়নে বিভিন্ন দলের প্রচেষ্টা বিনষ্ট হইবে। কিন্তু, দলীয় শাসনের অবসান যদি বাঞ্ছনীয় না হয়, তবে প্রশ্ন উঠিতে পারে, শাসনতন্ত্রে এমন কোনও ব্যবস্থা থাকা উচিত কিনা যাহাতে দলীয় শাসন ব্যবস্থা উল্লিখিত দোষত্রুটি হইতে মুক্ত থাকিতে পারে। এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা দলব্যবস্থার ত্রুটি দূর করিবার জন্য নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদান করিতে পারি।

প্রথমতঃ, শাসনতন্ত্র অনুযায়ী দেশের শাসন ব্যবস্থা এরূপভাবে গঠন করিতে হইবে যাহাতে কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দল অথবা ইহার নেতা সর্বময় শাসনকর্তৃত্ব লাভ না করিতে পারে। এজন্য যিনি রাষ্ট্রের প্রধান হইবেন, তাঁহাকে সর্বদাই দল-নিরপেক্ষ হইতে হইবে। ভারতের রাষ্ট্রপতি যতদিন তাঁহার পদে আসীন থাকেন, ততদিন তিনি রাজনৈতিক দল-নিরপেক্ষ থাকেন। তাহা ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতামত অপেক্ষা জনসাধারণের মতামতের উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। সেজন্য শাসনতন্ত্র অনুযায়ী পদচ্যুতি (Recall), গণ-উদ্যোগ (Initiative), গণভোট (Referendum) এবং নির্বিশেষ গণভোটের (Plebiscite) ব্যবস্থা করা উচিত।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের কিছু ব্যবস্থা থাকা উচিত

দ্বিতীয়তঃ, শাসনতন্ত্রে এমন বিধান থাকা উচিত যে সরকারী চাকুরী সাহায্য অথবা সম্মান বিতরণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যোগ্যতাকেই প্রধান মাপকাঠি ধরিতে হইবে, তাহার রাজনৈতিক মতামত অথবা দলীয় সদস্যপদ নহে। এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে দলীয় শাসন ব্যবস্থা হইতে অনেক দুর্নীতি দূর হইবে।

যোগ্যতাই উচ্চপদের মাপকাঠি হওয়া উচিত

তৃতীয়তঃ, কোনও রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করিয়া যাহাতে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী শাসনতন্ত্রের সংশোধন না করিতে পারে সেজন্য শাসনতন্ত্রকে সর্বদাই অনমনীয় রাখিতে হইবে এবং নাগরিকদের বিভিন্ন মৌলিক অধিকার লিখিত রাখিতে হইবে।

অনমনীয় শাসনতন্ত্র হওয়া উচিত

চতুর্থতঃ, দলীয় শাসনব্যবস্থার অপগুণে যাহাতে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ না হয় অথবা জাতীয় স্বার্থ আঘাতপ্রাপ্ত না হয় অথবা শাসনতন্ত্র মর্যাদা না হারায়, সেদিকে উপযুক্ত দৃষ্টি প্রদান করিবার জন্য বিচার বিভাগকে যথাসম্ভব স্বাধীন ও নিরপেক্ষ রাখিতে হইবে।

বিচারবিভাগ স্বাধীন হওয়া উচিত

পঞ্চমতঃ, সরকারী কর্মচারীগণকে কখনই রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে এবং রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারে সক্রিয়ভাবে লিপ্ত হইতে দেওয়া উচিত নয়। অবশ্য তাহারা নিজেদের রাজনৈতিক মতামত সম্পূর্ণ স্বাধীন রাখিতে পারিবে। তাহারা যাহাতে দলনিরপেক্ষ হইয়া জাতীয় স্বার্থে নিজেদের কাজ করিয়া যাইতে পারে, সেজন্য তাহাদের চাকুরী সম্পর্কীয় বিভিন্ন সর্ত এবং বেতন ও অন্যান্য বিভিন্ন ধরণের সুবিধা সর্বদা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত।

সরকারী কাজে রাজনৈতিক মতবাদের স্থান থাকা উচিত নয়

ষষ্ঠতঃ, আইন পরিষদে যাহাতে সংখ্যালঘু রাজনৈতিক দলের সদস্যগণও নির্বাচিত হইতে পারেন, সে রকম ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রের করিয়া দেওয়া উচিত।

সংখ্যালঘুর প্রতিনিধিত্ব

উপসংহারে আমরা বলিতে পারি, নাগরিকদের উপযুক্তভাবে রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হইলে দলীয় শাসনব্যবস্থা কখনই ত্রুটিমুক্ত হইতে পারে না। সেজন্য প্রধান প্রয়োজন হইতেছে উপযুক্তভাবে শিক্ষাবিস্তার করা। যতদিন জনমত দেশের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে সচেতন না হইবে এবং শিক্ষিত না হইবে, ততদিন দলীয় শাসন কখনই সার্থক হইবে না।

দ্বি-দলীয় শাসনব্যবস্থার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি (Arguments for and against the two party system.)

পৃথিবীর দুইটি প্রধান গণতান্ত্রিক দেশে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং গ্রেটবৃটেনে আমরা দ্বি-দলীয় শাসন-ব্যবস্থা দেখিতে পাই। দ্বি-দলীয় শাসন ব্যবস্থায় যে রাজনৈতিক দল আইন পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, সেই দলই শাসনকাজ পরিচালনা করে। ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে কমন্সসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রীসভা গঠন করে। কিন্তু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিনিধিসভার (House of Representatives) অথবা সিনেটসভার (Senate) সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রীসভা গঠন করে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনবিভাগের বিভিন্ন সচিব (Secretaries) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং তাহাদের মার্কিন কংগ্রেসের সদস্য হইতে হয় না।

দ্বি-দলীয় শাসনব্যবস্থার পক্ষে আমরা নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদান করিতে

পারি। প্রথমতঃ, এই ব্যবস্থায় সরকার একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থায়িভাবে গঠিত হয়। কিন্তু, আইন পরিষদে অপর একটি দলের অস্তিত্ব থাকায় সরকার গঠনকারী দল কখনই জনস্বার্থবিরোধী ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত থাকিতে সাহসী হয় না। কারণ, বিরোধীদল সর্বদাই সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের গঠনমূলক সমালোচনা করিতে এবং জনমতকে সেভাবে প্রভাবিত করিতে প্রস্তুত থাকে। দ্বি-দলীয় রাজনীতিতে দুইটি দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকে বলিয়া শাসনকার্যের উৎকর্ষতা অনেক বাড়িয়া যায় এবং নির্বাচকগণের পক্ষে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করা সহজ হয়।

দেশে দুইটি রাজনৈতিক দল থাকার বিরুদ্ধে বলা হয় যে জনসাধারণের পক্ষে শুধু দুইটি দল ব্যতীত অন্য কোনও বিকল্প দলের সহিত সহযোগিতা করিবার সুযোগ না থাকায় জনমত সুষ্ঠুভাবে অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে পূর্বে যখন ইংলণ্ডে রক্ষণশীলদল (Conservative Party) এবং উদারনৈতিক দল (Liberal Party) শুধু এই দুইটি রাজনৈতিক দল ছিল, তখন মধ্যপন্থীদের পক্ষে ভোট প্রদানের সময় যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করা খুবই কষ্টসাধ্য ছিল। দ্বিতীয়তঃ, আইন পরিষদে যদি শুধু একটি সরকার পক্ষীয় দল এবং অপরটি বিরোধী দল থাকে, তবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষোক্ত দলের মন্ত্রীসভা গঠন করিবার কোনও সম্ভাবনা থাকে না। যদি আইন পরিষদে একাধিক রাজনৈতিক দল থাকে, তবে যে কোনও দল অপর কোন দলের সহিত সম্মিলিত মন্ত্রীসভা (coalition ministry) গঠন করিতে পারে। বিশেষতঃ, দুইটি দল থাকিলে শাসনগোষ্ঠীর স্বৈরাচারী হইবার যে সম্ভাবনা দেখা যায়, বহুদল-সমন্বিত আইনপরিষদে সেই সম্ভাবনা তিরোহিত হয়। দুই দল সমন্বিত আইনপরিষদে দলীয় শাসন এবং শৃংখলা খুবই কঠোর হয় এবং সেক্ষেত্রে দলীয় সদস্যগণ অনেক সময়ই নিজেদের বিবেক বুদ্ধির নির্দেশ অমান্য করিয়াও ভোট প্রদান করিতে বাধ্য হয়।

বহুদলব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and disavantages of a multiple party system.)

বহুদল সমন্বিত আইনপরিষদের একটি প্রধান সুবিধা হইতেছে জনসাধারণের বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয়ে বিভিন্ন ধরণের মত পোষণ করিলে সেগুইলি আইনপরিষদে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়। বহু দল ব্যবস্থায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিও আইন পরিষদে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পাইয়া স্বাধীনভাবে নিজদের মতামত প্রকাশ করিতে পারে। মন্ত্রীসভাও বহুদল সমন্বিত শাসন ব্যবস্থায় স্বৈরাচারী হইতে পারে না। কারণ, সেইক্ষেত্রে সরকার পক্ষের রাজনৈতিক দলে ভাংগনের সৃষ্টি হইতে পারে

এবং সরকার পক্ষ অন্যান্য রাজনৈতিক দল কর্তৃক তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হইতে পারে। বহুদল সমন্বিত শাসন ব্যবস্থায় বিরোধী পক্ষের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া ইহাকে অপসারণ করা খুব কঠিন নহে। ফ্রান্স এবং নবগঠিত রাষ্ট্র পাকিস্তানে ইহা বহুবার হইয়াছে। জাতীয় সংকটের সময় বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে যদি সরকার গঠিত হয় (যেমন, ইংলণ্ডে হয়), তবে শাসন ব্যবস্থার উৎকর্ষতা অনেক বাড়িয়া যায়।

• বহুদল সমন্বিত আইনপরিষদের প্রধান অসুবিধা হইতেছে এই যে, অনেকগুলি দল সরকারের বিরোধিতা করে বলিয়া সরকার প্রায়ই স্থায়ী হয় না। ফ্রান্সে বহুদল ব্যবস্থার জন্য অনেকবার মন্ত্রীসভার পতন হইয়াছে। নবগঠিত রাষ্ট্র পাকিস্তানেও ইতিমধ্যে আমরা অনেকবার মন্ত্রীসভার পতন দেখিয়াছি। ইহাতে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। সেইজন্য কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন, বহুদল-ব্যবস্থার পরিবর্তে দুই-দল ব্যবস্থাই প্রত্যেক দেশে থাকা উচিত। বিশেষতঃ, যদি উভয় রাজনৈতিক দল সমানভাবে সংগঠিত হয় এবং সমান ক্ষমতার অধিকারী হয়, তবে সরকারের কর্মকুশলতা অনেক বাড়িয়া যায়। কিন্তু, বহুদল ব্যবস্থায় এই সুবিধা পাওয়া যায় না। তাহা ছাড়া, আইনপরিষদেও আইন প্রণয়ন অথবা সংশোধন সম্পর্কিত কোন ব্যাপারে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষে একমত হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইহার ফলে সরকার পক্ষে কোন নীতি কার্যকরী করিতে অযথা সময় অতিবাহিত হয় এবং ইহা সর্বদাই কোন না কোন দলের সদস্যদের অসন্তোষের কারণ ঘটায়। বহুদল ব্যবস্থায় ভোটারদেরও একটি বিশেষ সমস্যা আছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে সরকারী ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা প্রদান করে এবং ইহা ভোটদাতাগণের পক্ষে কোনও ব্যাপারে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করে। সেইজন্য বহুদল ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই জনমতকে বিভ্রান্ত করে।

উপসংহারে আমরা বলিতে পারি দুই-দলীয় শাসন ব্যবস্থা বহু-দলীয় শাসনব্যবস্থা হইতে সরকারের উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে বেশী সহায়ক। কিন্তু দেখিতে হইবে দুই-দলীয় ব্যবস্থায় উভয় দলের মধ্যে শক্তি সামর্থ্যের বৈষম্য যেন বেশী না হয়।

জনমত (Public Opinion)

অনেক সময় বলা হয় জনমত প্রকৃতপক্ষে জনগণের নহে, এবং ইহা একটি প্রকৃত মত নহে (…"It is neither *public* nor *opinion*)" অনেক সময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কয়েকজন অথবা দেশের নেতৃবৃন্দ কতিপয়

অভিমত পোষণ করিতে পারেন এবং জনসাধারণও হয়ত সে সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন থাকে না। সেইদিক হইতে চিন্তা করিলে এই মত প্রকৃতপক্ষে জনমত নহে। যাহাকে আমরা মতামত বলি, অনেকক্ষেত্রে তাহা হইতেছে কতিপয় বিশ্বাস অথবা ধারণা মাত্র। জনমত প্রাথমিকভাবে অল্প কয়েকজন নেতা গঠন করেন, তারপর ইহা দেশের মধ্যে প্রচারিত করা হয়। যদি দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অথবা কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকেরা এই মতের সারমর্ম বুঝিয়া ইহা গ্রহণ করে এবং ইহা কার্যকরী করিতে সচেষ্ট হয়, তখনই আমরা ইহাকে জনমত বলিতে পারি। লিপম্যানের (Lippman) ভাষায় "The symbolism of Public Opinion usually bears the mark of balancing of interests."১ জনমতের ভিত্তি অনেকাংশে নির্ভর করে জননেতাদের জ্ঞান এবং স্বার্থহীনতার উপর। সরকারের জন্য কার্যকরী জনমত বলিতে বুঝায় জনগণের মধ্যে এমন একটি সুদৃঢ় মত যাহা সুসংগঠিত এবং যাহা সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানের পরিচায়ক। কতজন লোক এই মত গ্রহণ করিয়াছে তাহা অপেক্ষা এই মতের গভীরতা কত বেশী, তাহাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। (…'the intensity of an opinion is often of more importance than the number of persons who compose it.'—Gettel).

জনমতের কার্যকারিতার উপায় (conditions of effectiveness of public opinion)—জনমতের কার্যকারিতা নিম্নলিখিত অবস্থার উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ, দেশের জনসাধারণকে সরকারী ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে সদাসচেতন এবং সতর্ক থাকিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, কতিপয় সাধারণ স্বার্থ সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখিতে হইবে। শ্রেণীগত ধর্মগত এবং জাতিগত বিরোধ অনেকক্ষেত্রেই বিভিন্ন জাতীয় স্বার্থ সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি করে। তৃতীয়তঃ, সরকার কি ধরণের হওয়া উচিত এবং সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের প্রকৃতি কিরূপ হওয়া উচিত, সেই সম্বন্ধেও জনসাধারণের মধ্যে মতৈক্য থাকা উচিত। চতুর্থতঃ, মত-প্রকাশের স্বাধীনতা এবং স্বাধীনভাবে আলোচনা করিবার অধিকার জনসাধারণের থাকা উচিত যাহাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরাও রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে নিঃসংকোচে নিজেদের মতামত প্রকাশ করিতে পারে। সর্বশেষে, অধিকাংশের যাহা ইচ্ছা তাহা যতদিন জনমত তীব্র থাকে, ততদিন সংখ্যালঘিষ্ঠদের মানিয়া লওয়া উচিত। আবার, সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থও সংখ্যাগরিষ্ঠদের কর্তৃক অবহেলিত হওয়া উচিত নয়।

১। Lippmann—Public Opinion.

জনমত গঠন ও প্রকাশের উৎস (Agencies for the creation and expression of Public opinion) :

ইংরেজ রাজনীতিবিদ স্যার রবার্ট পীলের মতে জনমত হইতেছে "ভ্রান্তি, দুর্বলতা, কুসংস্কার, বিবিধ অনুভূতি, গোঁড়ামি ও সংবাদপত্রের প্রচার প্রভৃতির একটি বিরাট সমন্বয়।"১

জনমত গঠন ও প্রকাশের একটি প্রধান উপায় হইতেছে সংবাদপত্র তাহা ছাড়া, বিভিন্ন বই এবং সাময়িকপত্রও জনমত গঠনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। সংবাদপত্রগুলি দেশের অবস্থা এবং সরকারের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে সংবাদ সরবরাহ করিয়া এবং সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিয়া জনমত গঠন করে এবং ইহাকে প্রভাবান্বিত করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতায় যে সংবাদপত্রগুলি চালিত হয়, সেইগুলি সংবাদ সরবরাহ এবং সরকারী কাজের সমালোচনায় নিরপেক্ষতা বজায় রাখিতে পারে না। কিন্তু, জনমত গঠনে সংবাদপত্রের নিরপেক্ষতার গুরুত্ব খুব বেশী।

সংবাদপত্রের পর বেতার এবং চলচ্চিত্রের ভূমিকা জনমত গঠনে ও প্রকাশে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সংবাদপত্রগুলির যেমন নির্ভুল সংবাদ পরিবেশন করা উচিত, বেতারেও সেইপ্রকার নির্ভুল তথ্য পরিবেশিত হওয়া উচিত। বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বেতার-বক্তৃতার মারফৎ জনমত গঠনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন উপায়ে জনমতকে নিজেদের স্বার্থে পরিচালিত করিবার জন্য চেষ্টা করে। দলীয় নেতাদের বক্তৃতা, বিবৃতি, তথ্যসম্বলিত বিভিন্ন সাময়িকপত্র, বই, প্রচারপত্র প্রভৃতির মারফৎ রাজনৈতিক দলগুলি জনমতের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করে। অনুরূপভাবে বিভিন্ন সংস্থা বা ক্লাব এবং শ্রমিকসংঘগুলিও নিজের সদস্যদের মধ্যে জনমত গঠন করিবার চেষ্টা করে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিও নিজ নিজ ক্ষেত্রে জনমত গঠন করে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি জাতীয় নেতাদের জীবনাদর্শ ছাত্রদের সামনে তুলিয়া ধরিয়া অথবা শিক্ষকগণ ছাত্রদের কাছে বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যার প্রকৃতি ও তাৎপর্য বুঝাইয়া জনমতকে গঠিত এবং শিক্ষিত করেন।

জনমত ও গণতন্ত্র (Public opinion and Democracy) :

গণতান্ত্রিক সরকারের সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষিত এবং সদাসতর্ক জনমতের উপর। আধুনিক গণতন্ত্রে জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে সরকারকে নিয়ন্ত্রিত

১। "...the great compound of folly, weakness, prejudice, wrong feeling, right feeling, obstinacy and newspaper propaganda" Quoted in Lippmann's Public Opinion.

করিতে পারে না। তাঁহারা আইনপরিষদে বিভিন্ন সদস্য নির্বাচন করেন এবং সেই সদস্যগণের মধ্য হইতেই মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। এক্ষেত্রে যদি জনগণ নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন না থাকে তবে মন্ত্রীসভা স্বৈরাচারী হইয়া যাইতে পারে এবং আইনপরিষদের সদস্যগণও মন্ত্রীসভার স্বৈরাচার দমন করিতে ব্যর্থ হইতে পারে। জনমত যদি সর্বদা সচেতন না থাকে, তবে আইনপরিষদের সদস্যগণও জনগণের স্বার্থরক্ষার জন্য সর্বদা ব্যস্ত থাকেন না। প্রত্যেকেই নিজের নিজের স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত থাকেন। সেইক্ষেত্রে মন্ত্রীসভার পক্ষে স্বৈরাচারীর ন্যায় কাজ করা এবং জনগণের স্বার্থ অপেক্ষা নিজেদের স্বার্থ বড় করিয়া দেখা খুবই স্বাভাবিক। সেইজন্য জনমত সর্বদাই সুদৃঢ় এবং সুসংগঠিত থাকিতে হইবে যাহাতে জনমতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করিতে সরকার সাহসী না হন। রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারেও জনমতকে সর্বদা নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে হয়, তাহা না হইলে রাষ্ট্রপতিও যে কোন সময়েই স্বৈরাচারীর ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারেন।

মন্ত্রীসভা চালিত শাসনব্যবস্থায় সচেতন জনমতের প্রয়োজনীয়তা

মানুষের স্বাধীনতা রক্ষার অনেকগুলি উপায় আছে, যেমন স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা, লিখিত শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত মৌলিক অধিকার, ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ এবং সুদৃঢ় জনমত। কিন্তু, জনমতের মত স্বাধীনতার শক্তিশালী রক্ষাকবচ আর দ্বিতীয়টি নাই। অধ্যাপক লাস্কির মতে সদা-সচেতনতাই স্বাধীনতার প্রকৃত মূল্য ("Eternal vigilance is the price of liberty.")। গণতান্ত্রিক দেশে নিজেদের অধিকার বা স্বাধীনতা যাহাতে মোটেই ক্ষুণ্ণ না হয়, সেইদিকে জনগণের নিজেদেরই খেয়াল রাখা উচিত। শাসকগণ যখন বুঝিতে পারিবেন যে তাঁহাদের কয়েকটি অন্যায়মূলক ক্রিয়াকলাপ জনমত কখনই বরদাস্ত করিবে না, তখনই তাঁহারা কোন অন্যায় কাজ করা হইতে বিরত থাকিবেন। জনমত সর্বদা সচেতন থাকিলে আইনপরিষদের সদস্যগণও নিজেদের অধিকার এবং কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকেন এবং প্রয়োজন হইলে সরকারের বিভিন্ন কাজের সমালোচনা করিতে পারেন। কোন একটা মত বা আদর্শকে আঁকড়াইয়া না ধরিয়া বর্তমানকালের আইনসভা জনমতের সংগে সমতুল্য রাখিয়া নিজেদের মতের পরিবর্তন করে।[১] শিক্ষিত

গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষিত জনমতের উপর

১। জনমতের দ্বারা বর্তমানকালের আইনসভা কতটা প্রভাবিত হয় সেই সম্বন্ধে বার্কার (Barker) বলেন, "To day we know that Public Opinion is always moving ; and we believe that it is moving onward, and we conceive the law along its course. We devise representative legislatures to mediate between public opinion and law and acting as the organs and exponents of the former, to modify the latter accordingly." (Barker-Greek Political Theory. Plato and his Predecessors. P. 44).

জনমতই গণতন্ত্রকে সফল করিয়া তুলিতে পারে। জনমতকে সর্বদা সতর্ক থাকিয়া শাসকশ্রেণীকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে তাঁহারা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি, সুতরাং জনস্বার্থ বিরোধী কোনও কাজ তাঁহাদের করা উচিত নয়। জনমত সর্বদা সচেতন থাকিলে বিচার বিভাগের কাজও অনেক উন্নত হয় এবং প্রত্যেকেই যাহাতে সমানভাবে সুবিচার পায়, সেভাবে বিচার করা হয়।

গণতন্ত্রে প্রত্যেক লোকেরই প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে সরকারের বিভিন্ন কাজে অংশ গ্রহণ করিতে হয়। জনমত যদি সদাসতর্ক থাকে তবে সুসংগঠিত জনমতের মাধ্যমেই জনসাধারণ গণতান্ত্রিক সরকারে পরোক্ষভাবে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

সংক্ষিপ্তসার

রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য—রাজনৈতিক দল বলিতে বুঝায় এমন একটি জনসমষ্টি যাহারা একটি বিশেষ নীতিতে একমত হইয়া একটি রাজনৈতিক সংস্থার মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে জাতীয় স্বার্থের উন্নতির জন্য কাজ করে, এবং নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া সরকার গঠন করিতে ও নিজের নীতিগুলিকে কার্যকরী করিতে চেষ্টা করে। রাজনৈতিক দলের সদস্যগণকে দলের কার্যসূচী এবং মূলনীতি সম্বন্ধে একমত হওয়া চাই। তাহাদের সর্ব অবস্থায় দলীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ থাকিতে হইবে এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে তাহাদের কার্যসূচী বাস্তবে রূপায়িত করিতে চেষ্টা করিবে। এই জন্য তাহাদের প্রধান লক্ষ্য হইতেছে সরকার গঠন করা।

রাজনৈতিকদলের সদস্যগণের মধ্যে যখন দলের মূলনীতি ও কর্মপন্থা লইয়া বিভেদের সৃষ্টি হয় এবং প্রত্যেকেই নিজেদের স্বার্থরক্ষার ব্যস্ত হইয়া পড়ে তখন ইহাকে কুচক্রী দল বা "Faction" বলা হয়।

গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের কাজ—রাজনৈতিক দলের প্রথম কাজ হইল দলীয় সংগঠন দৃঢ় করা এবং দলীয় মূলনীতি ও সেই নীতি কার্যকরী করিবার জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচী নির্ধারণ করা।

প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই সরকার গঠনের জন্য চেষ্টা করে। এই জন্য দেশের সাধারণ নির্বাচনের সময় ইহা আইনসভার সদস্য হইবার জন্য যোগ্য দলীয় প্রতিনিধিগণকে মনোনয়ন করে। যদি রাজনৈতিক দল আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে তবে পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা অথবা মন্ত্রীসভা-চালিত গণতন্ত্রে ইহা মন্ত্রীসভা গঠন করে এবং আইনসভায় নির্বাচিত দলীয়

নেতা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। সরকার গঠন করিলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের কাজ হইল নির্বাচনকালীন কর্মসূচী অনুযায়ী দলীয় নীতিগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করা, আইনসভার মাধ্যমে নিজের কাজের জন্য দেশবাসীর কাছে পরোক্ষভাবে দায়ী থাকা, এবং জাতীয় স্বার্থের উন্নতির জন্য দলীয় নীতির সহিত সংগতি রাখিয়া দেশের আইন ব্যবস্থার সংস্কার করা এবং দরকার হইলে নূতন আইন প্রণয়ন করা। কোন রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করিলে সরকারকে দেশের শাসনতন্ত্র মানিয়া চলিতে হয়।

সরকার গঠন না করিতে পারিলেও গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা মোটেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যদি কোন রাজনৈতিক দল আইনসভায় সংখ্যাধিক্য অর্জন না করিতে পারে তবে ইহা বিরোধী দলের ভূমিকা গ্রহণ করে। গণতান্ত্রিক সরকারে বিরোধী দলের ভূমিকা সরকারী দলের মতই গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের উপর ইহার একটি সক্রিয় প্রভাব আছে। আইন-সভায় নিজেদের কাজকর্মের দ্বারা রাজনৈতিক দলগুলি জনমতকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। যদি জনমত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের (সরকারপক্ষীয় অথবা সরকার-বিরোধী যে কোন দলের) ক্রিয়াকলাপের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়, তবে বিভিন্ন দল বিপুল জনমতকে কয়েকটি বিশেষ বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ করিতে পারে এবং বড় বড় দেশগুলিতেও গণতন্ত্রকে সার্থক করিতে পারে।

সরকার গঠন করিবার পর সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল সর্বদা সরকার স্থায়ী রাখিতে চেষ্টা করে। এজন্য আইনসভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল হুইপ্ (Whip) নির্বাচিত করে। তাঁহাদের কাজ হইল আইনসভার ভিতরে দলীয় শৃখংলা বজায় রাখা। অনেক সময় প্রয়োজন হইলে একাধিক রাজনৈতিক দল যৌথভাবে সরকার গঠন করিতে পারে। এইগুলিকে কোয়ালিশন সরকার (Coalition Government) বলা হয়। জনমতকে প্রভাবিত করিবার জন্য আইনসভার বাহিরেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিশেষ-ভাবে চেষ্টা করিয়া থাকে। জনমতকে প্রভাবিত কবিবার প্রধান উপায় হইল দলীয় নীতি বিশেষভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা। এইজন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল শোভাযাত্রা, সভা-সমিতির অনুষ্ঠান, সংবাদপত্র এবং পুস্তিকা প্রকাশ, ইত্যাদির সাহায্য লইয়া থাকে।

বর্তমানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের একটি অর্থ নৈতিক কার্যসূচী থাকে। গণতন্ত্রের সার্থকতার জন্য রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার অবদান অপরিসীম। যে সকল দেশে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানে শুধু একটি রাজনৈতিক

দলেরই অস্তিত্ব থাকে। শুধু একটি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকিলে আমরা উহাকে দলীয় ব্যবস্থা বলিতে পারি না। যদি দেশে একাধিক দল না থাকে তবে গণতন্ত্র বিপন্ন হইয়া পড়ে; কেন না, সেক্ষেত্রে সরকারী দলের ক্রিয়াকলাপের গঠনমূলক সমালোচনা হয় না এবং সরকার স্বৈরাচারী হইয়া পড়ে।

দলীয়-শাসনের সুবিধা—রাজনৈতিক দলগুলি জনমতকে সুসংগঠিত এবং দৃঢ় করে বলিয়া জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করিাত এবং তাহাদের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধিতে দলীয় শাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। দলীয় শাসনে সরকার খুব সহজে স্বৈরাচারী হইতে পারে না। বিরোধী দলগুলি সর্বদাই সরকারের গঠন-মূলক সমালোচনা করে এবং প্রয়োজন হইলে বিকল্প সরকার গঠনের জন্য প্রস্তুত থাকে। জনসাধারণেরও ইহাতে নিজেদের বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা হয়। দলীয় শাসনে সরকার-গঠনকারী দলকে সর্বদাই সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয় বলিয়া আইনসভায় প্রত্যেক দলই যথাসম্ভব শৃংখলা বজায় রাখিবার চেষ্টা করে।

দ্বিতীয়তঃ, দলীয় শাসনের আর একটি সুবিধা হইল, রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে সরকারের সহিত জনসাধারণের পরোক্ষ যোগ সূত্র স্থাপিত হয়।

তৃতীয়তঃ, দলীয় শাসন জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার করে এবং নাগরিকতাবোধ বাড়াইয়া দেয়।

চতুর্থতঃ, দলীয় শাসন যেমন জনসাধারণকে নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে, সেইপ্রকার ইহা তাহাদের কর্তব্যবোধেও উদ্বুদ্ধ করে।

দলীয়-শাসনের অসুবিধা—গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য দলীয় শাসনের খুব প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও ইহা অনেক ক্ষেত্রেই ত্রুটিপূর্ণ থাকে। (১) রাজনৈতিক দল-ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইল ইহা দলীয় মতবিভেদের ভিত্তিতে মানুষে-মানুষে কৃত্রিম কলহ, তিক্ততা, বিদ্বেষ, এবং দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। দলের প্রাধান্য বাজায় রাখাই যে কোন রাজনৈতিক দলের সদস্যদের প্রধান উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন রাজনৈতিক দল যে কোন প্রকার মিথ্যা এবং অন্যায় আচরণের আশ্রয় লইতে পারে।

(২) ইহাতে দলীয় সদস্যদের ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রায়ই ক্ষুণ্ণ হয়।

(৩) তাহা ছাড়া, দেশের সাধারণ নির্বাচনের সময় প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই আইন-পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিতে চাহে বলিয়া ফাঁকি দিয়াই হোক অথবা অন্য যে কোন প্রকারেই হোক ভোট সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করে ইহাতে দলীয় শাসনের নৈতিক মানের অবনতি হয়। (৪) দলীয়

শাসন ব্যবস্থায় সরকার পক্ষের দুর্নীতির পরিমাণও কম হয় না। নিজের দলের শক্তি ও শৃংখলা বজায় রাখিবার জন্য অনেক সময়ই মন্ত্রীগণ দলের সদস্যদের সরকারী চাকুরী অথবা সরকারী সাহায্য বিতরণ করেন।

(৫) দলীয় শাসনে আইনপরিষদের ক্রিয়াকলাপেও আমরা কতিপয় ত্রুটি দেখিতে পাই। অনেক সময় সরকার-বিরোধী দলগুলি সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা না করিয়া কেবল ইহার কাজের দোষ অনুসন্ধান করিতে থাকে। সর্বদাই সরকারী কাজে বাধার সৃষ্টি করিলে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

দ্বি-দলীয় এবং বহু-দলীয় শাসন-ব্যবস্থার গুণাগুণ—দ্বি-দলীয় শাসন-ব্যবস্থার নিম্নলিখিত গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, এই ব্যবস্থায় সরকার একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থায়ীভাবে গঠিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, দ্বি-দলীয় রাজনীতিতে দুইটি দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকে বলিয়া শাসনকার্যের উৎকর্ষতা অনেক বাড়িয়া যায় এবং নির্বাচকদের পক্ষে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন সহজ হয়।

দেশে দুইটি রাজনৈতিক দল থাকার বিরুদ্ধে বলা হয় যে জনসাধারণের পক্ষে শুধু দুইটি দল ব্যতীত অন্য কোনও বিকল্প দলের সহিত সহযোগিতা করিবার সুযোগ না থাকায় জনমত সুষ্ঠুভাবে অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয় না। দ্বিতীয়তঃ, আইনপরিষদে যদি শুধু একটি সরকার পক্ষীয় দল এবং অপরটি বিরোধী দল থাকে, তবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষোক্ত দলের মন্ত্রীসভা গঠন করিবার কোনও সম্ভাবনা থাকে না।

বহু দল ব্যবস্থায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিও আইনপরিষদে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পাইয়া স্বাধীনভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করিতে পারে। (২) মন্ত্রীসভাও বহু দল সমন্বিত শাসন-ব্যবস্থায় স্বৈরাচারী হইতে পারে না

কিন্তু, এই ব্যবস্থার প্রধান অসুবিধা হইতেছে এই যে, (১) অনেকগুলি দল সরকারের বিরোধিতা করে বলিয়া সরকার প্রায়ই স্থায়ী হয় না ইহাতে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। (২) বহুদল ব্যবস্থায় ভোটারদেরও একটি বিশেষ সমস্যা আছে। কোন্ দলের নির্বাচনপ্রার্থীকে ভোট দেওয়া উচিত, তাহা হইলে ভোটারদের প্রায়ই সমস্যায় পড়িতে হয়।

জনমতের কার্যকারিতার উপায়—জনমতের কার্যকারিতার জন্য দেশের জনসাধারণকে সরকারী ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে সদাসচেতন এবং সতর্ক থাকিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, কতিপয় সাধারণ স্বার্থ সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, সরকার কি ধরণের হওয়া উচিত এবং সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের প্রকৃতি কিরূপ হওয়া উচিত, সেই সম্বন্ধেও জনসাধারণের মধ্যে মতৈক্য থাকা উচিত। চতুর্থতঃ, মত প্রকাশের স্বাধীনতা

এবং স্বাধীনভাবে আলোচনা করিবার অধিকার জনসাধারণের থাকা উচিত। সর্বশেষে সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থও সংরক্ষিত থাকা উচিত।

জনমত গঠন ও প্রকাশের উৎস—প্রথমতঃ, জনমত গঠন ও প্রকাশের একটি প্রধান উৎস হইতেছে সংবাদপত্র। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন বই এবং সাময়িক-পত্রও জনমত গঠনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। জনমত গঠনে সংবাদপত্রের নিরপেক্ষতার গুরুত্ব খুবই বেশী। দ্বিতীয়তঃ' সংবাদপত্রের পর বেতার এবং চলচ্চিত্রের ভূমিকা জনমত গঠনে ও প্রকাশে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বেতার বক্তৃতার মারফত জনমত গঠনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন।

চতুর্থতঃ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন উপায়ে জনমতকে নিজেদের স্বার্থে পরিচালিত করিবার জন্য চেষ্টা করে। দলীয় নেতাদের বক্তৃতা, বিবৃতি, তথ্যসম্বলিত বিভিন্ন সাময়িকপত্র, বই, প্রচারপত্র, প্রভৃতির মারফৎ রাজনৈতিক দলগুলি জনমতের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করে।

পঞ্চমতঃ, বিভিন্ন সংস্থা বা ক্লাব এবং শ্রমিকসংঘগুলিও নিজের সদস্যদের মধ্যে জননত গঠন করিবার চেষ্টা করে। ষষ্ঠতঃ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিও নিজ নিজ ক্ষেত্রে জনমত গঠন করে। সর্বশেষে, আইনসভার সদস্যগণ আইন-সভার অধিবেশনে যে সব মতামত প্রকাশ করেন, তাঁহাও জনমত গঠনে সাহায্য করে। আইন সভার সদস্যগণের বিভিন্ন প্রকার বক্তৃতা ও মন্তব্য হইতে জনসাধারণ দেশের বিভিন্ন সমস্যার বিভিন্ন দিক বুঝিতে পারে।

জনমত ও গণতন্ত্র—গণতান্ত্রিক সরকারের সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষিত এবং সদাসতর্ক জনমতের উপর। আধুনিক গণতন্ত্রে জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে সরকারকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। তাঁহারা আইনপরিষদে বিভিন্ন সদস্য নির্বাচন করেন এবং সেই সদস্যগণের মধ্য হইতেই মন্ত্রীপরিষদ-শাশিত সরকারে মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। এক্ষেত্রে যদি জনগণ নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন না থাকে তবে মন্ত্রীসভার স্বৈরাচার দমন করিতে ব্যর্থ হইতে পারে। জনমত যদি সর্বদা সচেতন না থাকে, তবে আইনপরিষদের সদস্যগণও জনগণের স্বার্থরক্ষার জন্য সর্বদা ব্যস্ত থাকে না। সেই ক্ষেত্রে মন্ত্রীসভার পক্ষে স্বৈরাচারীর ন্যায় কাজ করা এবং জনগণের স্বার্থ অপেক্ষা নিজেদের স্বার্থ বড় করিয়া দেখা খুবই স্বাভাবিক। সেজন্য জনমত সর্বদাই সুদৃঢ় এবং সুসংগঠিত থাকিতে হইবে যাহাতে জনমতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করিতে সরকার সাহসী না হন। রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারেও জনমতকে সর্বদা নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে

সচেতন থাকিতে হয় তাহা না হইলে রাষ্ট্রপতিও যে কোন সময়েই স্বৈরাচারীর ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারেন।

জনমতের মত স্বাধীনতার শক্তিশালী রক্ষাকবচ আর দ্বিতীয়টি নাই। জনমত সর্বদা সচেতন থাকিলে আইন-পরিষদের সদস্যগণও নিজেদের অধিকার এবং কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকেন এবং প্রয়োজন হইলে সরকারের বিভিন্ন কাজের সমালোচনা করিতে পারেন। শিক্ষিত জনমতই গণতন্ত্রকে সফল করিয়া তুলিতে পারে। জনমত সর্বদা সচেতন থাকিলে বিচার বিভাগের কাজও অনেক উন্নত হয় এবং প্রত্যেকেই যাহাতে সমানভাবে সুবিচার পায়, সেইভাবে বিচার করা হয়।

গণতন্ত্রে প্রত্যেক লোকেরই প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে সরকারের বিভিন্ন কাজে অংশ গ্রহণ করিতে হয়। জনমত যদি সদাসতর্ক থাকে তবে সুসংগঠিত জনমতের মাধ্যমেই জনসাধারণ গণতান্ত্রিক সরকার পরোক্ষভাবে নিজেদের প্রভাব করিয়া থাকে।

Exercises

1. What is Political Party? Describe the essential functions of Political Parties in a democracy. (২৩৯-২৪২ পৃষ্ঠা)

2. Define a Political Party. "Without the existence of the organised parties, the functioning of the Parliamentary Government would prove impossible". Discuss.

3. Discuss the advantages and disadvantages of Party Government. Can you suggest any practical working alternative? (২৪২-২৪৬ পৃষ্ঠা)

4. What safeguards should be provided in the constitution to mitigate the evils of the party system? (২৪৪-২৪৬ পৃষ্ঠা)

5. Discuss the use, abuse and the true role of the party system in Democracy. (২৩৯-২৪৬ পৃষ্ঠা)

6. Discuss the arguments for and against a Two-party system and a multiple-party system respectively. (২৪৬-২৪৭ পৃষ্ঠা)

7. Discuss the nature of Public Opinion. What are the agencies for the creation and expression of Public Opinion? (২৪৮-২৫০ পৃষ্ঠা)

8. Discuss the nature and importance of Public Opinion in a poPular Government. (২৫০-২৫২ পৃষ্ঠা) (C.U.B.A. Part I 1962)

ষোড়শ অধ্যায় | রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ (Ends and Functions of the State)

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ (Various theories of the end of the State) :

রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন মতবাদ দিয়াছেন। এই মতবাদগুলির মধ্যে কোনটি রাষ্ট্রের উপর গুরুত্ব প্রদান করিয়াছে, আবার কোনটি জনসাধারণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। কিন্তু, রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে কয়েকটি সাধারণ যুক্তি আছে। জন লকের মধ্যে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইতেছে মানবজাতির কল্যাণ করা ("good of mankind")। তিনি বিশ্বাস করিতেন মানুষের কমনওয়েলথের মধ্যে একত্রিত হইয়া সরকারের শাসন মানিয়া লইবার একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে নিজেদের সম্পত্তি রক্ষা করা ("...the great and chief end of men uniting into commonwealths and putting themselves under government is the preservation of their property"—Locke)। অ্যাডাম স্মিথের (Adam Smith) মতে রাষ্ট্রের তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য আছে : প্রথমতঃ, সমাজকে অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রের হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ অথবা আক্রমণ হইতে রক্ষা করা, দ্বিতীয়তঃ, সমাজের প্রত্যেককে অপরাপর সদস্যের অবিচার অথবা অত্যাচার হইতে রক্ষা করা, অথবা ন্যায়ের প্রকৃত শাসন প্রতিষ্ঠা করা, এবং তৃতীয়তঃ, এমন কতিপয় কাজ করা অথবা সাধারণ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা যেগুলি কোনও ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থের জন্য নহে, সমাজের সামগ্রিক স্বার্থের দিক হইতে প্রয়োজনীয়। জার্মান লেখক হল্টজেনডর্ফ (Holtzendorff) রাষ্ট্রের ত্রিবিধ উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথমতঃ, জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে যাহাতে রাষ্ট্র নিজের অস্তিত্ব এবং অপর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা, এবং নিজের অধীনস্থ জনসাধারণ অথবা বিভিন্ন সংস্থার উপর নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রকে ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণ করিতে হইবে অথবা এইরূপ স্বাধীনতা রাষ্ট্রকে দিতে হইবে যাহা জনসাধারণ রাষ্ট্রের নিকট হইতে পাইতে পারে এবং যাহা জনসাধারণকে রাষ্ট্রের অথবা অপরাপর ব্যক্তিদের অকারণ হস্তক্ষেপ হইতে মুক্ত রাখে। তৃতীয়তঃ, জনসাধারণের সভ্যতা এবং সামাজিক

উন্নতি বৃদ্ধির চেষ্টা রাষ্ট্রকে করিতে হইবে এবং রাষ্ট্র জনগণকে শিক্ষা ও সাহায্য প্রদানের মারফৎ এই চেষ্টা করিতে পারে। ব্লুন্ট্‌শ্লির (Bluntschli) মতে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য হইতেছে জাতীয় শক্তি ও কর্মক্ষমতা বাড়াইয়া জাতীয় জীবনকে রক্ষা করা এবং পরোক্ষ উদ্দেশ্য হইতেছে জনসাধারণের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা বজায় রাখা। তিনি সাধারণ জনকল্যাণ বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সাধারণ জন-কল্যাণের তাৎপর্য সম্বন্ধে যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হইতে পারে সেই সম্বন্ধেও তিনি অবহিত ছিলেন। কেননা, এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে অনেকের মতে রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন না করিয়া একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা উচিত। বার্জেসের (Burgess) মতে রাষ্ট্রের তিনটি উদ্দেশ্য আছে ; যথা,—প্রাথমিক উদ্দেশ্য (Primary end), মাধ্যমিক উদ্দেশ্য (Secondary end) এবং শেষ বা চূড়ান্ত উদ্দেশ্য (Ultimate end)। রাষ্ট্রের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হইতেছে দেশের শান্তি, নিরাপত্তা, শৃংখলা ও ন্যায়পরতা এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সরকার ও স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করা। মাধ্যমিক উদ্দেশ্য অনুযায়ী রাষ্ট্রে জাতীয়তাবাদের আদর্শ সম্পূর্ণ করা এবং জাতির প্রত্যেকেরই ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও প্রতিভার বিকাশের সহায়তা করাই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জাতীয়তার ভিত্তিতে রাষ্ট্রগুলি গঠিত হওয়া উচিত। রাষ্ট্রের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হইতেছে মানবতা এবং বিশ্ব-সভ্যতার পূর্ণতা আনয়ন করা। উইলোবি (Willoughby) তাঁহার "The Nature of the State" বইয়ে রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের সেই শক্তির সহিত সংশ্লিষ্ট যাহার সাহায্যে ইহা জাতিসংঘে রাষ্ট্রের শান্তি, শৃংখলা এবং স্বাধীনতা বজায় রাখিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, যতদূর সম্ভব স্বাধীনতা সৃষ্টি করা এবং ইহা বজায় রাখা, যাহাতে এই স্বাধীনতা বজায় রাখা যায় সেইজন্য সরকারের পূর্ণতা সম্পাদন করা এবং যাহাতে জনসাধারণ এই স্বাধীনতা রক্ষায় সমর্থ হয়, সেইজন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করাও রাষ্ট্রের একটি উদ্দেশ্য। তৃতীয়তঃ, জনসাধারণের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক কল্যাণ সাধন করাও রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। অধ্যাপক গার্ণারও (Prof. Garner) অনুরূপভাবে রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথমতঃ, যে সুবিপুল জনসমষ্টি লইয়া রাষ্ট্র গঠিত, তাহাদের মধ্যে শান্তি, শৃংখলা, নিরাপত্তা এবং ন্যায়পরতা বজায় রাখা রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়তঃ, জনসাধারণের প্রয়োজন ছাড়াও, সমাজের সামগ্রিকভাবে যে সব জিনিষের প্রয়োজন অথবা যাহা কিছু চাহিদা তাহা সবই মিটাইবার চেষ্টা রাষ্ট্রকে করিতে হইবে। জাতীয় উন্নতি এবং দেশের সাধারণ মংগল যাহা কোনও ব্যক্তিবিশেষ অথবা কোন সংস্থা সাধন করিতে

পারে না, তাহা সাধন করিবার জন্য রাষ্ট্রকে সচেষ্ট থাকিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রের প্রধান এবং চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হইতেছে মানব সমাজের সভ্যতার মান উন্নত করা এবং এইভাবে ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়া সর্বজনীন ('universal in character') হইবার জন্য চেষ্টা করা।

অধ্যাপক লাস্কি মনে করেন, যুক্তিসম্মতভাবে বাঁচিয়া থাকার অর্থ হইল অপরের সংগে বাস করা এবং সেইজন্য সরকারের প্রয়োজন। কেননা, সভ্য সমাজের ক্রিয়াকলাপ বর্তমানে খুবই জটিল হইয়া পড়িয়াছে এবং এইগুলিকে কখনই অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রাখা যায় না। রাষ্ট্র এমন একটি প্রতিষ্ঠান যাহা জনসাধারণকে সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ সামাজিক কল্যাণ উপলব্ধি করিতে সাহায্য করে। রাষ্ট্রের কাজ মানুষের সব রকম কাজ নিয়ন্ত্রিত করা নহে। সামাজিক শৃংখলার মূল সূত্রটি রাষ্ট্র কার্যকরী করিতে পারে। কিন্তু সামাজিক শৃংখলাই শুধু রাষ্ট্রের অস্তিত্বের একমাত্র পরিচয় নহে। রাষ্ট্রের ক্ষমতা আছে, কারণ ইহার কর্তব্য আছে। ইহা মানুষকে নিজের পক্ষে যাহা সর্বোৎকৃষ্ট তাহা বুঝিতে সমর্থ করে। তত্ত্বের দিক দিয়া রাষ্ট্রের কি পরিচয়, তাহা দিয়া রাষ্ট্রকে বিচার করা যায় না; বাস্তবে রাষ্ট্র কি করে, সেই অনুযায়ী রাষ্ট্রকে বিচার করিতে হইবে। ("The state possesses power because it has duties. It exists to enable men, at least potentially, to realize the best that is in themselves. It is judged, not by what it is in theory, but by what it does in practice."— Prof. Laski, "Grammar of Politics.")

উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহাই স্পষ্ট হয় যে রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য সর্বকালের এবং সর্বদেশের লোকের জন্য নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। সভ্যতার স্তর, রাজনৈতিক চেতনার স্তর এবং যুগ-সমস্যা, ইত্যাদি কর্তৃক রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে প্রভাবিত হয়। সামাজিক কল্যাণ সম্বন্ধে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের ধারণা অনেকটা একরকম হইলেও, ইহা অর্জন করিবার উপায় সম্বন্ধে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীগণ একই অভিমত পোষণ করেন না। তবে দেশের প্রতিটি নাগরিকেরই কল্যাণ সাধন করা ব্যাপক অর্থে রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু, রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে বিশেষ মতভেদ দেখা যায়। কারণ, রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রকৃতপক্ষে কে প্রয়োগ করিবে সেই সম্বন্ধে মানুষ কখনই একমত হইতে পারে না। সেইজন্য অধ্যাপক গেটেল (Prof. Gettel) বলেন, "No phase of political speculation today is more important or leads to such wide divergence of opinion as that concerned with the functions of the State."

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (Ideal of Individualism) ;

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে বিভিন্ন ব্যক্তির যোগ্যতা আলাদাভাবে যাচাই করিয়া রাষ্ট্রকে প্রত্যেক নাগরিকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পূর্ণ সুযোগ দিতে হয়। বিভিন্ন নাগরিকের মধ্যে আমরা বিভিন্ন ধরণের ব্যক্তিত্ব-বিকাশ দেখিতে পাই। **প্রথমতঃ,** সমগ্র সমাজের স্বার্থেই ব্যক্তিবিশেষের প্রতি বিশেষ বিবেচনার জন্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বাদ একটি আবেদন। অধ্যাপক বার্নস বলেন, "Individualism implies that something must be done to give more opportunity for the full developement of every citizen. It is an appeal in the first place, in the interests of the whole community, for special consideration for the exceptional."

প্রাচীনকালে এথেন্সে এবং মধ্যযুগে রেঁনেসার (Renaissance) আত্মোন্নয়নের বাণীতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ নিহিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে আমরা যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ দেখিতে পাই, ইহার উৎপত্তি হইয়াছে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। শিল্প-বিপ্লবের পর "Laissez-faire" নীতি বিশেষভাবে প্রচলিত হয়। এই নীতি অনুযায়ী অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করা হইত না। কারণ, এই নীতির সমর্থকদের মতে স্বাধীন ব্যবসায়ের (free trade) জন্য রাষ্ট্রের দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত সমুদয় ক্রিয়াকলাপ জনসাধারণের হাতেই ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। তখনকার দিনে যে এই মতবাদ অযৌক্তিক ছিল, তাহা নহে, এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ একেবারেই থাকিবে না এরকমও কেহ মনে করিতেন না। ইহা বিশ্বাস করা কখনই অযৌক্তিক নয় যে সমাজের প্রকৃত স্বার্থ তখনই সিদ্ধ হইবে যখন সমাজের প্রত্যেকেই নিজের স্বার্থরক্ষার জন্য পূর্ণ সুযোগ পাইবে। কিন্তু "Laissez-faire" নীতির প্রতি অর্থনীতিবিদ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের সমর্থন থাকা সত্ত্বেও কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের একটা ঝোঁক থাকিয়া গিয়াছিল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মতবাদ অনুযায়ী "much more is made of the *limits* of government than of the *sphere* of government ; and all government is spoken of as restricting rather than as developing the governed, so that interference is made to seem a greater danger than carelessness." ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে সরকারের লক্ষ্য থাকে শুধু নিয়ন্ত্রণের প্রতি, উন্নয়ণের প্রতি নহে ; কিন্তু, রাষ্ট্রীয় অবহেলা অপেক্ষাও রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ অধিকতর বিপজ্জনক। সরকার ইহার নিজস্বক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ চালাইয়া গেলে জনসাধারণ যে উপকার পায়, সরকারের কার্যক্ষেত্র সীমিত হইলে তাহা অপেক্ষা বেশী উপকার পায়। হার্বার্ট স্পেন্সারের মতে সীমিত ক্ষেত্রের ভিতর সরকারী ক্রিয়াকলাপ শুধু যুক্তিসংগত

নয়, প্রয়োজনীয় বটে। ("Within its proper limit governmental action is not simply legitimate, but all-important."—Herbert Spencer.) কিন্তু সরকারের ক্রিয়াকলাপ সর্বদাই নেতিবাচকভাবে নিয়ন্ত্রণকারী হওয়া উচিত ("negatively regulative control")। সীমাবদ্ধ সরকারী নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করিয়া লইয়াই স্পেন্সার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু, জন্ স্টুয়ার্ট মিলের মতে জনসাধারণের তিনটি ব্যাপারে স্বাধীনতা থাকা দরকার, যথা, (১) চিন্তা এবং বাক্ স্বাধীনতা, (২) পছন্দ অনুযায়ী কিছু কথার স্বাধীনতা এবং। (৩) সংঘ গঠন করার স্বাধীনতা।

যাঁহারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমালোচনা করেন, তাঁহাদের মতে জনসাধারণ নিজেদের কল্যাণ কিভাবে হইবে, তাহা অনেক সময় বুঝিতে পারে না। কিন্তু, মিলের মতে যদি কোন ব্যক্তি তাহার নিজের কল্যাণ সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকে, তবে তাহার সমাজও এই ব্যাপারে কিছু বেশী জানার দাবী করিতে পারে না। জনসাধারণের উপর সমাজের অথবা রাষ্ট্রের একটি কর্তব্য আছে, তাহা হইতেছে জনসাধারণকে শিক্ষা প্রদান করা। কিন্তু শিক্ষা প্রদানে রাষ্ট্র জোর করিয়া জনসাধারণের উপর কিছু চাপাইয়া দিবে না,—রাষ্ট্র শুধু শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিবে। মিলের মতে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিগণ কিভাবে নিজেদের কল্যাণ সাধিত হইবে, তাহা তাঁহারা নিজেরাই ভাল বিচার করিতে পারেন। অধ্যাপক বার্নসের মতে মিল কর্তৃক সমর্থিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে এমন একটি জনসমাজের আদর্শ গৃহীত হইয়াছে যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজস্ব নিয়ন্ত্রণী ক্ষমতা থাকে এবং প্রত্যেকেই সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের অংশ গ্রহণ করে। মিলের মতে ক্ষমতার অংশ তখনই গ্রহণ করা যায়, যখন ইহা বিকেন্দ্রীত হয় এবং জ্ঞানের অংশীদার তখনই হওয়া যায় যখন ইহা কেন্দ্রীভূত হয়। ("Power can only be shared Mill thinks, by being decentralized and knowledge can only be shared by being centralized."—C. D. Burns.) সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তির মানসিক বৃত্তিগুলির সম্যক বিকাশ করাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের লক্ষ্য।

সিজ্উইকের (Sidgwick) মতে সর্বনিম্ন সরকারী নিয়ন্ত্রণ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়; যথা,—(১) ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষা, (২) ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষা এবং (৩) চুক্তি পালন।

অ-রাষ্ট্রতন্ত্র (Anarchism) হইতেছে কল্পনাসর্বস্ব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের রূপান্তর ("Anarchism is a sort of utopian Individualism)। অ-রাষ্ট্রতন্ত্রীগণ রাষ্ট্রের উপযোগিতা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহারা সাধারণতঃ দুই দলে বিভক্ত।

দার্শনিক অ-রাষ্ট্রতন্ত্রীগণের (Philosophical Anarchist) মতে শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে জনসাধারণকে রাষ্ট্রের অনুপযোগিতা সম্বন্ধে সচেতন করা উচিত। বিপ্লবপন্থী অ-রাষ্ট্রতন্ত্রীগণের (Revolutionary Anarchist) মতে ধ্বংসাত্মক কাজের সাহায্যে রাষ্ট্রের বিলোপ সাধন করা উচিত।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পক্ষে যুক্তি ঃ

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমর্থকগণের মধ্যে সাম্য এবং গণতন্ত্রের আদর্শের বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। সমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন লোকের প্রয়োজনীয় চাহিদা বিচার করিয়া দেখিবার এবং তাহা মিটাইবার যোগ্যতা রাষ্ট্রের আছে কিনা সেই বিষয়ে তাঁহারা সন্দিহান। তাহাদের মতে মানুষ নিজের মংগল ও অমংগল সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন। সুতরাং রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত হইয়া সহজাত ন্যায়পরতার ভিত্তিতে নিজের আশা আকাংখা অনুযায়ী কাজ করিলে মানুষ প্রকৃত সুখী হইবে। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকিলেই মানুষ আত্মবিশ্বাস হারাইয়া রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। সুতরাং নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য নাগরিকদের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত হইয়া সহজাত ন্যায়পরতার ভিত্তিতে (ethical argument) নিজেদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে দেওয়া উচিত।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমর্থকগণের মতে যোগ্যতম ব্যক্তিগণকে বাঁচিয়া থাকিবার সুযোগ দেওয়া উচিত। ডারউইন প্রদত্ত বিবর্তনবাদ (doctrine of evolution) প্রয়োগ করিয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীগণ বলেন রাষ্ট্রীয় সাহায্য না পাইলেও সমাজের যোগ্যতম ব্যক্তিগণ জীবনসংগ্রামে জয়ী হইয়া বাঁচিয়া থাকিবে এবং তাহা সমগ্র সমাজের অগ্রগতি অব্যাহত থাকিবে। অধ্যাপক বার্নসের ভাষায়, "Individualism is a protest against the modern tendency towards mediocrity and assimilation."

তৃতীয়তঃ, অর্থনৈতিক দিক হইতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীগণের যুক্তি হইতেছে এই যে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য বেসরকারী প্রয়াস এবং উদ্যোগ বিনষ্ট হয়। তাঁহারা শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিতে সহযোগিতা অপেক্ষা পারস্পরিক প্রতিযোগিতার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন। অবাধ-বাণিজ্যের (free trade) মধ্য দিয়া শিল্পজাতদ্রব্যের উৎপাদন এবং উৎকর্ষতা বৃদ্ধি হইবে বলিয়া "Laissez-faire" তত্ত্বের সমর্থকগণ মনে করেন। জিনিষপত্রের দাম এবং আয় বণ্টনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদানের পারিশ্রমিক যদি অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়, তবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীগণের মতে মূল্যস্তর স্বাভাবিক থাকে।

চতুর্থতঃ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীগণ ইতিহাসের অভিজ্ঞতার উপর নিজেদের মতবাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া বলেন যে অতীতে অনেক দেশেই জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি করার জন্য সমুদয় সরকারী প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। যেহেতু জনসাধারণ নিজেদের ভাল-মন্দ নিজেরাই বুঝিতে পারে সেজন্য তাহাদিগকে যতদূর সম্ভব রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত রাখিলেই তাহাদের ব্যক্তিত্বে পূর্ণ বিকাশ হইবে। সর্বশেষে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে জনসাধারণের অবস্থার সর্বাংগীন উন্নতি করিবার যোগ্যতা আছে কিনা সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। রাষ্ট্রের উপর অত্যধিক কাজের ভার অর্পণ করিলে ব্যয় বাহুল্যই হইবে, জনসাধারণের কোন প্রকৃত উন্নতি হইবে না।

বর্তমানে যাঁহারা সরকারী নিয়ন্ত্রণ এবং বেসরকারী প্রয়াসে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ পছন্দ করেন না, এবং যে সমস্ত রক্ষণশীল সমাজতান্ত্রিক নীতি ও ব্যবস্থার পরিবর্তনের ভয়ে ভীত, এবং গণতন্ত্রের সমর্থক যে সমস্ত চিন্তানায়ক মনে করেন যে গণতন্ত্র নিজের কর্মপরিধির বাহিরের কাজ করিলে নিজের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ করিবে,—তাঁহারা সকলেই পরোক্ষভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দৃষ্টিভংগীর সমর্থক হিসাবে কাজ করিয়াছেন।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমালোচনা (Criticisms of Individualism) :

আদর্শ হিসাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ মানুষের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের সামাজিক কারণ ও সামাজিক ফলাফল উপেক্ষা করে। ("As an ideal Individualism involves the neglect of the social causes and social results of action."—C. D. Burns.) অধ্যাপক বার্নসের মতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরোধিতা করা উচিত ; কারণ, সমাজের পক্ষে যাহা অনিষ্টকর এবং যাহা সমাজ হইতে দূর করা উচিত, তাহাকেই এই মতবাদ প্রশ্রয় দেয়। তাঁহার মধ্যে অধ্যাপক জন্ স্টুয়ার্ট মিল এবং সিজউইক (Sidgwick) সাধারণ মানুষের অহংভাব বুঝিতে পারেন নাই। কোন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীর স্বার্থের অনুরূপ যে সকলেরই স্বার্থ হইবে, এই রকম কোন নিশ্চয়তা নাই। সমাজের কল্যাণের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠদের প্রত্যেকের মতামত নির্ধারণ করা কখনই সম্ভবপর নহে। বার্নস বলেন, "ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি এই কারণে নয় যে ইহা ভুল,—ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি এই কারণে যে অর্ধ-সভ্য সমাজের বর্তমান প্রয়োজনের পক্ষে ইহা পর্যাপ্ত নহে। ("This objection to Individualism implies not that it is wrong, but that it is inadequate as an ideal for the present needs of a semi-civilized community."—C. D. Burns)।

অধ্যাপক সিজউকের মতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের একটি বিশেষ অপগুণ এবং বিপদের সৃষ্টি হয় তখনই যখন ব্যবসায় বাণিজ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা শিল্পগুলিকে অবাধ সংঘ প্রতিষ্ঠা করিবার অধিকার দেয় এবং এইভাবে চূড়ান্তভাবে একচেটিয়া কারবারের সৃষ্টি করে। সমাজতন্ত্রীগণ যখন বলেন যে ট্রাষ্ট, কার্টেল প্রভৃতি একচেটিয়ামূলক ব্যবসায় সংঘগুলি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমর্থনে সৃষ্ট, তখন তাহাদের মতামত একেবারে অযৌক্তিক নহে।

কোন ব্যক্তিই নিজের মংগলামংগল এবং স্বার্থ সম্বন্ধে সদা-সচেতন থাকে না। অনেক সময় শিক্ষিত ব্যক্তিগণও ভুলের বশে নিজের স্বার্থের প্রতিকূলে কাজ করেন। ব্যক্তিস্বাধীনতার নিরাপত্তা এবং সংরক্ষণের জন্যই কিছু পরিমাণে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। রাষ্ট্রের যদি জনসাধারণের উপর কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণী শক্তি না থাকে, ব্যক্তিস্বাধীনতা উচ্ছৃংখলতায় পরিণত হয়। স্বাধীনতার অর্থ উচ্ছৃংখলতা নয়। যাহাতে গণ-স্বাধীনতা সুরক্ষিত থাকে সেইজন্য কিছু পরিমাণে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

বিবর্তনবাদের সাহায্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীগণ যেভাবে তাহাদের মতবাদ সমর্থন করিবার চেষ্টা করেন, তাহাও বর্তমানযুগে গ্রহণযোগ্য নয়। জীবন সংগ্রামে শুধু যোগ্যতম ব্যক্তিই বাঁচিয়া থাকিবে (survival of the fittest) এই নীতি অনুমোদন করিলে যাহারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও অযোগ্য তাহাদের প্রতি উপেক্ষা এবং অবহেলা প্রদর্শিত হয়। বরং যাহারা দুর্বল ও অক্ষম তাহাদের রক্ষা করিবার জন্যই রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন। দুর্বল ও অক্ষম ব্যক্তিগণও সমাজেরই অংশ এবং সমাজ কখনই তাহাদিগকে উপেক্ষা করিতে পারে না। রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব হইতেছে তাহাদের ভালমন্দ উভয়দিক বিবেচনা করিয়া তাহাদের সমুদয় অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করা। রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপে বিভিন্ন রাষ্ট্রের যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি হইতেছে সেই সম্বন্ধে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বাদীগণ নীরব। অর্থনৈতিক দিক হইতে বিবেচনা করিলে, অবাধ বাণিজ্য অথবা অবাধ প্রতিযোগিতা অপেক্ষা রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধান এবং রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা অর্থনৈতিক উন্নতি দ্রুত অর্জিত হয়। শুধু তাহাই নহে,. রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে সুপরিকল্পিত উপায়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়। ইহাদের দিকে তাকাইলে আমরা দেখিতে পাই,—যেখানেই রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে সেখানে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টাগুলি বেসরকারী প্রয়াস অপেক্ষা রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে অধিকতর সাফল্য অর্জন করিয়াছে।

রাষ্ট্রীয় সহায়তা না থাকিলে জনসাধারণের মানসিক বৃত্তিগুলির সম্যক বিকাশ হয় না এবং দেশের সামগ্রিক স্বার্থে ইহাকে কাজে লাগান যায় না।

জার্মান দার্শনিক হেগেলের মতে রাষ্ট্রের সদস্য হিসাবেই কোন ব্যক্তির বিশেষ পরিচয় থাকে। সর্বজনীন ইচ্ছার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে পারিলেই জীবনে পূর্ণতা আছে। ("Only as a member of the state had the indvidual reality ; a perfect life consisted in living in accordance with the universal will.") ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় মানুষ সব সময়ই তাহার মানসিক বৃত্তিগুলিকে সদ্ব্যবহার করিতে পারে না। রাষ্ট্রের ভিতরে থাকিয়া রাষ্ট্রের নিকট হইতে সাহায্য অথবা সহ-যোগিতা পাইলেই মানুষ আদর্শ নাগরিক হইয়া নিজের এবং সমগ্র দেশের কল্যাণের জন্য চেষ্টা চালাইয়া যাইতে পারে। বর্তমানে বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপ অনুশীলন করিলে আমরা দেখিতে পাই সমাজজীবনের সর্বত্রই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের প্রসারণ হইতেছে। ইহা হইতেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অসম্পূর্ণতা এবং অযৌক্তিকতা প্রমাণিত হয়।

সমাজতন্ত্রের আদর্শ (Ideal of Socialism) :

রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের দিক হইতে সমাজতন্ত্রের আদর্শ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। সমাজতন্ত্রে যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের মতে রাষ্ট্র মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য।

প্রাচীনকালে প্লেটো এবং এরিস্টটল শিক্ষা দিয়াছিলেন যে রাষ্ট্রের মধ্যেই মানবজীবনের সর্বোচ্চ বিকাশ সম্ভবপর। জার্মাণী এবং ইংলণ্ডের আদর্শবাদী দার্শনিকগণও (idealist philosophers) মনে করিতেন যে সমাজ-জীবনে রাষ্ট্রের স্থান খুবই উচ্চে এবং রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ অথবা নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত মানব-জীবন কখনই সার্থকতা অর্জন করিতে পারে না! সমাজতন্ত্রে প্রত্যেক ব্যক্তিই অনুভব করে যে সে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন নয়,—সে সমাজেরই একটি অংশ এবং সমাজের উন্নতি হইলেই তাহার উন্নতি। ঊনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়তা-বাদের নীতি কর্তৃক প্রভাবিত হইয়া, এবং স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতার বৈপ্লবিক নীতিগুলির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার ফলে জার্মাণী এবং ইংলণ্ডের আদর্শবাদী দার্শনিকগণ যৌথদায়িত্ব এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। রাষ্ট্র তাঁহাদের মতে প্রাকৃতিক এবং ঐতিহাসিক উপায়ে গঠিত হইয়াছে,—সুতরাং রাষ্ট্রের অস্তিত্বের এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের সার্থকতা আছে। হেগেলের মতে রাষ্ট্রের সভ্যপদই মানুষের প্রধান পরিচয়,—তাহার নিজের ইচ্ছা হইতেও রাষ্ট্রের ইচ্ছা বড়, এবং রাষ্ট্রের সাধারণ ইচ্ছাকে না মানিয়া লইলে জীবন সম্পূর্ণ হয় না। হেগেল রাষ্ট্রের ইচ্ছাকেই বড় স্থান দিয়াছিলেন এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রের আদর্শবাদের তত্ত্বে (Idealist theory of the State) ব্যক্তিস্বাধীনতাকে

উপেক্ষা করা হয় এবং মানুষের অধিকার অপেক্ষা রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

সমাজতন্ত্রের দুইটি মূল কথা হইতেছে, যে কোনও কাজেরই সামাজিক ফলাফল আছে এবং যে কোনও পরিণতির সামাজিক কারণ আছে। যেমন ধরা যাক, ব্যক্তিবিশেষের সম্পদ বৃদ্ধি এবং কল্যাণ সাধনের পিছনে কতিপয় সামাজিক কারণ আছে। সুতরাং সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী লোকদের মতে বিভিন্ন কাজের উৎকৃষ্টতর সামাজিক ফল থাকা উচিত এবং সেইজন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ। আবার, জনসাধারণের কল্যাণ সাধনে সামাজিক কারণগুলিরই অবদান বেশী। সুতরাং রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপে এবং নিয়ন্ত্রণে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে যেখানে মানুষের আরও কল্যাণ সাধিত হয়।

গ্রীক দার্শনিক প্লেটো যে সাম্যবাদের বর্ণনা করিয়াছিলেন তাহা খুবই অবাস্তর ছিল। প্লেটোর মতে শাসকশ্রেণীকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং পারিবারিক বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে হইবে। সকলেরই সম্পত্তি এবং স্ত্রী এই দুইটিতে সকলেরই সমান অধিকার (Community of property and community of wives),—এই যুক্তি বর্তমানকালে হাস্যকর এবং অবাস্তব। পরবর্তী যুগে টমাস মুর তাঁহার "ইউটোপিয়া" (Utopia) গ্রন্থে একটি আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা দেন। ইংলণ্ডে পরবর্তীকালে রবার্ট ওয়েন (Robert Owen) কল্পলোকের সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন।

মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্র (Marxian Socialism)—সমাজতন্ত্রবাদের প্রতি সকলের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেন কার্ল মার্ক্স (Karl Marx)। ১৮৬৭ সালে মার্ক্স তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত "Das Kapital" গ্রন্থে ঘোষণা করেন যে সমাজতন্ত্রই যে কোনও রাষ্ট্রব্যবস্থার চরম পরিণতি। মার্ক্সের সমাজতন্ত্র প্রধানতঃ অর্থনৈতিক যুক্তির ভিত্তিতে গঠিত। তিনি তিনটি মূল সূত্রের সাহায্যে তাঁহার সমাজতন্ত্রের নীতি বুঝাইয়াছিলেন। সেইগুলি হইতেছে, (১) উদ্বৃত্ত মূল্যের (Theory of Surplus Value) তত্ত্ব, (২) ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা (Materialistic interpretation of History) এবং (৩) শ্রেণীসংগ্রাম মতবাদ (Theory of class-struggle)। মার্ক্সের মতে উৎপাদনের উপাদান মাত্র একটি এবং তাহা হইতেছে 'শ্রম'। শ্রমিক যে কাজ করে তাহার দুইটি সময় আছে, একটি হইতেছে সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় পরিশ্রমের সময় (Socially necessary labour time) এবং অপরটি হইতেছে অতিরিক্ত পরিশ্রমের সময় (Surplus labour time)। শ্রমিক কর্তৃক উৎপাদিত সামগ্রী মালিক যে দামে বিক্রয় করে, শ্রমিক সেই পরিমাণে মজুরী পায় না। যতটা মজুরী তাহাকে দেওয়া হয়, তাহা হইতেছে সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় পরিশ্রমের

সময়ের মূল্য এবং যতটা মজুরী হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা হইতেছে, তাহা হইতেছে তাহার অতিরিক্ত পরিশ্রমের সময়ের মূল্য। মালিক শ্রেণী প্রত্যেক শ্রমিককে কিছু না কিছু শোষণ করে। এই উদ্বৃত্ত মূল্য অথবা শোষণলব্ধ মুনাফা হইতেই মূলধনের সঞ্চয় (accumulation of capital) হয়। কিন্তু, তখন ইহার দুইটি পরিণতি দেখা যায়। প্রথমতঃ, একদিকে মালিক শ্রেণীর হাতে যতই মূলধন সঞ্চিত হইবে অপরদিকে শোষিত শ্রমিকশ্রেণী ততই সংঘবদ্ধ হইবে। দ্বিতীয়তঃ, মালিকদের মূলধন যতই বিনিয়োগ করা হইবে, অতিরিক্ত শ্রমিকগণ (Reserve army of Labour) ততই কাজে নিযুক্ত হইবে। পরে দেখা যাইবে যত বিনিয়োগ হইতেছে, সেই পরিমাণে শ্রমিক পাওয়া যাইতেছে না এবং মুনাফার হারও কমিয়া আসিয়াছে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইলেই মালিক শ্রেণীর মুনাফার হার কমিতে থাকে। তখন ধনতন্ত্রের সংকট আগাইয়া আসে এবং শ্রমিক শ্রেণী সংঘবদ্ধ হইয়া মালিক শ্রেণীকে অপসারণ করিয়া সমাজ-তন্ত্রের অথবা শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র (Dictatorship of the Proletariat) প্রতিষ্ঠা করে।

মার্ক্‌স্ প্রদত্ত ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যার (Materialistic interpretation of History) ভিত্তি হইতেছে শ্রেণীসংগ্রাম (class-struggle)। মানুষের সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনধারা তাহার অর্থনৈতিক জীবনেরই একটি প্রতিবিম্ব। সমাজের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ভিত্তি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইতিহাসের দিকে তাকাইলে বরাবরই একটা শ্রেণী-সংগ্রাম দেখা যায়। মধ্যযুগের সংগ্রাম ছিল ভূম্যধিকারী অভিজাত সম্প্রদায় (feudual lords) কৃষকদের এবং মধ্যে, শিল্প বিপ্লবের পর সেই সংগ্রাম দেখা যাইতেছে মালিক শ্রেণী এবং শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে। যাহাদের কিছু আছে এবং যাহাদের কিছুই নাই, তাহাদের মধ্যে একটি চিরন্তন বিরোধ আমরা দেখিতে পাই। মার্ক্‌সের মতে আধুনিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে শ্রমিক-মালিক বিরোধের সম্ভাবনা নিহিত। মালিকশ্রেণী ক্রমাগত শোষণ চালাইয়া গেলে ইহার স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবেই শ্রমিকশ্রেণী সংঘবদ্ধ হইবে এবং ইহার শেষ পরিণতিতে বিপ্লবের সৃষ্টি হইবে।

মার্ক্‌সের মতবাদের একটি অকৃত্রিম আবেদন আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার উদ্বৃত্ত মূল্যের সূত্রটি একটি ভুল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। উৎপাদনে শ্রমই একমাত্র উপাদান নয়। বিভিন্ন শ্রমিকের উপযোগিতা অথবা উৎপাদনীশক্তি বিভিন্ন ধরণের এবং সেইজন্য শ্রমিকের চাহিদার তীব্রতার উপরেও মজুরী নির্ভর করে। মার্ক্‌স্ এই বিষয়গুলি গভীরভাবে চিন্তা করেন নাই।

তাহা ছাড়া মানুষের সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাস যে সর্বদাই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে তাহা নহে। শিল্প-বিপ্লবের পরেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হইয়াছে। ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং ভৌগোলিক পরিবেশও মানুষের সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনকে প্রভাবিত করে, আমরা তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। আবার, মার্ক্সের মতে ধনতন্ত্র সম্পূর্ণ হইলে ইহার ধ্বংসের সূচনা হয় এবং তখনই সমাজ-তন্ত্রের আরম্ভ হয়। কিন্তু, এই নীতি ভুল। অনেক দেশে, এমনকি রাশিয়ায়ও ধনতন্ত্র সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই সমাজতন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। মার্ক্স্ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একনায়কতন্ত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু, বর্তমান-কালের অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন, গণতন্ত্রও আধুনিক সমাজতন্ত্রের বিরোধী নয়। অন্ততঃ ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র (Democratic Socialism) প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

সমাজতন্ত্রের অন্যান্য রূপ (other forms of Socialism) :

সমষ্টিপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদে (collectivism) উৎপাদনের উপাদানগুলির জাতীয়করণ করা হয় যাহাতে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। অপরদিকে বিনিময় ও ভোগব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুরূপ হয়। সমাজে যাহাতে অর্থনৈতিক শক্তি কোনও মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত না হয়, সমষ্টিপ্রধান সমাজতন্ত্র তাহার ব্যবস্থা করে। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সমষ্টিপ্রধান সমাজতন্ত্রীগণ বিশ্বাস করে। বর্তমানে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র (Democratic Socialism) ভারতে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হইতেছে, তাহার সহিত সমষ্টিপ্রধান সমাজতন্ত্রের কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। আর এক ধরণের সমাজতন্ত্র আমরা দেখিতে পাই। ইহার নাম রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র (State Socialism)। ইংলণ্ডে শ্রমিকদল কর্তৃক সরকার গঠিত হইবার পর আমরা কিছু পরিমাণে রাষ্ট্রপ্রধান সমাজতন্ত্র দেখিতে পাইয়াছিলাম। এই ধরণের সমাজতন্ত্রে বেকার ভাতা, বৃদ্ধবয়সের ভাতা, শ্রমিকদের জীবনবীমা, কারখানা সংক্রান্ত আইন প্রভৃতি প্রবর্তন করা রাষ্ট্রের কর্তব্যের অন্তর্গত বলিয়া ধরা হয়। আমাদের দেশে যে সমাজতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিতেছে তাহার সহিত রাষ্ট্রপ্রধান সমাজতন্ত্রের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। এই ধরণের সমাজতন্ত্রে উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থা সম্পূর্ণ-ভাবে রাষ্ট্রের হাতে থাকে। জর্জ বার্ণার্ড্ শ প্রমুখ কতিপয় ইংরাজ দার্শনিক ক্রমবিবর্তমান সমাজতন্ত্রে (Fabian Socialism) বিশ্বাসী ছিলেন। এই মতবাদে জোরজবরদস্তি করিয়া কখনই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না। জনমত যখন সুশিক্ষিত হইবে, তখনই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত ক্ষেত্র রচিত হইবে।

সুতরাং এই মতবাদে বিশ্বাসী লেখকদের মতে সাহিত্যের উন্নতির মারফৎ ক্রমে ক্রমে জনমতকে সুশিক্ষিত এবং সমাজতন্ত্রের পক্ষে সচেতন করিয়া তুলিতে হইবে।

অ-রাষ্ট্রতন্ত্রী সমাজতন্ত্রবাদ (Syndicalism) তিনটি মূলনীতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমতঃ, মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রবাদের ন্যায় এই মতবাদেও 'শ্রম'কে উৎপাদনের একমাত্র উপায় বলিয়া গণ্য করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন কৃষি, শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে, উৎপাদনের উপাদানগুলির মালিকানা হইল শ্রমিকের, এবং তৃতীয়তঃ, মালিকানার অধিকার লাভ করিবার জন্য শ্রমিকদের বিক্ষোভ প্রদর্শনের অধিকাব থাকিবে। দরকার হইলে এইজন্য ধর্মঘট ইত্যাদির আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে। এই মতবাদে বিশ্বাসী লেখকগণ রাষ্ট্রের কর্মদক্ষতায় বিশ্বাসী নহেন। তাঁহাদের মতে শ্রমিক শ্রেণী প্রয়োজন হইলে ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের সাহায্যেও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে পারে। তাঁহারা সমগ্র সমাজব্যবস্থা শ্রমিক সংঘের অধীনে আনয়ন করিবার পক্ষপাতী। শ্রমিক সংঘগুলিই শ্রমিকদের পক্ষ হইতে উৎপাদনের সমুদয় উপাদামগুলির মালিকানার অধিকারী হইবে। আর এক ধরণের সমাজতন্ত্রবাদে রাষ্ট্রের ন্যায় বিভিন্ন শ্রমিক সমিতিগুলিরও ক্ষমতা থাকিবে এবং সমিতিগুলিই সমগ্র সমাজব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক হইবে। এই সমিতিগুলি গঠিত হইবে শ্রমিকগণ কর্তৃক। ইহাকে সমিতিপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদ (Guild Socialism) বলে। এই মতবাদেও উৎপাদনের উপাদানগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়, কিন্তু, তাহা রাষ্ট্র কর্তৃক নহে, সেইগুলি নিয়ন্ত্রিত হয় শ্রমিকদের সমিতিগুলি কর্তৃক। এই মতবাদের সমর্থকগণের মতে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষমতা বণ্টন করিয়া কিছু সমিতিগুলিকে অর্পন করা উচিত। শ্রমিকগণ অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিভিন্ন সমিতি গঠন করিয়া সমগ্র সমাজ ব্যবস্থাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিতে চেষ্টা করে। এইভাবে সমগ্র সমাজের সমুদয় ক্ষমতা বিকেন্দ্রীত হইয়া যায়।

আধুনিক সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য (Features of modern Socialism):

আধুনিক সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের উপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজের সমস্ত ধন-সম্পদের ন্যায়সংগত বণ্টন করিয়া সামগ্রিক সমাজ কল্যাণ সাধন করাই সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য। সেইজন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ করা হয় এবং উৎপাদনের উপাদানগুলিকে সামাজিক মালিকানার অধীনে আনা হয়। তাহা ছাড়া সমাজের বিভিন্ন শিল্প অথবা উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টাগুলিকেও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন করা হয়। সমাজের

প্রয়োজন কতটা সিদ্ধ হইবে তাহাই শিল্প নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে বিবেচ্য বিষয়। ব্যক্তিগত মুনাফার স্থলে সামাজিক মুনাফা বৃদ্ধি করাই সমাজতন্ত্রের অন্যতম উদ্দেশ্য। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে সবল কর্তৃক দুর্বলকে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে শোষণ করা হয়, তাহা দূর করাই সমাজতন্ত্রের কার্যসূচী। আয় ও ধনের বৈষম্য করাইলেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় না। সমাজের প্রত্যেকটি লোকের কর্মসংস্থান করিয়া দেওয়া এবং পরিকল্পনার মাধ্যমে সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংগঠিত করিয়া দেশের সমুদয় সম্পদের ন্যায়সংগত বণ্টন করাও সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য। সর্বদাই রাষ্ট্রের প্রধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়া সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সকলের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সমাজ হইতে সর্বপ্রকার শোষণ দূর করা সমাজতন্ত্রের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত। আধুনিককালে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে আমরা সাম্যবাদ (communism) দেখিতে পাই। সাম্যবাদীগণ রাষ্ট্রপ্রধান সমাজতন্ত্রীদের (State capitalism) ন্যায় শান্তিপূর্ণভাবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নীতিতে বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের মতে বিপ্লব হইতেছে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার অপরিহার্য উপায়। সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার আদর্শ হইতেছে প্রত্যেককে তাহার সামর্থ্য অনুযায়ী এবং প্রত্যেককে তাহারা প্রয়োজন অনুযায়ী ("From each according to his ability, to each according to his needs") অর্থ উপার্জন করিতে দেওয়া। তবে সাম্যবাদীগণ রাষ্ট্রের অচিরাৎ ধ্বংসের পক্ষপাতী নহেন। তাঁহাদের মতে সাম্যবাদী ব্যবস্থা যখন সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখনই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আপনা হইতেই বিলুপ্ত হইবে।

সমাজতন্ত্রের পক্ষে যুক্তি Arguments in favour of Socialism) :

সমাজতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করিলেই ইহার সুবিধাগুলি আমরা দেখিতে পাই। প্রথমতঃ, সমাজতন্ত্রে ধনী-নির্ধনের মধ্যে তারতম্য অথবা পার্থক্য করা হয় না বলিয়া শ্রমিকদের এবং দরিদ্রদের স্বার্থ যথোপযুক্ত সংরক্ষিত হয়। সমাজ যখন সর্বপ্রকার শোষণমুক্ত হয়, তখনই মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে এবং মানুষ তাহার পূর্ণ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার লইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে। ন্যায়পরতার দিক হইতে আদর্শ হিসাবে সমাজতন্ত্রের স্থান খুবই উচুতে। দ্বিতীয়তঃ, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আমরা যে অবাধ বাণিজ্য এবং অবাধ প্রতিযোগিতা দেখিতে পাই, তাহার অপচয়গুলি সমাজতন্ত্রে বন্ধ হয়। সমাজতন্ত্রে উৎপাদকগণ সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের প্রেরণায় কাজ করেন না। কারণ, সমাজতন্ত্রে সমুদয় মুনাফা সমাজের কোনও ব্যক্তি বিশেষের নহে। উৎপাদকগণের কাজের লক্ষ্য হইতেছে সামগ্রিকভাবে সমাজের উন্নতি করা। সমাজতন্ত্রে

অপ্রয়োজনীয় প্রতিযোগিতা, বিজ্ঞাপন এবং প্রচারজনিত খরচ এবং প্রতিযোগিতামূলক বিক্রয় এবং মারাত্মক জিনিসপত্রের উৎপাদন বন্ধ করা সম্ভবপর হয়। ইহাতে উৎপাদনশক্তির যে অপচয় বন্ধ হয় তাহা উৎপাদিত সামগ্রীর পরিমাণ বৃদ্ধির কাজে ব্যবহার করা যাইতে পারে। নিয়ন্ত্রিত সহযোগিতামূলক ব্যবস্থায় অবাধ প্রতিযোগিতার সমুদয় ত্রুটি দূরীভূত হয়।

তৃতীয়তঃ, নীতিশাস্ত্রের দিক হইতে বিবেচনা করিয়া সমাজতন্ত্রবাদীগণ দাবী করেন যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষের নৈতিক চরিত্রের মান অবনত হয় এবং অসূতত্তা বাড়িয়া যায় বলিয়া সমাজতন্ত্র দেশের শাসনব্যবস্থার নৈতিক মান অনেক উন্নত করে। সমাজতন্ত্রবাদীগণ মনে করেন যে যতদিন ধনের বৈষম্য থাকিবে এবং সেইজন্য মুষ্টিমেয় লোকের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইবে, ততদিন লোকের ভোটাধিকারের মূল্য নাই। সম্পত্তির সাম্য রাজনৈতিক অধিকারের সাম্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। সুতরাং সমাজতন্ত্র হইতেছে গণতন্ত্রের অর্থনৈতিক পরিপূরক। ("The fact that men have the right to vote is of the little value if wide differences in wealth give influence and power to a small class. Equality in property···is essential to equality in political rights ; hence, socialism is the economic complement of democracy.")।

চতুর্থতঃ, জমি, খনি প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদগুলি ব্যক্তিগত মালিকানায় না থাকিয়া সামাজিক মালিকানার অধীন থাকিলে এইগুলি সমাজের সকলেরই হিতার্থে রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হয়। তাহাতে সব মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদ হইতে সমান উপকার পায়। সুতরাং সমাজতন্ত্রবাদীগণের যুক্তি ন্যায়পরতার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহা ছাড়া, মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থ সমগ্র সমাজের স্বার্থ হইতে বিচ্ছিন্ন নয়। সমষ্টিগত স্বার্থের উন্নতি হইলেই মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থের উন্নয়ন সম্ভবপর হয়।

পঞ্চমতঃ, গণতন্ত্রের সার্থকরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যদি সমাজতন্ত্রকে গণতন্ত্রের পরিপূরক ধরিয়া লওয়া হয়। গণতন্ত্রে সকলকেই সমান অধিকার দেওয়া হয়। সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্র সকলকেই সমানদৃষ্টিতে দেখে, সমান অধিকার ও সুযোগ দান করে এবং সর্বপ্রকার শোষণ হইতে মুক্তির ব্যবস্থা করে। মানুষ যদি অর্থনৈতিক দিক হইতে শক্তিশালী না হয়, তবে বিভিন্ন রাজনৈতিক অধিকার প্রহসনে পরিণত হয়। সমাজতন্ত্রের মূল কথা হইতেছে "নিজে বাঁচ এবং অপরকে বাঁচিতে দাও।" এই নীতি সহযোগিতার নীতিকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। "সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"—সার্থক সমাজতন্ত্রে এই নীতিটি কার্যকরী হইতে দেখা যায়। সর্বশেষে,

সমাজতন্ত্রে পরিকল্পিত উপায়ে রাষ্ট্রের পক্ষে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালাইয়া যাওয়া সম্ভবপর হয় বলিয়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি দ্রুত সংগঠিত হয়।

সমাজতন্ত্রের বিপক্ষে যুক্তি (Arguments against Socialism) :

সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আমরা নিম্নলিখিত যুক্তি দেখিতে পাই। প্রথমতঃ, সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ হইল ইহা, রাষ্ট্রের কর্মক্ষমতার উপর অত্যধিক আস্থা রাখে এবং ব্যক্তিবিশেষের কর্মোদ্যোগ ও কর্মক্ষমতার প্রকৃত মর্যাদা দেয় না। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের ক্ষমতা সীমিত, রাষ্ট্রের হাতে সমুদয় ক্ষমতা তুলিয়া দিলে সমাজজীবনে বিশৃংখলা সৃষ্টি হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, সমাজতন্ত্রবাদে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে অবহেলা করা হয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় না। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে ব্যক্তিস্বাধীনতা খুবই ক্ষুণ্ণ হয়। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের অর্থ হইল যাহারা সরকার গঠন করিয়া রাষ্ট্রের পরিচালনা করেন, তাহারাই সমগ্র সমাজব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ করেন। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও আমরা মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের পক্ষে দুর্নীতি চালাইয়া যাইবার এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধ করার সুযোগ দেখিতে পাই। ইহাতে সরকারের কর্মকুশলতাও কমে, জনসাধারণও সরকারের সমালোচনা করিয়া বিকল্প সরকার গঠনের সুযোগ পায় না। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা সমাজতন্ত্রের অন্যতম অপগুণ। শুধু তাহাই নহে, রাষ্ট্র নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখিবার জন্য সামরিক বিভাগের খুব শক্তিশালী ও শৃংখলাপরায়ণ রাখে, তাহাতে নাগরিকদের স্বাধীনতা ত' ক্ষুণ্ণ হয়-ই, বরং তাহারা প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের স্বৈরাচারের অধীনে ক্রীতদাসে পরিণত হয়। সরকার ক্রমেই আমলাতান্ত্রিক এবং দায়িত্বহীন হইয়া পড়ে।

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে বেসরকারী কর্মোদ্যম ও শিল্পক্ষেত্রে শিল্পোন্নয়নের বেসরকারী প্রয়াস ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বেসরকারী শিল্পপতিগণ মুনাফার আশায় নিজ নিজ শিল্পের উন্নতি করেন। ইহাতে তাহাদের নিজের কিছু পরিমাণে মুনাফা অর্জন করা সম্ভবপর হয়, দেশেরও শিল্পোন্নয়ন হয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে জনসাধারণের কর্মোদ্যম নষ্ট করিয়া দেয়। মানুষ যদি তাহার ব্যক্তিগত প্রতিভার পরিচয় কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে দিতে না পারে, তবে তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। সমাজতন্ত্রে মানুষ নিজের পছন্দ অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারে না। কারণ, প্রত্যেকের বৃত্তি নির্বাচনের (choice of occupation) ক্ষমতা থাকে রাষ্ট্রের হাতে।

চতুর্থতঃ, উৎপাদনের উপাদানগুলির উপর যৌথ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত

হইলে উৎপাদনের প্রকৃত পরিমাণ কমিয়া যাইতে পারে। ধনতন্ত্রে উৎপাদকগণ যখন কোন জিনিষ উৎপাদন করে, তখন মুনাফা লাভের আশায় তাহারা খুবই আন্তরিকভাবে কাজ করে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মুনাফার অর্থ যায় রাষ্ট্রের হাতে, সেখানে উৎপাদকগণও আন্তরিকভাবে কাজ করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করে না।

পঞ্চমতঃ, সমাজতন্ত্রবাদীগণ মানুষকে তাহার নিজের ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে যতটা স্বার্থপর মনে করেন, মানুষ যে সব সময়েই সেই প্রকার হয়, তাহা নহে। আমেরিকা একটি ধনতান্ত্রিক দেশ। কিন্তু, সেই দেশের শ্রমিকদের যে অবস্থা খুব খারাপ তাহা নহে। বরং একজন আমেরিকানের মাথাপিছু জাতীয় আয় একজন রাশিয়ানের মাথাপিছু জাতীয় আয় অপেক্ষা অনেক বেশী; জীবনযাত্রার মানও রাশিয়া অপেক্ষা আমেরিকায় অনেক উন্নত। সুতরাং শ্রমিকরা কখন কতটা সুবিধা পাইবে তাহা মালিকদের মনোবৃত্তির উপর নির্ভর করে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হইলেই যে শিল্পপতিগণ সর্বদা শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি করা সম্বন্ধে উদাসীন থাকিবেন, এমন কোনও কথা নাই।

সর্বশেষে আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদ বস্তুতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত,—ইহার কোন নৈতিক ভিত্তি নাই। তাহা ছাড়া, ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হওয়ায় মানুষের সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সাধারণ মানুষ কর্মোদ্যম ও আত্মনির্ভরশীলতা হারাইয়া ফেলে। তবে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে আধুনিক কালে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা এবং তত্ত্বাবধান ব্যতীত কোনও রাষ্ট্রের পক্ষে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং বিজ্ঞান-গবেষণার ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করা সম্ভবপর নহে।

রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের পরিধি (Proper sphere of the State) :

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং সমাজতন্ত্রবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি আলোচনা করিয়া ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের পরিধি এই মতবাদের কোনটির সাহায্যেই সম্পূর্ণভাবে বুঝান যায় না। রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা এবং মূল্য নির্ভর করে ইহার ক্রিয়াকলাপের উপর। ("The importance and value of the state can be judged only by its results.")। রাষ্ট্র হইতেছে সর্বাধিক পরিমাণ সামাজিক কল্যাণের জন্য মানুষকে উপযুক্ত করিবার জন্য একটি সংস্থা, এবং এই কাজ ইহা কতটা করিতে পারে তাহার উপরেই ইহার সার্থকতা নির্ভর করে। রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে সার্বভৌম ক্ষমতা কার্যকরী করিতে সমর্থ। প্রত্যেক রাষ্ট্রই নিজের ক্রিয়াকলাপ সীমিত করিয়া জনসাধারণকে নিজেদের কাজকর্মে কিছু পরিমাণে স্বাধীনতা দেওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করে। সেইজন্য জরুরী অবস্থা ব্যতীত স্বাভাবিক সময়ে শাসনতন্ত্রের নির্দেশেই রাষ্ট্র নিজের ক্ষমতা সীমাহীনভাবে ভোগ করে না। শুধু যুদ্ধ

এবং জরুরী অবস্থার সময় জনসাধারণের নিরাপত্তা ও কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপের পরিধি বাড়াইয়া দেওয়া হয়। কতিপয় কাজ আছে যেগুলি রাষ্ট্রকে অবশ্যই সম্পাদন করিতে হয় এবং সেই কাজগুলি করিবার জন্য রাষ্ট্রই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত। আবার কতিপয় কাজ আছে যেগুলি রাষ্ট্র জন-সাধারণের হাতে ছাড়িয়া দেয়। পরিবর্তনশীল সামাজিক অবস্থা এবং ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের ক্রিয়াকলাপের পরিধিরও পরিবর্তন হয়। তাহাছাড়া, রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি এবং লোকায়ত্ত সরকার উভয়ই রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজনীয়তা এবং সামাজিক সংস্কারের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে নূতন ধারণার সৃষ্টি করে। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে সমাজতন্ত্রের দিকে একটি সাধারণ প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যায়। তবে কতিপয় বিষয়ে মানুষের স্বাধীনতায় আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি হস্তক্ষেপ করে না; যেমন, ধর্ম এবং জ্ঞান অর্জন সম্পর্কিত স্বাধীন চিন্তাধারা। কোন কোন রাষ্ট্রে (যেমন আমেরিকায় এবং ইংলণ্ডে) বেসরকারী সম্পত্তির উপর রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করে না।

রাষ্ট্রের বিভিন্ন কাজকর্মকে আমরা দুইভাগে বিভক্ত করিতে পারি ;—

(১) কতিপয় কাজ আছে যেগুলি সম্পাদন করা যে কোন রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য। রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলেই রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য সম্বন্ধে ধারণার সৃষ্টি হয়; আবার, (২) কতিপয় কাজ আছে যেগুলি সম্পাদন করা রাষ্ট্রের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য নয়। এইগুলি রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক অথবা বিকল্প (optional) ক্রিয়াকলাপ। রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপগুলি তিনভাগে বিভক্ত। যথা,—(১) কতিপয় কাজ রাষ্ট্রের ক্ষমতার সহিত জড়িত, (২) কতিপয় কাজ আছে যেগুলি জনসাধারণের আইনগত অধিকার এবং স্বাধীনতার সহিত জড়িত, এবং (৩) সর্বশেষে, কতিপয় কাজ আছে যেগুলি সাধারণ কল্যাণের সহিত জড়িত। এই ক্রিয়াকলাপগুলি প্রথম দুইটি রাষ্ট্রের আবশ্যিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে পড়ে এবং সর্বশেষটি রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে পড়ে। দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখা এবং দেশকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করা যে কোন রাষ্ট্রেরই অবশ্যকর্তব্য। আবার, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পররাষ্ট্রগুলির সহিত সম্পর্ক নির্ধারণ করাও রাষ্ট্রের অবশ্যকর্তব্য। মুদ্রা ব্যবস্থা চালু রাখা এবং ডাক ও তার বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করাও রাষ্ট্রের অবশ্যকর্তব্য। কিন্তু, শিল্প ব্যবস্থার প্রকৃতি কিরূপ হইবে তাহা নির্ধারণ করা রাষ্ট্রের পক্ষে ঐচ্ছিক কর্তব্য। রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে ইহা নিজে নির্ধারণ করিতে পারে, আবার ইচ্ছা করিলে ইহা বেসরকারী শিল্প উদ্যোক্তাদের হাতে ছাড়িয়া দিতে পারে। বর্তমানকালের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে রাষ্ট্রের

অবশ্যকর্তব্য এবং ঐচ্ছিক কর্তব্যের মধ্যে সীমারেখার গুরুত্ব ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। বর্তমানে জনসাধারণের সামগ্রিকভাবে সব কিছু ভালমন্দের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু, এইজন্য যে জনসাধারণ স্বাধীনতা ভোগ করে না তাহা নহে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনসাধারণকে যথাসম্ভব স্বাধীনতা প্রদান করিতে হয়; ইহাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রভাব। আবার যখনই সামগ্রিক স্বার্থের প্রয়োজন হয়, রাষ্ট্র বিভিন্ন ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে;—ইহাই সমাজতন্ত্রের প্রভাব। সেইজন্য শুধু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অথবা শুধু সমাজতন্ত্রবাদ,—কোনটিই রাষ্ট্রের প্রকৃত ক্রিয়াকলাপ নির্ধারণ কবিতে পারে না। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সংগে রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক এবং অ সমাজ-তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের পার্থক্য সম্বন্ধে ধারণার পরিবর্তন হয়।

সামাজিক ব্যবস্থা যত জটিল হইতে থাকে, সাধারণ কল্যাণ অর্জন করিতে হইলে ততই ব্যক্তিগত স্বার্থকে সামগ্রিক সমাজের স্বার্থের নিকট খাটো করিতে হয়। বিশেষতঃ, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কার করিবার যোগ্যতা মানুষের আছে, এই বিশ্বাস হইতে এবং রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ভিত্তি থাকায় মানুষ রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান কর্তব্য ও দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লইতেছে।

রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের পরিধির কোনও সীমারেখা টানা সম্ভবপর নয়। এখন যাহা রাষ্ট্রের পক্ষে ঐচ্ছিক কর্তব্য মনে হইবে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হইলেই ইহাকে রাষ্ট্রের পক্ষে আবশ্যিক কর্তব্য মনে হইতে পারে। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকে ক্রমবর্ধমান ঝোঁক দেখা যাইতেছে। ইহার কারণ হইতেছে, ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কতিপয় মৌলিক দুর্বলতা। এই দুর্বলতা দূর করিবার জন্য রাষ্ট্রের সহযোগিতার প্রয়োজন। শুধু রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ নহে, কোন কোন কাজে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতার বিশেষ প্রয়োজন, এই জিনিষটা প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই অনুভব করিতেছে। সুতরাং রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের পরিধিকে সীমিত করা সম্ভবপর নহে।

রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ (Functions of the State):

রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপগুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রত্যেক রাষ্ট্রের পক্ষেই কতিপয় আবশ্যিক অথবা প্রাথমিক কাজ (Essential or primary functions) আছে। আবার কতিপয় কাজ আছে যেগুলি প্রয়োজন অনুসারে করা হয়। এইগুলিকে ঐচ্ছিক কাজ (Optional or Non-essential functions) বলে। প্রয়োজনীয় কাজগুলি আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, সেইগুলি প্রথমতঃ রাষ্ট্রের ক্ষমতা এবং জনসাধারণের বিভিন্ন আইনগত অধিকার ও স্বাধীনতার সহিত জড়িত। দ্বিতীয়তঃ, এক রাষ্ট্রের সহিত অপর রাষ্ট্রের সম্পর্ক, রাষ্ট্রের সহিত জনগণের সম্পর্ক এবং জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের

ভিত্তিতে রাষ্ট্রের আবশ্যিক কাজগুলি স্থিরীকৃত হয়। যুদ্ধের সময় এবং শান্তির সময় পররাষ্ট্রের সহিত কিরূপ সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে, তাহা নির্ধারণ করা রাষ্ট্রের একটি প্রয়োজনীয় কাজ। দেশের নাগরিকদের কি পরিমাণ স্বাধীনতা দেওয়া উচিত এবং রাষ্ট্রের সহিত নাগরিকদের কি সম্পর্ক হইবে, তাহা নির্ধারণ করিবার দায়িত্বও রাষ্ট্রের। নাগরিকদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করাও রাষ্ট্রের একটি প্রয়োজনীয় কাজ। এইজন্য রাষ্ট্রকে সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী, পুলিশ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ এবং অনেক সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করিতে হয়। দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃংখলা বজায় রাখিবার জন্য রাষ্ট্রকে একদিকে যেমন কারা বিভাগ এবং পুলিশ বিভাগ বজায় রাখিতে হয়, অপরদিকে সেই প্রকার রাষ্ট্রকে একটি বিচার বিভাগ স্থাপন করিতে হয়। যে কোন ধরণের সরকারই প্রতিষ্ঠিত হউক না কেন, রাষ্ট্রকে এই কাজগুলি সর্বদাই করিতে হয়। রাষ্ট্রের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই, রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে, ইহার সার্বভৌমত্ব। নিজের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখিবার জন্য রাষ্ট্রকে একটি সামরিক বিভাগ রাখিতে হয়। রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইতেছে একটি সুসংগঠিত সরকার। ইহা যাহাতে গঠিত হয় এবং ইহা যাহাতে ভালভাবে বিভিন্ন কাজ চালাইয়া যাইতে পারে, সেইজন্য রাষ্ট্রের একটি প্রয়োজনীয় কাজ হইতেছে রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা। রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক কাজগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইতেছে, জনসাধারণের স্বাধীনতা বজায় রাখিবার জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রসার করা। তাহাতে গণতান্ত্রিক আদর্শের মর্যাদা রক্ষিত হয় না, তাহা নহে। প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্রের সহিত রাষ্ট্রীয় সহযোগিতার কোনও বিরোধ নাই।

রাষ্ট্রের বিকল্প অথবা ইচ্ছামূলক কাজগুলি রাষ্ট্রের ক্ষমতা অথবা নাগরিকদের অধিকার ও স্বাধীনতার সহিত জড়িত নয়। রাষ্ট্র এই কাজগুলি করে নাগরিকদের সাধারণ কল্যাণের জন্য। নাগরিকদের নৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রগতির জন্য রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে নিজেই উদ্যোগী হইতে পারে। শিল্প ও ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে হইলে রাষ্ট্র কোনও কোনও প্রয়োজনীয় শিল্পের উন্নতি করিবার দায়িত্ব নিজের হাতে গ্রহণ করিতে পারে। আবার, কতিপয় শিল্পের উন্নতির ভার বেসরকারী প্রয়াসের উপর ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। 'রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য, জনশিক্ষা, শ্রমিক কল্যাণ, পূর্তকাজ, কৃষির উন্নতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে নিজেই বিভিন্ন কাজ করিতে পারে—সমাজে যাহারা বেকার, বৃদ্ধ এবং পংগু তাহাদের দুর্গতি দূর করিবার জন্য রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে বেকার-ভাতা, বার্ধক্য-ভাতা এবং অক্ষমতা-ভাতা ইত্যাদির প্রচলন করিতে পারে। সাধারণতঃ, কল্যাণরাষ্ট্রে

এই ব্যবস্থাগুলি অবলম্বিত হয়। কল্যাণ-রাষ্ট্রে এই কাজগুলি বর্তমানে রাষ্ট্র ক্রমে ক্রমে নিজের প্রয়োজনীয় কাজ বলিয়া গ্রহণ করিতেছে। এইজন্যই রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় ও ইচ্ছামূলক কাজের মধ্যে সীমারেখা টানা ক্রমেই কঠিন হইয়া পড়িতেছে।

জনসাধারণের সুবিধার জন্য রেলপথ স্থাপন করা পূর্বে রাষ্ট্রের ইচ্ছামূলক কাজ বলিয়া মনে করা হইত। কিন্তু বর্তমানে ইহাকে রাষ্ট্রের একটি প্রয়োজনীয় কাজ বলিয়া মনে করা হয়। ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করা পূর্বে রাষ্ট্রের ইচ্ছামূলক কাজ বলিয়া গণ্য করা হইত। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ দেশেরই কেন্দ্রীয় ব্যাংককে জাতীয়করণ করা হইতেছে। এমনকি শিক্ষা বিস্তারেও রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ক্রমেই স্বীকৃতি হইতেছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংস্কার করিবার ক্ষমতা মানুষের আছে,—এই বিশ্বাস যতই বাড়িতেছে ততই বেসরকারী ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ক্রমে ক্রমে স্বীকৃত হইতেছে। রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা বর্তমানে স্বীকৃত হয় রাষ্ট্র জনগণের কল্যাণের জন্য কতটা চেষ্টা করিতে পারে তাহা দ্বারা। জনগণের কল্যাণেই রাষ্ট্রের কল্যাণ,—এই তত্বটি যখনই স্বীকৃত হইবে তখনই, রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় এবং ইচ্ছামূলক কাজের মধ্যে কোন সংঘাতের সৃষ্টি হইবে না।

সংক্ষিপ্তসার

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ—ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ *laissez faire* নীতি বা স্বাধীন প্রচেষ্টার নীতির উপর ভিত্তিশীল। এই মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র জনসাধারণের কোন কাজেই হস্তক্ষেপ করিবে না। কারণ, জনসাধারণ নিজেদের ভালমন্দ রাষ্ট্র অপেক্ষা অনেক ভাল বুঝে এবং সেইজন্য রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ জনসাধারণের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের পক্ষে যুক্তি—সমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন লোকের প্রয়োজনীয় চাহিদা বিচার করিয়া দেখিবার এবং তাহা মিটাইবার যোগ্যতা রাষ্ট্রের আছে কিনা সেই বিষয়ে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের সমর্থকগণ সন্দিহান। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকিলেই মানুষ আত্মবিশ্বাস হারাইয়া রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। সুতরাং নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য নাগরিকদের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত হইয়া সহজাত ন্যায়পরতার ভিত্তিতে (Ethical argument) নিজেদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে দেওয়া উচিত।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের মতে যোগ্যতম ব্যক্তিগণকে বাঁচিয়া থাকিবার সুযোগ দেওয়া উচিত।

তৃতীয়তঃ, অর্থনৈতিক দিক হইতে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীগণের যুক্তি হইতেছে এই যে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য বে-সরকারী প্রয়াস এবং উদ্যোগ বিনষ্ট হয়।

চতুর্থতঃ, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীগণ বলেন যে অতীতে অনেক দেশেই জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি করার জন্য সমুদয় সরকারী প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। যেহেতু জনসাধারণ নিজেদের ভাল-মন্দ নিজেরাই বুঝিতে পারে সেইজন্য তাহাদিগকে যতদূর সম্ভব রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত রাখিলেই তাহাদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ হইবে।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের সমালোচনা—এই মতবাদের যে মোটেই যুক্তি নাই তাহা নহে। তবে বর্তমানকালে এই মতবাদটিকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা কোন দেশেই সম্ভবপর হয় নাই। প্রথমতঃ, অবাধ প্রতিযোগিতা বিভিন্ন শিল্পকে অবাধ সংঘ প্রতিষ্ঠা করিবার অধিকার দেয় এবং এইভাবে একচেটিয়া কারবারের পথ সুগম করে।

দ্বিতীয়তঃ, একথা ঠিক নয় যে জনসাধারণ সর্বদাই নিজেদের ভাল-মন্দ নিজেরা বুঝিতে পারে। ব্যক্তি-স্বাধীনতার নিরাপত্তা এবং সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিশেষ প্রয়োজন।

তৃতীয়তঃ, আধুনিক যুগে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ব্যতীত কোন দেশেই সুপরিকল্পিতভাবে অর্থনৈতিক উন্নতি হইতে পারে না।

সর্বশেষে, রাষ্ট্রীয় সহায়তা না থাকিলে জনসাধারণের মানসিক বৃত্তিগুলির সম্যক বিকাশ হয় না এবং দেশের সামগ্রিক স্বার্থে ইহাদের কাজে লাগান যায় না।

সমাজতন্ত্রের আদর্শ—রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের দিক হইতে সমাজতন্ত্রের আদর্শ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। সমাজতন্ত্রে যাহারা বিশ্বাসী তাহাদের মতে রাষ্ট্র মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। সমাজতন্ত্রে সব সামাজিক কাজেই রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ থাকে। উৎপাদনের উপকরণগুলিও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অধীন থাকে। সমাজতন্ত্রের আরও বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে ইহাতে জনগণের মধ্যে আয় ও ধনের বৈষম্য কমিয়া যায়, সমুদয় শিল্প জাতীয়করণ করা হয়, এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ব্যবস্থা করা হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত লাভের স্থানে সামাজিক লাভের বৃদ্ধি করাই সমাজতন্ত্রের উদ্দেশ্য। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদে সবল কর্তৃক দুর্বলকে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে শোষণ করা করা হয় তাহা দূর করাই সমাজতন্ত্রের কার্যসূচী। সাম্যবাদী বা সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার আদর্শ

হইতেছে প্রত্যেককে তাহার প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ উপার্জন করিতে দেওয়া, যাহাতে সমস্ত ধনসম্পদের ন্যায়সংগত বণ্টন হয়।

সমাজতন্ত্রের পক্ষে যুক্তি—সমাজতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করিলেই ইহার সুবিধাগুলি আমরা দেখিতে পাই। প্রথমতঃ, সমাজতন্ত্রে ধনী-নির্ধনের মধ্যে তারতম্য অথবা পার্থক্য করা হয় না বলিয়া শ্রমিকদের এবং দরিদ্রদের স্বার্থ যথোপযুক্ত সংরক্ষিত হয়। সমাজ যখন সর্বপ্রকার শোষণমুক্ত হয়, তখনই মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে এবং মানুষ তাহার পূর্ণ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার লইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, সমাজতন্ত্রে কোন সম্পদের অবাধ প্রতিযোগিতা জনিত অপচয় হয় না।

তৃতীয়তঃ, নীতিশাস্ত্রের দিক হইতে বিবেচনা করিয়া সমাজতন্ত্রবাদীগণ দাবী করেন যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষের নৈতিক চরিত্রের মান অবনত হয় এবং অসততা বাড়িয়া যায় বলিয়া সমাজতন্ত্র দেশের শাসনব্যবস্থার নৈতিক মান অনেক উন্নত করে।

চতুর্থতঃ, জমি, খনি প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদগুলি ব্যক্তিগত মালিকানায় না থাকিলে সামাজিক মালিকানার অধীন থাকিলে এইগুলি সমাজের সকলের হিতার্থে রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হয়।

পঞ্চমতঃ, গণতন্ত্রের সার্থকরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যদি সমাজতন্ত্রকে গণতন্ত্রের পরিপূরক ধরিয়া লওয়া হয়।

সমাজতন্ত্রের বিপক্ষে যুক্তি—সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রধান সমালোচনা হইল, ইহা রাষ্ট্রের কর্মক্ষমতার উপর অত্যধিক আস্থা রাখে, এবং ব্যক্তিগত কর্মপ্রচেষ্টার কোন মূল্য দেয় না। দ্বিতীয়তঃ, সমাজতন্ত্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতা নষ্ট হইয়া যায়। তৃতীয়তঃ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে বে-সরকারী ক্ষেত্রে শিল্পোন্নয়নের প্রচেষ্টা নষ্ট হয়।

সমাজতন্ত্রে মানুষ নিজের পছন্দ অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারেনা।

চতুর্থতঃ, উৎপাদনের উপাদানগুলির উপর যৌথ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হইলে উৎপাদনের প্রকৃত পরিমাণ কমিয়া যাইতে পারে।

পঞ্চমতঃ, সমাজতন্ত্রবাদীগণ মানুষকে তাহার নিজের ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে যতটা স্বার্থপর মনে করেন, মানুষ যে সব সময়েই সেই প্রকার হয়, তাহা নহে। আমেরিকা একটি ধনতান্ত্রিক দেশ। কিন্তু, সেই দেশের শ্রমিকদের যে অবস্থা খুব খারাপ তাহা নহে।

সর্বশেষে, আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদ বস্তুতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত,—ইহার কোন নৈতিক ভিত্তি নাই।

রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ (Functions of the State)—রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপগুলিকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। প্রত্যেক রাষ্ট্রের পক্ষেই কতিপয় আবশ্যিক অথবা প্রাথমিক কাজ (Essential or Primary functions) আছে। আবার, কতিপয় কাজ আছে যেগুলি প্রয়োজন অনুসারে করা হয়। এইগুলিকে ঐচ্ছিক কাজ (Optional or Non-essential functions) বলে। প্রয়োজনীয় কাজগুলি আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, সেইগুলি প্রথমতঃ রাষ্ট্রের এবং জনসাধারণের বিভিন্ন আইনগত অধিকার ও স্বাধীনতার সহিত জড়িত।

দ্বিতীয়তঃ, এক রাষ্ট্রের সহিত অপর রাষ্ট্রের সম্পর্ক, রাষ্ট্রের সহিত জনগণের সম্পর্ক এবং জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের আবশ্যিক কাজগুলি স্থিরীকৃত হয়।

তৃতীয়তঃ, দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখিবার জন্য রাষ্ট্রকে একদিকে যেমন কারা বিভাগ এবং পুলিশ বিভাগ বজায় রাখিতে হয়, অপর দিকে সেই প্রকার রাষ্ট্রকে একটি বিচার বিভাগ স্থাপন করিতে হয়।

Exercises

1. Discuss the various theories of the ends and purposes of the state. (২৫৮-৬০ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the value and limitations of Individualism as a social and political theory. (২৬১-৬৬ পৃষ্ঠা)

3. Examine the arguments in favour of Individualism as a theory of state function. (২৬৩-৬৫ পৃষ্ঠা)

4. Compare and contrast the various forms of socialism as regards aims, methods and programmes of actions. (২৬৫-৭৪ পৃষ্ঠা)

5. Examine Marxian concept of Socialism.

6. Discuss the arguments for and against Socialism. (২৭১-৭৪ পৃষ্ঠা)

7. "Socialism proposes to complete rather than oppose the liberal democratic creed." Discuss the statement. (C. U. B. A. Part I 1962)

(**উত্তর সংকেত :** অর্থনৈতিক কর্মসূচী বাদ দিলে সমাজতন্ত্রের আদর্শ এবং গণতন্ত্রের আদর্শের মধ্যে মূলতঃ কোন বিরোধ নাই। একটি অপরটির পরিপূরক। উভয়েরই ভিত্তি হইতেছে মানুষে মানুষে সাম্যবোধ। উভয় আদর্শই বিশ্বাস করে যে সব মানুষই সমাজের একান্ত আবশ্যক এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ। একজন যাহা কিছু করিবে, তাহা অপরের উপর কি প্রতিক্রিয়া হইতে পারে, সেইদিকে খেয়াল রাখিয়া করিতে হইবে। আলোচ্য অধ্যায়ে সমাজতন্ত্রের পক্ষে যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে সেইগুলি অবলম্বনে লিখ।)

C. U. Questions
1962
POLITICAL SCIENCE—PASS
First Paper

1. Describe the different methods of study in Political Science. Which of them do you consider to be the most desirable, and why ?

2. Discuss the Idealist Theory regarding the nature of the State.

3. Write an analytical note on the attacks upon the Monistic Theory of Sovereignty.

4. Define Law, and point out the distinction and relation between Law and Morality.

5. Discuss the problem of Nationalism *vs.* Internationalism.

6. Distinguish Democracy from Dictatorship and point out the conditions essential to the success of Democracy.

7. "Socialism proposes to complete rather than oppose the liberal democratic creed." Discuss the statement.

8. What are the different methods by which the electorate can exercise control over their representatives in modern democracies ?

9. Discuss the principles of organization of the Judiciary in modern States.

10. Discuss the nature and importance of public opinion in popular government.

প্রথম খণ্ড : গ্রেট ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা

প্রথম অধ্যায় | ব্রিটেনের রাজনৈতিক ঐতিহ্য (British Political Heritage)

ধারাবাহিকতা এবং গতিশীলতা হইতেছে ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য। একমাত্র ক্রমওয়েলের শাসনকাল ছাড়া ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থার মধ্যে ধারাবাহিকতার কোন অভাব পরিলক্ষিত হয় না। ইংলণ্ডের যে কোন প্রথা অথবা "Convention" যে কবে হইতে স্বরু হইয়াছে তাহা নির্দিষ্টভাবে বলা কঠিন।

পার্লামেণ্টারী প্রথার সৃষ্টি
(Origin of the Parliamentary System in England)

ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের সৃষ্টির কথা যদি আমরা চিন্তা করি, তবে দেখিতে পাই এ্যাংলো-স্যাক্সন যুগের উইটানাগেমট (Witenagemot) অথবা উইটান ইংলণ্ডের রাজাদের পরামর্শদাতা-সংসদ (Advisory Council) হিসাবে কাজ করিত। ১০৬৬ সালে নর্মান বিজয়ের পর উইটান বিলুপ্ত হইয়া যায়। ইহার পর বিজয়ী উইলিয়াম মাঝে মাঝে মহাপরিষদের (*Magnum Concilium* or Great Council) অধিবেশন আহ্বান করিতেন। এই পরিষদের সদস্য হইতেন আর্চবিশপ, বিশপ, এ্যাবট (Abbots), আর্ল (Earls) থেন্ (Thegns) এবং নাইটগণ (Knights)। দ্বিতীয় হেনরীর (১১৫৪-১১৮৯) রাজত্বকালে ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থা কিছু উন্নত হয় ; কিন্তু, তাঁহার পুত্র জনের (১১৯৯-১২১৬) রাজত্বকালে শাসনব্যবস্থা দুর্বল হইয়া পড়ে। সেই অবস্থায় জনের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা অনেক পরিমাণে মহাসনদ অথবা *Magna Charta* (The Great Charter) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই মহাসনদেই সর্বপ্রথম ঘোষণা করা হয় যে কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে বিনাবিচারে অথবা বে-আইনী-ভাবে গ্রেপ্তার, সম্পত্তিচ্যুত, সমাজচ্যুত, নির্বাসিত অথবা অন্য কোন প্রকারে

অত্যাচার করা যাইবে না। এই মহাসনদ সম্বন্ধে বলা যায়, "The document was not democratic in any modern sense, but it reiterated the principle that the king was not unlimited in power and that abuses of power might be resisted, and the legend subsequently attached to it made it a powerful instrument for liberty."[১] পরবর্তীকালে সরকারের কাজের পরিধি যতই বড় হইতে লাগিল, ততই শাসন বিভাগের জন্য বিভিন্ন দপ্তর এবং বিচারবিভাগের জন্য বিভিন্ন আদালত প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইল।

কিউরিয়া রেজিস (Curia Regis or the Little Council) প্রথমে বিচার-বিভাগীয় কাজ করিত। কাজের পরিধি বাড়িয়া যাইবার পর এই পরিষদটি একটি স্থায়ী সংসদে (Permanent Council) পরিণত হয় এবং ইহার মধ্যেই পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রিভি-কাউন্সিলের (Privy Council) সৃষ্টি হয়। এই প্রিভি-কাউন্সিল ক্রমশঃ শাসন বিভাগের কাজেও হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করে এবং সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রিভি-কাউন্সিলের কতিপয় ক্ষমতার সৃষ্টি হওয়ায় অনেকটা ক্যাবিনেটের কাজের ন্যায় ইহা কাজ করিতে আরম্ভ করে। মহাপরিষদের (The Great Council) বৈঠকে শুধু অভিজাত সম্প্রদায়ের বা রাজপরিবারের সহিত সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিগণ এবং চার্চের বিশপগণ যোগদান করিতে পারিতেন; ইহা অনেকটা বর্তমানকালের লর্ড সভার অনুরূপ ছিল। ১২৬৫ সালে সাইমন. ডি. মণ্টফোর্ট (Simon de Montfort) যে পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান করেন, তাহাতে প্রতিটি শায়ার (Shire) হইতে দুইজন নাইট এবং প্রতিটি বরো (borough) হইতে দুইজন প্রতিনিধি আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন; প্রথম এডোয়ার্ডের সময় ইংলণ্ডে আদর্শ পার্লামেণ্টের (Model Parliament) সৃষ্টি হয়। পার্লামেণ্টের মধ্যে তিনটি শ্রেণীর অস্তিত্ব দেখা যাইত। যথা, অভিজাতসম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, চার্চের প্রতিনিধি এবং সাধারণ জনপ্রতিনিধি।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে অভিজাতসম্প্রদায়ের দুইটি উপদলের মধ্যে "গোলাপ যুদ্ধ" (War of the Roses) বাধিয়া যায়। এই সংগ্রামের চূড়ান্ত বিজয়ী সপ্তম হেন্‌রী (১৪৮৫-১৫০৯) টিউডর রাজবংশের প্রথম রাজা হন। টিউডর রাজবংশের রাজারা স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। যদিও সপ্তম হেন্‌রীর আমলে পার্লামেণ্টের ক্ষমতা কিছু কমিয়া গিয়াছিল, তবুও তাঁহার পুত্র অষ্টম হেন্‌রীর (১৫০৯-১৫৪৭) রাজত্বকালে রাজার সহিত রোমান ক্যাথলিকদের নিরন্তর সংগ্রামের ফলে পার্লামেণ্টের মর্যাদা অনেক বাড়িয়া

১। The Government of Great Britain—Carter, Herz and Ranney.—P. 26.

গিয়াছিল। অষ্টম হেনরীর পরে এলিজাবেথ (১৫৫৮-১৬০৩) পুনরায় চার্চের সংগঠন করেন; কিন্তু, এই সময়ে চার্চে প্রটেস্ট্যাণ্টদের প্রাধান্ত বাড়িয়া যায়। এলিজাবেথের পর প্রথম জেম্‌স্ (১৬০৩-১৬২৫) ছিলেন স্টুয়ার্ট রাজবংশের প্রথম রাজা। তিনি "রাষ্ট্র ঈশ্বরের বিধানে সৃষ্ট হইয়াছে," এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁহার এই বিশ্বাস পার্লামেণ্টের আদর্শের বিরোধী ছিল। শুধু ১৬১৪ সালের কয়েকটি সপ্তাহ ব্যতীত ১৬১১ সাল হইতে ১৬২১ সাল পর্যন্ত প্রথম জেম্‌স্ প্রকৃতপক্ষে কোন পার্লামেণ্টের সাহায্য ব্যতীতই দেশ শাসন করেন। পরে যখন তিনি পার্লামেণ্ট আহ্বান করিতে বাধ্য হইলেন, তখন পার্লামেণ্টের কঠোর সমালোচনার ফলে তিনি পার্লামেণ্ট ভাংগিয়া দিতে বাধ্য হইলেন। প্রথম জেম্‌সের পর প্রথম চার্লস্ (১৬২৫-১৬৪৯) খুব অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার প্রথম দুইটি পার্লামেণ্ট ভাংগিয়া দেন। যখন ১৬২৮ সালে পুনরায় পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান করা হইল, তখন পার্লামেণ্টের সদস্যগণ—একটি "অধিকারের আবেদনপত্র" (Petition of Rights) দাখিল করিয়া রাজ্যের জনসাধারণের পূর্বতন অধিকারগুলির পুনরায় প্রবর্তন করিবার দাবী করিলেন এবং রাজশক্তির ক্ষমতার অপব্যবহার বন্ধ করিবারও দাবী করিলেন। চার্লস্ এই আবেদনপত্র গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ইহার পর ১৬৪২ সাল হইতে ১৬৩৯ সাল পর্যন্ত আমরা দেখি রাজা ও পার্লামেণ্টের মধ্যে ঝগড়া এবং তাহার পরিণতি হিসাবে একটি গৃহ-বিবাদ। ১৬৫৩ সালে পার্লামেণ্টারী সেনাদলের নেতা ক্রমওয়েল প্রটেক্টরেট (Protectorate) গঠন করিলেন এবং তখন খুব অল্পসময়ের জন্য ইংলণ্ডের একমাত্র লিখিত শাসনতন্ত্র রচিত হয়। কিন্তু, ক্রমওয়েলের সংগেও পার্লামেণ্টের খুব সম্প্রীতি ছিল না। ১৬৫৮ সালে ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় চার্লসের (১৬৬০-১৬৮৫) আমলে পুনরায় রাজতন্ত্রের সুরু হয়। দ্বিতীয় চার্লস এ্যাংগ্লিকান চার্চ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং যাহারা নূতন অবস্থা মানিয়া লইতে আপত্তি করিলেন, তিনি তাহাদের ধর্মীয় এবং নাগরিক অধিকার নিয়ন্ত্রিত করিলেন। যদিও চার্লস্ দেখাইতেন যে তিনি সর্বদাই পার্লামেণ্টের কর্তৃত্ব মানিয়া চলিতে প্রস্তুত, প্রকৃতপক্ষে তিনি স্বৈর ক্ষমতা লাভের প্রয়াসী ছিলেন। চার্লসের পর তাঁহার ভাই দ্বিতীয় জেম্‌স্ (১৬৮৫-১৬৮৮) মাত্র তিন বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি ক্যাথলিক চার্চের পুনঃপ্রতিষ্ঠা চাহিয়াছিলেন এবং তাঁহার এই প্রচেষ্টা প্রচণ্ডভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়। অবশেষে ১৬৮৮ সালে ইংলণ্ডে গৌরবময় বিপ্লবের (Glorious Revolution) অনুষ্ঠান হয়; দ্বিতীয় জেমস্‌কে সিংহাসনচ্যুত করিয়া জনসাধারণ তাঁহার কন্যা মেরী ও জামাতা উইলিয়ামকে (প্রিন্স অফ্ অরেঞ্জকে) সিংহাসনে বসাইল। তাঁহাদের আমলে রাজা ও পার্লামেণ্টের মধ্যে সব বিরোধের অবসান হইল।

১৬৮৯ সালে পার্লামেণ্ট একটি Bill of Rights প্রণয়ন করিয়া পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থার যে সকল প্রতিবন্ধক ছিল, সেইগুলি দূর করিল। আইন প্রণয়ন সম্পর্কে পার্লামেণ্টের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইল এবং পার্লামেণ্টের সম্মতি ব্যতীত রাজার পক্ষে কোন কর ধার্য করা নিষিদ্ধ করা হইল। তাহা ছাড়া, নিয়মিতভাবে পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান করা রাজার পক্ষে বাধ্যতামূলক করা হইল। প্রথম দুইজন হ্যানোভেরিয়ান রাজা প্রথম জর্জ (১৭১৪-১৭২৭) এবং দ্বিতীয় জর্জের (১৭২৭-১৭৬০) আমলে রাজার ক্ষমতা আরও কমিয়া যায় এবং ক্যাবিনেট বা রাজার উপদেষ্টামণ্ডলী হিসাবে একটি মন্ত্রীসভার হাতে শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইতে আরম্ভ করে।

ক্যাবিনেটের উৎপত্তি (The rise of the Cabinet)

ইহা অনেক আগেই বুঝা গিয়াছিল যে প্রিভি কাউন্সিলের মত একটি বিরাট সংসদের পক্ষে শাসনকাজের খুঁটিনাটি ব্যাপার দেখাশোনা অথবা পরিচালনা করা সম্ভবপর নয়। রাজা দ্বিতীয় চার্লস্ তাঁহার কয়েকজন অন্তরংগ উপদেষ্টার সাহায্যে নিজের কাজ করিতেন; তাঁহাদের বলা হইত *Cabals* এবং এই Cabal হইতেই পরবর্তীকালে রাজার একান্ত উপদেষ্টামণ্ডলী বা মন্ত্রীসংসদের সৃষ্টি হয়। স্টুয়ার্ট রাজারা সর্বদাই নিজেরা নিজেদের মন্ত্রীগণকে মনোনীত করিতেন। উইলিয়াম এবং পরে এ্যানির (Anne) আমলে রাজার মন্ত্রীসভা বা ক্যাবিনেট-সদস্যদের নিয়মত বৈঠক হইত এবং ইহার সদস্যগণ রাজা কর্তৃক মনোনীত হইলেও ইহা বুঝা গিয়াছিল যে মন্ত্রীসভার উপর পার্লামেণ্টের আস্থা থাকিলে রাজার পক্ষেই শাসনকাজ চালান খুব সুবিধাজনক হয়। এ্যানি সাধারণতঃ একটি রাজনৈতিক দল হইতেই মন্ত্রীদের মনোনীত করিবার নীতি পছন্দ করিতেন না; কিন্তু উইলিয়াম শুধু একটি রাজনৈতিক দলের মধ্য হইতে মন্ত্রীসভা গঠন করার নিয়ম চালু করিয়াছিলেন। এইভাবে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মন্ত্রীসভা গঠনের নিয়ম প্রবর্তিত হয়। ১৭২১ হইতে ১৭৪২ সাল পর্যন্ত ক্যাবিনেট এবং পার্লামেণ্ট উভয়ই লর্ড ওয়ালপোলের (Lord Walpole) নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছিল।

লর্ড ওয়ালপোল ছিলেন ইংলণ্ডের প্রথম "Lord of the Treasury" এবং "Chancellor of the Exchequer", বা অর্থমন্ত্রী. এবং প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন ইংলণ্ডের প্রথম প্রধান মন্ত্রী। তৃতীয় জর্জের আমলে (১৭৬০-১৮২০) রাজার দুর্বলতার সুযোগে ক্যাবিনেট এবং পার্লামেণ্ট আরও শক্তিশালী হইয়া উঠে। তৃতীয় জর্জের রাজত্বের শেষকালে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই ইংলণ্ডে পাকাপাকিভাবে ক্যাবিনেট শাসনব্যবস্থার প্রচলন হয়।

বৃটেনে দলব্যবস্থার উৎপত্তি (The rise of Parties in Britain)

বৃটেনের দলব্যবস্থাও ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে গড়িয়া উঠিয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর আগে অভিজাতসম্প্রদায়ের মধ্যে দলাদলি ছিল বটে এবং গোলাপ-যুদ্ধের (Wars of the Roses) সময়ে অথবা ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ দেখা যাইত বটে, কিন্তু, তবুও সেই সময়ে দলব্যবস্থা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা গড়িয়া উঠে নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি যে গৃহযুদ্ধ হয় তাহাতে রাজার সমর্থকদের বলা হইত এ্যাংগ্লিকান ক্যাভালিয়ারস্ (Anglican Cavaliers) এবং পার্লামেন্টের সমর্থকদের বলা হইত পিউরিটান রাউণ্ডহেডস্ (Puritan Roundheads)। এই দুইটি দলের মধ্যে ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের সংঘাত দেখা গিয়াছিল। দ্বিতীয় চার্লসের সিংহাসনারোহণের পর ইংলণ্ডে দুইটি দলের সৃষ্টি হইল। একটি দলকে বলা হইত টোরি (Tory); এই দলের সদস্যগণ ছিলেন রাজশক্তির সমর্থক। অপর দলটিকে বলা হইত হুইগ (Whig),—এই দলের মধ্যে অভিজাতসম্প্রদায়ের লোকও ছিল, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের লোকও ছিল। তাহারা উগ্র রাজশক্তির সমর্থক ছিলেন না। দ্বিতীয় জেমসের আমলে টোরি দলের মধ্যে দুইটি ভাগ হইয়া যায়। টোরি দলের কেহ কেহ রাজার অনুগত থাকিয়া গেলেন আবার কেহ কেহ চার্চের অনুগত হইয়া গেলেন। ইহার কারণ ছিল এই যে দ্বিতীয় জেমস্ এ্যাংগ্লিকান চার্চকে পছন্দ করিতেন না। টোরি দলের কোন কোন সদস্য গৌরবময় বিপ্লবের সময় হুইগ দলে যোগদান করিলেন। ইহাতে কিছু সময়ের জন্য, বিশেষতঃ, গৌরবময় বিপ্লবের পর ইংলণ্ডের রাজনীতিক্ষেত্রে হুইগ দলের প্রাধান্য দেখা যায়। ১৭৮৩ সালে ইয়াংগার পিটের (Younger Pitt) নেতৃত্বে টোরি দল ক্ষমতা লাভ করে। ১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লবের ব্যাপারে ইংলণ্ডে বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং তখন হুইগ দলের মধ্যে পুনরায় ভাগ হইয়া যায়। এডমাণ্ড বার্কের (Edmund Burke) নেতৃত্বে হুইগ দলের কিছু কিছু লোক টোরি দলে যোগদান করে এবং শুধু ১৮০৬ সাল ছাড়া ১৭৮৩ সাল হইতে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত ইংলণ্ডে টোরি দলই নেতৃত্ব করে। যদিও গৌরবময় বিপ্লবের ফলে হাউস অফ কমন্সের চূড়ান্ত ক্ষমতা স্বীকৃত হইয়াছিল, তবুও হাউস অফ কমন্সও তখনও সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিকভাবে গঠিত হয় নাই। ১৮৩২ সালের সংস্কার আইন (The Great Reform Act of 1832) আধুনিক বৃটিশ গণতন্ত্রের সূচনা করে। [ইহার পর ১৮৬৭ সালে এবং ১৮৮৪ সালে ভোটারের সংখ্যা আরও বাড়িয়া যায় এবং অবশেষে ১৯১৮ সালে সব একুশ বৎসর বয়স্ক পুরুষ নাগরিককে এবং গুণের ভিত্তিতে ত্রিশ বৎসরের উর্দ্ধে নারীগণকে ভোটাধিকার দেওয়া

হয়। ১৯২৮ সালে পুরুষদের মত নারীরাও সমান ভিত্তিতে ভোটাধিকার পাইল।]

নির্বাচন-প্রথার প্রসার হইবার সংগে সংগে ইংলণ্ডের রাজনীতিক্ষেত্রে পট পরিবর্তন হইল। পরবর্তীকালে হুইগদল উদারনৈতিক দল (Liberal Party) রূপে পরিণত হইল এবং টোরি দল রক্ষণশীল দল (Conservative Party) রূপে পরিচিত হইল। ১৮৬৭ সালে নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যা বাড়িয়া যাইবার পর ডিজরেলী (Disreli) এবং গ্ল্যাডস্টোন (Gladstone) যথাক্রমে Conservative Party এবং Liberal Party'র নেতারূপে স্বীকৃত হন। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে উদারনৈতিক দলের একাংশের সমর্থনে শ্রমিকদলের (Labour Party) সৃষ্টি হয় এবং প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে শ্রমিকদলের শক্তি ও সদস্যসংখ্যা উদারনৈতিক দলকে ছাড়াইয়া যায়।

বর্তমানে ইংলণ্ডে রাজনৈতিক দল হিসাবে দুইটি দলই প্রধান এবং সেইগুলি হইতেছে রক্ষণশীল দল এবং শ্রমিকদল। উদারনৈতিক দলের ভূমিকা এখন খুবই নগণ্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সাম্যবাদী দলও (Communist Party) নিজেদের সংগঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু তাহা সফল হয় নাই।

Exercises

1. Trace the Continuity of the British Parliamentary System. (১-৪ পৃষ্ঠা)

2. Give an account of the gradual growth of the Parliamentary System in England. (১-৪ পৃষ্ঠা)

3. Write a note on the history of the rise of the Cabinet in England. (৫ পৃষ্ঠা)

4. Give an outline of the history of the Political Parties in England. (৫-৬ পৃষ্ঠা)

দ্বিতীয় অধ্যায়

গ্রেট বৃটেনের শাসনতন্ত্রের উৎস ও বৈশিষ্ট্য
(Sources and the features of the British Constitution)

ডি টোকুয়াভিলি (De Tocqueville) বলিয়াছিলেন যে ইংলণ্ডে কোন শাসনতন্ত্রের অস্তিত্ব নাই।[১] টমাস পেইনও (Thomas Paine) এইরকম অভিযোগ করিয়াছিলেন ; তিনি বলিয়াছিলেন, "Can Mr. Burke produce the English Constitution? If he cannot, we may fairly conclude that though it has been so much talked about, no such thing as a Constitution exists, or ever did exist." কিন্তু ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র নাই, একথা বলা ভুল। যে দেশ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা গণতান্ত্রিক দেশ বলিয়া গর্ব করে, সেই দেশের নিশ্চয়ই একটি শাসনতন্ত্র আছে, তবে সেই শাসনতন্ত্রটি অলিখিত অবস্থায় আছে। একটি অলিখিত শাসনতন্ত্র কিভাবে গণতন্ত্রের ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়া গেল, তাহা ভাবিলে আমাদের মনে বিস্ময় জাগে।

বৃটিশ শাসনতন্ত্রের উৎস (Sources of the Brit sh Constitution)

শাসনতন্ত্রের উৎস

গ্রেট বৃটেনের শাসনতন্ত্রের উৎস হইতেছে, কতিপয় সনদ (charters), বিধিবদ্ধ আইন (statutes), আইনের সিদ্ধান্ত (Judicial decisions), শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে লিখিত বই [যেমন, বেজহটের (Bagehot) "The English Constitution," মে'র (May) "Parliamentary Practice", জেনিংসের (Jennings) "Cabinet Government", এনসনের (Anson) "Law and Custom of the Constitution"] প্রথাগত আইন (Common Law) এবং প্রথাগত বিধান (Conventions), ইত্যাদি।

মহাসনদ (Magna Charta), অধিকারের আবেদনপত্র (Petition of Rights), অধিকারের বিল (Bill of Rights), মীমাংসার আইন (Act of Settlement), ১৮৩২ সালের সংস্কার আইন (Reform Act of

---

১। "In England, the Constitution..........there is no such thing."

1832), ১৮৬৭, ১৮৮৪ ও ১৯১১ সালের সংস্কার আইন, ১৯১১ সালের পার্লামেণ্টারী আইন (Parliamentary Act of 1911), প্রভৃতি চুক্তিপত্র ও আইন বহুলাংশে ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র গড়িয়া তুলিয়াছিল।

আইনের সিদ্ধান্তও ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রকে প্রভাবিত করিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বেইনব্রিজ বনাম পোস্টমাস্টার জেনারেল (১৯০৬), বিউটি' বনাম গিলব্যাংক্স্ (Beauty vs. Gillbanks), এ্যাস্‌লি বনাম ওয়াইট (Ashley vs, White), অব্‌সোর্ণ বনাম এম্যালগেমেটেড সোসাইটি (Obsorne vs. Amalgamated Society Co. Ltd), প্রভৃতি মামলা যথেষ্ট পরিমাণে সংবিধানের ক্রমবিবর্তনকে প্রভাবিত করিয়াছে। অধ্যাপক ডাইসির মতে, ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র আইন প্রণয়নের দ্বারা যতটা প্রভাবিত হইয়াছে, জনসাধারণের অধিকার রক্ষা কল্পে মামলা-মোকদ্দমার অনুসিদ্ধান্তের দ্বারা তাহা আরও বেশী প্রভাবিত হইয়াছে।[১] অনুরূপভাবে প্রথাগত আইনেরও (Common Laws) উল্লেখ করা যাইতে পারে। অধ্যাপক মুনরোর ভাষায়, "the Common Law like statutory law is continual in process of developments of judicial decisions."

ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রের সর্বাপেক্ষা বড় উৎস হইল প্রথাগত বিধান (Conventions)। প্রথাগত আইনের ভিত্তিতেই রাজার ক্ষমতাগুলি কার্যকরী হয়। অগের (Ogg) মতে এই প্রথাগত বিধানগুলি হইতেছে এমন কতিপয় বোঝাপড়া অথবা অভ্যাস যেইগুলি সরকারী কর্তৃপক্ষের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করে।[২] লর্ড ব্রাইসও (Lord Bryce) বলেন, "The British constitution works by a body of understandings which no writer can formulate". এই প্রথাগত বিধানগুলিকে কেন্দ্র করিয়া ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। পার্লামেণ্টের ক্ষমতা, ক্যাবিনেটের ক্ষমতা, রাজার সহিত ক্যাবিনেটের সম্পর্ক, জনসাধারণের অধিকার ইত্যাদি সব কিছু প্রধানত ইংলণ্ডের প্রথাগত বিধানের উপর ভিত্তিশীল। যদি ইংলণ্ডের প্রথাগত বিধানগুলি কার্যকরী না হইত, তবে ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রের কাঠামো ভাংগিয়া

১। "The English Constitution, far from being the result of legislation in the ordinary sense of the term, is the fruit of contests carried on in Courts on behalf of the rights of the individuals." (Dicey)

২। Understaning, practices, and habits which alone regulate a large portion of the actual relations and operations of the public authorities." (Ogg)

পড়িত। ইংরাজ জাতি স্বভাবতঃ খুব রক্ষণশীল (conservative) বলিয়াই প্রথাগত বিধানগুলি গড়িয়া উঠিতে পারিয়াছে।

বৃটিশ শাসনতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য (Salient features of the British Constitution)—মুনরোর মতে বৃটিশ শাসনতন্ত্র হইতেছে পৃথিবীর অন্যান্য শাসনতন্ত্রের মাতার ন্যায়।[১] অন্যান্য দেশের শাসনতন্ত্রগুলি কোন-না-কোন ভাবে বৃটিশ শাসনতন্ত্র হইতে কিছু উপাদান ধার করিয়াছে।

বৃটিশ শাসনতন্ত্রের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রথমতঃ, গ্রেট বৃটেনে আমরা এককেন্দ্রিক (unitary) শাসনব্যবস্থা দেখিতে পাই। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় শাসন-সম্পর্কিত সমুদয় ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে; স্থানীয় শাসন-কর্তৃপক্ষ থাকিলেও সেইগুলির ক্ষমতা ও অস্তিত্ব নির্ভর করে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর। ইংলণ্ডে আমরা কাউন্টি, বরো এবং অন্যান্য স্থানীয় শাসন-প্রতিষ্ঠান দেখিতে পাই; ইহারা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সৃষ্ট এবং ইহাদের অস্তিত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন করা হয়; কিন্তু, ইংলণ্ডে এইরূপ করা হয় নাই। আইন প্রণয়নে রাজা-সমেত-পার্লামেন্টই (King-in Parliament) সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী।

এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা

দ্বিতীয়তঃ, ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র অলিখিত (unwritten) এবং নমনীয় (flexible)। ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রের একটি বিরাট অংশ প্রথাগত আইন (Common Law) এবং প্রথাগত বিধানের (Conventions) ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য মহাসনদ (Magna Charta), ১৬৮৯ সালের অধিকারের বিল (Bill of Rights), ১৯১১ এবং ১৯৪৯ সালের পার্লামেন্টারী আইন (Parliamentary Acts of 1911 and 1949) প্রভৃতি কয়েকটি আইন লিপিবদ্ধ। কিন্তু, সামগ্রিকভাবে গ্রেট বৃটেনের শাসনতন্ত্র অলিখিত। আবার, শাসনতন্ত্রের সংশোধন করা খুব কঠিন নয়। যেভাবে পার্লামেন্টে সাধারণতঃ আইন প্রণয়ন করা হয়, অনুরূপভাবে শাসনতন্ত্রের সংশোধন সম্পর্কে যে কোন প্রকার আইন প্রণীত হয়। এই নমনীয়তা (flexibility) বৃটিশ শাসনতন্ত্রের একটি প্রধান

অলিখিত এবং নমনীয় শাসনতন্ত্র

১। "The British Constitution is the mother of all constitutions, the British Parliament is the mother of Parliaments. No matter by what names the legislative bodies of other countries may be known, they have a common parentage."
(Munro)

বৈশিষ্ট্য। ১৯৩৬ সালের Abdication Actটি পার্লামেণ্টে বিল উত্থাপনের পর আধা ঘণ্টার মধ্যেই অনুমোদিত হইয়া গিয়াছিল। ইহাই শাসনতন্ত্রের নমনীয়তার চূড়ান্ত নিদর্শন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র অনমনীয় (rigid) এবং তাহা সংশোধন করিতে হইলে একটি জটিল পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। ভারতের শাসনতন্ত্র খুব নমনীয় অথবা খুব অনমনীয় নহে।

রাজা-সমেত-পার্লামেণ্টের সার্বভৌমত্ব

তৃতীয়তঃ, রাজা-সমেত-পার্লামেণ্টের (King-in-Parliament) সার্বভৌমত্ব বৃটিশ শাসনতন্ত্রের অপর একটি বৈশিষ্ট্য। আইনের দিক হইতে পার্লামেণ্টের উপর কোন বাধানিষেধ নাই। ইংলণ্ডের বিচার বিভাগ পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারিলেও ইহার বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিতে পারে না। এমন কি পার্লামেণ্ট ইচ্ছা করিলে আদালতের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিতে পারে। পার্লামেণ্টের প্রাধান্য যদিও যুক্তরাজ্য এবং উপনিবেশগুলির প্রতি প্রযোজ্য, বৃটিশ ডোমিনিয়নগুলির উপর প্রকৃতপক্ষে পার্লামেণ্টের কোন কর্তৃত্ব নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেস সার্বভৌম আইনপরিষদ (sovereign law-making body) নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট মার্কিন কংগ্রেস কর্তৃক প্রণীত আইনের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিতে পারে।

সরকারের ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ হয় নাই

চতুর্থতঃ, ইংলণ্ডে সরকারের ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ (Separation of powers) করা হয় নাই। মণ্টেস্কু (Montesquieu) অনুমান করিয়াছিলেন, গ্রেট বৃটেনের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করিয়া সরকারের তিনটি প্রধান বিভাগের কাজ পরিচালিত হয়। কিন্তু, বাস্তবক্ষেত্রে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয় নাই। মন্ত্রীসভার সকলেই আইনসভার সদস্য এবং আইন প্রণয়নে তাঁহাদের পূর্ণ ক্ষমতা আছে। মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী রাজা সব কাজ করেন এবং মন্ত্রীসভাই প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের শাসন পরিচালন বিভাগের সর্বেসর্বা। লর্ডসভা বৃটিশ আইনসভার উচ্চতর কক্ষ; কিন্তু ইহার কিছু কিছু বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা আছে। ইহাকেই ইংলণ্ডের বিচার বিভাগে আপীল করিবার উচ্চতম কর্তৃপক্ষ বলা হয়। ইংলণ্ডের রাজা একাধারে রাষ্ট্রের প্রধান এবং শাসন বিভাগের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ। কিন্তু, তিনি আইনসভার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং রাজার মধ্যে সরকারের সব বিভাগেরই ক্ষমতার এক বিচিত্র সমাবেশ হইয়াছে। ইংলণ্ডের যিনি লর্ড চ্যান্সেলার তিনি একাধারে আইনসভা, শাসন-পরিচালন বিভাগ এবং বিচার বিভাগের সদস্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেখানে আমরা ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ দেখিতে পাই, ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রে সেখানে আমরা দায়িত্বের কেন্দ্রীয়করণ দেখিতে পাই। র‍্যামসে মুইর

Ramsay Muir) বলেন, "If Separation of Powers is the essential principle of the American constitution, concentration of responsibility is the essential principle of the British constitution."

পঞ্চমতঃ, ইংলণ্ডে তত্ত্ব ও বাস্তবের (conflict between theory and practice) মধ্যে সংঘাত দেখা যায়। একদিকে ইংলণ্ডে আমরা দেখিতে পাই

তত্ত্ব ও বাস্তবের মধ্যে অমিল

রাজতন্ত্র; রাজার নামেই শাসন বিভাগের সমুদয় কাজ নির্বাহ করা হয়। অপরদিকে দেখা যায় ইংলণ্ডে পার্লামেণ্টারী শাসন। অগের (Ogg) ভাষায়, "The Government of U. K. is in ultimate theory an absolute monarchy, in form a constitutional limited monarchy and in actual charater a democratic republic". অর্থাৎ, ইংলণ্ডে যে রাজতন্ত্র আমরা দেখিতে পাই, তাহা হইতেছে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (constitutional monarchy)। ইংলণ্ডে রাজা কোন অন্যায় করেন না ("The King can do no wrong") এবং 'রাজা কখনও মরেন না" ("The King never dies)"। সরকারের পক্ষে যাহা কিছু করা হয়, সেইগুলির জন্য দায়ী থাকেন মন্ত্রীসভা। মন্ত্রীসভার সদস্যগণ পার্লামেণ্টের সভ্য। সুতরাং ইংলণ্ডে কার্যক্ষেত্রে আমরা দায়িত্বশীল সরকার (responsible government) বা পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা দেখিতে পাই।

ষষ্ঠতঃ, আইনের অনুশাসন (Rule of Law) বৃটিশ শাসনতন্ত্রের অপর বৈশিষ্ট্য। সোভিয়েট ইউনিয়ন, ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের

আইনের অনুশাসন

শাসনতন্ত্রের ন্যায় ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রেও লিপিবদ্ধভাবে নাগরিকদের কোন মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) প্রদান করা হয় নাই। কিন্তু, কর্মক্ষেত্রে নাগরিকগণ বিভিন্ন অধিকার হইতে বঞ্চিত নহে। ইংলণ্ডের নাগরিকগণ আইনের দ্বারাই শাসিত। আইনের অনুশাসন অথবা "Rule of Law" কথাটি বিশেষভাবে প্রচলন করেন ডাইসি (Dicey)। ডাইসি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের উপর ভিত্তি করিয়া আইনের অনুশাসন প্রচলন করেন। তাঁহার মতে আইনের অনুশাসনের তিনটি নীতি আছে। প্রথমতঃ, আইনের প্রাধান্য সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হয়। সরকারের কোন স্বৈরী ক্ষমতা (arbitrary power) অথবা নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করিবার ক্ষমতা (discretionary power) নাই। নাগরিকদের স্বাধীনতার রক্ষক হইতেছে আইন। কোন বিচারালয় কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত শাসনবিভাগ কোন নাগরিকের স্বাধীনতায় অথবা সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ

করিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, আইনের চক্ষে সকলেই সমান। সব নাগরিককেই দেশের সাধারণ আইন (Ordinary Law of the land) পালন করিতে হইবে এবং সাধারণ আদালতের (Ordinary Courts) অধীন থাকিতে হইবে। সাধারণ নাগরিক ও সরকারী কর্মচারী সকলেই একই আইন পালন করিবে এবং আইন ভংগের কারণ ঘটিলে তাহাদের একই আদালতের বিচারাধীন হইতে হইবে। ফ্রান্সে সরকারের সহিত সাধারণ নাগরিকের বিবাদ মীমাংসা করিবার জন্য পৃথক শাসনবিভাগীয় আইন (Administrative Law) এবং শাসনবিভাগীয় আদালত (Administrative Court) থাকে। তৃতীয়তঃ, জনসাধারণের যে সকল অধিকার আদালত কর্তৃক নির্ধারিত হয়, সেইগুলির ভিত্তিতে ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারত, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় নাগরিকদের অধিকারগুলি লিপিবদ্ধভাবে বৃটিশ শাসনতন্ত্র কর্তৃক স্বীকৃত হয় নাই। কার্যক্ষেত্রে, বিশেষতঃ ১৮৯৩ সালের জননিরাপত্তা আইন (Public Protection Act) প্রণীত হইবার পর হইতে ইংলণ্ডের সরকারী কর্মচারীদের অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ আইনের অধিকার হইতে বিচ্ছিন্ন রাখা হইয়াছে।

অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা

সর্বশেষে, ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রে আমরা একটি অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা (unbroken continuity) দেখিতে পাই। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আমরা এই ধারাবাহিকতা দেখিতে পাই না। ইংলণ্ডে রাজা অথবা রানী, লর্ডসভা, প্রিভি কাউন্সিল, প্রভৃতি (যাহারা অতীতে শাসনব্যবস্থায় সক্রিয় ভূমিকা অবলম্বন করিত) এখনও অতীতের সহিত বর্তমানের প্রত্যক্ষ যোগসূত্র রক্ষা করিতেছে।

আইনের অনুশাসন (Rule of Law)

ডাইসির মতে আইনের অনুশাসন তিনটি নীতির উপর ভিত্তিশীল

আইনের অনুশাসন (Rule of Law) ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সোভিয়েট, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতবর্ষের ন্যায় ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রের নাগরিকদের লিখিতভাবে কোনও মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) দেওয়া হয় নাই। কিন্তু, কার্যক্ষেত্রে কোন নাগরিকই বিভিন্ন ব্যক্তিগত সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত নহে। অধ্যাপক ডাইসি আইনের অনুশাসন বা "Rule of law" কথাটি বিশেষভাবে প্রচলন করেন। কিন্তু ডাইসির পূর্বেও 'আইনের অনুশাসন' কথাটির অর্থ ইংলণ্ডের অধিবাসীদের জানা ছিল। ১২১৫ সালের মহাসনদে (Magna Charta) বলা হইয়াছে যে কোন স্বাধীন প্রজাকে (Freeman) বিনা বিচারে অথবা দেশের আইন ব্যতীত আটক রাখা যাইবে না। ডাইসি

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উপর ভিত্তি করিয়া আইনের অনুশাসন প্রচলন করেন। তাঁহার মতে আইনের অনুশাসন তিনটি নীতিকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রথমতঃ আইনের প্রাধান্য সরকারকে স্বীকার করিতে হইবে। সরকারের কোন প্রকার স্বৈরী ক্ষমতা (Arbitrary Power) অথবা নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করিবার ক্ষমতা (Discretionary power) নাই। নাগরিকদের স্বাধীনতা রক্ষা করে দেশের আইন। কোন বিচারালয় কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত শাসন বিভাগ কোন নাগরিকের স্বাধীনতা অথবা সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেনা। "No man is punishable or can lawfully be made to suffer in body or goods except for a distinct breach of law established in the ordinary legal manner before the ordinary courts.") দ্বিতীয়তঃ, আইনের চক্ষে সকলেই সমান। সব নাগরিককেই দেশের সাধারণ আইন (Ordinary Law of the land) পালন করিতে হইবে এবং সাধারণ আদালতের (Ordinary Courts) অধীন থাকিতে হইবে। সাধারণ নাগরিক ও প্রধানমন্ত্রী হইতে পুলিশ কনস্টেবল অথবা ট্যাক্স-কালেক্টার পর্যন্ত যে কোন সরকারী কর্মচারীকে একই আইন পালন করিতে হইবে এবং আইন ভংগের কারণ ঘটিলে তাহাদের সেই কাজের জন্য একই দায়িত্ব থাকিবে। ("Every official from the Prime Minister down to a constable or a collector of taxes is under the same responsibility for every act done without legal justification as any other citizen.") ফ্রান্সে সরকারের সহিত সাধারণ নাগরিকের বিবাদ মীমাংসা করিবার জন্য পৃথক শাসন বিভাগীয় আইন (Administrative Law) এবং শাসন বিভাগীয় আদালত Administrative Court) থাকে। তৃতীয়তঃ, জনসাধারণের যে সকল অধিকার আদালত কর্তৃক নির্ধারিত হয়, সেইগুলির ভিত্তিতে ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র গাড়য়া উঠিয়াছে। ভারত, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় নাগরিকদের অধিকারগুলি লিপিবদ্ধভাবে শাসনতন্ত্র কর্তৃক স্বীকৃত হয় নাই। কার্যক্ষেত্রে বিশেষতঃ ১৮৯৩ সালের জননিরাপত্তা আইন (Public Protection Act) প্রণীত হইবার পর হইতে ইংলণ্ডের সরকারী কর্মচারীদের অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ আইনের অধিকার হইতে বিচ্ছিন্ন রাখা হইয়াছে।

সমালোচনা—ডাইসি আইনের অনুশাসনের যে তিনটি নীতি বর্ণনা করিয়াছেন, বর্তমান যুগের শাসনতন্ত্রের বিশেষজ্ঞগণ ইহার বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন। বিশেষতঃ ডাইসির "Law of the Constitution" বইটি প্রকাশিত হইবার পর "আইনের অনুশাসন" সম্বন্ধে নূতন চিন্তাধারার সৃষ্টি

হইয়াছে। আইনের অনুশাসনের প্রথম নীতি অনুযায়ী সরকারের স্বৈর ক্ষমতা অথবা নিজের ইচ্ছানুযায়ী কোন কিছু করিবার ক্ষমতা নাই"। কিন্তু, বর্তমানে শাসনব্যবস্থা এত জটিল হইয়াছে যে শাসনবিভাগকে নিজের হাতে ব্যাপক ক্ষমতা রাখিতে হয়। ফৌজদারী আইনগুলিতে এমন অনেক অপরাধ আছে যেইগুলির সম্পর্কিত নিয়মাবলী সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগগুলি সৃষ্টি করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ডাইসির মতে সরকারী কর্মচারী হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ নাগরিক পর্যন্ত সকলকেই আইনভংগের অপরাধী হইলে সাধারণ আইন অনুযায়ী সাধারণ আদালতের বিচারাধীন থাকিতে হয়। এ ক্ষেত্রে দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিবার মত। 'সাধারণ আইন' বলিতে ডাইসি প্রথাগত আইন অথবা পার্লামেণ্ট প্রণীত আইনের কথা বিবেচনা করিয়াছেন। কিন্তু, পূর্বেই বলা হইয়াছে, ফৌজদারী বিচারে আমরা অনেক সময়েই সংশ্লিষ্ট সরকারীবিভাগ কর্তৃক সৃষ্ট নিয়মকানুন দেখিতে পাই। তাহা ছাড়াও, নাগরিকগণকে অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ আইন ব্যতীতও তাহাদের পেশাসংক্রান্ত বিশেষ আইন মানিয়া চলিতে হয় এবং বিশেষ বিচারালয়ের (Special Tribunal) নিকট দায়ী থাকিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ আমরা সেনাবাহিনীর জন্য সামরিক আইন ও সামরিক বিচারালয় এবং যাজক সম্প্রদায়ের জন্য যাজকীয় আইন ও যাজকীয় বিচারালয়ের উল্লেখ করিতে পারি। তৃতীয়তঃ, ডাইসির আইনের অনুশাসন অনুযায়ী আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান। কিন্তু, 'আইনের দৃষ্টিতে সমতা' বলিতে এই বুঝায় না যে সরকারী কর্মচারী এবং সাধারণ নাগরিক একই পরিমাণ ক্ষমতা ভোগ করে। ডাইসি বলিতে চাহেন যে সরকারী কর্মচারীগণ নিজেদের পদমর্যাদার অজুহাতে আইন অমান্য অথবা সাধারণ আদালতের বিচার এড়াইয়া যাইতে পারেন না। কিন্তু, সরকারী কর্মচারী এবং সাধারণ লোক যে কার্যক্ষেত্রে একই ধরণের সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন, তাহা নহে। একজন সামান্য পুলিশ কর্মচারী যে কোন নাগরিককে গ্রেপ্তার করিবার ক্ষমতা রাখে (অবশ্য বিনাবিচারে আটক করিয়া রাখিবার ক্ষমতা রাখে না)। কিন্তু, একজন সাধারণ নাগরিকের অভিযোগে কাহাকেও এমনিতে গ্রেপ্তার করা চলে না। ইংলণ্ডের সমাজব্যবস্থায় সকলের প্রতি ন্যায়বিচার করা সম্ভবপর হয় না। কারণ ইংলণ্ডে এখনও অভিজাতসম্প্রদায়ের অস্তিত্ব থাকায় পুলিশ বিভাগ এবং বিচারবিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হইতে পারে নাই। তাহা ছাড়া, কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সাধারণ নাগরিকের অভিযোগ আনাও সহজসাধ্য নহে। কারণ, ইংলণ্ডে এমন বিধান আছে যে নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইয়া গেলে সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিচারালয়ের নিকট অভিযোগ করা যাইবে না এবং অভিযোগ অ-প্রমাণিত থাকিলে অভিযোগকারীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। আবার সরকারী দপ্তর সাধারণের মত মামলার সহিত

সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় প্রামাণ্য তথ্যাদি অথবা দলিলপত্র আদালতের নিকট পেশ করিতে বাধ্য নহে।

সর্বশেষে ডাইসির মতে আইনের অনুশাসন অনুযায়ী ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র সাধারণ বিচারালয় কর্তৃক নির্ধারিত নাগরিকদের সাধারণ অধিকারের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং ব্যক্তিগত অধিকার শাসনতান্ত্রিক আইনের পরিবর্তে সাধারণ আইনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু, এই যুক্তি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ যোগ্য নহে। ইংলণ্ডের রাজা-সমেত-পার্লামেণ্ট (King-in-Parliament) হইতেছে সার্বভৌম আইন পরিষদ (Sovereign Law-making body)। ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রে পার্লামেণ্টের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। ইলণ্ডে অনেক নাগরিক অধিকার পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত আইনে নাগরিকদের প্রদান করা হইয়াছে। অবৈতনিক শিক্ষা সমাজ-বীমার ব্যবস্থা, এই অধিকারগুলি নাগরিকগণ পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত আইন হইতে পাইয়াছে। ডাইসি ইহা চিন্তা করেন নাই। নাগরিকদের অধিকার রক্ষা করিবার দায়িত্ব হইতেছে সাধারণ আদালত এবং সাধারণ আইনের। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে পার্লামেণ্ট ইহার সার্বভৌমত্বের সাহায্যে যে কোন সময় সাধারণ আইনের পরিবর্তন করিতে পারে। সুতরাং, নাগরিক অধিকার মূলতঃ পার্লামেণ্টের সার্বভৌমত্বের উপর নির্ভরশীল।

শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি অথবা প্রথাগত বিধান (Conventions)—ইংলণ্ডের প্রথাগত বিধান অথবা শাসনতান্ত্রিক নীতি বলিতে এমন কতিপয় শাসনতান্ত্রিক নীতি বুঝায় যেগুলি প্রচলিত প্রথা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া ও চুক্তির মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এই নীতিগুলি রাষ্ট্রীয় আইনের সমান মর্যাদা লাভ করে। কিন্তু ইহারা আদালতের বিচার্য বিষয়ের বহির্ভূত। এই বিধানগুলি কতিপয় রাষ্ট্রনৈতিক নীতি বুঝায় যেগুলি রাজা, মন্ত্রীমণ্ডলী এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে শাসনতন্ত্রসম্মত উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করে। "(They include various political customs or usages which regulate ordinary conduct of the crown, of the ministers, and of public authorities under the constitution.") এই প্রথাগত বিধানগুলিকে আমরা মোটামুটিভাবে তিনভাগে বিভক্ত করিতে পারি : (১) রাজশক্তির ক্ষমতা এবং মন্ত্রীসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থার সহিত জড়িত প্রথাগত বিধান; (২) পার্লামেণ্টের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপের সহিত জড়িত প্রথাগত বিধান; এবং (৩) কমনওয়েল্‌থের সহিত জড়িত বিভিন্ন প্রথাগত বিধান। রাজা অথবা রানী মন্ত্রীসভার সাহায্য এবং উপদেশ অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করেন, শাসনব্যবস্থার পরিচালনার জন্য মন্ত্রীসভা কমন্সসভার নিকট দায়ী থাকে এবং

প্রথাগত বিধানগুলি তিনভাগে বিভক্ত

উক্ত সভা অনাস্থা প্রস্তাব অনুমোদন করিলে পদত্যাগ করে। রাজা অথবা রানী আইন প্রণয়নের জন্য পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিলে সম্মতি দিতে বাধ্য থাকেন,—এই প্রথাগত বিধানগুলি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আবার, লর্ডসভা যখন আপীল আদালত হিসাবে আপীলের বিচার করিবেন তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রথাগত বিধান অনুযায়ী আইন-বিশারদ লর্ডগণ ব্যতীত অন্য লর্ডগণ উপস্থিত থাকিবেন না। তৃতীয় শ্রেণীর প্রথাগত বিধান অনুযায়ী 'কমনওয়েল্‌থ অব নেশন্‌স্‌'-এর অন্তর্ভুক্ত জাতিগুলির সহিত বৃটিশ সরকারের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হয়।

আইন ও প্রথাগত বিধানের মধ্যে পার্থক্য

আইন এবং প্রথাগত বিধানের মধ্যে পার্থক্য আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। আইন হইতেছে মানুষের বাহ্যিক ও সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য এমন কতিপয় নিয়মকানুন যেগুলি আদালত কর্তৃক গৃহীত, স্বীকৃত এবং কার্যকরী করা হয়। এই অর্থে বিধিবদ্ধ আইন (Statutes), রাজশক্তি কর্তৃক বিশেষ অধিকার বলে দেওয়া আদেশসমূহ (Statutory and Prerogative Orders of the Crown) এবং বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত বা ব্যাখ্যাগুলি (Judicial decisions or interpretations) আইন বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রথাগত বিধানগুলি প্রচলিত সামাজিক চিন্তাধারা, পারস্পরিক চুক্তি এবং বুঝাপড়ার ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। এইগুলিকে আইনের সমতুল্য হিসাবে স্বীকার করিয়া লওয়া হইলেও এইগুলি আদালতের বিচার্য বিষয়ের বহির্ভূত।

প্রথাগত বিধান কেন পালন করা হয়

প্রথাগত বিধানগুলি কেন পালন করা হয় এই প্রশ্নের জবাবে ডাইসি নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করিয়াছেন। ডাইসির মতে প্রথাগত বিধান অমান্য করা হইলে পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় আইন লংঘন করা হইবে। সুতরাং আইনভংগজনিত অপসারণের ভয়ে (fear of impeachment) সরকার প্রথাগত বিধানগুলি পালন করেন। কিন্তু এই যুক্তির কতটা সার্থকতা আছে, তাহা ভাবিবার বিষয়। বর্তমানে সরকারকে অপসারণ করার নীতি অকেজো হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু, প্রথাগত বিধানের লংঘন হইলেই যেসব ক্ষেত্রে আইনভংগের অপরাধ হয়, তাহা নহে। লর্ডসভার আপীল বিচারের কাজে যদি আইনজ্ঞ লর্ডগণ ব্যতীত অন্যান্য লর্ডগণ অংশ গ্রহণ করেন, তবে যে আইনভংগ করা হয়, তাহা নহে। জনমতের চাপই প্রথাগত বিধান পরিপূর্ণভাবে কার্যকরী করে। ডাইসি মনে করেন যে, যদি কোনও প্রথাগত বিধান লংঘন করা হয়, তবে সমস্ত শাসনব্যবস্থায় একটি গোলযোগের সৃষ্টি হইবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যদি প্রতি বৎসর একবার পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান করা যায়, তবে সরকারের বাজেট আইন পরিষদ কর্তৃক

অনুমোদিত হইবেনা এবং সমস্ত শাসনব্যবস্থায় গোলযোগের সৃষ্টি হইবে। পার্লামেণ্টের সম্মতি ব্যতীত শাসনবিভাগ কখনই ব্যয়বরাদ্দ করিতে পারে না, কারণ তাহা বে-আইনী হয়। সুতরাং এইক্ষেত্রে প্রথাগত বিধান অনুযায়ী প্রতিবৎসর একবার পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান না করিলে সমস্ত শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গোলযোগের সৃষ্টি হয়। আবার কমন্‌ওয়েলথ্‌ সম্পর্কে যে সকল প্রথাগত বিধান আছে, সেইগুলি যদি পালন করা না হয়, তবে কমন্‌ওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির সহিত সম্পর্কে গোলযোগের সৃষ্টি হইবার আশংকা থাকে। কোন কোন লেখক মনে করেন যে প্রথাগত বিধানগুলি অংশতঃ পালন করা হয় এই কারণে যে লংঘন করিলে এইগুলি আইনে পরিণত হয়।

যেহেতু প্রথাগত বিধানগুলি মানিয়া চলা হয়, সেইজন্যই প্রমাণিত হয় যে এইগুলির উপযোগিতা আছে; প্রথাগত বিধানগুলি থাকায় শাসনতন্ত্র নমনীয় হইয়াছে এবং নির্বাচকমণ্ডলীর পক্ষে শাসক নির্বাচন করা সম্ভবপর হইয়াছে। রাজা প্রয়োজন হইলে পার্লামেণ্ট ভাংগিয়া দিতে পারেন, এই প্রথাগত বিধানটি প্রচলিত থাকায় নির্বাচকমণ্ডলীর পক্ষে বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে নিজেদের মতামত প্রকাশ করিয়া পুনরায় আইনসভার সভ্য নির্বাচন করা সম্ভবপর হইয়াছে। তাহা ছাড়া, প্রথাগত বিধানগুলি থাকায় আইনসভা ও শাসনবিভাগের মধ্যে সুসমঞ্জস এবং সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে এবং বৃটিশ ডোমিনিয়ন ও কমনওয়েল্‌থের সভ্য রাষ্ট্রগুলিও বৃটিশ সরকারের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিতে পারিয়াছে।

সংক্ষিপ্তসার

১। বৃটিশ শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the British Constitution)—আমরা বৃটিশ শাসনতন্ত্রের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই। প্রথমতঃ বৃটেনের শাসনব্যবস্থা এককেন্দ্রিক। দ্বিতীয়তঃ, বৃটেনের শাসনতন্ত্র নমনীয় ও অলিখিত। তৃতীয়তঃ, বৃটেনে রাজা-সমেত-পার্লামেণ্ট হইতেছে সার্বভৌম। চতুর্থতঃ, বৃটেনের শাসনব্যবস্থায় সরকারের ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ করা হয় নাই। পঞ্চমতঃ, ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থার তত্ত্ব ও বাস্তবের মধ্যে সংঘাত দেখা যায়। তত্ত্বের দিক হইতে বিচার করিলে ইংলণ্ডে আমরা রাজতন্ত্র দেখিতে পাই; বাস্তবের দিক হইতে ইংলণ্ডে আমরা পার্লামেন্টারী শাসন দেখিতে পাই। ষষ্ঠতঃ, আইনের অনুশাসন (Rule of Law) বৃটিশ শাসনতন্ত্রের অপর বৈশিষ্ট্য। সর্বশেষে, ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রে আমরা একটি অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা দেখিতে পাই।

২। আইনের অনুশাসন এবং প্রথাগত বিধান—আইনের অনুশাসন নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের সমতুল্য। আইনের অনুশাসন তিনটি নীতির উপর ভিত্তিশীল। প্রথমতঃ আইনের প্রাধান্য সরকারকে স্বীকার করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ আইনের চক্ষে সকলেই সমান। তৃতীয়তঃ জনসাধারণের যে সকল অধিকার আদালত কর্তৃক নির্ধারিত হয়, সেইগুলির উপর ভিত্তি করিয়া ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রথাগত বিধান-গুলিকেও আমরা তিনভাগে ভাগ করিতে পারি ; যথা, রাজশক্তির ক্ষমতা এবং মন্ত্রীসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থার সহিত জড়িত প্রথাগত বিধান ; (২) পার্লামেণ্টের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপের সহিত জড়িত প্রথাগত বিধান ; এবং (৩) কমনওয়েলথের সহিত জড়িত বিভিন্ন প্রথাগত বিধান।

Exercises

1. Discuss the sources of the British Constitution.
(৭—৮ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the salient features of the British constitution.
(৯—১২ পৃষ্ঠা)

3. Give a critical estimate of Dicey's Conception of the Rule of Law. (১২—১৫ পৃষ্ঠা)

4. Discuss the nature and the importance of conventions of the Constitution of England. Discuss Dicey's views on the nature of the sanction behind them. (১৫—১৭ পৃষ্ঠা)

5. Do you support the view that the British Constitution has got no existence ? Give reasons for your answer.

[এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হইবে যে বৃটিশ শাসনতন্ত্র অলিখিত হইলেও ইহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। মহাসনদ, বিভিন্ন চুক্তি, অধিকারের বিল, বিভিন্ন আইন, সাধারণ আইন (Common Law) এবং প্রথাগত বিধানকে কেন্দ্র করিয়া বৃটিশ শাসনতন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। বৃটিশ শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন উৎসগুলি অবলম্বন করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর লিখ।]

তৃতীয় অধ্যায়

রাজা, মন্ত্রীসভা ও প্রধানমন্ত্রী (The King, the Cabinet and the Prime Minister)

ইংলণ্ডে শাসনবিভাগ অথবা Executive বলিতে বুঝায় রাজা, মন্ত্রীসভা এবং সরকারী কর্মচারীবৃন্দ।

ইংলণ্ডের রাজনীতিক্ষেত্রে রাজা সর্বদাই একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। তবে বর্তমানে পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা উন্নত হইয়া যাইবার দরুণ প্রকৃত শাসনভার মন্ত্রীসভার হাতে চলিয়া আসিয়াছে এবং ইহাতে রাজার ক্ষমতা অনেক কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু, ইহাতে রাজশক্তির জনপ্রিয়তা মোটেই কমে নাই। বর্তমানে রাজা যে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে যোগদান করেন না এবং তিনি যে নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা হিসাবে দেশের শাসনব্যবস্থার ভারসাম্য রক্ষা করেন, সেইজন্যই তিনি জনপ্রিয় হইয়াছেন।

রাজা এবং রাজশক্তির মর্যাদা (Position of the King and the Crown):

রাজা এবং রাজশক্তির অর্থ এক নহে। রাজা ব্যক্তিগতভাবে রাজমর্যাদা ভোগ করেন; কিন্তু রাজশক্তি হইতেছে একটি বিশেষ সংস্থা, ইহা হইতেছে একটি আইনানুগ ধারণা "(a legal idea)"—দেশের শাসনকাজের সুবিধার জন্য ইহা হইতেছে এক কার্যকরী পরিকল্পনা ("a convenient working hypothesis")। রাজশক্তিকে একটি বিশেষ সংস্থা হিসাবে মনে করা হয় বলিয়াই "রাজার মৃত্যু নাই" ("The King never dies") অথবা "রাজা কোন অন্যায় করিতে পারেন না" ("The King can do no wrong")—এই কথাগুলি প্রচলিত হইয়াছে। রাজপদে অধিষ্ঠিত কোনও ব্যক্তির মৃত্যু হইতে পারে, কিন্তু, ইহাতে রাজশক্তির অবসান হয় না। রাজশক্তির মর্যাদা সর্বাগ্রে রক্ষিত হয় এবং ইহা কতিপয় সাধারণ নিয়ম এবং প্রথাগত বিধানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় যদি রাজা এমন কোনও কাজ করেন যাহাতে প্রথাগত বিধান লংঘন করা হয়, তখন সর্বাগ্রে রাজশক্তির মর্যাদা রক্ষার চেষ্টা করা হয়। এজন্যই অষ্টম এডওয়ার্ড (Edward VIII) স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করিয়া রাজশক্তির মর্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। রাজা বা রানী মারা যাইতে পারেন, কিন্তু সেজন্য রাজশক্তির হাতে যে সকল ক্ষমতা ন্যস্ত করা আছে, সেগুলি নষ্ট হয় না। ইহাই "রাজার মৃত্যু নাই" উক্তিটির তাৎপর্য। ১৯১০ সালের "রাজমৃত্যু আইন" (The

"রাজার মৃত্যু নাই"

Demise of the Crown Act, 1910) অনুসারে কোন রাজার মৃত্যুর পর রাজকর্মচারীদের চাকুরির কোন পরিবর্তন হয় না এবং নূতন করিয়া কোন পদে নূতন লোক নিয়োগের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং ইহাতে রাজশক্তির কাজ অব্যাহত থাকে।

মন্ত্রীসভার দায়িত্বের ফলে রাজা দোষমুক্ত ("The King can do no wrong" because of ministerial responsibility)। ইংলণ্ডের

রাজা দোষমুক্ত

শাসনতন্ত্রে "রাজা দোষমুক্ত" এই তত্ত্বটি হইতে "রাজা অন্যায় ত' করিতেই পারেন না, এমন কি অন্যায়ের চিন্তাও করিতে পারেন না", "অশোভন কাজ রাজার পক্ষে করা অসম্ভব"—এই সব উক্তির সৃষ্টি হইয়াছে। রাজা তৃতীয় হেনরীর সময় তিনি নাবালক থাকাকালীন সময়ে এই তত্ত্বটি বিশেষ প্রসার লাভ করে। ইংলণ্ডে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা (Responsible government) থাকায় রাজকার্য সম্পাদিত হয় মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুযায়ী। কেননা, সরকারের সমুদয় কাজের জন্য মন্ত্রীসভাকে আইনসভার নিকট দায়ী থাকিতে হয়, সুতরাং সরকারের দিক হইতে কোন অন্যায় অনুষ্ঠিত হইলে ইহার পূর্ণ দায়িত্ব হইতেছে মন্ত্রীদের এবং প্রয়োজন হইলে মন্ত্রীদের আদালতে অভিযুক্ত করা যায়। ১৯৪৬ সালের "The Crown Proceedings Act" অনুযায়ী সরকারের দিক হইতে কোন বে-আইনী কাজ অনুষ্ঠিত হইলে রাজশক্তির অংগ হিসাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে অভিযুক্ত করা হয়। রাজা তাঁহার নিয়োগকারী হিসাবে অভিযুক্ত হইবেন না। কারণ রাজশক্তি কখনও অন্যায় করিতে পারে না অথবা অন্যায়ের চিন্তা করিতে পারে না। ইংলণ্ডে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় যখনই রাজার নামে কোন আদেশ জারী করা হয়, তখনই সেই আদেশপত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর স্বাক্ষর থাকে। সেই আদেশপত্রের যাহা কিছু ফলাফল, তাহার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী এবং মন্ত্রীসভা যৌথভাবে দায়ী, রাজা নহে।

ডক্টর ফাইনার (Dr. Finer) বলেন, "When we talk of actions of the Crown in politics, we mean that the people, Parliament and the cabinet have supplied the motive power through the formal arrangements established by centuries of constitutinal development. The crown is the ornamental cap over all these effective centres of political energy." বৃটেনের শাসনব্যবস্থায় নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বিশেষ সফল হইয়াছে।

কিন্তু বর্তমানে কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্রে The Crown Proceedings Act of 1947, অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানগত রাজার (institutional monarch) বিপক্ষে দেওয়ানী আদালতে অভিযোগ করা যায়। হাইকোর্ট এবং কাউন্টি কোর্টে

অন্যায়কারী কোনও রাজকর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইলে সেই কর্মচারী কর্তৃক অনুষ্ঠিত অন্যায়ের (tort) জন্য প্রতিষ্ঠানগত রাজাকে (institutional monarch) দায়ী করা যায়, ব্যক্তিগতভাবে রাজার অথবা রানীর সেইজন্য কোন দায়িত্ব নাই।

রাজার ক্ষমতা (Powers of the Crown)—রানী অথবা রাজা এমনিতে রাষ্ট্রের প্রধান। কিন্তু, বিশেষ অধিকারবলে তিনি কতিপয় বিশেষ ক্ষমতা ভোগ করেন। যেমন, রাজা বা রানী পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করিতে, স্থগিত রাখিতে এবং ভাংগিয়া দিতে পারেন। তিনি মন্ত্রী এবং বিচারকদের নিয়োগ করেন। যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তি স্থাপন করা, নৌবাহিনী রক্ষা করা, অপরাধীর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করা—ইত্যাদি ক্ষমতাও রাজাকে দেওয়া হইয়াছে। রাজার ক্ষমতার দুইটি উৎস আছে। একটি হইতেছে রাজার বিশেষ অধিকার (Royal Prerogatives) এবং অপরটি হইতেছে পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত আইন (Parliamentary Statutes)। ডাইসির মতে রাজার বিশেষ অধিকারগুলি হইতেছে রাজার হস্তে ন্যস্ত ইচ্ছামূলক ক্ষমতাগুলির অবশিষ্টাংশ ("The residue of discretionary powers is left at any moment in the hands of the crown")।

রাজার বিশেষ ক্ষমতা

রাজার বিশেষ ক্ষমতা (Royal Prerogatives) অনুযায়ী রাজা ন্যায় বিচারের উৎস (fountain of justice)। রাজা পার্লামেন্ট আহ্বান করা, ইহার অধিবেশন বজায় রাখা অথবা ইহার অধিবেশন ভাংগিয়া দেওয়ার ক্ষমতার অধিকারী! রাজা দেশের সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। রাজা সমুদয় সম্মানের উৎস (Sole fountain of honour). রাজা কখনও শিশু নহেন (The king is never an infant); আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে রাজা জনগণের প্রতিভূ; রাজা বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতগণকে গ্রহণ করেন এবং কেহ যদি ন্যায় বিচার এড়াইবার জন্য রাজ্য ছাড়িতে চায়, রাজা তাহাকে বাধা দিতে পারেন। রাজা এই সমুদয় বিশেষ ক্ষমতা বর্তমানে মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

রাজার শাসনবিভাগীয় ক্ষমতাগুলি (executive and administrative powers) পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন, রাজা মন্ত্রীদের এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগ করেন। তিনি সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর প্রধান, এবং তিনি প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তি স্থাপন করিতে পারেন। পররাষ্ট্র সম্পর্কিত নীতি এবং পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত ব্যয়-বরাদ্দের ব্যবহার তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। যদি রাজ্যের কোন অংশ হাতছাড়া করিবার প্রশ্ন অথবা

শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা

জনসাধারণের উপর কর স্থাপনের কোন প্রশ্ন জড়িত না থাকে, তবে রাজা ইচ্ছা করিলে পার্লামেন্টের সম্মতি না লইয়াই যে কোন প্রকার চুক্তি সম্পাদন করিতে পারেন।

রাজার আইনবিভাগীয় ক্ষমতা (legislative powers) অনুযায়ী তিনি আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করা, স্থগিত রাখা এবং ভাংগিয়া দেওয়া সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন। পার্লামেন্টের নূতন অধিবেশনে রাজা অভিভাষণ প্রদান করিতে পারেন। রাজা পার্লামেন্টের অংশ বলিয়া পরিগণিত হন এবং রাজা-সমেত পার্লামেন্টই (King-in-Parliament) ইংলণ্ডের আইনগত সার্বভৌম (legal sovereign)। অবশ্য রাজা যে অভিভাষণ প্রদান করেন, তাহা প্রণয়ন করেন প্রধানমন্ত্রী। কেননা, সেই অভিভাষণেই সরকারের নীতি ঘোষণা করা হয় এবং ঘোষিত নীতিটির জন্য পার্লামেন্টের নিকট মন্ত্রীসভার পূর্ণদায়িত্ব থাকে। কোন কোন উপনিবেশ সম্পর্কে রাজা বিশেষ অধিকার বলে "স-পরিষদ রাজাজ্ঞা" (Orders-in-council) অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা ভোগ করেন। ১৭০৭ সালের পর হইতে আইনসভা কর্তৃক যে কোন বিলে সম্মতি প্রদান করিতে রাজা কখনও অস্বীকার করেন নাই। পার্লামেন্ট যখন শাসনতন্ত্র সংশোধন করিবার জন্য কোন বিল অনুমোদন করিবে রাজা তখনই মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী সেই বিলে সম্মতি প্রদান করিবেন। পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করা, বজায় রাখা অথবা ভাংগিয়া দেওয়ার ব্যাপারেও রাজা সর্বদা মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন।

আইন বিভাগীয় ক্ষমতা

রাজার বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা (Judicial powers) অনুযায়ী রাজা বিচারকদের নিয়োগ করেন এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীর শাস্তি মকুব করিতে পারেন। তত্ত্বের দিক হইতে রাজা বা রাণী হইতেছেন "ন্যায় বিচারের উৎস" ("fountain of Justice")। সমস্ত ফৌজদারী মামলা রাজশক্তির নামে আনীত হয়। প্রিভি কাউন্সিলের বিচারবিভাগীয় কমিটির (The Judicial Committee of the Privy Council") পরামর্শ অনুযায়ী রাজা ডোমিনিয়ন এবং উপনিবেশগুলি সম্পর্কে আপীল বিচার করিয়া থাকেন।

বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা

রাজার অন্যান্য ক্ষমতাগুলি (Miscellaneous powers) হইতেছে, তিনি ইংলণ্ডের খ্রীষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠানের প্রধান (Head of the Established Church of England) এবং সেই অধিকারে তিনি আর্চবিশপ, বিশপ এবং অন্যান্য ধর্মযাজকদের নিয়োগ করেন।

রাজার যে সব ক্ষমতা আমরা আলোচনা করিলাম, সেইগুলি সবই আইনানুমোদিত ক্ষমতা। কার্যক্ষেত্রে রাজা নিজে কিছুই করেন না।

রাজশক্তির পক্ষে সব ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী হইতেছে মন্ত্রীসভা। কেননা, মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুযায়ী রাজা সব কাজ করেন। সেইজন্ত রাজাকে "আড়ম্বরপূর্ণ অপদার্থ" (magnificent cipher) বলা হয়। রাজার এত ক্ষমতা থাকা সত্বেও শাসনকার্যে তিনি কখনও ব্যক্তিগত মতামতের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন না। রাজাকে যদিও আড়ম্বরপূর্ণ অপদার্থ" শাসক বলা হয়, তবুও কার্যক্ষেত্রে তাহাকে ঠিক "আড়ম্বরপূর্ণ অপদার্থ" শাসক বলা যায় না। যখন পার্লামেণ্টে দলীয় নেতা নির্দিষ্ট থাকেন না অথবা কোন প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেন অথবা তাঁহার মৃত্যু ঘটে, তখন দেশের শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন কাজে রাজা দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন। ১৯৩১ সালে রাজা পঞ্চম জর্জ ম্যাক্‌ডোনাল্ডের নেতৃত্বে জাতীয় সরকার গঠনে বিশেষ ভূমিকা অবলম্বন করিয়াছিলেন। বেজহটের (Bagehot) মতে রাজার তিনটি বিশেষ অধিকার আছে। যথা, পরামর্শদানের অধিকার (the right to be consulted), উৎসাহ প্রদান করিবার অধিকার (the right to encourage) এবং সতর্ক করিয়া দিবার অধিকার (the right to warn)। রাজা (অথবা রাণী) শাসন-সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যাপারে সব খোঁজখবর রাখিয়া প্রয়োজন হইলে মন্ত্রীদের পরামর্শ প্রদান করিতে পারেন অথবা সতর্ক করিয়া দিতে পারেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া এবং সম্রাট সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড এই দুইটি অধিকার সর্বদাই প্রয়োগ করিতেন। অনেক কাল ধরিয়া রাজত্ব করিলে দেশের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে রাজা (অথবা রাণীর) যে অভিজ্ঞতা হয় তাহা একেবারে উপেক্ষণীয় নহে। সুতরাং রাজা অথবা রাণী কর্তৃক প্রদত্ত পরামর্শ অথবা উপদেশের যথেষ্ট মূল্য আছে। রাজার পদমর্যাদাই রাজাকে ক্ষমতা দান করে এবং সেই ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করা অনেকাংশে রাজার ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে। সুতরাং রাজাকে আমরা "আড়ম্বরপূর্ণ অপদার্থ" বলিতে পারি না। তিনি যদি তাহাই হইতেন, তবে রাজতন্ত্র ইংলণ্ডে এতদিন টিকিয়া থাকিত না। রাজশক্তির যেমন বিপুল পদমর্যাদা আছে, অপরদিকে ইহার প্রয়োজনীয়তাও আছে। রাজশক্তি কমনওয়েল্‌থ দেশগুলির মধ্যে যোগসূত্র বজায় রাখে। যদি ইংলণ্ডে রাজতন্ত্র না থাকিয়া প্রজাতন্ত্র থাকিত, তবুও ইংলণ্ডে একজন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করিতে হইত। প্রজাতন্ত্রে রাষ্ট্রপতির যে ভূমিকা থাকে, ইংলণ্ডের রাজতন্ত্রেও রাজার সেই ভূমিকা আমরা দেখিতে পাই। সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখিবার জন্য এবং অলিখিত শাসনতন্ত্র অনুযায়ী দেশের শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হইবার জন্ত যে প্রথাগত বিধান আমরা ইংলণ্ডে দেখিতে পাই, সেইগুলি রাজশক্তিকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। ইংরাজদের জাতীয় চরিত্র রাজতন্ত্র কর্তৃক বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছে;

রাজা সর্বদা আড়ম্বরপূর্ণ অপদার্থ নহেন

কেননা, রাজশক্তি ইংলণ্ডের জনগণের কাছে দেশাত্মবোধের প্রতীক। সুতরাং ইংলণ্ডে রাজশক্তির বিশেষ মূল্য আছে।

ইংলণ্ডে রাজতন্ত্র টিকিয়া থাকিবার কারণ (**Reasons for the survival of kingship in England**)—ইংলণ্ডে রাজশক্তির গুরুত্ব আলোচনা করিয়া আমরা দেখিয়াছি যে রাজা শুধু একজন "আড়ম্বরপূর্ণ অপদার্থ" শাসক নহেন। যেসব কারণে ইংলণ্ডে রাজশক্তির বিশেষ গুরুত্ব আছে; সেইগুলির জন্য রাজতন্ত্র ইংলণ্ডে এখনও টিকিয়া আছে। রাজতন্ত্র টিকিয়া থাকিবার কারণগুলি আলোচনা করিলেই প্রথমেই যে কারণটি মনে পড়ে তাহা হইতেছে এই যে ইংরাজ জাতি খুবই রক্ষণশীল। যে রাজশক্তিকে ইংরাজ জাতি এতকাল ধরিয়া বিপুল সম্মান প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছে, সেই রাজশক্তিকে ইংরাজগণ উচ্ছেদ করিতে চাহে না। বিশেষতঃ, রাজা বা রাণী ইংরাজদের কাছে দেশাত্মবোধের প্রতীক।

দ্বিতীয়তঃ, ইংলণ্ডে যে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত তাহা নিয়মতান্ত্রিক (constitutional) এবং তাহা গণতন্ত্রের পথে কোনপ্রকার বাধার সৃষ্টি করে নাই। কেননা, রাজা শুধু রাজত্বই করেন, শাসন করেন না ("The king reigns, but does not govern".—Sir Henry Maine)। রাজশক্তির পক্ষে মন্ত্রীগণই সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের জন্য আইনসভার কাছে দায়ী থাকেন।

তৃতীয়তঃ, পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা বা মন্ত্রীসভা-চালিত শাসনব্যবস্থায় একজন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধানের (Constitutional Head) প্রয়োজন খুব বেশী। যদি রাজতন্ত্রের অবসান করিতে হয়, তবুও রাজা বা রাণীর পরিবর্তে ইংলণ্ডের জনগণকে একজন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত করিতে হইবে। কিন্তু, ইহাতে ইংলণ্ডের পক্ষে যে খুব সুবিধা হইবে, তাহা নহে। কারণ, ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র অলিখিত। কতিপয় সাধারণ আইন বা প্রথাগত বিধানের ভিত্তির উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত। এই সাধারণ আইন বা প্রথাগত বিধানগুলি রাজশক্তিকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। যদি রাজশক্তির অবসান করা হয় তবে এই প্রথাগত বিধানগুলি কার্যকরী হইবার পথে বাধার সৃষ্টি হইবে এবং দেশে শাসনতান্ত্রিক গোলযোগের সৃষ্টি হইবে। রাজা বা রানী হইতেছেন জাতীয় ঐক্য ও সংহতির প্রতীক। জাতীয় স্বার্থে ইহার অবসান হওয়া উচিত নহে।

চতুর্থতঃ, পরামর্শদাতা, উপদেষ্টা, উৎসাহপ্রদানকারী এবং সতর্ককারী হিসাবে রাজার ভূমিকা খুবই মূল্যবান। তাহা ছাড়া, রাজার দুইটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে;—প্রথমতঃ, সাধারণ নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করা অথবা দলীয় নেতার পদত্যাগ বা মৃত্যুজনিত শূন্যতা সৃষ্টি হইলে নূতন নেতা

নির্বাচন করা, এবং দ্বিতীয়তঃ, প্রয়োজন হইলে পার্লামেন্ট ভাংগিয়া দিয়া পুনরায় সাধারণ নির্বাচনের অনুষ্ঠান করা।

পঞ্চমতঃ, কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে এবং সমগ্র সাম্রাজ্যের সংহতি ও যোগসূত্র স্থাপনের রাজা অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আর কোন রাষ্ট্রপ্রধান নাই। ইংলণ্ডে যদি রাজতন্ত্রের অবসান হয়, তবে কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির সংগে ইংলণ্ডের যোগসূত্র এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে সংহতি নষ্ট হইয়া যাইবে।

মন্ত্রীসভা এবং ক্যাবিনেটের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between the Cabinet and the Ministry)—মন্ত্রীসভা গঠিত হয় প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক। হাউস্ অফ্ কমন্সে যে রাজনৈতিকদল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই দলের নেতাকে রাজা বা রাণী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করেন এবং মন্ত্রীসভা গঠনের আহ্বান করেন। মন্ত্রীদের মনোনয়ন করেন প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাজা বা রাণী তাঁহাদের আইনতঃ নিযুক্ত করেন। মন্ত্রীসভা গঠিত হয় সমস্ত মন্ত্রীদের লইয়া। মন্ত্রীগণ রাজকর্মচারী সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহাদের পদটি রাষ্ট্রনৈতিক। মন্ত্রীগণ গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন এবং এক বা একাধিক দপ্তরের ভার গ্রহণ করেন। মন্ত্রী-সভার মধ্যে নিম্নতর পদে অধিষ্ঠিত মন্ত্রী (Junior ministers), উপমন্ত্রী (Deputy ministers) এবং দপ্তরবিহীন মন্ত্রীও (Ministers without portfolio) থাকেন। তাঁহারা, এটর্নী জেনারেল, সলিসিটর জেনারেল পার্লামেন্টের কর্মসচিব এবং সহকারী কর্মসচিববৃন্দ (Parliamentary Secretaries and Under-Secretaries), কম্পট্রোলার, ভাইস চেম্বারলেন (Vice chamberlain), প্রভৃতিও মন্ত্রীসভার সদস্য। স্বাভাবিক অবস্থায় মন্ত্রীসভার জনসংখ্যা হয় ৬০।৭০ জন। ক্যাবিনেট হইতেছে মন্ত্রীদের মধ্য হইতেই গঠিত বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ক্ষুদ্রতর পরিষদ এবং ইহার মনোনয়ন-কর্তাও প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। মন্ত্রীদের মধ্যে যাহারা প্রধানমন্ত্রীর মনোনয়ন অনুযায়ী দেশের শাসনকাজে রাজা বা রাণীকে পরামর্শ প্রদান করিবার জন্য আহুত হন, তাঁহারাই ক্যাবিনেটের সদস্য বলিয়া পরিগণিত হন। সাধারণতঃ ক্যাবিনেটের সদস্যগণ প্রত্যেকেই সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলির ভার গ্রহণ করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ক্যাবিনেটের সদস্যগণ মন্ত্রীসভার সদস্য; কিন্তু মন্ত্রীসভার সদস্যগণ সকলেই ক্যাবিনেটের সদস্য নহেন। তবে ক্যাবিনেটের সদস্য নহেন, এই রকম মন্ত্রীরাও নিজের দপ্তরের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে আলোচনার সময় ক্যাবিনেটের সভায় উপস্থিত থাকিতে পারেন। ইংলণ্ডে প্রথাগত বিধান অনুযায়ী ক্যাবিনেটের সদস্যগণ

ক্যাবিনেট হইতেছে মন্ত্রীসভার মধ্যেই একটি বিশেষ ক্ষমতাশালী ক্ষুদ্রতর পরিষদ

প্রিভি কাউন্সিলের (Privy council) সদস্য হন। প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে ক্যাবিনেটের সদস্যগণ মন্ত্রীসভার বিভিন্ন কর্মসূচী সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় গোপনীয়তা বজায় রাখেন। ক্যাবিনেটের সদস্যগণ যৌথভাবে সরকারের নীতি নির্ধারণ করিয়া থাকেন। সাধারণ মন্ত্রীগণ পৃথকভাবে নিজ নিজ দপ্তরের কাজগুলি সম্পাদন করেন। শাসনবিভাগের বিভিন্ন কাজের জন্য শুধু ক্যাবিনেটের সদস্যগণেরই যৌথ দায়িত্ব আছে অন্যান্য মন্ত্রীগণের যৌথ দায়িত্ব নাই।

• ক্যাবিনেটের বিভিন্ন কাজ (Functions of the Cabinet):

বেজ্‌হটের (Bagehot) মতে ক্যাবিনেট হইতেছে শাসনবিভাগ এবং আইন-প্রণয়ন বিভাগের মধ্যে সংযোজক চিহ্ন। ("The cabinet is the hyphen that joins, and the buckle that fastens the Executive and the Legislative Dpartments together."—Bagehot)। গ্রেটবৃটেন শাসনবিভাগের প্রধান পরিচালক হইল ক্যাবিনেট। শুধু তাহাই নহে,—বৃটিশ উপনিবেশগুলি এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য দেশগুলির শাসনবিভাগের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপও বৃটিশ ক্যাবিনেট কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। পার্লামেন্টের নিকট সরকারের যে শাসননীতি পেশ করা হয়, তাহা চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করিবার দায়িত্ব ক্যাবিনেটের। তাহাছাড়া পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত শাসননীতি অনুযায়ী দেশের শাসনব্যবস্থা চালাইবার দায়িত্বও ক্যাবিনেটের। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কাজগুলির নীতি নির্ধারণ করা এবং সেইগুলির মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য ও সংহতি আনয়ন করিবার দায়িত্বও ক্যাবিনেটের উপরেই ন্যস্ত। আইনসভার অধিবেশন কখন ডাকা হইবে এবং ইহা কতদিন স্থায়ী হইবে, অথবা আইনসভার অধিবেশনের কার্যসূচী কি হইবে এবং কোন্ কোন্ বিল আইনে পরিণত হইবে, সবই ক্যাবিনেট স্থির করে। পার্লামেন্টের নিজের দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় ক্যাবিনেটের সদস্যগণের পক্ষে পার্লামেন্টের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত করা ক্যাবিনেটের পক্ষে মোটেই কঠিন নহে। ক্যাবিনেটের সদস্যগণ দেশের শাসনবিভাগের বিভিন্ন কাজ-কর্মের ব্যাপারে রাজা বা রাণীকে পরামর্শ প্রদান করিয়া থাকেন। অর্থসম্বন্ধীয় যে বিলগুলি (Money bills) পার্লামেণ্ট অনুমোদন করিবার পর সরকার টাকা খরচ করিতে পারে, সেই বিলগুলিও ক্যাবিনেটের সদস্যগণই রচনা করিয়া থাকেন। বাজেট অথবা যে কোন প্রকার সরকারী বিল পার্লামেণ্টকে দিয়া অনুমোদিত করাইয়া লইতে হয়।

রাজশক্তির সহিত ক্যাবিনেটের সম্পর্ক (The Cabinet in relation to the Crown)—রাজা হইতেছেন দেশের নামেমাত্র প্রধান।

শাসনবিভাগের প্রকৃত পরিচালক (real executive) হইতেছে মন্ত্রীসভা। মন্ত্রীসভা আইনতঃ রাজা কর্তৃক নিযুক্ত হয়। তবে রাজা প্রথমতঃ আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে অন্যান্য মন্ত্রীদের নিযুক্ত করেন। রাজা শাসনবিভাগের কোনও কাজের জন্য দায়ী থাকেন না এবং রাজার নামে যে সমস্ত কাজ-কর্ম সম্পাদিত হয়, সেইগুলির পূর্ণ দায়িত্ব হইতেছে ক্যাবিনেটের এবং রাজাও ক্যাবিনেটের সদস্যদের পরামর্শ অনুযায়ী সমুদয় কাজ-কর্ম করেন।

ক্যাবিনেটের প্রধান বৈশিষ্ট্য—(Salient features of the Cabinet)—বৃটিশ ক্যাবিনেটের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ :—প্রথমতঃ, ক্যাবিনেটের সদস্যগণ সাধারণতঃ একই রাজনৈতিক দলের সদস্য থাকেন। ইহাতে তাহাদের একই রাষ্ট্রনৈতিক পরিচয় (Political homogeneity) থাকে। তবে জাতীয় সংকটের (national emergencies) সময় কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা (Coalition Cabinet) গঠিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, আইনসভা এবং শাসনবিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকায় ক্যাবিনেটের সদস্যগণকে পার্লামেন্টের সদস্য হইতে হয়। যদি ক্যাবিনেটের সদস্য হইবার সময় কেহ পার্লামেন্টের সদস্য না থাকেন, তবে তাঁহাকে ক্যাবিনেটের সদস্য হইবার ছয়মাসের মধ্যে পার্লামেন্টের সদস্য হইতে হয়। পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং দলীয় সদস্যগণের মধ্য হইতে ক্যাবিনেট গঠন করেন। তৃতীয়তঃ ইংলণ্ডে মন্ত্রীসভাকে পার্লামেন্টের নিকট দায়ী থাকিতে হয়। এই দায়িত্ব দুইপ্রকার ; যথা,—আইনগত এবং রাষ্ট্রনৈতিক। আইনগতভাবে প্রত্যেক মন্ত্রীই রাজাকে যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহার জন্য দায়ী থাকেন। সেইজন্যই বলা হয়, "রাজা কোন অন্যায় করিতে পারেন না ("The king can do no wrong.")। রাজনৈতিক দায়িত্ব বলিতে বুঝায় মন্ত্রীগণ ব্যক্তিগতভাবে এবং যৌথভাবে পার্লামেন্টের নিকট দায়ী। ইহাকেই মন্ত্রীসভার দায়িত্ব বা "Ministerial Responsibility" বলা হয়। যদি কমন্সসভার সদস্যগণ মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তবে মন্ত্রীসভার সদস্যগণকে পদত্যাগ করিতে হয়। চতুর্থতঃ, ক্যাবিনেটের আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার সংহতি। ক্যাবিনেটের পতন হইলে ইহা কোনও মন্ত্রীর জন্য হয় না, —সামগ্রিকভাবেই ক্যাবিনেট ইহার নীতি ও ক্রিয়াকলাপের জন্য আইনসভার কাছে দায়ী থাকে। শুধু তাহাই নহে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পূর্ণ ঐক্য এবং সংহতি বজায় রাখিবার দায়িত্ব হইতেছে ক্যাবিনেটের। পঞ্চমতঃ, ক্যাবিনেটকে সর্বদাই প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের অধীন থাকিতে হয়। ক্যাবিনেটের গঠন হইতে আরম্ভ করিয়া ইহার পতন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীই ক্যাবিনেটকে পরিচালনা করেন।

তাহা ছাড়া, প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেটের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিয়া ক্যাবিনেটের সদস্যগণের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখেন। লর্ড মর্লি (Lord Morley) বলিয়াছেন, "Although in Cabinet, all its members stand on the equal footing, speak with equal voice and on the rare occasions when a division is taken are counted on the fraternal principle of one man, one vote, yet the head of the Cabinet is Prime Minister who occupies a position which so long as it lasts, is one of exceptional and peculiar authority." ষষ্ঠতঃ, ক্যাবিনেটের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল ইহার বিভিন্ন অধিবেশনের গোপনীয়তা। দেশের আইন এবং প্রথাগত বিধান অনুযায়ী ক্যাবিনেটের বিভিন্ন অধিবেশনের গোপনীয়তা রক্ষিত হয়।

১৯২০ সালের Official Secrets Act অনুযায়ী ক্যাবিনেটের অধিবেশনের বিভিন্ন ব্যাপার প্রকাশ করা নিষিদ্ধ করিয়াছে। ১৯৩৪ সালে ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী জর্জ ল্যান্সবারির পুত্র এডগার ল্যান্সবারি তাঁহার জীবনীতে ক্যাবিনেটের অধিবেশনের একটি memorandum প্রকাশ করায় তাঁহার জরিমানা হয়। ১৯২২ সালে ভারতের শাসনসংক্রান্ত কতিপয় ব্যাপার ফাঁস হইয়া যাইবার দরুণ ভারতসচিবকে পদত্যাগ করিতে হয়।

মন্ত্রীদের দায়িত্ব এবং তাহা কার্যকরী করিবার উপায় (Ministerial Responsiblity and modes of enforcing it)—

পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে সরকারের দায়িত্বশীলতা। আইনসভায় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে মন্ত্রীসভার সদস্যগণকে পৃথক এবং যৌথভাবে দায়ী থাকিতে হয়। ইংলণ্ডে ক্যাবিনেটের সদস্যগণ সম্মিলিতভাবে সরকারের নীতির জন্য এবং নিজেদের কাজের জন্য আইনসভার কাছে দায়ী থাকেন। আবার, যৌথ দায়িত্ব ছাড়াও প্রত্যেক মন্ত্রীকেই নিজ নিজ দপ্তরের জন্য পৃথকভাবে আইনসভার কাছে দায়ী থাকিতে হয় এবং আইন সভার সদস্যগণের নিকট জবাবদিহি করিতে হয়। ইংলণ্ডে যে সকল মন্ত্রী লর্ডসভার সদস্য, তাঁহাদের পক্ষ হইতে আইনসভার কথা বলিবার জন্য পার্লামেন্টারী কর্মসচিব (Parliamentary Secretary) অথবা অধস্তন কর্মসচিব (Under-Secretaries) থাকেন। এই রাষ্ট্রনৈতিক দায়িত্ব ছাড়াও মন্ত্রী-দায়িত্বের (Ministerial Responsibility) আর একটি দিক আছে। রাজকর্মচারী হিসাবে মন্ত্রীগণ নিজেদের ক্রিয়াকলাপের জন্য ব্যক্তিগতভাবে আদালতের কাছে দায়ী থাকেন। ইহা হইতেছে তাঁহাদের আইনগত দায়িত্ব (legal responsibility)।

মন্ত্রীসভার সহিত পার্লামেণ্টের, বিশেষতঃ কমন্সসভার, সম্পর্ক বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে পূর্বে কমন্সসভাই মন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণ করিত ; কিন্তু মন্ত্রীসভা ক্রমেই পার্লামেণ্টের ক্ষমতা খর্ব করিয়া ইহার উপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। মন্ত্রীগণকে পার্লামেণ্টের সদস্য হইতে হয় এবং যদি কোনও মন্ত্রী নিজপদে অধিষ্ঠিত হইবার সময় পার্লামেণ্টের সদস্য না থাকেন, তবে মন্ত্রীত্ব পাইবার ছয়মাসের মধ্যেই তাঁহাকে আইনসভা বা পার্লামেণ্টের সদস্য হইতে হয়। আবার মন্ত্রীসভার অস্তিত্ব নির্ভর করে যতক্ষণ পর্যন্ত ইহা কমন্সসভার আস্থাভাজন থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত। যদি কোন মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত আইনের খসড়া পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত না হয় অথবা অর্থমন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত বাজেট অথবা অন্য যে কোন প্রকার অর্থসংক্রান্ত বিল যদি পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত না হয় তবে মন্ত্রীসভা একযোগে পদত্যাগ করিবে। যদি মন্ত্রীদের বেতন পার্লামেণ্ট কমাইয়া দেয় অথবা মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক কোনও প্রস্তাব গৃহীত হয়, তখনও মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করে। আবার, যদি কোনও বেসরকারী সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত কোনও আইনের খসড়া মন্ত্রীসভার আপত্তিতে পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত হয়, তবে ইহা মন্ত্রীসভার উপর আইনসভার অনাস্থা সূচিত করে এবং তখন মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করে। তাহা ছাড়া, সরকারী বিভিন্ন বিভাগের ক্রিয়াকলাপের জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে পার্লামেণ্টের সদস্যগণ মন্ত্রীদের যা কিছু প্রশ্ন করেন, মন্ত্রীগণ সেইগুলির জবাব দিতে বাধ্য থাকেন। সুতরাং, তত্ত্বের দিক হইতে বিচার করিলে কমন্সসভাই ক্যাবিনেটকে নিয়ন্ত্রিত করে, এমনকি কতদিন ইহার অস্তিত্ব থাকিবে ইহাও কমন্সসভার উপর নির্ভর করে। কিন্তু, কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যতদিন কমন্সসভা মন্ত্রীসভার নির্দেশ অথবা ইচ্ছানুযায়ী নিজেদের ক্রিয়াকলাপ সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, ততদিন ইহা নিজে টিকিয়া থাকিতে পারে। এজন্যই অধ্যাপক লাস্কি (Prof. Laski) বলিয়াছেন, "The House of Commons gives the Cabinet life; but normally, it can itself live only so long as it is prepared to go on giving life to the cabinet."

মন্ত্রীসভা ও পার্লামেণ্টের মধ্যে সম্পর্ক

বর্তমানে মন্ত্রীসভাই কার্যতঃ কমন্সসভাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। কমন্সসভায় বেসরকারী সদস্যদের প্রতিপত্তি বর্তমানে খুবই কম। সরকার পক্ষ নিজের দলের সংখ্যাধিক্যের জোরে যে কোন আইনের খসড়া অথবা শাসনতন্ত্রের সংশোধনী প্রস্তাব পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত করাইতে পারে। কখন হাউস অফ্ কমন্সের অধিবেশন আহ্বান করা হইবে অথবা অধিবেশন কতদিন স্থায়ী হইবে এবং অধিবেশন চলাকালীন আইনসভায় কর্মসূচী

কি হইবে, তাহাও মন্ত্রীসভাই স্থির করেন। এমনকি প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছা করিলে রাজাকে (অথবা রাণীকে) পার্লামেন্ট ভাংগিয়া দিবার পরামর্শও দিতে পারেন। সাধারণতঃ পার্লামেন্টের সদস্যগণও সক্রিয়ভাবে ক্যাবিনেটের বিরোধী হইতে সর্বদা সাহসী হন না। কারণ, প্রথমতঃ রাজনৈতিক দলব্যবস্থা ইংলণ্ডে খুবই অনমনীয় থাকায় সরকারপক্ষীয় দলের সদস্যগণ সর্বদাই তাঁহাদের দলীয় নেতা প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ মানিয়া চলেন। কারণ, দলীয় নেতার নির্দেশ অমান্য করার অপরাধে যদি কোনও সদস্য স্বীয় দল হইতে বহিষ্কৃত হন তবে অন্য কোন রাজনৈতিক দলে যোগদান করিয়া তিনি নিজের রাজনৈতিক জীবনের পুনর্বাসন করিতে সমর্থ হন না। দ্বিতীয়তঃ, যদি প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্টে কখনও সম্মুখীন হন, তবে তিনি রাজাকে দিয়া পার্লামেন্ট ভাংগিয়া দিতে পারেন এই বলিয়া পার্লামেন্টের সদস্যগণকে ভয় দেখাইতে পারেন। ইহাতেও অনেক কাজ হয়। কেননা, কোন সদস্য সে ক্ষেত্রে পুনর্নির্বাচনের ঝুঁকি নিতে চাহেন না বলিয়া নির্বিবাদে সরকারকে সমর্থন করেন।

প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা ও ক্ষমতা (Position and Powers of the Prime Minister)

ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদ হইল প্রধানমন্ত্রীর। কমন্সসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দলের নেতা বলিয়াই প্রধানমন্ত্রী নিজপদে অধিষ্ঠিত থাকেন এবং এত প্রতিপত্তি অর্জন করেন। প্রধানমন্ত্রী সাধারণতঃ রাজস্ববিভাগের প্রথম লর্ডের (The First Lord of the Treasury) পদ অলংকৃত করেন। তাঁহার এবং মন্ত্রীসভায় তাঁহার সহকর্মীদের মাহিনা কত হইবে তাহা ১৯৩৭ সালের রাজ-সচিব আইনে (The Ministers of the Crown Act, 1937) বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা এবং মর্যাদার সহিত তিনি কমন্সসভার যে দলের নেতা, সেই দলের ক্ষমতা ও মর্যাদা গভীরভাবে জড়িত।

আইনগতভাবে ইংলণ্ডে রাজা-সমেত-পার্লামেন্টেই (King-in-Parliament) সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। রাজা বা রাণীর প্রধান পরামর্শদাতা হইতেছেন প্রধানমন্ত্রী। সরকারের বিভিন্ন কাজ সম্বন্ধে রাজা বা রাণীকে অবহিত রাখার দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর। পার্লামেন্ট আহ্বান করা, ইহার অধিবেশন বজায় রাখা এবং ইহা ভাংগিয়া দেওয়া, লর্ডসভার সদস্যসংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়া, প্রিভি-কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত করা, যাজক ও বিচারক নিয়োগ করা এবং রাজা বা রাণীর জন্মদিনে অথবা অন্যপ্রকার কোন বিশেষ কাজের জন্য সম্মানসূচক উপাধি বিতরণ করা,—ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের কাজে প্রধানমন্ত্রী রাজা বা রাণীকে পরামর্শ প্রদান করিয়া থাকেন।

প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ বা কমন্সসভার নেতা। যে রাজনৈতিক দল কমন্সসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, তিনি সেই দলের নেতৃত্ব করেন। কমন্সসভার অধিবেশন আহ্বান করা এবং ইহা বজায় রাখা অথবা ভাংগিয়া দেওয়া প্রধানমন্ত্রীর উপরেই নির্ভর করে। তিনি দলীয় শৃংখলা বজায় রাখিয়া নিজের দলের সংখ্যাধিক্যের জোরে পার্লামেন্টের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত করেন। বিরোধী দলের সংগে সম্পর্ক বজায় রাখিয়া যাহাতে পার্লামেন্টের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়, সেই দিকেও প্রধানমন্ত্রী লক্ষ্য রাখেন। প্রধানমন্ত্রী যতদিন পার্লামেন্টের আস্থাভাজন থাকিবেন, ততদিনই তিনি নিজের পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। সুতরাং, যাহাতে কোন অবস্থায়ই পার্লামেন্টে তাঁহার নেতৃত্বের অবসান না হয়, তিনি সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখেন। পার্লামেন্টকে কোন ব্যাপারে স্বমতে আনিতে না পারিলে তিনি রাজাকে পার্লামেন্ট ভাংগিয়া দিয়া পুনরায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য পরামর্শ প্রদান করিতে পারেন।

প্রধানমন্ত্রী কমন্সসভার নেতা

ক্যাবিনেটের সংগে প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্ক অংগাংগীভাবে জড়িত। প্রধানমন্ত্রী তাঁহার ক্যাবিনেট গঠন করেন এবং ক্যাবিনেট সদস্যদের মনোনয়ন করিয়া তাঁহাদের নিয়োগ করিবার জন্য রাজা বা রাণীকে পরামর্শ প্রদান করেন। ক্যাবিনেটের অন্যান্য সদস্যগণ তাঁহার সমমর্যাদাসম্পন্ন সহকর্মী। তবে তিনিই তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী এবং ক্যাবিনেটের বিভিন্ন সভায় তিনিই সভাপতিত্ব করেন। প্রয়োজন হইলে তিনি রাজা বা রাণীকে পরামর্শ প্রদান করিয়া যে কোন মন্ত্রীকে পদচ্যুত করিতে পারেন এবং মন্ত্রীসভার সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন দপ্তরের পুনর্বণ্টন করিতে পারেন। যদি ক্যাবিনেট সদস্যগণের মধ্যে সরকারী নীতি লইয়া মতভেদের সৃষ্টি হয়, তাহা মীমাংসা করিবার দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর ; কেননা, তিনিই ক্যাবিনেটের সদস্যগণের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখেন। আইনসভার নিকট ক্যাবিনেটের যৌথ দায়িত্ব থাকায় বিভিন্ন মন্ত্রী প্রয়োজন অনুসারে নিজ নিজ দপ্তরের সহিত জড়িত বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রীর সহিত আলোচনা করেন। প্রধানমন্ত্রীও বিভিন্ন দপ্তরের কার্যসূচীর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। রাজস্ব বিভাগের প্রধান লর্ড (First Lord of the Treasury) হিসাবে তিনিই সিভিল সার্ভিসের প্রধান পদগুলিতে নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন। বাস্তবে, ক্যাবিনেট সদস্যগণের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি এত বেশী যে অনেক সময়েই ইহা স্বেচ্ছাচারিতার (Dictatorship) পর্যায়ে পড়িয়া যায়।

প্রধানমন্ত্রী ও ক্যাবিনেটের মধ্যে সম্পর্ক

আইনসভার ভিতরে প্রধানমন্ত্রীই তাঁহার নিজস্ব রাজনৈতিক দলের নেতা। যে দল আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, সেই দলের নেতাই রাজা

কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। দলের মর্যাদা এবং দলীয় নেতার মর্যাদা অংগাংগীভাবে জড়িত। আইনসভার ভিতরে দলীয় শৃংখলা বজায় রাখা, সরকার পক্ষে সর্বদা দলীয় সমর্থন অর্জন করা এবং নির্বাচনের সময় যাহাতে নিজের দল জয়যুক্ত হয় সেইদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা, ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষদায়িত্ব আছে। দলীয় সমর্থন যাহাতে সর্বদাই পাওয়া যায় সেজন্য ক্যাবিনেটের সদস্য নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হয়। মন্ত্রীসভা এবং ক্যাবিনেটের সদস্য নির্বাচনের সময় প্রধানমন্ত্রীকে নিজের দলকে সর্বদাই সন্তুষ্ট রাখিতে হয়। যদি কখনও দলের ভিতর উপদলের সৃষ্টি হয়, তবে সেই উপদলগুলি যাহাতে দলের সামগ্রিক স্বার্থের বিরুদ্ধে না যায়, সেদিকে প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। সেইজন্য প্রধানমন্ত্রী পার্লামেণ্টারী রাজনৈতিকদলের নেতা হিসাবে প্রায়ই দলীয় সদস্যদের সভা আহ্বান করেন এবং দলের নীতিগুলিকেই সরকারের বিভিন্ন নীতির মধ্যে রূপায়িত করিতে চেষ্টা করেন। নিজের দলের সহিত প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্ক প্রধানতঃ প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে। যদি প্রধানমন্ত্রী বিশেষ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন এবং দৃঢ়চেতা হন, তবে তিনি দলীয় শৃংখলা অনায়াসে বজায় রাখিতে পারেন।

প্রধানমন্ত্রী ও তাঁহার রাজনৈতিক দলের মধ্যে সম্পর্ক

নিজের দলের সহিত যেমন প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখিতে হয়, সেই প্রকার বিরোধী দলের নেতার সহিতও তাঁহাকে যোগসূত্র বজায় রাখিতে হয়। বিশেষতঃ জরুরী অবস্থার (emergency) সৃষ্টি হইলে অথবা কোন দেশের সহিত যদি ইংলণ্ড যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়া পড়ে, তখন দেশে জাতীয় সরকার (National Government) অথবা সম্মিলিত সরকার (Coalition Government) প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন বিভিন্ন দলের মধ্যে সংহতি বজায় রাখিয়া সরকারের বিভিন্ন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত করিবার দায়িত্ব হইতেছে প্রধানমন্ত্রীর। অনেক সময় বলা হয়, ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর কাজ অথবা পদমর্যাদা কি হইবে, তাহা তিনি নিজেই স্থির করেন। "The office of the Prime Minister in England is what its holder chooses to make it."—Asquith)। প্রধানমন্ত্রীই ক্যাবিনেট সদস্যগণের সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং নিজের নীতি অনুযায়ী সামগ্রিকভাবে সরকারের নীতি স্থির করেন এবং আইনসভায় নিজের দলের সংখ্যাধিক্যের জোরে সেই নীতি পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত করাইয়া কার্যকরী করেন। যদি পার্লামেণ্ট প্রকৃতপক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বিরোধিতা করে অথবা সমগ্র ক্যাবিনেটের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করে তবে প্রধানমন্ত্রী রাজা বা রাণীকে পরামর্শ প্রদান করিয়া পার্লামেণ্ট ভাংগিয়া দিতে পারেন। ইহাই পার্লামেণ্টের

জরুরী অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব

উপর প্রধানমন্ত্রীর চূড়ান্ত ক্ষমতা। এই ক্ষমতা থাকায় তাঁহার পক্ষে সরকারের বিভিন্ন নীতি কার্যকরী করার পথে কোনদিকেই বাধা থাকে না। বিশেষতঃ তাঁহার পরামর্শেই রাজা সব কাজ করেন। সুতরাং সাধারণ নির্বাচনের সময় লক্ষ্য রাখিতে হয়, কোন্ দল আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিল। যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, সেই দলের নেতাই প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং তিনি সরকারের কোনও নীতি কার্যকরী করিতে আইনসভার নিকট হইতে কোন বাধাপ্রাপ্ত হন না। এজন্য জেনিংস (Jennings) বলেন, ইংলণ্ডে সাধারণ নির্বাচন প্রকৃতপক্ষে প্রধানমন্ত্রীরই নির্বাচন। সরকারের পক্ষ হইতে যাহা কিছু করার প্রয়োজন হয়, প্রধানমন্ত্রী তাহাই করিতে পারেন। কারণ একদিকে রাজা বা রাণী তাঁহার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন, অপরদিকে পার্লামেন্টেও নিজের দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে প্রধানমন্ত্রী নিজের বা সরকারের কার্যসূচী বাস্তবে রূপায়িত করার পথে বাধাপ্রাপ্ত হন না। সুতরাং তিনি নিজেই তাঁহার কাজ অথবা পদমর্যাদা কি হইবে, তাহা স্থির করেন।

প্রধানমন্ত্রীই বাস্তবে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী

ক্যাবিনেটের একনায়কত্ব (Dictatorship of the Cabinet)

আমেরিকানগণ অনেক সময় বলিয়া থাকেন যে গ্রেট বৃটেন প্রকৃতপক্ষে একটি ক্যাবিনেটের একনায়কত্বের অধীনে আছে।[১] হাউস অফ্ কমন্সের উপর মন্ত্রীসভার যে কর্তৃত্ব আমরা দেখিতে পাই তাহাতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে মন্ত্রীসভা পার্লামেন্টে যে বিল-ই অনুমোদন করিতে চাহে, সেই বিল-ই অনুমোদন করিতে পারে। ক্যাবিনেটের এই ক্ষমতা সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়া রেম্‌সে মুইর (Ramsay Muir) বলেন, "A body which wills such power as these may fairly be described as omnipotent in theory, however, incapable it may be in using its omnipotence. Its position, whenever it commands a majority, is a dictatorship until qualified by publicity". ক্যাবিনেটের বিভিন্ন কাজের উপর আলাদাভাবে জনমতের চাপ দেওয়া সব সময় সম্ভবপর নহে। ক্যাবিনেটের কোন কাজ যদি জনসাধারণ পছন্দ নাও করে তবে তাহাদের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়। কারণ, একমাত্র সাধারণ নির্বাচনের সময়েই জনসাধারণ ক্যাবিনেটের বিভিন্ন কাজ অথবা নীতি সম্বন্ধে নিজেদের মতামত প্রকাশ করিতে পারে। এইজন্য অনেক সময় অভিযোগ করা হইয়া থাকে যে ইংলণ্ডে শুধু *"Plebiscitary Democracy"* বা 'গণভোট'-নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র'

১। The Government of Great Britain—Cartet, Herz and Ranney P. 149

দেখা যায়, এবং ইহাতে সরকারের বিভিন্ন কাজ পর্যালোচনা করিবার পর জনসাধারণ ইহার পক্ষে অথবা বিপক্ষে শুধু "হাঁ" বা "না" বলিতে পারে,—সরকারের নীতি নির্ধারণে জনসাধারণের কোন হাত নাই। সরকারের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সমুদয় দায়িত্ব এবং ক্ষমতা ক্যাবিনেটের হাতেই থাকে। তবে ইহাও সত্য যে ক্যাবিনেট সাধারণতঃ জনমতের বিপক্ষে কোন কাজ করে না এবং জনগণের ইচ্ছা পরোক্ষভাবে কার্যকরী হয়। গ্রেট-বৃটেনে ক্যাবিনেটের এই একনায়কত্ব গড়িয়া উঠিবার পিছনে নিম্নলিখিত কারণগুলি দায়ী :—

প্রথমতঃ, ইংলণ্ডের রাজনৈতিক দলব্যবস্থা খুবই অনমনীয় হওয়ায় ক্যাবিনেটের ক্ষমতা বাড়িয়া যাইবার পথ প্রশস্ত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে পার্লামেন্টের সদস্যগণ এখনকার মত দলের হুইপদের (Party Whip) নিয়ন্ত্রণাধীন এত বেশী পরিমাণে ছিল না। ইংলণ্ডে রাজনৈতিক দল ব্যবস্থা এত অনমনীয় যে, যে কোন সদস্যই দলীয় নির্দেশ মানিয়া চলিতে বাধ্য। যদি দলীয় নির্দেশ কোন সদস্যের বিবেকের বিরুদ্ধে যায়, তবুও তাহা দলের স্বার্থে পালন করিতে হয়। প্রধানমন্ত্রী হইতেছেন পার্লামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে তিনি দলীয় সদস্যগণকে যাহা করিবার নির্দেশ প্রদান করেন, দলীয় সদস্যগণকে তাহাই পালন করিতে হয়। ইহাতে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীনে ক্যাবিনেটের একনায়কত্বের সৃষ্টি হয়। সুয়েজখালে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের যৌথ আক্রমণে যখন সমগ্র বিশ্বে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়, তখন ইংলণ্ডে পার্লামেণ্টের অনেক রক্ষণশীল সদস্য (Conservative members) প্রধানমন্ত্রী এণ্টনী ইডেনের কাজ মনে মনে সমর্থন করেন নাই এবং তাহাদের ক্ষোভ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তবুও যখন এণ্টনী ইডেনের অবলম্বিত ব্যবস্থার সমর্থনে ভোট গ্রহণ করা হয় তখন দেখা যায় যে রক্ষণশীল দলের সমুদয় সদস্যই তাহাদের দলীয় নেতার সমর্থনে ভোট প্রদান করিয়াছিলেন। দলীয় ব্যবস্থার এই কঠোরতা হাউস অফ্ কমন্সের মধ্যে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়। অধ্যাপক লাস্কির ভাষায়, "This rigidity is, of course, reflected in the House of Commons itself." রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিদ্রোহ সাধারণতঃ জরুরী অবস্থা না হইলে দেখা যায় না; এমনকি ১৯৩১ সালের শ্রমিক দলের মধ্যে বিভেদও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিলনা।[১]

দলব্যবস্থার অনমনীয়তা

১। Any considerable rebellion in a party is, therefore, an occurrence unlikely save in the gravest circumstances; even in 1931, only sixteen members of the Labour Party crossed the House with Mr. Ramsay Macdonald. (Parliamentary Government in England, Laski, P. 74)

দ্বিতীয়তঃ, ক্যাবিনেটের একনায়কত্বের আর একটি কারণ হইল মন্ত্রীদের যৌথ দায়িত্ব (collective responsibility)। ইংলণ্ডের প্রত্যেক মন্ত্রীই জানে যে তাহার পরাজয় হইলে সমগ্র মন্ত্রীসভাকেই পদত্যাগ করিতে হইবে। এই ব্যবস্থার ফলে সব মন্ত্রীগণ সমষ্টিগতভাবে সব কাজ করে এবং একজন অপরের সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসে। ইহার ফলস্বরূপ মন্ত্রীসভার শক্তি ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে এবং কমন্স সভায় মন্ত্রীসভাকে প্রকৃতপক্ষে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় না।

মন্ত্রীদের যৌথদায়িত্ব

তৃতীয়তঃ, পার্লামেণ্টের কাজের চাপ খুব বাড়িয়া যাওয়ায় সব সময়েই দ্রুত আইন তৈয়ার করা পার্লামেণ্টের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। সেইজন্য আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা অনেক সময় নিজের হাতে না রাখিয়া পার্লামেণ্ট মন্ত্রীদের orders-in-council বা স-পরিষদ রাজাজ্ঞা ঘোষণা করিবার ক্ষমতা দিয়াছে। ইহাকে "delegated legislation" বলা হয়। যেহেতু প্রতিবৎসর "স-পরিষদ রাজাজ্ঞা" orders-in-council বাড়িয়া যাইতেছে, সেইজন্য পার্লামেণ্টে মন্ত্রীদের ক্ষমতাও বাড়িয়া যাইতেছে। তাহা ছাড়া, অনেক সময় পার্লামেণ্টে কোন বিল উথাপিত হওয়া মাত্রই গৃহীত ও অনুমোদিত হইয়া যায়; ইহাতে পার্লামেণ্টের পক্ষে দ্রুত আইন প্রনয়ন করা সম্ভবপর হয়।

"Delegated legislation" প্রথার উদ্ভব

চতুর্থতঃ, শাসনসংক্রান্ত ন্যায়বিচারের নীতি (Principle of administrative justice) গড়িয়া উঠাও ক্যাবিনেটের একনায়কত্বের অন্যতম কারণ। মন্ত্রীসভার বিভিন্ন দপ্তরগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট মামলা মিটাইয়া ফেলিবার দায়িত্ব মন্ত্রীসভাকেই দেওয়ার একটি ঝোঁক সরকারের দেখা যায়। পূর্বে আদালতে এই সমস্ত মামলার বিচার হইত। কিন্তু, বর্তমানে মন্ত্রীসভার বিভিন্ন দপ্তরগুলি এই ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়ায় সামগ্রিকভাবে মন্ত্রীসভার ক্ষমতা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯৩৬ সালের Old Age Pension Act অনুযায়ী স্বাস্থ্যদপ্তরে এই আইন অনুযায়ী পেন্সন সম্পর্কেও সমুদয় রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা চলে।

পঞ্চমতঃ, ক্যাবিনেটের একনায়কত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার আরও একটি কারণ হইতেছে এই যে প্রধানমন্ত্রী যে কোন সময়েই রাজাকে হাউস্ অফ্ কমন্সের অধিবেশন ভাংগিয়া দিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারেন। মন্ত্রীসভা যদি কমন্স-সভায় কখনও ভোটে পরাজিত হয় তবে প্রধানমন্ত্রী এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া নিজের মন্ত্রীসভাকে পতনের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু, প্রধানমন্ত্রীর এই ক্ষমতার অর্থ এই নয় যে মন্ত্রীসভা বিপদে

হাউস অফ্ কমন্সের অধিবেশন ভাংগিয়া দেওয়ার ক্ষমতা

পড়িলেই রাজা হাউস অফ্ কমন্সের অধিবেশন ভাংগিয়া দিবেন। জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজন হইলেই এই ক্ষমতা (কোন কোন ক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃতভাবে) প্রয়োগ করা হয়।[১]

ষষ্ঠতঃ, ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা এমনভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে যে ক্যাবিনেটের স্বৈরতন্ত্র আপনা হইতেই প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা সত্য যে, মন্ত্রীসভার স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পথে পার্লামেণ্টের বহু সদস্য বাধা প্রদান করেননা, তবুও লোয়েলের (Lowell) মতে এই স্বৈরতন্ত্রের পিছনে সর্বদা সমালোচনার ভয়, জনমতের স্বীকৃতি আদায়ের প্রচেষ্টা, জনগণের আস্থা হারাইবার ভয় এবং পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনের সুফল সম্বন্ধে প্রত্যাশা প্রভৃতি থাকে, এবং ইহার মধ্য দিয়াই চূড়ান্ত প্রচারের মাধ্যমে এই স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। (**"...an autocracy exerted with the utmost publicity, under a constant fire of criticism, and tempered by the force of public opinion, the risk of a want of cofidence and the prospects of the next election."**) সমালোচকগণ বলেন যে পার্লামেণ্টে সরকারী দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে বলিয়াই যে মন্ত্রীসভা স্বৈরাচারী হয় তাহা নহে; সরকারী দল যে পার্লামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, তাহার পিছনে থাকে—জনগণের অকৃত্রিম সমর্থন। মন্ত্রীসভাকে এমনভাবে চলিতে হয় যেন কাজের মধ্য দিয়া ইহা জনগণের সমর্থন না হারায়। এইক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর একটি বিশেষ দায়িত্ব আছে। কার্লাইলের কথা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীকেও ভাবিতে হয়, "*I am their leader, therefore I must follow them.*"

ইংলণ্ডে মন্ত্রীসভার যে একনায়কত্ব আমরা দেখিতে পাই, ইহার মূল উৎস হইতেছে মন্ত্রীসভার বিভিন্ন দপ্তরের সচিবগণের অনুসৃত নীতি ও কাজ।

আমলাতান্ত্রিকতার সৃষ্টি

এইজন্য প্রকৃতপক্ষে গ্রেট বৃটেনের মন্ত্রীসভার স্বৈরাচারের পিছনে আমলাতান্ত্রিকতা (Bureaucracy) শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। বৃটেনে যিনি অর্থমন্ত্রী হন্ তিনি হয়ত সরকারী আয়-ব্যয় নীতির খুঁটিনাটি নাও বুঝিতে পারেন (অবশ্য অধ্যাপক

১। ডক্টর ফাইনার (Dr. Finer) বলেন, "Some of the spontaneous and valid creativeness of the House of Commons is dissipated by the threat of the cabinet to dissolve it if it is overcome upon a matter it deems vital. Now this point has been falsely overstressed. It has been phrased as though the Cabinet were in the habit of letting the Houses know that it will definitely dissolve upon such and such provocation, as though members were coerced only by the thought of their election expenses. This is not so. The operation is much subtle, and something unintentional." The Theory and Practice of Modern Government. P. 620

ডাল্টন যখন অর্থমন্ত্রী ছিলেন, তখন এই যুক্তিটি খাটিত না) অথবা স্বাস্থ্যমন্ত্রী হয়ত চিকিৎসা শাস্ত্রের কিছু নাও বুঝিতে পারেন, ইহাতে মন্ত্রীসভার নীতি নির্ধারণে কোন অসুবিধা হয় না। কারণ মন্ত্রীগণ নিজেদের দপ্তরের সচিবদের পরামর্শ অনুযায়ীই নীতি নির্ধারণ এবং সেই নীতি কার্যকরী করেন।

সংক্ষিপ্তসার

১। **রাজার মর্যাদা ও ক্ষমতা**—রাজা এবং রাজশক্তির অর্থ এক নহে। ব্যক্তিগতভাবে রাজা রাজমর্যাদা ভোগ করেন; কিন্তু রাজশক্তি হইতেছে একটি বিশেষ সংস্থা। রাজশক্তির অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা থাকে। সেইজন্য বলা হয়, "রাজার মৃত্যু নাই"। রাজা রাষ্ট্রের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান; সরকারী কাজের জন্য মন্ত্রীগণই সর্বদা দায়ী থাকেন। এইজন্য বলা হয় "রাজা কোন অন্যায় করিতে পারেন না।" রাজার ক্ষমতার দুইটি উৎস আছে। প্রথমতঃ রাজার কতিপয় বিশেষ অধিকার (Royal Prerogatives) আছে। দ্বিতীয়তঃ পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত কতিপয় আইনের (Parliamentary Statutes) সাহায্যেও রাজা কিছু ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। রাজা মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। তাহা ছাড়া তিনি সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর প্রধান। প্রয়োজন হইলে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তি স্থাপন করিতে পারেন। শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা অনুযায়ী পররাষ্ট্র সম্পর্কিত নীতি এবং পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত ব্যয়-বরাদ্দের ব্যবহার তাঁহার নিয়ন্ত্রনাধীন থাকে। আইন-বিভাগীয় ক্ষমতা অনুযায়ী রাজা আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করেন, স্থগিত রাখেন এবং প্রয়োজনের সময় ভাংগিয়া দিতে পারেন। রাজা-সমেত-পার্লামেণ্ট (King-in-Parliament) ইংলণ্ডের আইনগত সার্বভৌম। বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা অনুযায়ী রাজা বিচারকদের নিয়োগ করেন এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীর শাস্তি মকুব করিতে পারেন। রাজা হইতেছেন ন্যায়বিচারের উৎস। তাহা ছাড়া রাজা ইংলণ্ডের খ্রীষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং সেই অধিকারে তিনি আর্চবিশপ, বিশপ এবং অন্যান্য ধর্মযাজকদের নিয়োগ করেন।

তত্ত্বের দিক হইতে রাজার এতগুলি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বাস্তবে রাজা নিজে কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করেন না। মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী তিনি সব কাজ করেন। এইজন্য অনেক সময় রাজাকে একজন আড়ম্বরপূর্ণ অপদার্থ ("magnificent cipher") বলা হয়। কিন্তু, ইহা অতিশয়োক্তি বলা যাইতে পারে। কারণ, রাজার তিনটি বিশেষ অধিকার আছে, যথা, পরামর্শদানের অধিকার, উৎসাহ প্রদান করিবার অধিকার এবং সতর্ক করিয়া দিবার অধিকার। ইংলণ্ডে রাজার একটি বিশেষ মর্যাদা আছে এবং নিয়ম-

তান্ত্রিক প্রধান হিসাবে ও কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে সংহতি বজায় রাখিবার যোগসূত্র হিসাবে ইংলণ্ডে রাজার বিশেষ প্রয়োজন আছে। ইংলণ্ডে যদি রাজতন্ত্র না থাকিয়া প্রজাতন্ত্র থাকিত, তবুও একজন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধানের প্রয়োজন থাকিত। রাজা সেই প্রয়োজন মিটাইয়াছেন। এইজন্য ইংলণ্ডে রাজতন্ত্র এখনও টিঁকিয়া আছে।

২। **ক্যাবিনেটের কাজ ও ক্ষমতা**—মন্ত্রীসভা ও ক্যাবিনেট এক জিনিষ নয়। ক্যাবিনেট হইতেছে মন্ত্রীসভার মধ্যেই একটি বিশেষ ক্ষমতাশালী ক্ষুদ্রতর পরিষদ। হাউস অফ্ কমন্সে যে রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, সেই দলের নেতাকেই রাজা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করেন এবং তাহাকে মন্ত্রীসভা গঠন করিতে বলেন। ক্যাবিনেট হইতেছে শাসন-বিভাগ এবং আইন-প্রণয়ন বিভাগের মধ্যে সংযোজক চিহ্ন। পার্লামেণ্টের নিকট সরকারের শাসননীতি পেশ করা, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা, আইনসভার অধিবেশন কখন আহ্বান করা হইবে এবং ইহা কতদিন স্থায়ী হইবে অথবা ইহার কার্যসূচী কি হইবে এবং কি কি বিল আইনে পরিণত হইবে, ইত্যাদি সবই ক্যাবিনেট ঠিক করিয়া থাকে। ক্যাবিনেটের পরামর্শ অনুযায়ী রাজা পরিচালিত হন। ক্যাবিনেটের সদস্যগণ একই রাজনৈতিক দলের সদস্য হন এবং নিজেদের কাজের জন্য তাঁহারা হাউস অফ্ কমন্সের নিকট যৌথভাবে দায়ী থাকেন। হাউস অফ্ কমন্স যদি কখনও মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অথবা যে কোন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করে, তবে সমগ্র মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক দলব্যবস্থার অনমনীয়তার দরুণ এবং রাজাকে দিয়া যে কোন সময়েই হাউস অফ্ কমন্স ভাংগিয়া দিবার ক্ষমতা মন্ত্রীসভার হাতে থাকার দরুণ মন্ত্রীসভাকে হাউস অফ্ কমন্সে বিশেষ সংকটের সম্মুখীন হইতে হয় না। যেহেতু হাউস অফ্ কমন্সে সরকারী দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে সেইজন্য যে কোন সরকারী বিল আইনে পরিণত করিতে অথবা ব্যয়-বরাদ্দ হাউস অফ্ কমন্সকে দিয়া অনুমোদিত করাইতে মন্ত্রীসভার পক্ষে অসুবিধা হয় না। বর্তমানে আমরা ক্যাবিনেটের একনায়কত্ব দেখিতে পাই। এই একনায়কত্বের পিছনে আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ক্রমেই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ইংলণ্ডে জরুরী অবস্থায় কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা (Coalition Ministry) গঠিত হয়।

৩। **প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা ও ক্ষমতা**—ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থায় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদ হইল প্রধানমন্ত্রীর। প্রধানমন্ত্রী হাউস অফ্ কমন্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের নেতা। তিনি মন্ত্রীসভা গঠন করেন ; মন্ত্রীসভা গঠন করিবার সময় তাঁহাকে লক্ষ্য রাখিতে হয় যেন দলীয় সংহতি বজায়

থাকে। সরকারের বিভিন্ন কাজ সম্বন্ধে রাজাকে অবহিত রাখার দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর এবং তিনি সর্বদাই রাজাকে রাজকর্ম পরিচালনায় পরামর্শ ও উপদেশ দিয়া থাকেন। ইংলণ্ডে এইরূপ প্রথা গড়িয়া উঠিয়াছে যে প্রধানমন্ত্রীর সাহায্য ও পরামর্শ ব্যতীত রাজার কোন কিছুই করিবার ক্ষমতা নাই। প্রধানমন্ত্রী কমন্সসভার নেতা। কমন্সসভায় শুধু দলীয় শৃংখলা বজায় রাখিয়া নিজের দলের সংখ্যাধিক্যের জোরে পার্লামেণ্টের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত করাই প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নহে; বিরোধী দলের সংগে সম্পর্ক বজায় রাখিয়া যাহাতে পার্লামেণ্টের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় সেই দিকেও প্রধানমন্ত্রী লক্ষ্য রাখেন। ক্যাবিনেটের সংগে প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্ক অংগাংগীভাবে জড়িত। প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেট গঠন করেন এবং সমগ্র মন্ত্রীসভা ও ক্যাবিনেটের সভায় সভাপতিত্ব করেন। ক্যাবিনেটের সদস্যগণের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর। আইনসভার নিকট ক্যাবিনেটের যৌথ দায়িত্ব থাকার দরুণ বিভিন্ন মন্ত্রী প্রয়োজন অনুসারে নিজ নিজ দপ্তরের সহিত জড়িত বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রীর সহিত আলোচনা করেন। দেশে জরুরী অবস্থা অথবা জাতীয় সংকটের সৃষ্টি হইলে প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলগুলির সংগে একটি কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা (Coalition Ministry) গঠন করেন। হাউস অফ্ কমন্সের অধিবেশন আহ্বান করা, স্থগিত রাখা অথবা ভাংগিয়া দেওয়ার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছাই চূড়ান্ত। কারণ, তাঁহার পরামর্শ অনুযায়ীই রাজা এই ব্যাপারে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

Exercises

1. Examine the following statements with regard to the British Constitution :

(a) "The King never dies."

(b) "The King can do no wrong." (১৯—২১ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the position and the powers of the monarch in the British Constitutional system. (C. U. B. A. 1962)

(১৯—২৩ পৃষ্ঠা)

3 Discuss the implications of constitutional monarchy as it obtains in England, How far do you agree with the view that "the British monarch is a *Magnificent cipher*—a cipher who signs everything, but signs nothing except in obedience to advice". (১৯—২৭ পৃষ্ঠা)

4. Account for the survival of Kingship in England.

(২৩—২৫ পৃষ্ঠা)

5. Discuss the chief characteristics of the British Cabinet. What are its functions and its relation with the Parliament?

(২৫—৩০ পৃষ্ঠা)

6. "The Cabinet is the keystone of the political arch."

Discuss the statement with reference to the functions performed by the Cabinet in England. (২৫—২৮ পৃষ্ঠা)

7. Distinguish between the Cabinet and the Ministry, what is the relation between the Cabinet and the Crown?

(২৫ পৃষ্ঠা ; ২৬—২৭ পৃষ্ঠা)

8. What do you mean by Ministeral Responsibility in England? What are the methods of enforcing it?

(২৮—৩০ পৃষ্ঠা)

9. Discuss the relationship between the Cabinet and House of Commons in England. (২৮—৩০ পৃষ্ঠা)

10. "The Parliamentary System in Britain tends to make the Cabinet all-powerful." Explain why this is so.

(২৮—৩০ পৃষ্ঠা)

11. "The theory is that the House (of Commons) controls the Government (in England)·······It is equally true to say that the Government controls the House" (Jennings).—Discuss the statement. (২৮—৩০ পৃষ্ঠা)

12. "The House of Commons gives the Cabinet life; but normally it can itself live only so long as it is prepared to go on giving life to the Cabinet." (Laski)—Examine the extent to which this statement holds good in normal times and in emergencies. (২৮—৩০ পৃষ্ঠা)

13. Discuss the position and powers of the Prime Minister of England in relation to (a) the Sovereign, (b) Parliament, (c) the Cabinet and (d) his Party. (৩০—৩৩ পৃষ্ঠা)

14. "The office of the Prime Minister (in England) is what its holder chooses to make it." (Asquith)—Discuss the

statement with special reference to the position of the Prime Minister in the English Constitutional System.

(৩০—৩৩ পৃষ্ঠা)

15. Do you support the charge sometimes made against the English Political System that it is a *"Plebiscitary Democracy."* Give reasons for your answer pointing out the factors which contributed to the growth of Cabinet Dictatorship in England. (৩৩—৩৭)

16. "The Cabinet is all-powerful in the British Political System."—Why is this so ? Why is it said that "Bureaucracy thrives behind Cabinet Dictatorship" in England ?

(৩৩—৩৭ পৃষ্ঠা)

চতুর্থ অধ্যায় | বৃটিশ পার্লামেণ্ট (The British Parliament)

পার্লামেণ্টের সার্বভৌমত্ব (Sovereignty of the Parliament)

অধ্যাপক ডাইসির মতে আইনের দিক হইতে বিচার করিলে পার্লামেণ্টের সার্বভৌমত্ব বৃটিশ শাসনতন্ত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। পার্লামেণ্ট বলিতে বুঝায় রাজা, হাউস অফ্ লর্ডস্ এবং হাউস্ অফ্ কমন্স। রাজা-সমেত-পার্লামেণ্ট (King-in-Parliament) হইতেছে ইংলণ্ডের আইনগ্রাহ্য সার্বভৌম। পার্লামেণ্ট শুধু আইন প্রণয়ন করে না, শাসনতন্ত্রের সংশোধনও করে। এইজন্য দ্য টকুয়াভিলি (De Tocqueville) বলেন, "The Parliament is at once a legislative and a constituent assembly". অধ্যাপক ডাইসি আইন প্রণয়ন ক্ষেত্রে পার্লামেণ্টের সার্বভৌমত্বের কতিপয় উদাহরণ দিয়াছেন। যেমন, ১৭০১ সালের সেটেলমেণ্ট আইন (The Act of Settlement) ইংলণ্ডের উত্তরাধিকার আইনের মৌলিক পরিবর্তন সাধন করিয়াছিল। তাহা ছাড়া ১৭১৬ সালের Septennial Act, (যে আইনে তৎকালীন পার্লামেণ্টারী নির্বাচনের মেয়াদ তিন বৎসর হইতে সাত বৎসর পর্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল) এবং ১৭২১ সালের Act of Indemnity প্রভৃতি আইন প্রণয়ন ক্ষেত্রে পার্লামেণ্টের সর্বময় ক্ষমতার সাক্ষ্য দেয়। এমন কি ইংলণ্ডে আদালতের বিচারকগণের রায়ও পার্লামেণ্টের আইনকে অগ্রাহ্য করিতে পারে না। পার্লামেণ্টের এই সার্বভৌমত্ব থাকা সত্ত্বেও ইহার তিনটি আইনগত সীমা আছে। প্রথমতঃ, বলা হইয়া থাকে যে পার্লামেণ্ট এমন কোন আইন প্রণয়ন করিতে পারে না যাহা নীতিশাস্ত্র-বিরোধী। কিন্তু, এই কথার উত্তরে বলা যায় যে নীতিশাস্ত্রের সহিত আইনের সংগতি অথবা অসংগতি যাহাই থাকুক না কেন, আইন সর্বদাই আইন। আইন যেহেতু পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত হয়, সেইজন্য ইহা সর্বদাই পালনীয়। দ্বিতীয়তঃ, পার্লামেণ্টের ক্ষমতার আর একটি সীমা হইল এই যে পার্লামেণ্টের আইন কখনও শাসনতন্ত্র সম্মত বিশেষ অধিকারকে (Prerogatives) স্পর্শ করিতে পারে না। তবুও পার্লামেণ্টের অনেক আইন শাসনতন্ত্রসম্মত কতিপয় বিশেষ অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে।

তৃতীয়তঃ, সাধারণতঃ নূতন পার্লামেণ্ট কখনও পুরাতন পার্লামেণ্ট প্রণীত আইনকে বাতিল করিতে পারে না। কিন্তু, যদিও ১৮০০ সালের Act of Union স্থায়ীভাবে প্রণীত হইয়াছিল, তবুও মাঝে মাঝে এই আইনের

সংশোধন হইয়াছে এবং ১৯২২ সালে আয়র্ল্যাণ্ড আলাদা রাষ্ট্রে পরিণত হইবার পর এই আইন বাতিল হইয়া যায়।

পার্লামেণ্টের সার্বভৌমত্বের এই তিনটি সীমা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া অধ্যাপক ডাইসি মন্তব্য করিয়াছেন যে পার্লামেণ্টের সার্বভৌমত্ব আইনগত ভাবে সর্বদাই সত্য নহে। ইহার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয়বিধ সীমা আছে[1]। প্রথমতঃ কতিপয় সামাজিক সর্ত বা অবস্থা পার্লামেণ্টের আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতাকে সীমিত করে। ইহা হইতেছে বাহ্যিক সীমা। দ্বিতীয়তঃ, আভ্যন্তরীণ সীমা হিসাবে ইহা এমন কোনও আইন প্রণয়ন করিতে পারে না যাহা জনমতের বিপক্ষে যাইতে পারে এবং যাহাতে জনমত ক্ষুব্ধ হইতে পারে। অধ্যাপক লাস্কি মন্তব্য করিয়াছেন, "No Parliament would dare to disenfranchise the Roman Catholics or to prohibit the existence of Trade Unions." অর্থাৎ, কোন পার্লামেণ্টই রোমান ক্যাথলিকদের ভোটাধিকার ক্ষুণ্ণ করিতে অথবা শ্রমিকসংঘগুলিকে উচ্ছেদ করিতে সাহসী হইতে পারে না। উপরোক্ত সীমা ছাড়াও, আইনের বিচার বিভাগীয় ব্যাখ্যাও অনেক ক্ষেত্রে পার্লামেণ্টের সার্বভৌমত্বকে ক্ষুণ্ণ করে। তাহা ছাড়া, দেশের মধ্যে বিভিন্ন সংঘ যখন শক্তিশালী হইয়া উঠে, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সেই সংঘগুলির অভিমতকে পার্লামেণ্ট একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারে না। ১৯৩৪ সালের Union Act অনুযায়ী সাউথ আফ্রিকার জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বৃটিশ পার্লামেণ্টের সার্বভৌমত্ব নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সীমা

লর্ডসভার গঠন (Composition of the House of Lords) :

ইংলণ্ডের লর্ডসভা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন আইনপরিষদ। লর্ডসভার সদস্যগণের সংখ্যা প্রায় ৮৪৫ এবং তাঁহাদের নিম্নলিখিত ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, (১) স্কটল্যাণ্ডের ১৬ জন প্রতিনিধি; (২) রাজপরিবারের রাজকুমারগণ; (৩) উত্তরাধিকারসূত্রে লর্ডগণ; (৪) ২৮ জন আয়ার্ল্যাণ্ডের আজন্ম প্রতিনিধি, তন্মধ্যে বর্তমানে ছয়জন আছেন; (৫) ২৬ জন ধর্মযাজক,

১। লেসলি ষ্টিফেন (Leslie Stephen) বলেন, "The power of legislature is, of course, strictly limited. It is limited, so to speak, both from within and rom without ; *from within* because the legislature is the product of a certain social condition and determined by whatever determines the society ; and *from without* because the power of imposing laws is dependent upon the istinct of subordination which is itself limited."

তন্মধ্যে ২ জন আর্চবিশপ এবং ২৪ জন বিশপ; এবং (৬) আপীল-আদালতের বিচারক হইবার জন্য ৯জন লর্ড। যাঁহারা উত্তরাধিকারসূত্রে লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের মৃত্যুর পর মৃত লর্ডের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে লর্ড বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। তাহা ছাড়া রাজা বা রানীর জন্মদিনে অথবা ইংরাজী নববর্ষের দিনে অনেক ভাগ্যবান ব্যক্তি লর্ড উপাধিতে ভূষিত হন।

লর্ডসভার ক্ষমতা ও ক্রিয়াকলাপ (Powers and functions of the House of Lords)—ইংলণ্ডের লর্ডসভার দুই প্রকার কাজ আছে, প্রথমটি আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত (Legislative) এবং দ্বিতীয়টি বিচার সংক্রান্ত (Judicial and deliberative)। লর্ডসভা পার্লামেণ্টের উচ্চ কক্ষ। কোনও বিল আইনে পরিণত হইবার পূর্বে কমন্সসভা কর্তৃক অনুমোদিত হইবার পর লর্ডসভার অনুমোদন দরকার হয়। যে কোন প্রকার সাধারণ বিল উচ্চকক্ষ আলোচনা করিতে পারে এবং ভোট প্রদান করিতে পারে। এই কাজে লর্ডসভার পক্ষে কমন্সসভার ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা কিছু পরিমাণে প্রতিরোধ করা সম্ভবপর হয়; কিন্তু, ১৯১১ সালের পার্লামেণ্টারী আইন প্রবর্তিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত লর্ডসভা কমন্সসভার সহিত আইন প্রণয়ন ব্যাপারে প্রায় সমান ক্ষমতা ভোগ করিত। ১৯১১ সালের এবং ১৯৪৯ সালের পার্লামেণ্টারী আইন লর্ডসভার ক্ষমতা বিশেষভাবে সংকুচিত করিয়াছে। ১৯৪৯ সালের আইন অনুযায়ী লর্ডসভা যদি কমন্সসভা কর্তৃক অনুমোদিত কোনও আইনের খসড়া অনুমোদন না করে, অথচ কমন্সসভা যদি ইহা পর পর দুইবার অনুমোদন করে, তবে বিলটি এমনিতেই রাজা বা রানীর অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হয়। লর্ডসভা বিলটিকে আইনে পরিণত হওয়ায় বাধার সৃষ্টি করিতে পারে না, তবে ইহাতে বিলম্ব ঘটাইতে পারে। তবে এইক্ষেত্রে কমন্সসভা যদি বিলটি দুইবার অনুমোদন করিয়া আইনে পরিণত করিতে চাহে, তবে প্রথমবার অনুমোদনের জন্য বিলটির প্রথম পাঠ এবং দ্বিতীয়বার চূড়ান্ত অনুমোদনের মধ্যে একবৎসর সময়ের ব্যবধান রাখিতে হইবে। লর্ডসভা অর্থসংক্রান্ত বিল উত্থাপন করিতে পারে না, এবং অর্থসংক্রান্ত বিল অনুমোদনের জন্য বর্তমান লর্ডসভার সম্মতিরও প্রয়োজন হয় না। কোনও বিল আইনে পরিণত হইবার সময়টি লর্ডসভা এক বৎসর পিছাইয়া দিতে পারে। অনেক সময়ে এই সময়ের ব্যবধানে কোন বিলের প্রতিকূলে জনমত গঠিত হইতে পারে।

লর্ডসভার ক্ষমতার ক্রমিক হ্রাস

লর্ডসভা বিচার বিভাগীয় ক্ষমতাও ভোগ করে। যুক্তরাজ্য এবং আয়ারল্যাণ্ডের সর্বোচ্চ আপীল আদালত হইল লর্ডসভা। সাধারণ লর্ডগণ আপীল বিচারকাজে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন না। শুধু আইনজ্ঞ লর্ডগণ, (নয়জন সাধারণ আপীল লর্ডসমেত) এই কাজে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

লর্ডসভার কোন সদস্য যদি গুরুতর অপরাধ অথবা বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে অভিযুক্ত হন, তবে তাহার বিচার করিবার মূল ক্ষমতা লর্ডসভার আছে। তাহা ছাড়া, কমন্সসভা যদি কখনও কোনও উচ্চপদস্থ রাজকীয় কর্মচারীকে অপসারণ করিবার (impeachment) প্রস্তাব আনয়ন করে, তখন লর্ডসভা ইহার আদালত হিসাবে কাজ করে।

লর্ডসভার বিচার-বিভাগীয় ক্ষমতা

লর্ডসভার সমালোচনা (Criticisms of the House of Lords)

অধ্যাপক লাস্কির মতে রাজনীতিক্ষেত্রে লর্ডসভা কখনই নিরপেক্ষ হইতে পারে নাই এবং জনমত সম্পর্কে স্বাধীনভাবে চিন্তা করে নাই। লর্ড বেল্‌ফোর (Lord Balfour) একবার বলিয়াছিলেন যে, আইনসভার ভিতরেই হোক অথবা বাহিরেই হোক, লর্ডসভা সর্বদা দেখিতে চাহে যেন রক্ষণশীল দল সর্বদা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে।[১] র‍্যামসে মুইর (Ramsay Muir) লর্ড সভাকে "The common fortress of wealth" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। কারণ, লর্ডসভার সদস্যগণের মধ্যে সকলেই সমাজের অভিজাত, ধনী সম্প্রদায়ের লোক। বিভিন্ন কোম্পানীর ডিরেক্টরগণের মধ্যে যতজন কমন্স সভার সদস্য, তাহা অপেক্ষা বেশী তাহারা লর্ডসভার সদস্য। গণতান্ত্রিক দেশে এই ধরণের একটি অভিজাতগণের সংসদ বজায় রাখার কোন সার্থকতা নাই। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে রক্ষণশীল দল ব্যতীত অন্য কোন দল সরকার গঠন করিলে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে লর্ডসভা প্রতিকূলতার সৃষ্টি করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, লর্ড সভার ইতিহাসে দেখা যায় যে ইহার অধিবেশনে অধিকাংশ সদস্যগণের উপস্থিতি খুবই কম থাকে। অধ্যাপক লাস্কি বলেন, "The House of Lords consists of some seven hundred and fifty members ; but it is a very different body in its working aspects. Its normal attendance is about thirtyfive ; and there are only thirteen occasions since 1919 when more than two hundred members have been present at debate." লর্ডসভার

১। "The House of Lords is not an impartial and objective body which takes an independent and detached view of the public opinion it encounters. Its composition makes is and is intended to make it, a fundamental part of the institutional strategy of the Right. It is intended to see as Lord Balfour once put it, that in office or out of it, the Conservative Party is permanently in power." (Laski)

সদস্যগণ উত্তরাধিকারসূত্রে ইহার সদস্য হইয়া থাকেন। এই সদস্যগণের মধ্যে অনেকেই দেশের রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকেন না। গণতান্ত্রিক দেশের আদর্শের সংগে এই ধরণের উত্তরাধিকারসূত্রে গঠিত আইনসভার খাপ খায় না। জেনারেল ব্রাইটের (General Bright) মতে "The House of Lords is not and cannot be perpetual in a free country." অনেকদিন পূর্বেই ফরাসী লেখক আবে সিঁয়ে (Abbe Seieyes) দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার বিরোধিতা করিয়া বলিয়াছিলেন যে উচ্চপরিষদ যদি আইন প্রণয়নের ব্যাপারে নিম্নপরিষদের সহিত একমত হয় তবে ইহা বাহুল্য মাত্র, আর যদি ইহা নিম্নপরিষদের সহিত একমত না হয়, তবে ইহা বিপজ্জনক। (Of what use will a Second Chamber be ? If it agrees with the Representative House it will be superfluous, if it disagrees mischievous.)

লর্ডসভার ক্ষেত্রেও সমালোচকগণ আবে সিঁয়ের এই উক্তি প্রয়োগ করেন। সর্বশেষে, লর্ডসভা বজায় না রাখিলে বৃটিশ সরকারের অনেক খরচ বাঁচিয়া যাইত। কারণ এই সভা বজায় রাখার অর্থ হইল লর্ডগণের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করা।

লর্ডসভার উপযোগিতা (Utility of the House of Lords)

লর্ডসভার বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনা করা হইলেও ইহার যে কোন উপযোগিতা নাই, তাহা নহে। ১৯১৮ সালে লর্ড ব্রাইসের (Lord Bryce) সভাপতিত্বে যে সংস্কার কমিটি গঠন করা হইয়াছিল, সেই কমিটি লর্ড সভার চারিটি বিশেষ কাজের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ, জনমত যাচাই করিয়া লইবার জন্য কোন বিলের অনুমোদন করিবার সময় লর্ডসভা দেরী করিতে পারে। শাসনতন্ত্রের মৌলিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নে এই বিলম্ব হওয়ার বিশেষ মূল্য আছে। দ্বিতীয়তঃ, লর্ডসভা আইনের ক্ষেত্রে কমন্সসভা কর্তৃক অনুমোদিত বিলগুলি সম্বন্ধে খোলাখুলি আলোচনা করিয়া ইহার সংশোধন সুপারিশ করিতে পারে। অনেক সময় কাজের চাপে হয়ত কমন্সসভা একটি বিলের নানাদিক বিবেচনা না করিয়াই ইহা অনুমোদন করিতে পারে। কিন্তু, এই ব্যাপারে লর্ডসভার বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা সম্ভবপর হয়। তৃতীয়তঃ, যে সমস্ত বিল লইয়া বিতর্কের অবকাশ নাই, সেই সকল বিল প্রথমে লর্ডসভায় উপস্থাপিত করিয়া আইন প্রণয়নের কাজ সহজ করা যাইতে পারে এবং কমন্সসভার কাজের চাপ কমাইয়া দেওয়া

যাইতে পারে। চতুর্থতঃ, কমন্সসভা কর্তৃক অনুমোদিত বিলগুলির পরিবর্তন লর্ড সভায় সাধিত হইতে পারে। এক্ষেত্রে লেকির (Lecky) উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "The necessity of a Second Chamber to exercise a controlling, modifying, retarding influence, has acquired almost the position of an axiom." হাউস অব্ লর্ড সম্বন্ধে আমেরিকান লেখক মুনরো (Munro) বলেন, "It examines and revises non-financial measures. It insists, when the occasion arises that ample time be given for a full public discussion of all such bills before they become a part of the Law of the land. It compels sober second thought and gives opportunity for passions to subside."

লর্ডসভার অবসান হওয়া উচিত কিনা—

অনেকে বলেন, লর্ডসভার উচ্ছেদ হওয়া উচিত। কারণ, ইহা জাতীয় প্রগতির অন্তরায়। লর্ডসভা রক্ষণশীল এবং প্রতিক্রিয়াশীল দল অথবা শ্রেণীগুলির স্বার্থ সংরক্ষণের একটি অবলম্বন। তাহাছাড়া, প্রকৃতপক্ষে ইহার কোনও ক্ষমতা নাই। আইন প্রণয়নে কমন্সসভাই যাহা কিছু করার সব করে। ক্যাবিনেট সদস্যগণের নির্দেশেই পার্লামেণ্ট প্রকৃতপক্ষে পরিচালিত হয়। যখন জাতীয় প্রয়োজনে কোনও আইন দ্রুত প্রণয়ন করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়, তখন লর্ডসভা ইহার বিরোধিতা করিয়া অথবা ইহার প্রণয়নে বিলম্ব ঘটাইয়া জাতীয় প্রগতির পথ রুদ্ধ করে। কিন্তু অনেকে মনে করেন, লর্ডসভার কিছু উপযোগিতা আছে ; কমন্সসভা কর্তৃক অনুমোদিত বিল আইনে পরিণত হইতে এক বৎসর বিলম্ব ঘটাইয়া লর্ডসভা জনসাধারণকে পুনরায় সেই বিল সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করিবার সুযোগ দেয় এবং এইভাবে জনমতের উপর প্রভাব বিস্তার করে। দ্বিতীয়তঃ, আপীল আদালতের কাজ করায় লর্ডসভা একেবারে নিষ্ক্রিয় বসিয়া থাকে না। তৃতীয়তঃ, লর্ডসভা ইহার কমিটির মাধ্যমে কোন স্থানীয় স্বার্থ সংক্রান্ত বিল সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করিতে পারে। তাহাছাড়া, অনেক সময় অবিতর্কমূলক বিল উত্থাপন ও বিচার-বিবেচনা করিয়া লর্ডসভা কমন্সসভার সময় সংক্ষেপ করিতে সাহায্য করে। সর্বশেষে বৈদেশিক বিষয়, দেশরক্ষা, কমনওয়েলথের সদস্য রাষ্ট্রগুলির সহিত ইংলণ্ডের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে লর্ডসভা মূল্যবান আলাপ-আলোচনা করিয়া বিভিন্ন সমস্যাগুলির উপর নূতন আলোক সম্পাত করিতে পারে। লর্ডসভায় অনেক আইনজ্ঞ, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, অবসরপ্রাপ্ত সেনাধ্যক্ষ ও রাজনীতিজ্ঞ থাকেন। তাহাদের সাহায্যে দেশের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে লর্ডসভার বিতর্ক জনমতের উপর বিশেষ প্রভাব

বিস্তার করে। লর্ডসভাকে কেন্দ্র করিয়াও ইংলণ্ডে অনেক প্রথাগত বিধান গড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং লর্ডসভার বিলোপ সাধন করিলে প্রথাগত বিধান-গুলির মর্যাদাও রক্ষিত হইবে না।

আমাদের মনে হয়, লর্ডসভার বিলোপসাধন না করিয়া ইহার সংস্কার সাধন-করা উচিত। আমেরিকার সিনেটের মত লর্ডসভাকে এত বেশী ক্ষমতা প্রদান না করিয়াও ইহার সংস্কারসাধন করা যাইতে পারে। রাষ্ট্রের অর্থসংক্রান্ত বিলের আইনে পরিণত হওয়ার ব্যাপারে লর্ডসভার সম্মতি প্রদানের বিধান চালু হওয়া উচিত। লর্ডসভার বিলোপসাধনের বিপক্ষে যেসকল যুক্তি উপরে প্রদান করা হইল, সেইগুলি যাহাতে বাস্তবিকই ফলপ্রসূ হইতে পারে সেইজন্যই লর্ডসভার সংস্কার সাধন করা উচিত। লর্ডসভার উপযোগিতার যে চারিটি কারণ উপরে আলোচনা করা হইয়াছে সেইগুলি ভালভাবে কার্যকরী হইবে যদি লর্ডসভার সদস্যসংখ্যা কমাইয়া ইহাকে আরও অধিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়। কমন্সসভা প্রকৃতপক্ষে ক্যাবিনেট কর্তৃক পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে যদি লর্ডসভাকেও কিছু ক্ষমতা দেওয়া হয়, তবে রাষ্ট্রের আইন আইনপ্রণয়ন ব্যাপারে শুধু ক্যাবিনেট-চালিত কমন্সসভাই নহে, লর্ডসভারও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকিবে।

লর্ডসভার সম্পূর্ণ বিলোপ না করিয়া সংস্কার করা উচিত

লর্ডসভার সদস্যদের অধিকারসমূহ (Privileges of the members of the House of Lords) ইংলণ্ডের লর্ডসভার সদস্যগণ নিম্নলিখিত অধিকার ভোগ করিয়া থাকেন : (১) পার্লামেন্টের অধিবেশন আরম্ভ হইবার পূর্বে এবং পরে ৪০ দিনের মধ্যে লর্ডসভার কোন সদস্যকে দেওয়ানী অন্যায়ের জন্য আটক করা যায় না; (২) লর্ডসভার সদস্যগণ প্রত্যেকে পৃথকভাবে রাজা, অথবা রানীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন, কিন্তু কমন্সসভার সদস্যগণকে সমষ্টিগতভাবে স্পীকারের মাধ্যমে রাজা বা রানীর সহিত দেখা করিতে হয়। (৩) লর্ডসভার সদস্যগণ বক্তৃতা প্রদানের স্বাধীনতা ভোগ করেন। লর্ডসভার অধিবেশন আরম্ভ করিবার সময় প্রত্যেক লর্ডকে ব্যক্তিগতভাবে আহ্বান করা হয়। কিন্তু, কমন্সসভার অধিবেশন আরম্ভ হইবার সময় সদস্যগণকে সমষ্টিগতভাবে আহ্বান করা হয়। (৫) লর্ডসভা নিজের অবমাননার জন্য কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শাস্তি প্রদান করিতে পারে; কাহাকেও আটক করা হইলে অধিবেশন বন্ধ হইবার ফলে সে মুক্তি পায় না; (৬) লর্ডসভা গ্রেটবৃটেন এবং উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের আপীল আদালত হিসাবে কাজ করে; (৭) কমন্সসভা কর্তৃক আনীত অপসারণের শাস্তি সম্পর্কিত প্রস্তাব (impeachments) লর্ডসভা বিচার-বিবেচনা করিতে পারে; এবং (৮) প্রত্যেক লর্ডেরই আলোচনার সময় সংখ্যাধিক্যের সংগে মতানৈক্য ঘটিলে নিজের মতামত লর্ডসভার কার্য-বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার অধিকার আছে।

কমন্সসভার সদস্যদের অধিকার (Privileges of the members of the House of Commons) কমন্সসভার সদস্যগণ নিম্নলিখিত অধিকার ভোগ করিয়া থাকেন : (১) পার্লামেন্টের অধিবেশন আরম্ভ হইবার পূর্বে এবং পরে ১০ দিনের মধ্যে কমন্সসভার কোন সদস্যকে বিশ্বাসঘাতকতা অথবা নাশমূলক কোন ক্রিয়াকলাপের অভিযোগ ব্যতীত গ্রেপ্তার করা যায় না ; (২) ১৬৮৯ সালের অধিকারের বিধি অনুযায়ী কমন্সসভার সদস্যগণ আইনসভার বিতর্কের সময় বক্তৃতা প্রদানের পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেন এবং সেই বক্তৃতার জন্য কখনও শাস্তি পাইতে পারেন না ; (৩) স্পীকারের মাধ্যমে সমষ্টিগতভাবে কমন্সসভার সদস্যগণ রাজা (বা রানীর) সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন ; (৪) নিজেদের কার্যবিবরণী ও কার্যসূচী নিয়ন্ত্রিত করিবার অধিকার কমন্সসভার সদস্যগণের থাকিবে ; এবং (৫) অধিকার ভংগের অপরাধে কারাদণ্ড দাবীর অধিকারও কমন্সসভার সদস্যদের থাকে।

সরকারী বিল সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন-পদ্ধতি (Process of law-making in cases of Public Bills) :

একটি বিলের আইনে পরিণত হইবার পথে অনেকগুলি স্তর আছে।

প্রথম স্তরে বিলটি বিষয়বস্তুর সাধারণ বর্ণনা-সংবলিত লিপি অনুযায়ী বিলের উত্থাপক নিজে অথবা সরকারপক্ষের পার্লামেন্টোরী কৌঁসুলী ইহার খসড়া (draft) রচনা করেন। দ্বিতীয় স্তরে বিলটি আইনসভায় উত্থাপিত হয়। বিলটি উত্থাপিত করার দুইটি উপায় আছে। প্রথম উপায়ে প্রস্তাব করিয়া (on a motion) এবং দ্বিতীয় উপায়ে লিখিত নোটিশ (on a written notice) প্রদান করিয়া বিলটি উত্থাপন করা হয় এবং প্রথমবার পাঠ করা হয়। প্রথম পাঠের (first reading) সময় বিলটি লইয়া কোন বিতর্কের অনুষ্ঠান করা হয় না। ইহার পর স্পীকারের নির্দেশে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী কর্তৃক বিলটির দ্বিতীয় পাঠের জন্য দিন স্থির করা হয়। বিলটির দ্বিতীয় পাঠ (second reading) হইল আইন প্রণয়নের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। এই সময় বিলের সাধারণ নীতিগুলি লইয়া সরকার পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়, এবং বিলটির নীতিগত অনুমোদনের জন্য ভোট গ্রহণ করা হয়। ভোটে যদি সরকার পক্ষ পরাজিত হয় তবে মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করিতে হয় এবং বিলটিও নাকচ হইয়া যায়। দ্বিতীয় পাঠের পর বিলটি স্থায়ী কমিটিগুলির (Standing Committees) একটিতে পাঠান হয়। অথবা সমগ্র সভার কমিটির (The Committee of the Whole House) অনুমোদিত প্রস্তাব অনুযায়ী বিলটিকে কোন সিলেক্ট কমিটিতে (Select Committee) প্রেরণ করা হয়। বিলটি সম্বন্ধে কমিটির বিচার-বিবেচনা

শেষ হইলে বিলটি কমন্সসভায় ফেরত আসে। কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে তখন বিলটির প্রতিটি ধারা অনুযায়ী বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় এবং পার্লামেন্টের সংখ্যাধিক্যের মতে কোন কোন ধারায় প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়। যদি কমিটি বিলটির কোনপ্রকার সংশোধন না করেন, তবে কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে পুনরায় বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় না,—কেননা তখন ইহার প্রয়োজন থাকে না। তৃতীয় পাঠের (third reading) সময় বিলটির শুধু মৌখিক বা আনুষ্ঠানিক পরিবর্তন হইতে পারে। কমন্সসভা তখন হয় বিলটি অনুমোদন করে অথবা ইহা পরিত্যাগ করে। তবে সভার সদস্যগণ তখনও নীতিগতভাবে বিলটির সমালোচনা করিতে পারেন। তৃতীয় পাঠেও যদি বিলটি অনুমোদিত হয় তবে কমন্সসভা হইতে বিলটি লর্ডসভায় প্রেরিত হয়। লর্ডসভায়ও অনুরূপভাবে বিলটিকে অনুমোদিত হইতে হয়; তবে লর্ডসভায় বিলটিকে অনুমোদন করার উপায়টি অপেক্ষাকৃত সহজ ও দ্রুত হয়। লর্ডসভা সাধারণতঃ কমন্সসভা কর্তৃক প্রেরিত বিল অনুমোদন করেন। যদি উভয় কক্ষের মধ্যে বিলটির কোন ধারা লইয়া মতভেদ হয়, তবে উভয় কক্ষের সদস্যগণ (লর্ডসভার কতিপয় সদস্য এবং ইহার দ্বিগুণ সংখ্যক কমন্সসভার সদস্যগণ) একটি বৈঠকে মিলিত হইয়া তাহা বিবেচনা করিয়া মতভেদের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করেন। তাহা ছাড়া, এক কক্ষের কমিটি অপর কক্ষের কমিটির সহিত বাণী বিনিময় করিয়া মতবিরোধ মিটাইবার চেষ্টা করেন। ইহার পর বিলটি রাজা বা রানীর নিকট প্রেরিত হয়। রাজা বা রানী বিলটি অনুমোদন করিলে ইহা আইনে পরিণত হয়।

অর্থসম্বন্ধীয় বিলের আইনে পরিণত হওয়ার পদ্ধতি (Process of Law-making in regard to money bills):

অর্থ সংক্রান্ত বিলগুলি সরকারের আয়-ব্যয়, ঋণগ্রহণ অথবা ঋণপরিশোধের সহিত জড়িত। অর্থসম্বন্ধীয় বিলগুলিকে ইংলণ্ডে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা, (a) অর্থ-বিল (finance bill) (b) বিনিয়োগ-বিল (appropriation bill) এবং (c) সঞ্চিত তহবিল বিল (consolidation fund bill)। বৃটিশ সরকার ব্যাংক অফ্ ইংলণ্ডে সঞ্চিত তহবিলে ইহার সমুদয় আয় জমা রাখে। সরকারের ব্যয় দুই প্রকারের হয়। কতিপয় ব্যয় সরকারের লিপিবদ্ধ আইন অনুযায়ী হয় এবং এইগুলিতে পার্লামেন্টের সম্মতির প্রয়োজন হয় না। যেমন কম্পট্রোলার ও অডিটার-জেনারেলের বেতন, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিগণের পেন্সন এবং জাতীয় ঋণ পরিশোধ, ইত্যাদি। এইগুলিকে সঞ্চিত তহবিলী ব্যয় (The Consolidated Fund Services) নামে অভিহিত করা হয়। তাহা ছাড়া, কতিপয় ব্যয় আছে, যেইগুলিকে পার্লামেন্টের

অনুমান-সাপেক্ষ ব্যয় (The Supply Services) নামে অভিহিত করা হয়। এই আনুমানিক হিসাবগুলি (estimates) কতিপয় খাতে ভাগ করা হয় এবং ভাগগুলিকে 'ভোট' (votes) নামে অভিহিত করা হয়। প্রত্যেকটি 'ভোট' আবার কতকগুলি 'উপখাত' (sub-heads) এবং 'দফায়' (items) বিভক্ত।

প্রতি বৎসর অক্টোবর মাসে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে এই মর্মে নোটিশ দেওয়া হয় যেন ইহারা আগামী বৎসরের সম্ভাব্য খরচের একটি আনুমানিক হিসাব অর্থদপ্তরের নিকট নির্দিষ্ট ফর্মে দাখিল করে। অর্থদপ্তর এই আনুমানিক হিসাবগুলির খুঁটিনাটি পরীক্ষা করিয়া দেখে এবং অর্থদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তরের যৌথ আলোচনার মাধ্যমে হিসাবের মীমাংসা করা হয়। জানুয়ারীর শেষ অথবা ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমে কমন্সসভায় এই হিসাবগুলি উত্থাপিত হয়। তখন কমন্সসভা "সমগ্র কক্ষ সরবরাহ কমিটি" (The Committee of the Whole in Supply) এবং "সমগ্র কক্ষ উপায়-নির্ধারণী কমিটি" (The Committee of the Whole on Ways and Means) গঠন করে। সরবরাহ কমিটি সরকারী বার্ষিক ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখে এবং ইহা অনুমোদন করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করে। উপায় নির্ধারণী কমিটির কাজ হইল সরবরাহ কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত সরকারী ব্যয়ের জন্য সঞ্চিত তহবিল হইতে অর্থ প্রদান করিবার এবং প্রয়োজনীয় কর স্থাপন করিবার প্রস্তাব অনুমোদন করা। কমিটিগুলি মোট সরকারী ব্যয়ের হিসাব সংক্রান্ত আলোচনার জন্য কমন্স সভায় ২৬ দিন সময় পায়। এই ২৬ দিনের মধ্যেই অনুপূরক হিসাব (Supplementary Estimates) এবং বিভিন্ন 'ভোট' (Votes on Account) লইয়া সমুদয় হিসাবের আলোচনা ও অনুমোদন শেষ করিতে হয়। ইহার পর বিনিয়োগ বিলটি (appropriation bill) কমন্সসভার সম্মতির জন্য প্রেরিত হয়।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের প্রয়োজন অনুযায়ী হিসাব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া অর্থমন্ত্রী (Chancellor of the Exchequer) বাজেটটি কমন্সসভায় উত্থাপন করেন, এবং একটি বক্তৃতার মাধ্যমে বাজেট বিতর্কের সূচনা করেন। কতিপয় আয়ের হিসাব আছে যেইগুলির জন্য পার্লামেন্টের সম্মতির প্রয়োজন হয় না। তবে আয়কর, চা-এর উপর শুল্ক, ইত্যাদি ধার্য করিবার জন্য পার্লামেন্টের সম্মতির প্রয়োজন হয়। আয় এবং ব্যয়ের সমুদয় হিসাবপত্র কমিটিদ্বয় কর্তৃক বিবেচিত হইবার পর ফিনান্স বিলের (finance bill) আকারে পার্লামেন্টে উত্থাপিত হয়। এইগুলি বিবেচনার জন্য সমগ্র কমন্সসভার একবার সরবরাহ কমিটি (Committee of the Whole in

Supply) এবং আরেকবার উপায় নির্ধারণ কমিটি (Committee of the Whole on Ways and Means) হিসাবে অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনের সময় স্পীকার কমিটির সভাপতিত্ব করেন না,—কমিটির সভাপতিই ইহার সভাপতিত্ব করেন। কমন্সসভা কর্তৃক বিলগুলির তৃতীয় পাঠ শেষ হইয়া গেলে ও অনুমোদিত হইয়া গেলে স্পীকার এইগুলিকে অনুমোদন করেন, এবং ১৯১১ সালের পার্লামেণ্টারী আইন অনুযায়ী সেইগুলি লর্ডসভায় প্রেরিত হয়। লর্ডসভাকে বিনা সংশোধনে এই বিলগুলিকে এক মাসের মধ্যে অনুমোদন করিতে হয় এবং তারপর এইগুলি রাজার সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হয় ও আইনে পরিণত করা হয়।

বর্তমানে কমন্সসভার সমুদয় কাজেই ক্যাবিনেট ইহাকে নিয়ন্ত্রিত করে। প্রকৃতপক্ষে সরকারী আয়-ব্যয়ের উপরেও পার্লামেণ্ট নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেছে না। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে ট্রেজারী বিভাগই নিজের দায়িত্বে সরকারী আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রণয়ন করে। নূতন কর বসাইবার প্রস্তাব অথবা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব পার্লামেণ্ট করিতে পারে না। কতিপয় আয়-ব্যয়ের হিসাবের উপর, যেমন, কম্পট্রোলার ও অডিটার জেনারেলের বেতন, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের পেন্সন ইত্যাদিতে, পার্লামেণ্টের প্রকৃতপক্ষে কোন নিয়ন্ত্রণী ক্ষমতা নাই। কম্পট্রোলার ও অডিটার জেনারেল সরকারী আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করিয়া যে রিপোর্ট প্রদান করেন, তাহা হাউস অফ কমন্স কর্তৃক সরকারী হিসাবের উপর স্থায়ী কমিটির (Standing Committee on Public Accounts) নিকট প্রেরণ করা হয়। এই কমিটি রিপোর্টটি পরীক্ষা করিয়া সরকারী আয়-ব্যয় হিসাবের কোন গরমিল খুঁজিয়া পাইলে সরকারের নিকট কৈফিয়ত তলব করে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় সরকারী ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে এই কমিটির কার্যকারিতা খুব বিশেষ নাই। কেননা, ক্যাবিনেট নিজের দলের সংখ্যাধিক্যের জোরে অর্থসংক্রান্ত সমুদয় সরকারী ব্যবস্থার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি অনায়াসে আদায় করিতে পারে। সময়ের অভাব এবং কাজের চাপ ও জটিলতার জন্য কমন্সভার পক্ষেও সামগ্রিকভাবে সর্বদা সরকারী ব্যয়ের বিচার-বিবেচনা করা সম্ভবপর হয় না।

বিশেষ স্বার্থ-সংক্রান্ত বেসরকারী বিল (Private Bills)

এই ক্ষেত্রে বিল উত্থাপনের পূর্বে বিশেষ স্বার্থ-সংক্রান্ত বিলের উদ্যোক্তাগণ (Promoter) গেজেটে অথবা স্থানীয় সংবাদপত্রে বিলের বিষয় সম্বন্ধে

জ্ঞাতব্য তথ্য প্রকাশ করেন। তারপর বিলের ছাপান প্রতিলিপি সহ বিলটিকে বিশেষ স্বার্থ সংক্রান্ত বিলের অফিসে (Private Bill Office) দাখিল করিতে হয় এবং ইহার অনুলিপি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদপ্তরগুলিতে প্রেরণ করিতে হয়। ইহার পর এই আবেদনপত্র বা বিলের পরীক্ষকগণ (The Examiners of petitions for Private Bills) পরীক্ষা করিয়া দেখেন বিলটি নির্দেশের সর্ত পূরণ করিয়াছে কি না। যদি বিলটি সমুদয় সর্ত পূরণ করিয়াছে এই মর্মে পরীক্ষকগণ রিপোর্ট করেন তবে ইহা পার্লামেণ্টের দুই কক্ষের একটিতে উত্থাপিত হয় এবং ইহার প্রথম পাঠ হয়। প্রথম পাঠটি (first reading) নিতান্তই আনুষ্ঠানিক ব্যাপার। দ্বিতীয় পাঠে (second reading) যদি বিলটি সম্বন্ধে কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপিত না হয়, তবে ইহা "আপত্তি-বিহীন বিল কমিটি"র (Unopposed Bill Committee) নিকট প্রেরিত হয়। আর যদি বিলটি সম্বন্ধে কোনও সদস্য আপত্তি তোলেন, তবে ইহাকে সাধারণ প্রাইভেট কমিটির (Ordinary Private Bills Committee) নিকট প্রেরণ করা হয়। এই কমিটির কাজ অনেকটা বিচার-বিভাগীয় তদন্তের মত। কমিটি বিলের উদ্যোগ এবং আপত্তিকারী উভয়পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া সংশ্লিষ্ট কক্ষের নিকট রিপোর্ট প্রদান করেন। তারপর বিলটির তৃতীয় পাঠ হয় এবং স্বাভাবিক নিয়মের মধ্য দিয়া আইনে পরিণত হয়।

এই ব্যবস্থাটি ব্যয়বহুল। তবে ইহার একটি সুবিধা হইতেছে এই যে যদি কোন কর্তৃপক্ষ অথবা প্রতিষ্ঠান সাধারণ আইনে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে অধিকতর ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার অধিকার পাইতে চান, তাহারা এই ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন।

অনুমোদন-সাপেক্ষ নির্দেশ (Provisional Orders)

এই ব্যবস্থা অনুযায়ী স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অথবা বিধিবদ্ধ আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত কোন সংস্থা সাধারণ আইনের অতিরিক্ত কোন ক্ষমতা বা অধিকার পাইবার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদপ্তরের নিকট আবেদন করে। সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগ আবেদনপত্রটি পরীক্ষা করিয়া আবেদনপত্রের সার্থকতা সম্বন্ধে সন্তুষ্ট হইলে প্রার্থিত নির্দেশ প্রদান করে। কিন্তু এই নির্দেশটি পার্লামেণ্টের অনুমোদন-সাপেক্ষ থাকে। সেইজন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী অথবা তাঁহার পক্ষে অন্য কেহ এই নির্দেশের অনুমোদনের জন্য পার্লামেণ্টে অনুমোদন বিল (Confirmation Bill) উত্থাপন করেন। তারপর, প্রাইভেট বিলের নিয়মানুসারেই এই বিলগুলি পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সাধারণতঃ অনুমোদন বিলগুলি

(Confirmation Bill) সরকারের পক্ষ হইতে উত্থাপিত হয় বলিয়া এইগুলিতে কেহ আপত্তি করেন না। সেইজন্য প্রায়ই এই বিলগুলিকে 'আপত্তি-বিহীন বিল কমিটির' (Unopposed Bills Committee) নিকট প্রেরণ করা হয়।

কমন্সসভার গঠন ও কাজ (Composition and Functions of the House of Commons):

কমন্সসভাকে আইনসভার নিম্নকক্ষ বলা হইলেও ইহা লর্ডসভা অপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষমতাশালী ও গুরুত্বপূর্ণ।

কমন্সসভার বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৬২৮ জন। পার্লামেন্টের সদস্যগণ প্রত্যেকেই বাৎসরিক একহাজার পাউণ্ড বেতন পাইয়া থাকেন। যাঁহাদের ভোটাধিকার আছে, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই পার্লামেন্টের সদস্যপদের জন্য নির্বাচনে দাঁড়াইবার অধিকার আছে। ১৯১১ সালের পার্লামেন্টের আইন অনুযায়ী কমন্সসভার স্থায়িত্ব সাধারণভাবে পাঁচবৎসর; অবশ্য মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী সংকটকালে রাজা কমন্সসভা ভাংগিয়া দিতে পারেন। সামগ্রিকভাবে তাঁহাদের কাজগুলিকে নিম্নলিখিত ছয়ভাগে বিভক্ত করা চলে—(১) আইন প্রণয়ন,—ইহাই কমন্সসভার প্রধান কাজ, (২) সরকারী আয়ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, (৩) সরকারকে নিয়ন্ত্রণ, (৪) সরকারের নিকট অভিযোগ জ্ঞাপন, এবং ইহার প্রতিকার দাবী করা, (৫) শাসন সংক্রান্ত বিষয়ের খবরাখবর রাখা, এবং (৬) প্রধানমন্ত্রী মনোনয়নে সাহায্য করা।

কমন্সসভার সদস্যগণের বিভিন্ন কাজের পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, ইহার প্রধান কাজ হইতেছে আইন প্রণয়ন করা। আইনতঃ পার্লামেণ্ট হইতেছে সার্বভৌম আইনপরিষদ। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে আইন প্রণয়নের কাজ কমন্সসভাই নির্বাহ করে। আইনের খসড়া তৈয়ারী করা হইতে আরম্ভ করিয়া—প্রথম পাঠ, দ্বিতীয় পাঠ, সংশ্লিষ্ট কমিটিতে প্রেরণ এবং তৃতীয় পাঠের মাধ্যমে ইহাকে চূড়ান্তভাবে আইনে পরিণত করার কাজ মন্ত্রীসভার তত্ত্বাবধানে এবং নিয়ন্ত্রণে কমন্সসভাই নির্বাহ করিয়া থাকে। দেশের শাসনবিভাগের কাজ তত্ত্বাবধান করিবার ক্ষমতা কমন্সসভার হাতে থাকে। কমন্সসভার সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতাকেই রাজা মন্ত্রীসভা গঠন করিবার জন্য আহ্বান করেন। কোন মন্ত্রীসভাই কমন্সসভার নির্দেশ অথবা ইচ্ছাকে অবহেলা করিতে সাহসী হন না। মন্ত্রীগণ সরকারের যে কার্যসূচী গ্রহণ করেন তাহাকে কতিপয় আইনের মাধ্যমে বাস্তবে রূপায়িত করাই পার্লামেন্টের কাজ। কিন্তু, একথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে পার্লামেন্টের নামে আইন

প্রণয়নের সমুদয় কাজ নির্বাহ করা হইলেও আইন প্রণয়নের সমুদয় ক্ষমতা ক্রমেই পার্লামেণ্ট হইতে মন্ত্রীসভার হাতে অর্থাৎ শাসনবিভাগের হাতে চলিয়া আসিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, মন্ত্রীগণের প্রস্তাবিত আইনের খসড়াটিকে যদি পার্লামেণ্ট চূড়ান্ত আইনের রূপ না দেয়, তবে প্রধানমন্ত্রী রাজা বা রাণীকে দিয়া কমন্সসভা ভাংগিয়া দিতে পারেন। সুতরাং, আইন প্রণয়ন ক্ষেত্রেও কমন্সসভা শুধু নামেই কর্তা, কার্যক্ষেত্রে ইহার কোনপ্রকার কর্তৃত্ব নাই। সেইজন্য পার্লামেণ্ট সম্বন্ধে সিড্নি লো (Sidney Low) বলিয়াছিলেন, "The show of power is with it···Much of its efficiency has passed to other agents. Its own servants have become, for some purpose, its masters." সুতরাং পার্লামেণ্টের আসল কাজ আইন প্রণয়ন নহে, ইহার আসল কাজ হইতেছে সরকারের নিকট অভিযোগ জ্ঞাপন করিয়া ইহার প্রতিকারের দাবী করা, মন্ত্রীগণকে সরকারী ক্রিয়াকলাপের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া সরকারকে দোষত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তোলা এবং জনমতের উপর প্রভাব বিস্তার করা, সরকারের কাজের সমালোচনা করা এবং প্রয়োজন হইলে (সরকার বিরোধী দলকর্তৃক) সরকারের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক প্রস্তাব আনা এবং বাস্তবক্ষেত্রে রাষ্ট্রনায়ক মনোনয়নে সাহায্য করা। বাস্তবক্ষেত্রে সরকারী আয়ব্যয়ের উপরেও পার্লামেণ্টের কোনপ্রকার নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা নাই। সব কিছুই ক্যাবিনেটের হাতে।

সরকারী আয়-ব্যয়ের উপর কমন্সসভার কর্তৃত্ব (Parliamentary Control over finance):

বর্তমানে কমন্সসভার সমুদয় কাজেই ক্যাবিনেট ইহাকে নিয়ন্ত্রিত করে। প্রকৃত পক্ষে সরকারী আয়-ব্যয়ের উপরেও পার্লামেণ্ট নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেছে না। পার্লামেণ্ট মন্ত্রীসভার কাজের সমালোচনা করে, সরকারের নিকট বিভিন্ন অভাব অভিযোগ জ্ঞাপন করে এবং অবশেষে ক্যাবিনেটের নির্দেশে সমুদয় সরকারী ব্যবস্থার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান করে। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে ট্রেজারী বিভাগই নিজের দায়িত্বে সরকারী আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রণয়ন করে। এইজন্য মে (May) বলিয়াছিলেন, "The Crown demands money, the commons grant it, and the Lords assent to the grant: but the commons do not vote money unless it is required by the crown." নূতন কর বসাইবার প্রস্তাব অথবা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব পার্লামেণ্ট করিতে পারে

না।[১] কতিপয় আয়-ব্যয়ের হিসাবের উপর, যেমন, কম্পট্রোলার ও অডিটার জেনারেলের বেতন, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের পেন্সন ইত্যাদিতে, পার্লামেন্টের প্রকৃতপক্ষে কোন নিয়ন্ত্রণী ক্ষমতা নাই। কম্পট্রোলার ও অডিটার জেনারেল সরকারী আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করিয়া যে রিপোর্ট প্রদান করেন, তাহা হাউস অফ কমন্স কর্তৃক সরকারী হিসাবের উপর স্থায়ী কমিটির (Standing Committee on Public Accounts) নিকট প্রেরণ করা হয়। এই কমিটি রিপোর্টটি পরীক্ষা করিয়া সরকারী আয়-ব্যয় হিসাবের কোন গরমিল খুঁজিয়া পাইলে সরকারের নিকট কৈফিয়ৎ তলব করে। কিন্তু, বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় সরকারী ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে এই কমিটির কার্যকারিতা খুব বিশেষ নাই। কেননা, ক্যাবিনেট নিজের দলের সংখ্যাধিক্যের জোরে অর্থসংক্রান্ত সমুদয় সরকারী ব্যবস্থার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি অনায়াসে আদায় করিতে পারে। সময়ের অভাব এবং কাজের চাপ ও জটিলতার জন্য কমন্সসভার পক্ষেও সামগ্রিকভাবে সর্বদা সরকারী ব্যয়ের বিচার-বিবেচনা করা সম্ভবপর হয় না।

বৃটিশ পার্লামেন্টে বিরোধীদলের ভূমিকা (Role of the Opposition in the British Parliament) :

পার্লামেন্টের অন্যতম কাজ হইতেছে সরকারের বিভিন্ন কাজের সমালোচনা করিয়া ইহার ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি দূর করিবার চেষ্টা করা। এই সমালোচনার সংগঠন এবং পরিচালনা করিয়া থাকে সরকার-বিরোধী দল। ইংলণ্ডে কয়েকটি রাজনৈতিক দল থাকিলেও পার্লামেন্টে মুখ্যতঃ দুইটি রাজনৈতিক দলই প্রধান। বর্তমান কমন্সসভায় রক্ষণশীল দল এবং শ্রমিক দল,—এই দুইটি রাজনৈতিক দল আছে। এই দুইটি দলের মধ্যে যে দলটি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে, সেই দলটিই (বর্তমানে রক্ষণশীল) সরকার গঠন করিয়াছে। যে দলের সংখ্যাধিক্য নাই—এবং সেজন্য যে দল সরকার গঠন করিতে পারে না, সেই দলকেই বিরোধী দল বলা হয়। ইহার প্রধান কাজ হইল সরকারের সমালোচনা করিয়া জনমতকে নিজের পক্ষে আনা যাহাতে পরবর্তী নির্বাচনের সময় ইহা জনগণের আস্থা অর্জন করিয়া পার্লামেন্টের সংখ্যাধিক্য অর্জন করিতে পারে। সরকারী দলের যেমন শাসন পরিচালনা করিবার অধিকার থাকে,

বিরোধী দল সরকারের সমালোচনা করে

১। "The Principle that the sanction of the Crown must be given to every grant of money drawn from the public revenue applies equally to the taxation levied to provide reveune."

(May—Parliamentary Practice in England.)

সরকার-বিরোধী দলের সেইপ্রকার সরকারী দলের বিরোধিতা এবং সমালোচনা করিয়া সরকারের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলির প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার অধিকার আছে। যদি পরবর্তী নির্বাচনে আগেকার বিরোধী দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, তখন সেই দল সরকার গঠন করিবার সুযোগ লাভ করে এবং আগেকার সরকারী দল তখন বিরোধী দলের ভূমিকা অবলম্বন করে। সুতরাং বিরোধী দলকে সর্বদাই বিকল্প সরকার (alternative government) গঠন করিবার যোগ্যতা রাখিতে হয়।

বিরোধিতা সর্বদাই গঠনমূলক হওয়া উচিত

যদিও বিরোধী দলের প্রধান কাজ সরকারের বিরোধিতা করা, সেই বিরোধিতা দায়িত্বশীল এবং গঠনমূলক হওয়া উচিত। কেননা, আজ যে দলকে বিরোধী দলের ভূমিকা অবলম্বন করিতে হইতেছে, ভবিষ্যতে সেই দল যদি সরকার গঠনের সুযোগ পায়, তখন ইহাকেও অনুরূপভাবে বিরোধী দলের সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইবে।

মন্ত্রীসভা-চালিত সরকারে বিরোধী দলের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইংলণ্ডের দিকে তাকাইলে আমরা দেখিতে পাই, ক্যাবিনেট সদস্যগণই প্রকৃতপক্ষে কমন্সসভাকে নিয়ন্ত্রণ করেন। এমন কি, আইন প্রণয়ন ব্যাপারেও কমন্সসভাকে ক্যাবিনেটের মুখাপেক্ষী এবং নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টারী শাসনের পিছনে আমরা দেখিতে পাই মন্ত্রীসভার ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা। প্রকৃতপক্ষে প্রধানমন্ত্রী পার্লামেণ্টের অধিবেশনে শুধু সরকারের পক্ষে দলীয় নেতাই নহেন, তিনিই বর্তমানে কমন্সসভার ক্রিয়াকলাপের নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। এই সভায় মন্ত্রীসভার এবং বিশেষতঃ প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন কাজের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি সম্বন্ধে জনসাধারণকে অবহিত রাখা এবং মন্ত্রীদের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতাকে প্রতিরোধ করা খুবই দরকার। সেই গুরু দায়িত্ব পালন করিয়া থাকে বিরোধী দল। একনায়কতন্ত্র (Dictatorship) অপেক্ষা গণতন্ত্রের (Democracy) উৎকর্ষতা এই কারণেই বেশী গণতন্ত্রে (ইহা প্রত্যক্ষই হউক আর পরোক্ষই হউক) প্রত্যেক নাগরিকেরই সরকারের সমালোচনা করিবার অধিকার এবং সরকারের কাজে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার থাকে।

বিরোধী দলের প্রয়োজনীয়তা

ইংলণ্ডের বিরোধী দল শুধু সরকারের সমালোচনাই করে না, ইহা সরকারের কাজে অংশ গ্রহণও করিয়া থাকে। ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থায় বিরোধী দলের গুরুত্ব ইহার প্রচলিত নাম হইতেই অনুমান করা যায়। ইংলণ্ডের সরকারকে যেমন রাজা বা রাণীর সরকার (His or Her Majesty's Government) বলা হয়, বিরোধী দলকেও সেই প্রকার রাজা বা রাণীর বিরোধী দল (His or Her Majesty's Opposition) বলা হয়। ইংলণ্ডে বিরোধী দলের ভূমিকা

শুধু একটি নিষ্ক্রিয় স্তোকবাক্য ("idle phrase") নহে। ইংলণ্ডের পার্লামেন্টে বিরোধী দলের সৃষ্টি প্রথমতঃ প্রথাগত আইনের ভিত্তিতে হইয়াছিল। পরে ইহার অস্তিত্ব পার্লামেন্টের আইনে (Ministers of the Crown Act, 1937) স্বীকৃত হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে কমন্সসভায় রাজা বা রাণীর সরকারের সর্বাপেক্ষা যে বৃহৎ বিপক্ষ দল থাকে, তাহার নেতাকেই বিরোধী দলের নেতা বলা হইবে। তিনি প্রতি বৎসর ২০০০ পাউণ্ড বেতন পাইয়া থাকেন। সুতরাং ইহা হইতেই বিরোধী দলের ভূমিকা যে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হয়, তাহাও স্পষ্ট হইয়াছে। বিরোধী দল প্রয়োজন হইলে সরকার পক্ষের সহিত বিভিন্ন ধরনের বোঝাপড়া ও চুক্তি করিয়া থাকে যাহাতে সরকার জাতীয় স্বার্থে সুষ্ঠুভাবে কাজ সম্পাদন করিতে পারে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, ইংলণ্ডে জরুরীকালীন অবস্থার (emergency) সৃষ্টি হইলে বিরোধী দল সম্মিলিত সরকার গঠনে সরকারী দলের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিয়া থাকে, সরকার পক্ষের যে সমালোচনা বিরোধী দল করিয়া থাকে, তাহা জাতীয় স্বার্থেই করিয়া থাকে। সুতরাং এই সমালোচনা সর্বদাই গঠনমূলক হয়। জাতীয় সংকটের সময় বিরোধী দলও সরকারী দলের সহিত একযোগে কাজ করে। ইহাই ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীর সরকারের বিরোধী দলের প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রধানমন্ত্রীও জাতীয় স্বার্থের সহিত জড়িত বিভিন্ন ব্যাপারে আলোচনা করিবার জন্য মাঝে মাঝে বিরোধী দলের নেতার সহিত বৈঠকে মিলিত হন। ইংলণ্ডে সংখ্যালঘু দল সরকারী দলের শাসন করিবার অধিকার যেমন স্বীকার করে, সরকারী দলও সেইপ্রকার সংখ্যালঘু দলকে সরকারের সমালোচনা করিবার সুযোগ প্রদান করে। তাহা ছাড়া, সরকার পক্ষের সমুদয় কাজই যে উৎকৃষ্ট অথবা গ্রহণযোগ্য হইবে, এমন কোন কথা নাই। বিরোধী দলের গঠনমূলক সমালোচনার ফলে সরকারও অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ উপকৃত হয়। ইংলণ্ডে দলীয় রাজনীতিতে অন্যান্য দেশের ন্যায় কখনই তিক্ততার সৃষ্টি হয় নাই। কমন্সসভার যে পাব্লিক একাউণ্ট্স কমিটি (Public Accounts Committee) গঠিত হয়, তাহাতে সভাপতি নির্বাচিত হন সাধারণতঃ বিরোধী দলের নেতা অথবা একজন বিরোধী দলের প্রভাবশালী সদস্য।

জরুরী অবস্থায় বিরোধী দলের ভূমিকা

ইংলণ্ডে বিরোধী দল সর্বদাই রাজশক্তির প্রতি "অনুগত" ("Loyal") থাকে—অর্থাৎ, বিরোধী দল শুধু সরকারী ব্যবস্থাগুলির সমালোচনাই করিবে,—রাজশক্তির অমর্যাদা করিবে না। রাজশক্তির মর্যাদা রক্ষায় সরকারের যতখানি দায়িত্ব ও কর্তব্য, বিরোধী দলের ভূমিকা তাহা অপেক্ষা কম নহে। সেইজন্যই কমন্সসভার বিরোধী দলকে রাজা বা রাণীর অনুগত

বিরোধী দল ("His or Her Majesty's opposition") বলা হয়।

বিরোধী দল সর্বদাই রাজশক্তির অনুগত

ইংলণ্ডে যখন সরকারী দল ও বিরোধী দলের মধ্যে কোন ব্যাপারে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়, তখন ইহা জাতীয় সমস্যাগুলির সমাধানের সুপরিকল্পিত উপায় সম্বন্ধে একমত না হওয়ার জন্যই মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়।

স্পীকারের পদমর্যাদা এবং বিভিন্ন কাজ (Position and different functions of the Speaker)— কমন্সসভার সদস্যদের মধ্যে স্পীকারের পদ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। "Speaker" শব্দটি আসিয়াছে "Spokesman" শব্দটি হইতে। অনেক আগে কমন্সসভার সদস্যগণ রাজার নিকট কোন আবেদন বা প্রার্থনা জানাইতে হইলে একজন মুখপাত্র (Spokesman) নিযুক্ত করিতেন। তিনি কমন্সসভার সদস্যগণের পক্ষ হইতে রাজার নিকট সেই আবেদনপত্র অথবা প্রার্থনাপত্র পেশ করিতেন। বর্তমানে কমন্সসভার নূতন অধিবেশন আরম্ভ হইলে সদস্যদের মধ্য হইতে একজনকে স্পীকার নির্বাচিত করিতে হয়। পূর্বে স্পীকারকে রাজা নিয়োগ করিতেন। এখন স্পীকার কমন্সসভার সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। সাধারণতঃ প্রধান-মন্ত্রীর মনোনীত ব্যক্তিই বর্তমানে স্পীকার নির্বাচিত হন ;—কেননা, প্রধানমন্ত্রী যাঁহার নাম প্রস্তাব করিবেন, তিনিই কমন্সসভার সরকারী দলের সংখ্যাধিক্যের জোরে নির্বাচিত হইবেন। তবে বর্তমানে স্পীকারের নির্বাচন যাহাতে সর্ববাদি-সম্মত হয় সেজন্য সরকারী দলও বিরোধী দলের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রথাগত বিধান অনুযায়ী যদি স্পীকার ঐ পদে পুনর্নির্বাচিত হইতে চাহেন, তবে তাঁহাকে পুনঃনির্বাচিত করা হয়। স্পীকারের বেতন হইতেছে বাৎসরিক পাঁচ হাজার পাউণ্ড, এবং কাজ হইতে অবসর গ্রহণের পর তাঁহাকে রাজকীয় সম্মানে ভূষিত করা হয়। সাম্প্রতিককালে ১৯৩৫, ১৯৪৫, ১৯৫১ সালের কমন্সসভার নূতন অধিবেশনগুলিতে স্পীকারের নির্বাচন সর্ববাদিসম্মত হয় নাই; স্পীকারের পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

স্পীকার কমন্সসভার অধিবেশনে সর্বদাই দল নিরপেক্ষ থাকেন। কমন্স-সভার বাহিরেও তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করেন না। তিনি রাজনৈতিক দলগুলির সভাসমিতিতেও যোগদান করেন না। তাঁহার প্রধান দায়িত্ব হইতেছে কমন্সসভার শৃংখলা ও মর্যাদা রক্ষা করা। ইহা করিবার জন্য যতটুকু কথা বলা প্রয়োজন, তিনি ততটুকু কথাই কমন্সসভার অধিবেশনে বলেন। কখনই তিনি নিজের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক মতবাদ অথবা সরকারের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে সমালোচনামূলক অথবা প্রশংসাসূচক মতামত ব্যক্ত করেন না। যদি কমন্সসভার অধিবেশনে কোনও আইন প্রণয়নের ব্যাপারে অথবা কোনও প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে সমানসংখ্যক ভোটসংখ্যা হয় তখন তিনি

তাঁহার নির্ণায়ক ভোট (Casting Vote) প্রদান করিয়া কমন্সসভার অচল অবস্থার অবসান করেন। তবে নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিবার সময়েও এমন-ভাবে ভোটপ্রদান করেন যাহাতে কমন্সসভা সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সম্বন্ধে পূর্ণ-বিবেচনা করিবার সুযোগ পায়। কমন্সসভার সময়ের যাহাতে সদ্ব্যবহার হয়, সবগুলি দলেরই স্বার্থ যাহাতে রক্ষিত হয়, কেহ যেন পার্লামেন্টের বিভিন্ন নিয়ম-কানুনের অন্যায় সুযোগ গ্রহণ না করে অথবা ইহার কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি না করে, এবং বিতর্কের সময় যাহাতে কাহারও উপর ব্যক্তিগত আক্রমণ না হয় অথবা তিক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি না হয়—সেদিকে লক্ষ্য রাখার দায়িত্ব হইতেছে স্পীকারের। যদি কোন ক্ষেত্রে পূর্বেকার নজির, সিদ্ধান্ত অথবা নির্দেশসমূহ স্পষ্ট বলিয়া মনে হয়, তবে স্পীকার কমন্সসভার মর্যাদা, ঐতিহ্য এবং প্রথাগত বিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কমন্সসভার অধিবেশন পরিচালনা করেন।

কমন্সসভার অধিবেশনের বিভিন্ন নিয়মকানুনের ব্যাখ্যা করা এবং বৈধতার প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা করার দায়িত্বও স্পীকারের। মুলতুবী প্রস্তাবে (closure motion) অনুমতি দেওয়া অথবা না দেওয়ার অধিকার স্পীকারের আছে। যখন কমন্সসভার অধিবেশন চলিতে থাকে, তখন হয়ত কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একসংগে একাধিক সদস্য বক্তৃতা প্রদান করিতে চাহিতে পারেন। তখন স্পীকার ঠিক করেন কাহাকে কতটা বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ প্রদান করা হইবে। কোন সদস্য যদি কমন্সসভার শৃংখলা নষ্ট করেন অথবা অশোভনীয় উক্তি করিয়া ইহার মর্যাদা নষ্ট করেন, তবে স্পীকার তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিতে পারেন এবং চরম অবস্থায় কমন্সসভা হইতে বহিষ্কারও করিয়া দিতে পারেন।

বিভিন্ন বিল যখন আইনে পরিণত হইবার জন্য কমন্সসভায় উত্থাপিত হয়, তখন কোন্ বিলগুলি অর্থসংক্রান্ত বিল, তাহা স্পীকার ঠিক করেন। সর্বশেষে স্পীকার হইতেছেন কমন্সসভার মুখপাত্র, স্পীকারের মাধ্যমেই কমন্সসভার সদস্যগণ সমষ্টিগতভাবে রাজা বা রাণীর সংগে সাক্ষাৎ করিতে পারেন। কমন্স-সভার কোন সদস্যের বিরুদ্ধে যদি অধিকার লংঘনের অভিযোগ থাকে, তবে সেই অভিযোগ বিবেচনা করিয়া সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকেন স্পীকার। তাহা ছাড়া, স্পীকার কমন্সসভার বিভিন্ন স্থায়ী কমিটিগুলির সভাপতিদের নিযুক্ত করেন।

স্পীকারের পদমর্যাদা এবং বিভিন্ন কাজ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে স্পীকারের ব্যক্তিগত কর্মকুশলতা, বুদ্ধি-বিবেচনা, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, আইনশাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান এবং ব্যক্তিত্ব না থাকিলে কোন স্পীকারই উপযুক্ত ভাবে এই দায়িত্বপূর্ণ কাজ নির্বাহ করিতে পারেন না।

আমেরিকার জনপ্রতিনিধি সভার স্পীকার এবং ইংলণ্ডের কমন্সসভার স্পীকারের মধ্যে পার্থক্য (Speaker of the U. S. House of Representatives vs. Speaker of the U. K House of Commons.):

আমেরিকার জনপ্রতিনিধি সভার (House of Representatives) স্পীকারের সহিত ইংলণ্ডের কমন্সসভার স্পীকারের কয়েকটি ব্যাপারে অমিল আছে। আমেরিকার জনপ্রতিনিধিসভার স্পীকারের কার্যকলাপ ২ বৎসর, তিনি কখনই দল-নিরপেক্ষ থাকেন না। বরং, জনপ্রতিনিধিসভায় তিনি আইন প্রণয়ন কাজের পরিচালনা করেন। আমেরিকায় সরকারের ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ হওয়ায় শাসনবিভাগের কর্মকর্তাগণ আইন প্রণয়নের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন না। সুতরাং আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধি সভার নেতৃত্ব করিবার দায়িত্ব আসিয়া পড়ে স্পীকারের উপর। তিনিই প্রকৃতপক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। আমেরিকায় জনপ্রতিনিধিসভার স্পীকারের নির্বাচন কখনই সর্ববাদি-সম্মত হয় না। তবে জনপ্রতিনিধিসভার সভাপতি হিসাবে স্পীকার সভার বিভিন্ন নিয়মকানুনের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইংলণ্ডের কমন্সসভার স্পীকার এবং আমেরিকার জনপ্রতিনিধিসভার স্পীকারের মধ্যে মূলগত পার্থক্য রহিয়া গিয়াছে। কমন্সসভার স্পীকারের পদমর্যাদা যেরূপ ঐতিহ্যমণ্ডিত, জনপ্রতিনিধিসভার স্পীকারের পদমর্যাদা সেইরূপ ঐতিহ্যমণ্ডিত নহে। তাহা ছাড়া, আমেরিকার জনপ্রতিনিধিসভার স্পীকার কখনই ইংলণ্ডের কমন্সসভার স্পীকারের ন্যায় দল-নিরপেক্ষ থাকেন না।

বৃটেনের কমিটি ব্যবস্থা (Committee System)

বর্তমানকালে আইন পরিষদগুলির কাজের চাপ খুব বাড়িয়া যাওয়ায় প্রত্যেক আইনসভাই সাধারণতঃ কতিপয় কমিটির মাধ্যমে দ্রুত আইনসভার কাজগুলি সম্পন্ন করিতে চাহে। ইংলণ্ডে কমন্সসভায়ও আমরা এই ব্যবস্থা দেখিতে পাই। কমন্সসভার প্রতিটি অধিবেশন আরম্ভ হইবার পূর্বে কয়েকটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিগুলির সদস্য নির্বাচিত করে নির্বাচনী কমিটি (Committee of Selection)। সরকারী দল এবং বিরোধী দল সম্মিলিতভাবে নির্বাচনী কমিটি গঠন করে। ইংলণ্ডে আমরা নিম্নলিখিত কমিটিগুলি দেখিতে পাই:—

প্রথমতঃ, আমরা দেখিতে পাই সরকারী বিলের উপর স্থায়ী কমিটি (Standing Committee on Public bills)—এই প্রকার পাঁচটি কমিটি আছে এবং প্রত্যেকটির সদস্যসংখ্যা ৩০ হইতে ৫০ জনের ভিতর এবং

প্রত্যেকটির আরও অতিরিক্ত ১৫ হইতে ২০ জন সদস্য গ্রহণ করিবার অধিকার আছে।

দ্বিতীয়তঃ, বিলগুলিকে আইনে পরিণত করিবার সময় দ্বিতীয় পাঠ হইয়া গেলে বিলগুলিকে সিলেক্ট কমিটির নিকট পাঠান হয়। সিলেক্ট কমিটিগুলি গঠিত হয় এই বিলগুলি বিচার বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য এবং সেগুলি সম্বন্ধে রিপোর্ট পেশ করিবার জন্য। সিলেক্ট কমিটির সদস্য সংখ্যা থাকে ১৫ জন। তৃতীয়তঃ সেসনাল কমিটিগুলি (Sessional Committee) কোন বিশেষ অধিবেশনে গঠিত হয় বিভিন্ন ব্যাপারে আবেদনপত্রগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য। চতুর্থতঃ বিশেষ স্বার্থ সম্পর্কিত বেসরকারী বিল কমিটিগুলির (Private Bills Committees) প্রত্যেকটি চারজন সদস্য লইয়া গঠিত হয়। এইগুলির কাজ হইল যে সমস্ত বে-সরকারী বিল সম্পর্কে পার্লামেন্টে আপত্তি তোলা হয় সেগুলি সম্বন্ধে বিচার-বিভাগীয় তদন্তের অনুরূপ তথ্যানুসন্ধান করা ; বিভিন্ন দলের সাক্ষ্য গ্রহণ করার পর এই কমিটিগুলি পার্লামেন্টে তথ্যানুসন্ধানের রিপোর্ট দাখিল করে। পঞ্চমতঃ, আমরা সমগ্র সভার একটি কমিটি (Committee of the Whole House) দেখিতে পাই। ইহা প্রকৃতপক্ষে কমন্সসভারই একটি বিশেষ রূপ ; কেননা, কমন্সসভার প্রত্যেক সদস্যই এই কমিটির সদস্য। এই সভায় স্পীকার সভাপতিত্ব করেন না। এই সভার জন্য আলাদা একজন সভাপতি থাকেন। এই সভার কাজকর্ম অপেক্ষাকৃত কম আনুষ্ঠানিক। স্পীকার কমিটির সদস্য হিসাবে একবারের বেশী কথা বলিতে পারেন। কিন্তু কমন্সসভার সদস্য হিসাবে তিনি কমন্সসভার কাজ পরিচালনার ব্যাপার ছাড়া কথা বলিতে পারেন না। সমগ্র সভার কমিটি সম্বন্ধে র‍্যামসে মুর (Ramsay Muir) বলেন, "No bill, however important, ought to be discussed in a Committee of the whole House···the work of detailed consideration and amendment ought to be entrusted to those members who have special qualifications for dealing with the subject of the bill."

যখন সরকারের আয়-ব্যয় সম্পর্কিত বিলগুলি লইয়া কমন্সসভায় আলোচনা চলে, তখন কমন্সসভায় দুইটি কমিটি থাকে। একটি হইতেছে "সমগ্র কক্ষ সরবরাহ কমিটি" (The Committee of Supply) এবং অপরটি হইতেছে "সমগ্র কক্ষ উপায়-নির্ধারণী কমিটি" (The Committee of Ways and Means).

ইংলণ্ড ও আমেরিকার কমিটি ব্যবস্থার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। প্রথমতঃ, ইংলণ্ডে কমিটিগুলি নির্বাচিত হয় নির্বাচনী কমিটি (Committee of

Selection) কর্তৃক। প্রত্যেকটি রাজনৈতিকদলের প্রতিনিধিদের লইয়া এই কমিটি গঠিত হয়। কিন্তু মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে, রাজনৈতিক দলগুলির পরিচালকমণ্ডলী একটি কমিটি মনোনয়ন করেন এবং সেই কমিটি প্রত্যেক দলের সদস্যগণকে লইয়া নির্বাচনী কমিটি গঠন করে। দ্বিতীয়তঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিটি বিল আলোচনার পূর্বেই কমিটিতে প্রেরিত হয়। তাহাতে কমিটি বিলগুলির প্রভূত পরিবর্তন করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু ইংলণ্ডে প্রত্যেকটি বি লর দ্বিতীয় পাঠ এবং বিতর্কমূলক আলোচনা শেষ হইয়া গেলে বিলটি কমিটিতে প্রেরিত হয়। তৃতীয়তঃ ইংলণ্ডে সরকারী বিল এবং বেসরকারী বিলের মধ্যে পার্থক্য করা হয় এবং ইহাদের জন্য আলাদা কমিটি করা থাকে। কিন্তু মার্কিন কংগ্রেসে সরকারী এবং বেসরকারী বলিয়া বিলগুলির কোন শ্রেণীবিভাগ নাই কমন্সসভার কমিটিগুলির সভাপতিগণ বিলগুলি সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকেন। মাকিন কংগ্রেসের বিভিন্ন কমিটির সভাপতিগণ বিলগুলি সম্বন্ধে নিরপেক্ষ ত' থাকেনই না, বরং নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী তাঁহার বিলগুলির পরিবর্তন করিয়া থাকেন। অনেক সময় কমিটির সভাপতির নামে আইনের নামকরণ হয়, যেমন, সারম্যান আইন, রোজার আইন, ইত্যাদি।

সংক্ষিপ্তসার

১। ইংলণ্ডের আইনসভা হইতেছে King-in-Parliament; আইনসভার দুইটি কক্ষ আছে, যথা, লর্ডসভা ও কমন্সসভা। লর্ডসভার ক্ষমতা অনেক কমিয়া গিয়াছে। লর্ডসভায় অর্থসংক্রান্ত বিল উত্থাপিত হইতে পারে না, অথবা অর্থসংক্রান্ত বিল অনুমোদনের জন্য লর্ডসভার অনুমতির প্রয়োজন হয় না। অন্যান্য বিল আইনে পরিণত হইতে হইলে লর্ডসভার অনুমোদনের প্রয়োজন। লর্ডসভা কোনও বিলের আইনে পরিণত হওয়া এক বৎসর পিছাইয়া দিতে পারে। লর্ডসভা বিচার বিভাগীয় ক্ষমতাও ভোগ করে। যুক্তরাজ্যের ও আয়ারল্যাণ্ডের সর্বোচ্চ আপীল আদালত হইল লর্ডসভা। তাহাছাড়া, কমন্সসভা যদি কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীকে অপসারণ করিবার (impeachment) প্রস্তাব আনয়ন করে, তখন লর্ডসভা ইহার আদালত হিসাবে কাজ করে।

লর্ডসভার বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনা করা হইয়াছে এবং এইজন্য ইহার বিলোপসাধন করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। কিন্তু, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয়, লর্ডসভাকে বিলুপ্ত না করিয়া ইহার সংস্কার সাধন করা উচিত। লর্ডসভা ও কমন্সসভার সদস্যদের কতিপয় অধিকার (privileges) আছে।

কমন্সসভার সদস্যগণ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। কমন্সসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাই প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হইয়া থাকেন। কমন্সসভা যদি মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করে, তবে মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করিতে হয়। অর্থসংক্রান্ত বিল একমাত্র কমন্সসভাতেই উত্থাপিত হইতে পারে। সরকারের কাজ কর্মের বিভিন্ন ব্যাপারে কমন্সসভা মন্ত্রীগণকে প্রশ্ন করিতে পারে এবং মন্ত্রীগণও সেই সকল প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য থাকেন। কিন্তু বর্তমানে ইংলণ্ডে মন্ত্রীসভার ক্ষমতা এত বাড়িয়া গিয়াছে যে পার্লামেন্টের পক্ষে নিজের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভবপর হয় না। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাজা যে কোন সময়েই কমন্সসভা ভাংগিয়া দিতে পারেন।

২। ইংলণ্ডে কোন বিল আইনে পরিণত হইলে বিলটির তিনটি পাঠ (Three readings) হয়। অর্থসম্বন্ধীয় বিলগুলিকে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়; যথা, অর্থবিল, বিনিয়োগ বিল, এবং সঞ্চিত তহবিল বিল। বিভিন্ন বিলগুলি আইনে পরিণত হইবার পথে বৃটেনের কমিটি ব্যবস্থার একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। দ্বিতীয় পাঠের পর বিভিন্ন বিল ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটিতে পাঠান হয়। অথবা সমগ্র সভার কমিটির প্রস্তাব অনুযায়ী বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। সরকারী আয়ব্যয়ের উপরেও কমন্সসভার বিশেষ কর্তৃত্ব আছে। কম্পট্রোলার ও অডিটার জেনারেল সরকারী আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করিয়া যে রিপোর্ট প্রদান করেন, তাহা হাউস অব কমন্স কর্তৃক সরকারী হিসাবের উপর স্থায়ী কমিটির (Standing Committee on Public Accounts) নিকট পাঠান হয়। এই কমিটি সরকারী আয়-ব্যয় সম্পর্কে সরকারের নিকট হইতে কৈফিয়ৎ তলব করিতে পারে।

৩। কমন্সসভার স্পীকার সর্বদাই দল-নিরপেক্ষ থাকেন। এমন কি কমন্স সভার বাইরেও তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করেন না। অথবা রাজনৈতিক দলগুলির সভাসমিতিতে যোগদান করেন না। তিনি কমন্সসভার সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং যদি কোন প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে কখনও সমান ভোটসংখ্যা হয় তবে স্পীকার তাঁহার নির্ণায়ক ভোট (Casting Vote) প্রদান করেন। কমন্সসভার অধিবেশনের মুলতুবী প্রস্তাবে অনুমতি দেওয়া বা না দেওয়ার অধিকার স্পীকারের আছে। আমেরিকার জনপ্রতিনিধি সভার স্পীকার কিন্তু দল-নিরপেক্ষ নহেন; বরং তিনি আইন প্রনয়ণ কাজ পরিচালনা করিতে পারেন। কারণ, প্রকৃতপক্ষে তিনিই জনপ্রতিনিধি সভার সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের নেতা।

Exercises

1. Describe the composition and functions of the House of Lords. Do you think that the House of Lords serves any useful purpose in the English Constitutional System? Give reasons for your answer. (৪৩—৪৭ পৃষ্ঠা)

2. "The House of Lords should be abolished, retained in its present form, or reformed." With which of these views do you agree? Give reasons for your answer. (৪৫—৪৮ পৃষ্ঠা)

3. Discuss the privileges of (a) the members of the House of Lords and (b) the members of the House of Commons. (৪৮—৪৯ পৃষ্ঠা)

4. Indicate the different stages through which a Public Bill must pass before it can become an Act of the Parliament. (৪৯—৫০ পৃষ্ঠা)

5. Write a note on the Law-making process of the British Parliament. (৪৯—৫০ পৃষ্ঠা)

6. Trace the progress of a money bill in the British Parliament from its inception to Royal assent. (৫০—৫২ পৃষ্ঠা)

7. How are the Private bills passed by the House of Commons? What do you mean by "Provisional Orders?" (৫৩—৫৪ পৃষ্ঠা)

8. Discuss the functions of the House of Commons. (৫৪—৫৫ পৃষ্ঠা)

9. "The British legislature is anything but legislative in its main functions."—Do you agree with this view? Give reasons for your answer. (৫৪—৫৫ পৃষ্ঠা)

10. "His Majesty's opposition is no idle phrase."—Discuss. (৫৬—৫৯ পৃষ্ঠা)

11. "The efficiency of the Parliamentary System in Great Britain is largely due to His Majesty's loyal opposition."—Discuss the statement. (৫৬—৫৯ পৃষ্ঠা)

12. Discuss the positions and functions of the Speaker of the British House of Commons, and compare his position and functions to those of the Speaker of the House of Representatives in the U. S. A. (৫৯—৬১ পৃষ্ঠা)

13. Give an outline of the Committee System in the British Parliament. (৬১—৬৩ পৃষ্ঠা)

পঞ্চম অধ্যায়

বৃটেনের দলব্যবস্থা
(Party System in Great Britain)

ইংলণ্ডের রাজনৈতিক দলব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য (Main features of the party system in England) :

পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিই হইতেছে রাজনৈতিক দলব্যবস্থা। ব্রাইসের ভাষায় "Parties are inevitable. No free large country has been without them. They bring order out of the chans of a multitude of voters." দলগুলি জনমত গঠন করে এবং নির্বাচনের সময় জনসাধারণের ভোটের সাহায্যে পার্লামেণ্টে সদস্যসংখ্যার দিক হইতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়া সরকার গঠন করিতে চেষ্টা করে। যে দল পার্লামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, সেই দলই সরকার গঠন করে এবং সরকারী দলের পর সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দলটি বিরোধী দল হিসাবে কাজ করে। অনেক বিষয়ে পার্লামেণ্টের ভিতরে এবং পার্লামেণ্টের বাহিরে রাজনৈতিক দলগুলির ক্রিয়াকলাপে অনেক পার্থক্য থাকে। কিন্তু, দলগুলি প্রায় সমপদ্ধতিতেই সংগঠিত হয়। পার্লামেণ্টের ভিতরে দলীয় নেতার নির্দেশে সদস্যগণকে কাজ করিতে হয়। দলীয় নেতার নির্দেশ কার্যকরী করিবার জন্য কয়েকজন হুইপ থাকেন। পার্লামেণ্টের বাহিরে দলের কেন্দ্রীয় পরিচালন কমিটি দলের কর্মসূচী গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু দলের বৃহত্তর স্বার্থে কেন্দ্রীয় পরিচালন কমিটি পার্লামেণ্টারী দলের ক্রিয়াকলাপেও হস্তক্ষেপ করিতে পারে। পার্লামেণ্টের নির্বাচনকেন্দ্রগুলির সহিত যোগসূত্র রক্ষা করা, প্রার্থী মনোনয়ন এবং নির্বাচনের সহিত জড়িত বিভিন্ন কাজ করিবার জন্য প্রত্যেক রাজনৈতিক দলেরই স্থানীয় সংগঠন থাকে। ১৮৩২ সালের সংস্কার আইন অনুযায়ী ভোটাধিকার বিস্তারের পর হইতে বিভিন্ন "রেজিস্ট্রেশন সোসাইটি" এবং "ককাস" (caucus) গুলি স্থানীয় দলীয় সংগঠনের ভিত্তি স্থাপন করে। বর্তমানে ইংলণ্ডে রাজনৈতিক দল প্রধানতঃ দুইটি, রক্ষণশীল দল ও শ্রমিক দল। পূর্বে উদারনৈতিক দল বিশেষ প্রভাবশালী ছিল। কিন্তু, বর্তমানে উদারনৈতিক দলের প্রভাব নাই বলিলেই হয়। ইংলণ্ডের দলব্যবস্থা অত্যন্ত অনমনীয় (rigid) ফ্রান্সের মত একটি দলের সদস্যের যখন খুশী তখনই অন্য দলে চলিয়া যাওয়া ইংলণ্ডে দেখা যায় না।

ইংলণ্ডের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দলব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। সরকারী দলের নেতৃত্বই প্রধানমন্ত্রীকে এত ক্ষমতা দিয়াছে। দলীয় সংগঠনই ক্যাবিনেটের নীতির মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখে। কমন্সসভায় একটি রাজনৈতিক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতাই ক্যাবিনেটকে ক্ষমতাশালী হইতে সাহায্য করে। আবার বিরোধী দলের সুসংগঠনই ক্যাবিনেটকে স্বেচ্ছাচারিতা কমাইতে বাধ্য করে।

ইংলণ্ডের দলীয় ব্যবস্থার ইতিহাস (History of the party system in England):

(ইংলণ্ডের দলীয় ব্যবস্থার ইতিহাস সম্বন্ধে যে আলোচনা প্রথম অধ্যায়ে করা হইয়াছে তাহা দ্রষ্টব্য।)

ইংলণ্ডের রাজনৈতিক দল-ব্যবস্থার সৃষ্টি হয় ইয়র্কিস্ট ও ল্যাঙ্কাস্ট্রিয়ানদের মধ্যে কলহ হইতে। তখনকার দিনে নির্বাচন বা ভোটের মাধ্যমে দলগত শক্তির পরীক্ষা হইত না। বারুদ ষড়যন্ত্র (Gunpowder plot) এবং গোলাপ যুদ্ধই (War of the Roses) ইহার প্রমাণ। পরে ধর্মীয় ভিত্তিতেও জনসাধারণের মধ্যে দুইটি ভাগ হইয়া যায়, একটি দল ছিল প্রোটেস্ট্যাণ্ট এবং অপরটি ছিল রোমান ক্যাথলিক। তাহা ছাড়া একদল লোক পিউরিটান মতাবলম্বী বলিয়া পরিচিত হইতেন। এই ধর্মীয় ভিত্তি হইতেই রাজনৈতিক দলব্যবস্থার ভিত্তি রচিত হয় এবং তৃতীয় উইলিয়মের সময় হুইগ এবং টোরী এই দুইটি রাজনৈতিক দল প্রাধান্য বিস্তার করে। ১৮৩২ সালের সংস্কার আইন (The Reform Act of 1832) প্রণীত হইবার পর হুইগ এবং টোরী দলের স্থানে আমরা যথাক্রমে রক্ষণশীল (Conservative) এবং উদারনৈতিক (Liberal) দলের সৃষ্টি দেখিতে পাই। ইংলণ্ডে উনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে রক্ষণশীল এবং উদারনৈতিক দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইতিহাস। ১৮৯০ সালের পূর্ব পর্যন্ত শ্রমিক দল (Labour Party) পার্লামেণ্টে দলগত রূপ পায় নাই। ১৮৯৯ সালে বিভিন্ন শ্রমিকসংঘ এবং সমাজতান্ত্রিক সংস্থাগুলি পার্লামেণ্টের সদস্য নির্বাচনে অধিকসংখ্যক প্রার্থী দাঁড় করাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইহার ফলে শ্রমিক-সংঘ সমবায় সমিতি, সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি লইয়া গঠিত একটি ফেডারেশনের সৃষ্টি হয় এবং ইহাই কয়েক বৎসর পর শ্রমিকদল বলিয়া পরিচিত হইতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও উদারনৈতিক দলের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতেই উদারনৈতিক দলের প্রভাব ক্রমেই কমিয়া যায় এবং শ্রমিকদলের প্রভাব ক্রমেই বাড়িয়া যায়। বর্তমানে ইংলণ্ডে রক্ষণশীল দল এবং শ্রমিকদলই প্রধান। বর্তমানে পার্লামেণ্টে

উদারনৈতিক দলের একজন সদস্যও নাই। তাহা ছাড়া, ইংলণ্ডেও একটি সাম্যবাদীদল (Communist Party) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু, ইংলণ্ডের রাজনৈতিক জীবনে ইহার প্রভাব খুবই অকিঞ্চিৎকর।

বর্তমানে ইংলণ্ডে আমরা প্রকৃতপক্ষে দুই দলীয় ব্যবস্থা দেখিতে পাই। গণতন্ত্রের সাফল্যের পক্ষে ইহা খুবই প্রয়োজনীয়। কেননা, ইহাতে সরকারের কর্মকুশলতা বাড়িয়া যায়।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী (Aims and programmes of the political parties) :

রক্ষণশীল দল (Conservative Party)—ইংলণ্ডে রক্ষণশীল দল (Conservative Party) সাধারণতঃ বড় বড় শিল্পপতি, মহাজন, ব্যাংক মালিক, ভূম্যধিকারী এবং গোঁড়া মতবাদসম্পন্ন লোকদের প্রতিনিধিত্ব করে। বিভিন্ন শিল্প জাতীয়করণ করার পক্ষপাতী তাঁহারা নহেন। ব্যক্তিগত শিল্পোন্নয়নের প্রয়াস রক্ষা করার ব্যাপারে রক্ষণশীল দল সর্বদাই উন্মুখ। এই দল সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষক।

ডক্টর ফাইনারের মতে "The social institutions favoured by Conservatives are Crown and national unity, Church, a powerful governing class, and the freedom of private property from state interference." ১৯৪৯ সালে রক্ষণশীল দল ইংলণ্ডে পূর্ণকর্মের স্থান (Full Eemployment) বজায় রাখাই কর্মসূচী হিসাবে ঘোষণা করে। ১৯৫১ সালের নির্বাচনী প্রচারে রক্ষণশীল দল গৃহ-ব্যবস্থার (Housing) উপর গুরুত্ব প্রদান করে। ১৯৫৫ সালে নির্বাচনী প্রচারে রক্ষণশীল দলের প্রতিশ্রুতি ছিল, "Prosperity through free enterprise" অর্থাৎ, 'নিয়ন্ত্রণবিহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সমৃদ্ধি'। উদারনৈতিক দল এবং রক্ষণশীল দল উভয়েই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কাঠামোয় কাজ করিত। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধে এবং পরবর্তীকালে ১৯১৯ সালের বিশ্বব্যাপী মন্দা বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর বিশেষ চাপের সৃষ্টি করায় শিল্প জাতীয়করণ ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের দিকে অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, এবং শ্রমিক দলও ক্রমশঃ জনপ্রিয় হইতে থাকে। ইহাতে উদারনৈতিক দল ক্রমশঃ জনপ্রিয়তা হারাইতে থাকে।

শ্রমিক দল (Labour Party)—শ্রমিক দলের (Labour Party) সংগঠনে বিভিন্ন শ্রমিকসংস্থা ও শ্রমিকসংঘেরই প্রাধান্য বেশী। এই দলের নীতি হইল বিভিন্ন শিল্পগুলিকে ব্যক্তিগত মালিকানা হইতে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় লইয়া আসা এবং সমস্ত শ্রমিককেই সমাজের কল্যাণের কাজে নিয়োজিত

করা। তবে শ্রমিক দল শাসনতান্ত্রিক নিয়মকানুনে বিশ্বাসী এবং শিল্পগুলি জাতীয়করণ করা হইলে মালিকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নীতিও সমর্থন করে। শ্রমিকদল সমাজতন্ত্র অপেক্ষা গণতন্ত্রের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে। গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাজতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করাই শ্রমিকদের লক্ষ্য।

শ্রমিকদল এবং রক্ষণশীলদলের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে সংগতি দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ যখন শ্রমিকদলে দক্ষিণপন্থীদের প্রাধান্য থাকে তখন ইহা সমাজের কোন মৌলিক পরিবর্তন চাহে না। শিল্পের জাতীয়করণ করা হইলেও মালিকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। ১৯১৮ সালে শ্রমিকদল কর্তৃক প্রদত্ত সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞায় বলা হইয়াছিল "উৎপাদনের উপকরণ বণ্টন এবং বিনিময় বিষয়ে সামাজিক কর্তৃত্বই" সমাজতন্ত্র। কিন্তু পরবর্তীকালে শ্রমিক দলের নেতা মরিসন এই সংজ্ঞার পরিবর্তন করেন। তাঁহার মতে সমাজ-সম্পর্কিত বিষয়সমূহে সামাজিক দায়িত্ব প্রতিষ্ঠা করার নীতিই সমাজতন্ত্র। ইংলণ্ডের শ্রমিকদল যে সম্পূর্ণভাবে সমাজতান্ত্রিক, তাহা নহে। এই দল কোন কোন ক্ষেত্রে বেসরকারী ক্ষেত্রের অস্তিত্ব সমর্থন করে। সুতরাং এই দলের নীতি অনেকটা মিশ্র-অর্থনীতির (Mixed Economy) নীতি সমর্থন করে। আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্বন্ধে শ্রমিকদল ও রক্ষণশীল দলের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য খুব কম। দুই দলই কমনওয়েলথ অফ নেশন্‌স্ এবং বৃটিশ উপনিবেশগুলি সম্পর্কে এক মত পোষণ করে। তবে এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, ইদানীং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যতগুলি দেশ ইংরেজ সাম্রাজ্যের অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত হইয়াছে, সেগুলি সবই শ্রমিক দলের আমলে হইয়াছে।

সাম্যবাদী বা কমিউনিস্ট দল (Communist Party): এই দল ধনতন্ত্রের সম্পূর্ণ অবসান এবং সমাজতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ চায়। যুদ্ধের সময় কমিউনিস্ট দল শ্রমিক দলের সহিত কাজ করিয়া জনগণের উপর কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়া ফেলে। ইহাতে শ্রমিকদল পরে কমিউনিস্ট প্রভাবান্বিত সদস্যগণকে দল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। গত দুইটি নির্বাচনে কমিউনিস্ট দল কমন্সসভায় সদস্য প্রেরণ করিতে পারে নাই।

উদারনৈতিক দল (Liberal Party)—উদারনৈতিক দল এককালে খুবই প্রভাবশীল ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে শ্রমিক দলের ক্রমোন্নতিতে এবং রক্ষণশীলদলের অটুট সংগঠনের ফলে উদারনৈতিক দলের প্রাধান্য নষ্ট হইয়া যায়। উদারনৈতিক দল সামাজিক সংস্কার এবং শিল্প জাতীয়করণ নীতি সমর্থন না করিয়া সরকারী নিয়ন্ত্রণের নীতি সমর্থন করে। বর্তমানে উদার-নৈতিক দলের কোন সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা দেখিতে পাওয়া যায় না,—দলীয় সংগঠনও খুব দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আজকাল এই দল মামুলীভাবে রক্ষণশীলদলের নীতি সমর্থন করিয়া থাকে।

সংক্ষিপ্তসার

১। পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র রাজনৈতিক দলব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। ইংলণ্ডে কমন্সসভায় যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই দলের নেতাকেই রাজা মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য আহ্বান করেন। তিনি নিজের দলের সদস্যদের মধ্য হইতে তাঁহার মন্ত্রীসভা গঠন করেন। কমন্সসভার দ্বিতীয় বৃহত্তম দলটি বিরোধী দলরূপে পরিচিত হয়। ইংলণ্ডের রাজনৈতিক দলগুলির উদ্দেশ্য পৃথক হইলেও সংগঠন পদ্ধতি প্রায় একরূপ। দলব্যবস্থা সেইদেশে খুবই অনমনীয়। বর্তমানে ইংলণ্ডে আমরা প্রধানতঃ দুইটি রাজনৈতিক দলকেই সক্রিয় দেখিতে পাই। সেই দুইটি হইতেছে রক্ষণশীল দল এবং শ্রমিক দল। উদারনৈতিক দলের প্রভাব বর্তমানে ইংলণ্ডে স্তিমিত হইয়া গিয়াছে। সাম্যবাদী বা কমিউনিস্ট দলও ইংলণ্ডে খুব শক্তিশালী নয়।

২। ইংলণ্ডের রাজনৈতিক দলব্যবস্থার সৃষ্টি হয় ইয়র্কিস্ট ও ল্যাঙ্কাস্ট্রিয়ানদের মধ্যে কলহ হইতে। বারুদ ষড়যন্ত্র ও গোলাপ যুদ্ধে এই কলহ আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তীকালে ধর্মের ভিত্তিতে ইংলণ্ডে দুইটি দলের সৃষ্টি হয়। একটি ছিল প্রটেস্ট্যাণ্ট এবং অপরটি ছিল রোমান ক্যাথলিক। এই ধর্মীয় দলাদলি হইতেই হুইগ ও টোরী নামে দুইটি রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়। ১৮৩২ সালের সংস্কার আইন প্রণীত হইবার পরে এই দুইটি দল যথাক্রমে উদারনৈতিক দল ও রক্ষণশীল দল রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

Exercises

1. Discuss the main features of the Party System in England. (৬৬—৬৭ পৃষ্ঠা)

2. Give an outline of the rise of the Party System in England. (এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রথম অধ্যায়টি দেখ।)

3. Discuss the aims and programmes of the different Political Parties in England. (৬৮—৭০ পৃষ্ঠা)

ষষ্ঠ অধ্যায়

বৃটেনের বিচার ব্যবস্থা (Judicial System of Britain)

ইংলণ্ডের বিচার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Main features of the Judicial System in England):

ইংলণ্ডের বিচার ব্যবস্থার একটি বিশেষ সুনাম আছে; তাহা হইতেছে এই যে যেই দেশের বিচার ব্যবস্থায় সর্বদাই ন্যায়ের নীতি অনুসরণ করিবার প্রচেষ্টা দেখা যায়; ইংলণ্ডের বিচারবিভাগ সম্বন্ধে কখনও দুর্নীতির অভিযোগ হয় নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় বৃটেনের বিচার ব্যবস্থার *Judicial Review* করিবার ক্ষমতা নাই। পার্লামেণ্ট প্রণীত কোন আইন বিধিসম্মত কিনা তাহা বিচার করিবার অধিকার বৃটেনের বিচার ব্যবস্থার নাই। ইংলণ্ডে শাসনসংক্রান্ত কোন আলাদা বিচারালয় (Administrative Courts) নাই। সাধারণ বিচারালয়েই (Ordinary Courts) সরকারী কর্মচারীদেরও বিচার হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অথবা ভারতের নাগরিকদের ন্যায় ইংলণ্ডের নাগরিকদের কোন মৌলিক অধিকার নাই। কিন্তু সেই দেশে কতিপয় আইনের নিয়ম (Rules of Law) সেই নিয়মগুলির ভিত্তিতেই বৃটেনের বিচার ব্যবস্থা নাগরিকদের স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে একটি বিশেষ ভূমিকা অবলম্বন করে। ইংলণ্ডের বিচার ব্যবস্থার আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে সেই দেশই সর্বপ্রথম জুরীর মাধ্যমে (Jury System) মামলা-মোকদ্দমা বিচার করিবার প্রথা প্রবর্তিত করে। ইংলণ্ডের বিচার ব্যবস্থা খুবই সহজ; একটি মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবার পথে সেখানে কোন জটিলতার সৃষ্টি হয় না। ইংলণ্ডের আইনবিদ্‌গণের মধ্যে দুইটি শ্রেণী আছে; একদল হইতেছেন সলিসিটার (Solicitors), তাঁহাদের কাজ হইতেছে মক্কেলদের নিকট হইতে মামলা গ্রহণ করিয়া যুক্তিতর্ক এবং বিচারের জন্য সেইগুলিকে তৈয়ার করা; অপর দল হইতেছেন ব্যারিস্টার, তাঁহাদের কাজ হইতেছে কোর্টে সেই মামলাগুলির বিচারের সময় যুক্তি প্রদান করা অথবা তর্ক-বিতর্ক করা।

বিচার ব্যবস্থার সংগঠন (Organisation of the Judiciary)

ইংলণ্ডের বিচারালয়গুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা, দেওয়ানী আদালত, ফৌজদারী আদালত এবং ডোমিনিয়ন ও উপনিবেশগুলির জন্য

আপীল আদালত। ছোট ছোট দেওয়ানী বিচারের জন্য একটি ছোট আদালত আছে। ইহাকে বলা হয়, "Court of Summary Jurisdiction." ইহার উপরে কতিপয় কাউন্টি আদালত (County Courts) আছে। এইগুলি ছাড়াও কতিপয় বরো আদালত (Borough Courts) আছে। লণ্ডন শহরের কাউন্টি আদালতটিকে "The Mayor's and City of London Court" বলা হয়। কাউন্টি আদালতের এলাকার বাহিরে অধিক অর্থ সম্বন্ধীয় বিবাদগুলির বিচার উচ্চ আদালত (The High Court of Justice) অনুষ্ঠিত হয়—ইহা উচ্চতম বিচারালয়ের (The Supreme Judicature) একটি অংশ। আদালতের (High Court) উপর একটি আপীল আদালত (Court of Appeal) আছে। এই আদালতে পাঁচজন বিচারপতি উচ্চ ন্যায় আদালত হইতে (High Court of Justice) যে সকল আপীল আসে সেগুলি বিচার-বিবেচনা করেন। লর্ড চ্যান্সেলার ইহার সভাপতিত্ব করেন। উচ্চতম আপীল আদালত হইতেছে লর্ডসভা।

উচ্চ আদালতে (High Court of Justice) তিনটি বিভাগ আছে, যথা, (১) রাজা বা রাণীর বিচার বিভাগ (The King's or Queen's Bench Division), (২) চ্যান্সারী বিভাগ (The Chancery Division) এবং (৩) ইচ্ছাপত্র, বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং নৌবাহিনী সংক্রান্ত বিচার বিভাগ (The Probate, Divorce and Admiralty Division)।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, লর্ডসভাই ইংলণ্ডের উচ্চতম আপীল আদালত। লর্ডসভায় সমস্ত বিচার বিভাগীয় কাজ পরিচালনার জন্য নয়জন আইনজ্ঞ লর্ড আছেন। তাহা ছাড়া, যে সমস্ত লর্ড আইনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, তাঁহারাও বিচারবিভাগ পরিচালনার সময় লর্ডসভায় উপস্থিত থাকিতে পারেন। ইংলণ্ডের ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার সংগঠনে আমরা প্রথমেই ছোট ছোট অপরাধের বিচারের জন্য কতিপয় ক্ষুদ্র দায়রা বিচার বা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত (Petty Sessional or Magistrates' Courts) দেখিতে পাই। ইহার পরবর্তী আদালত হইল ত্রৈমাসিক আদালত (Quarter Sessions)। এই আদালতে কম গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় নির্দিষ্ট অপরাধ সম্বন্ধে লিখিতভাবে অভিযোগ করা যায়। এখানে বিচার জুরীর সাহায্যে হইয়া থাকে। মৃত্যু অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের শাস্তি এই আদালত দেয় না। অপরাধ যদি গুরুতর হয়, তবে ইহা "Assizes" বা সাময়িক আদালতে পাঠান হয়। বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে ইহার অধিবেশন বসে। সাময়িক আদালতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় প্রকার মামলার বিচার থাকে। ইহার পরবর্তী উচ্চ আদালত হইতেছে ফৌজদারী আপীল আদালত (Court of Criminal Appeal)। এই আদালত অধস্তন অন্যান্য আদালত হইতে প্রেরিত আপীল বিচার

বিবেচনা করে। ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন ইংলণ্ডের লর্ড চীফ জাস্টিস্ এবং রাজার বা রাণীর বিচার বিভাগের (The King's or Queen's Bench Division) বিচারপতিগণ। সকলের উপরে লর্ডসভা। লর্ডসভায় যে সকল ফৌজদারী মামলা এটর্নি জেনারেল কর্তৃক অনুমোদিত হইবার পর আপীলের জন্য প্রেরিত হয়, লর্ডসভা সেগুলির বিচার করে।

ইংলণ্ডের ১৯২৫ সালের উচ্চতর বিচারালয় আইন (The Supreme Court of Judicature Act, 1925) অনুযায়ী বিচারকগণ অসদাচরণ না করিলে তাঁহাদের অপসারণ করা যায় না এবং তাহাও সম্ভবপর হয় যদি পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষে তাঁহাদের অপসারণের উদ্দেশ্যে (impeachmet) কোন প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। বিচারকদের কাজের সমালোচনা কমন্সসভার সদস্যগণ করিতে পারেন না। বিচারকদের বেতন সঞ্চিত তহবিলে (Consolidated Fund) ধার্য করা আছে। ইহাতে বিচার পতিগণ কার্যক্ষেত্রে কিছুটা নির্ভীক বা স্বাধীন হইতে পারেন। কিন্তু ইংলণ্ডের বিচার বিভাগ পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত আইনের বৈধতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে পারে না। অবশ্য বিচার বিভাগ পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত আইনের ব্যাখ্যা করিতে পারে কর্যক্ষেত্রে বিচার বিভাগ পার্লামেণ্টের ও ক্যাবিনেটের অধীন ; কেন না, বিচারালয়ের কোন সিদ্ধান্ত যদি ক্যাবিনেট অথবা পার্লামেণ্টের নিকট অনভিপ্রেত হয় তবে পার্লামেণ্টে অতি সহজেই আইন প্রণয়ন করিয়া সেই সিদ্ধান্ত বাতিল করিয়া দিতে পারে।

প্রিভি কাউন্সিল (Privy Council) :

প্রিভি কাউন্সিলের উৎপত্তি হয় নর্মান যুগের রাজার "কিউরিয়া রেজিস্" (Curia Regis) বা ক্ষুদ্রতম পরিষদ হইতে। রাজপরিবারের কর্মচারিগণ এবং রাজার ইচ্ছানুযায়ী মনোনীত অভিজাতসম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ ইহাব সদস্য হইতেন এবং রাজাকে শাসন পরিচালনায় সাহায্য করিতেন। পরবর্তীকালে এই পরিষদ দুইভাগে বিভক্ত হয়, প্রথমটি বিচার-বিভাগের কাজ লইয়া ব্যস্ত থাকিত এবং দ্বিতীয়টি শাসনবিভাগের কাজ লইয়া ব্যস্ত থাকিত। দ্বিতীয় বিভাগটিই প্রিভি কাউন্সিল (Privy Council) নামে পরিচিত হয়। প্রিভি কাউন্সিলের সদস্যগণ রাজার নিকট নিজেদের কাজের জন্য দায়ী থাকিতেন, পার্লামেণ্টের নিকট নহে। প্রিভি কাউন্সিলের সদস্যসংখ্যা পরবর্তীকালে বাড়িয়া যাওয়ায় রাজার একটি ক্ষুদ্রতর মন্ত্রণা-সভার প্রয়োজন হয় এবং ইহা হইতেই মন্ত্রীসভার উৎপত্তি হয়।

বর্তমানে প্রিভি কাউন্সিলের বিশেষ গুরুত্ব নাই। কেননা, শাসনবিভাগের সমুদয় কাজ পরিচালনা করিবার দায়িত্ব বর্তমানে ক্যাবিনেটের এবং

ক্যাবিনেটকে এজন্য পার্লামেন্টের নিকট দায়ী থাকিতে হয়। প্রিভি কাউন্সিলের কাজ বর্তমানে আনুষ্ঠানিক মাত্র। যদি কখনও প্রিভি কাউন্সিলের সাহায্যের দরকার হয় তাহা হইলে উহার মারফত স-পরিষদ রাজাজ্ঞা (Order-in-Council) জারী করা হয়। ইহা নিতান্ত আনুষ্ঠানিক ব্যাপার। সাধারণতঃ, যুদ্ধ ঘোষণা, পার্লামেন্টের সভা আহ্বান করা, স্থগিত রাখা এবং ভংগ করা, অথবা জাতীয় স্বার্থের সহিত জড়িত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে আদেশ জারী করা হয় প্রিভি কাউন্সিলের মাধ্যমে। মন্ত্রী এবং অন্যান্য পদস্থ কর্মচারীগণ প্রিভি কাউন্সিলের সভায় শপথ গ্রহণ করেন। প্রিভি কাউন্সিলের বিভিন্ন কমিটির মধ্যে বিচার বিভাগীয় কমিটিই (Judicial Committee) প্রধান। ১৮৩৩ সালে রাজার অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলি (Rcsiduary Powers of the Crown) প্রয়োগ করার জন্য এই কমিটি গঠিত হয়। বিভিন্ন চার্চের কোর্ট হইতে অথবা চ্যানেল দ্বীপের (chanal island) কোর্ট হইতে যে সকল আপীল আসে, সেই আপীলগুলি এই কমিটি গ্রহণ করিয়া থাকে, পূর্বে বিভিন্ন ডোমিনিয়নগুলি হইতেও বিভিন্ন আপীল প্রিভি কাউন্সিল গ্রহণ করিত। তাহা ছাড়া নৌবাহিনী, রাজকীয় আদালত, উপনিবেশ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বৃটিশ ডোমিনিয়নের বিচারালয় হইতে মামলার চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য আপীল করা হয় এই কমিটিতে।

বর্তমানে প্রিভি কাউন্সিলের সদস্যসংখ্যা প্রায় তিনশত। ক্যাবিনেটের প্রত্যেক সদস্যই প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য। বর্তমানে অন্যান্য মন্ত্রীগণও প্রিভি কাউন্সিলের সদস্যপদ লাভ করেন। কাউন্সিলের প্রত্যেক সদস্যই আজীবন সদস্যপদ লাভ করেন। সেইজন্য বর্তমান এবং পূর্ববর্তী ক্যাবিনেট-গুলির সদস্যগণই প্রিভি কাউন্সিলের সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাহা ছাড়া, সাহিত্য, আইন, রাষ্ট্রনীতি, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অথবা উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারি-গণকেও প্রিভি কাউন্সিলের সদস্যপদে মনোনীত করা হয়। ক্যাণ্টারবেরী এবং ইয়র্কের আর্চবিশপগণও প্রিভি কাউন্সিলের সদস্যপদ লাভ করেন।

Exercises

1. Discuss the main features of the British Judicial System. (৭১—৭৩ পৃষ্ঠা)

2. Give an outline of the organisation of the Judiciary in England. (৭১—৭৩ পৃষ্ঠা)

3. Write a note on the Privy Council. (৭৩—৭৪ পৃষ্ঠা)

সপ্তম অধ্যায়

ইংলণ্ডের স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থা (Local Government in England)

ইংলণ্ডে আমরা এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা দেখিতে পাই। কিন্তু, এই এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার ভিতরে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার গুরুত্ব কম নহে। পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রে যে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনব্যবস্থার গুরুত্ব খুব বেশী তাহা উনবিংশ শতাব্দীতে জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁহার Representative Government বইয়ে লিখিয়া গিয়াছিলেন। ব্ল্যাকস্টোনের মতে The liberties of England may be ascribed above all things to her local institutions. Since the days of their Saxon ancestors her sons have learned at their own gates the duties and responsibilities of Citizens.

স্থানীয় শাসনব্যবস্থার সৃষ্টি (Rise of Local Government)

ইংলণ্ডের স্থানীয় সরকারের গঠন একটি অপরিকল্পিত ও নেতৃত্বহীন ব্যবস্থার মধ্যে সম্ভবপর হইয়াছে।

"The English system of Local Government is the result of a long historical evolution, for the most part unguided and unplanned."

মুনরো বলেন, ১৮৩৫ সালের পূর্বে ইংলণ্ডে ছোট ছোট অনেকগুলি স্থানীয় শাসনকেন্দ্র ছিল। ১৮৩৫ সালে ইংলণ্ডে Municipal Corporations Act প্রণীত হয় এবং এই আইন অনুযায়ী ইংলণ্ডের বরোগুলিকে (borough administration) সুসংগঠিত করা হয়। ১৮৮৮ সালে স্থানীয় সরকার আইন (Local Government Act) অনুযায়ী কাউন্টিগুলিকে সুসংগঠিত করা হয়। ১৮৯৪ সালের একটি আইন অনুযায়ী বিভিন্ন জেলা এবং প্যারিস পরিষদগুলিকে (District and Parish Councils) সুসংগঠিত করা হয়। এই আইনে শহরাঞ্চলে এবং গ্রামাঞ্চলে আলাদা আলাদা জেলা গঠন করা হয়। ১৯২৯ সালের স্থানীয় সরকার আইনে বিভিন্ন জেলাকে সম্মিলিত করিয়া স্থানীয় সংগঠনগুলিকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করিবার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৩৩

সালের একটি আইনে স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলির সমুদয় ক্ষমতাগুলিকে একটি আইনের মাধ্যমে বিধিবদ্ধ করা হয়। ১৯৪৬ সালের জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা আইনে (National Health Service Act) আঞ্চলিক বোর্ডগুলির হাতে হাসপাতাল সংগঠন করিবার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। জাতীয় সাহায্য আইনে (National Assistance Act) স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে বৃদ্ধ, পংগু, অন্ধ, মূক এবং বধির লোকদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করিবার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ১৯৪৭ সালের শিশু আইন (Children Act) অনুযায়ী অনাথ শিশুদের যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্পণ করা হয়। ১৯৪৫ সালের Local Government Boundaries Commission অনুযায়ী বিভিন্ন কাউন্টি ও বরোর সীমানা নির্ধারণ করিবার জন্য একটি Boundary Commission গঠন করা হয়। ১৯৪৯ সালে এই আইনটি বাতিল করা হয়।

ইংলণ্ডের স্থানীয় শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Salient Features of the Local Government in England)

ইংলণ্ডের স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ ইংলণ্ডের স্থানীয় শাসনব্যবস্থার উৎপত্তি এ্যাংগ্লো-স্যাক্সন যুগে দেখা যায় এবং তখন হইতেই জনসাধারণ নিজেদের স্থানীয় ব্যাপারের শাসনসংক্রান্ত কাজে নিজেরাই দায়িত্ব লইতেন। দ্বিতীয়তঃ, সময়ের পরিবর্তনের সংগে ইংলণ্ডের স্থানীয় শাসনব্যবস্থা নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইয়াছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আইনের ফলে স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির শুধু সংগঠন ব্যবস্থারই পরিবর্তন হয় নাই, কাজেরও পরিবর্তন হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, যদিও স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির সংগঠনগুলির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে, তবুও বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে এই শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্মনীতির মধ্যে একটি ঐক্যবোধ আনিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সর্বশেষে, যদিও স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানগুলি নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ভোগ করে তবুও বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানগুলির কাজে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। এই হস্তক্ষেপ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে, আর্থিক সাহায্য প্রদান করিবার ক্ষেত্রে এবং শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রতিভাত হয়।

ইংলণ্ডের স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির সংগঠন (Organisation of the Local Bodies in England)

ইংলণ্ডের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে প্রধান হইতেছে কাউন্টি। কাউন্টিগুলি দুইপ্রকার ; যথা ঐতিহাসিক কাউন্টি (Historical Counties)

এবং শাসনতান্ত্রিক কাউন্টি (Administrative Counties)। এ্যাংগ্লো-স্যাক্সন সায়ার (Shires) হইতে ঐতিহাসিক কাউন্টিগুলির সৃষ্টি হইয়াছে; এইগুলির সংখ্যা হইতেছে ৫২; এই কাউন্টিগুলির কোনটিরই কাউন্টি পরিষদ নাই। এইগুলিকে পার্লামেণ্টের সদস্য নির্বাচনের সময় ব্যবহার করা হয়। ১৮৮৮ সালের স্থানীয় সরকার আইন অনুযায়ী ৬২টি শাসনতান্ত্রিক কাউন্টির সৃষ্টি করা হয়। এইগুলির প্রত্যেকেরই একটি কাউন্টি পরিষদ (County Council) আছে। এই পরিষদের একজন সভাপতি থাকেন এবং কয়েকজন অল্ডারম্যান ও কাউন্সিলার থাকেন।

কাউন্টি

কাউন্সিলারগণ অল্ডারম্যানগণকে ছয় বৎসরের জন্য নির্বাচিত করেন। কিন্তু তাঁহাদের অর্ধেকই প্রতি তিন বৎসরে অবসর গ্রহণ করেন। বৎসরে চারবার কাউন্টি পরিষদের বৈঠক বসে। গ্রাম্য জেলা পরিষদগুলির কাজ তত্ত্বাবধান করার ক্ষমতা কাউন্টি পরিষদের হাতে থাকে।

কাউন্টি রেট (County rate) ধার্য করার ক্ষমতা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনক্রমে টাকা ধার করার ক্ষমতা এই পরিষদের থাকে। তাহা ছাড়া, মাদকদ্রব্য ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স প্রদান করিবার ক্ষমতা থাকে কাউন্টির Justice of the Peace-এর হাতে।

কাউন্টিকর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারীগণ কাউন্টির প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে। প্রতিটি কাউন্টিতে অর্থ, শিক্ষা, জনসাহায্য জনস্বাস্থ্য, গৃহ-ব্যবস্থা, কৃষি, প্রসূতি-ব্যবস্থা, শিশু-কল্যাণ, প্রভৃতি সংক্রান্ত অন্যূন নয়টি কমিটি থাকে। এই কমিটিগুলির মধ্যে সেই পরিষদ ইহার ক্ষমতা ও দায়িত্ব নির্বাহ করিয়া থাকে।

একটি জনাকীর্ণ শহর লইয়া একটি কাউন্টি বরো (County Borough) গঠিত হয়। ১৯২৬ সালের আইন অনুযায়ী একটি কাউন্টি বরোতে কমপক্ষে ৭৫,০০০ লোক থাকিতে হইবে। প্রতিটি কাউন্টি বরোতে একটি কাউন্টি বরো পরিষদ থাকে এবং ইহাই কাউন্টি বরোর সমুদয় কাজ ও ক্ষমতা (যেমন প্রতিটি কাউন্টিতে করা হয়) নির্বাহ করিয়া থাকে। প্রতিটি বরোতে একজন মেয়র (Mayor) থাকেন। জনসাধারণ তিন বৎসরের জন্য অল্ডারম্যানগণকে নির্বাচিত করেন। যতজন কাউন্সিলার থাকেন তাহার এক-তৃতীয়াংশ অল্ডারম্যান থাকেন। অল্ডারম্যানগণের এক-তৃতীয়াংশ প্রতিবৎসর অবসর গ্রহণ করেন। বরোর কাজগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা, স্থানীয় আইন প্রণয়ন, স্থানীয় শাসন পরিচালনা এবং অর্থসংক্রান্ত কাজ।

কাউন্টি বরো

১৮৯৪ সালের District and Parish Councils Act অনুযায়ী

শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা গঠন করা হয়। শহরাঞ্চলের বড় বড় জেলাগুলিকে বরোর মর্যাদা দেওয়া হয়। গ্রামাঞ্চলে যে জেলাগুলি থাকে সেইগুলিকে প্যারিশের (Parish) মর্যাদা দেওয়া হয়। ছোট শহরগুলিও প্যারিশ হইতে পারে। প্রতি প্যারিশে তিনশতের বেশী লোক থাকিলেই একটি প্যারিশ পরিষদ গঠন করা হয়।

জেলা

স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির আয়ের উৎস—(Sources of Revenues of the local bodies)—স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির আয়ের উৎস হইতেছে নিম্নরূপ—(১) স্থানীয় রেট (Local Rates),—সাধারণতঃ স্থানীয় অধিবাসীদের সম্পত্তি এবং বাসগৃহের উপর ইহা ধার্য করা হয়। কোন বাসগৃহে যিনি থাকেন, তিনি সেই বাসগৃহের মালিক না হইলেও তাহাকে এই কর দিতে হয়।

(২) সরকারী সাহায্য (Grants in Aid)—১৮৩৫ সালের আইন হইতেই স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারী সাহায্য প্রদান করিবার নীতি চালু করা হয়। এই সরকারী সাহায্য দুই প্রকার হইতে পারে যথা, Percentage Grants এবং Block Grants। প্রথমটি হইতেছে একটি নির্দিষ্ট খরচের শতকরা একটি অংশ (যেমন, পুলিশ খরচের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) কেন্দ্রীয় সরকার প্রদান করিয়া থাকে এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে সাধারণ সরকারী সাহায্য। দ্বিতীয় ধরনের সাহায্যটি ১৯২৯ সালের স্থানীয় সরকার আইন প্রবর্তিত হয়।

(৩) বিভিন্ন কাউন্টি পরিষদ যে লাইসেন্স প্রদান করে, সেই লাইসেন্স ফি (Licence Fee) হইতে কিছু রাজস্ব পাওয়া যায়।

(৪) স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির আওতার মধ্যে ব্যবসায় বাণিজ্য চালাইতে হইলেও কর প্রদান করিতে হয়; ইহাকে বাণিজ্যজনিত রাজস্ব (Trading Revenue) বলা হয়।

(৫) কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনক্রমে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি স্থানীয় জনসাধারণের নিকট হইতে ধার গ্রহণ করিতে পারে।

Exercises

1. Describe the salient features of the system of Local Government in England. What are the sources of revenues of the Local Bodies in England? (৭৬—৭৮ পৃষ্ঠা)

2. Give an outline of the organisation of the Local Self-Government in England. (৭৫—৭৮ পৃষ্ঠা)

3. "The English system of Local Government is the result of a long historical evolution, for the most part unguided and unplanned." (Munro)—Discuss the statement. (৭৫—৭৬ পৃষ্ঠা)

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা

অষ্টম অধ্যায়

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ ও বৈশিষ্ট্য (Evolution of the American Constitution and its features)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের ক্রমবিকাশ—(Evolution of the American Constitution)

আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে ১৩টি মূল রাষ্ট্র যোগদান করে। ১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই তারিখে আমেরিকা স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং ১৭৭৭ সালের ১৫ই নভেম্বর তারিখে ১৩টি মূলরাষ্ট্র একত্রিত হইয়া একটি রাষ্ট্র সমবায় (Confederation) গঠন করে। ১৭৮৭ সালে ফিলাডেলফিয়ায় এই মূল-রাষ্ট্রগুলি একটি শাসনতন্ত্র গঠন করিবার জন্য সমবেত হয়। নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী মার্কিন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসে ১৭৮৯ সালের ৪ঠা মার্চ তারিখে। যুক্তরাষ্ট্রের নীতির উপর এই শাসনতন্ত্র ভিত্তিশীল ছিল এবং ইহাতে প্রতিটি মূলরাষ্ট্রেরই সমান মর্যাদা ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-তন্ত্রটিকে খুব অনমনীয় (rigid) করা হয় এবং আজ পর্যন্ত ইহার মাত্র ২২টি সংশোধন হইয়াছে। কিন্তু তবুও কতিপয় প্রথাগত বিধানের (Conventions) ফলে এবং বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্তের (judicial interpretations) ফলে শাসনতন্ত্রের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন হইয়াছে। রাষ্ট্রপতির পরোক্ষ নির্বাচন, দুইবারের বেশী রাষ্ট্রপতির নির্বাচনপ্রার্থী না হওয়া, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারীদের মেয়াদ সিনেট কর্তৃক ভদ্রতাসূচকভাবে অনুমোদন করা (Senatorial courtesy), ক্যাবিনেটের উৎপত্তি, সপ্তাহে একবার সাংবাদিকদের সহিত রাষ্ট্রপতির সাক্ষাৎকার, এবং জনপ্রতিনিধিসভার কার্যপদ্ধতি, প্রভৃতি অনেক কিছুই প্রথাগত বিধানের মাধ্যমে সৃষ্টি হইয়াছে। শাসনতন্ত্রের সংশোধন করা আমেরিকায় খুবই কঠিন। কিন্তু বিচারবিভাগীয়

সিদ্ধান্তের দ্বারা শাসনতন্ত্র সংশোধনের উদ্দেশ্য সাধন করা যায়। কোন বিধান কার্যকরী হইলে প্রকৃতই ইহাতে শাসনতান্ত্রিক বিধান লংঘন করা হইবে কি না, এই বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া আমেরিকায় বিবেচিত হয়। যদি সুপ্রীম কোর্ট এই নির্দেশ দেয় যে সংশ্লিষ্ট বিধানটি কার্যকরী হইলে শাসনতন্ত্র লঙ্ঘিত হইবে না, তাহা হইলে শাসনতন্ত্র সংশোধন করিবারও কোন প্রয়োজন হয় না সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশমত সেই বিধানটি কার্যকরী করা চলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে এই বিধানটি থাকার ফলে শাসনব্যবস্থার কাজ খুবই নমনীয় হইয়া গিয়াছে, যদিও শাসনতন্ত্রটি প্রকৃতপক্ষে খুবই কঠোর বা অনমনীয়। এইজন্য মুনরোর (Munro) মতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রটি হইতেছে a living organism, a Darwinian, not a Newtonian affair" ক্রমবিকাশের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রটির যথেষ্ট পরিবর্তন হইয়াছে। অনেক প্রথাগত বিধান এই শাসন ব্যবস্থায় গড়িয়া উঠিয়াছে, এবং সর্বোপরি সুপ্রীম কোর্ট শাসনতন্ত্রের অভিভাবক (guardian) হিসাবে কাজ করায় শাসনতন্ত্রটি কখনই স্থাণু থাকে নাই; অনমনীয়তার মধ্যে থাকিয়াও ইহা পরিবর্তনশীল হইয়াছে। মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হিউজেস্ (Hughes) বলিয়াছিলেন, "we are under the constitution, but the constitution is what the judges say it."

আমেরিকার শাসনতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য (Chief features of the constitution of the U.S.A.) :

১৭৭৭ সালে আমেরিকার বৃটিশ উপনিবেশগুলি একটি রাষ্ট্র-সমবায় (Confederation) গঠন করে। মুন্‌রোর (Munro) মতে এই রাষ্ট্র-সমবায়ের করধার্য করা, ঋণ-গ্রহণ, ব্যবসায়-বাণিজ্যের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করা এবং প্রতিরক্ষার রক্ষিবাহিনী বজায় রাখার ক্ষমতা ছিল না বলিয়া উপনিবেশগুলির মধ্যে ঐক্য বজায় ছিল না। এইজন্য ১৭৮৭ সালে ওয়াশিংটনের সভাপতিত্বে ১৩টি নবজাত রাষ্ট্রের এক সভা (convention) আহ্বান করা হয় এবং নূতন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র গৃহীত হয়। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সদস্যরাষ্ট্রের সংখ্যা ৫০,—সম্প্রতি আলাস্কা ও হাওয়াই রাজ্যও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সদস্য হইয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র আলোচনা করিলে আমরা ইহার নিম্নলিখিত প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিতে পাই।

প্রথমতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের প্রকৃতি যুক্তরাষ্ট্রীয় (federal)। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন, শাসনতন্ত্র দ্বারা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার-

গুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন এবং অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলি (residuary powers) রাজ্যসরকারগুলিকে অর্পণ, ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ, দ্বৈত নাগরিকতা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য ইত্যাদি সব বৈশিষ্ট্যগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রটি লিখিত (written)। অবশ্য এই শাসনতন্ত্রে যে প্রথাগত বিধানের কোনও ভূমিকা নাই, তাহা নহে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে ক্যাবিনেট আমরা দেখিতে পাই, তাহা প্রথাগত বিধানের ফলেই সৃষ্ট হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি (doctrine of Separation of Powers) অনুসৃত হইয়াছে। শাসনতন্ত্রের ১নং ধারায় আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত সমুদয় ক্ষমতা কংগ্রেসের হাতে অর্পণ করা হইয়াছে, ২নং ধারায় শাসন সংক্রান্ত সমুদয় ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে অর্পণ করা হইয়াছে এবং ৩নং ধারায় বিচারবিভাগীয় সমুদয় ক্ষমতা সুপ্রীমকোর্টের হাতে অর্পণ করা হইয়াছে। অবশ্য সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অনুসরণ করা কখনই সম্ভবপর নহে। তবুও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মোটামুটিভাবে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অনুসৃত হইয়াছে। শুধু ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতিই নহে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি (Theory of checks and balance) অনুসৃত হইয়াছে। কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত বিলে রাষ্ট্রপতি পকেট ভিটো (Pocket veto) প্রয়োগ করিয়া তাহা বাতিল করিতে পারেন। অবশ্য অন্যান্য ক্ষেত্রে যদিও রাষ্ট্রপতি ভিটো প্রয়োগ করিতে পারেন, তবুও যদি দ্বিতীয়বার কংগ্রেস দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাহায্যে বিলটি অনুমোদন করেন, তবে রাষ্ট্রপতির ভিটো কার্যকরী হয় না। তাহাছাড়া, কংগ্রেস প্রণীত আইনকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করার অধিকার সুপ্রীমকোর্টের আছে। ব্যক্তি-স্বাধীনতা বজায় রাখিবার জন্য শাসনতন্ত্রটিকে এমনভাবে রচনা করা হইয়াছে যাহাতে সরকারের প্রত্যেক বিভাগ অপর দুই বিভাগকে মোটামুটিভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়া সরকারের ভারসাম্য বজায় রাখিতে সমর্থ হয়।

চতুর্থতঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমরা রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার (Presidential government) দেখিতে পাই। ইহা ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণের ফল। মার্কিন ক্যাবিনেটের সদস্যগণ মার্কিন কংগ্রেসের সদস্য নহেন, এবং নিজেদের ক্রিয়াকলাপের জন্য মার্কিন কংগ্রেসের নিকট দায়ী থাকেন না। শাসন বিভাগের প্রধান হইতেছেন রাষ্ট্রপতি। তিনি একটি বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলী (electoral college) কর্তৃক নির্বাচিত হন। মার্কিন কংগ্রেসের অধিবেশন আহ্বান করা, স্থগিত রাখা অথবা ইহা ভাংগিয়া দেওয়ার অধিকার রাষ্ট্রপতির নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে আইন প্রণয়ন বিভাগ হইতে শাসনবিভাগকে

পৃথক করিয়া রাখিবার নীতি অনুসৃত হওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের প্রয়োজন হয়।

পঞ্চমতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমরা শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা দেখিতে পাই। শাসনতন্ত্রের রক্ষা ও ব্যাখ্যা করিবার দায়িত্ব হইতেছে বিচার-বিভাগের। তাহা ছাড়া, ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অনুসৃত হওয়ায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। জেম্‌স্ বেকের (James Beck) মতে সুপ্রীম কোর্ট হইতেছে "balance-wheel of the constitution." চার্লস্ বিয়ার্ডও (Charles Beard) বলিয়াছিলেন, "The Supreme Court is the crowning feature of the federal system."

ষষ্ঠতঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমরা শাসনতন্ত্র অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন দেখিতে পাই। ক্ষমতা বণ্টনের নীতি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্রে, যেমন, আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উপর কর ধার্য করিবার বা বাক্-স্বাধীনতা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণ প্রভৃতি করিবার ব্যাপারে কোন ক্ষমতা নাই। আবার সন্ধি, চুক্তি ইত্যাদি সম্পাদন করিবার ক্ষমতা, কোন রাষ্ট্রসমবায়ে যোগদান করিবার ক্ষমতা, এবং মুদ্রা নির্মাণ করিবার ক্ষমতা মূল রাষ্ট্রগুলির নাই। রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ বাড়িয়া যাওয়ায় অবশিষ্ট বিষয়গুলি সম্পর্কে বিভিন্ন ক্ষমতা (residuary powers) মূলরাষ্ট্রগুলিকে দেওয়া হইয়াছে।

সপ্তমতঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রটি খুব অনমনীয় (rigid)। খুব সহজে ইহা সংশোধন করা যায় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রটিকে দুইটি উপায়ে সংশোধন করা যায়।

প্রথমতঃ কংগ্রেস সভার দুই কক্ষের মোট সদস্যদের $\frac{2}{3}$ অংশকে শাসনতন্ত্র সংশোধনের কোন প্রস্তাব সমর্থন করিতে হইবে, অথবা বিকল্পে আটচল্লিশটি রাজ্যের (বর্তমানে পঞ্চাশটি) দুই-তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ বত্রিশটি মূলরাষ্ট্র দ্বারা এই সংশোধনের জন্য বিশেষ একটি সভা (convention) আহ্বান করিয়া এই প্রস্তাবটি সমর্থন করাইতে হইবে। এইরূপে সমর্থিত সংশোধনী প্রস্তাব ছত্রিশটি রাজ্যের আইনসভা অথবা আহূত সভায় উপস্থিত $\frac{3}{4}$ সংখ্যক সদস্য দ্বারা সমর্থিত হইলে শাসনতন্ত্র পরিবর্তিত হইবে। কিন্তু এই সংশোধন পদ্ধতি অনুযায়ী আজ পর্যন্ত মাত্র ২২ টি সংশোধন হইয়াছে। সংশোধনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক আইন প্রণয়নের বিচার বিভাগীয় সমীক্ষার (Judicial Review of legislation) দ্বারা।

শাসনতন্ত্র সংশোধনের পদ্ধতি

অষ্টমতঃ আমেরিকার শাসনতন্ত্রে দ্বৈত নাগরিকতা (double citizenship)

দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে এই ব্যবস্থা নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক অধিবাসী একই সংগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কোন এক মূলরাষ্ট্রের নাগরিক। সর্বশেষে, আমেরিকার নাগরিকগণকে আমেরিকার শাসনতন্ত্র কতিপয় মৌলিক অধিকার প্রদান করিয়াছে।

শাসনতন্ত্রের দিক হইতে বিচার করিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার মূলরাষ্ট্রগুলি অপেক্ষা দুর্বল। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ আদালতের ব্যাখ্যার সাহায্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে অধিকতর শক্তিশালী করা হইয়াছে। সম্প্রতি প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রেই কেন্দ্রীয় সরকারকে অধিকতর ক্ষমতা প্রদানের ঝোঁক দেখা যায়। ভারতেও কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারগুলি অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী।

ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রের সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের তুলনা

ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র অলিখিত এবং নমনীয়, কিন্তু আমেরিকার শাসনতন্ত্র লিখিত এবং অনমনীয়। আবার ইংলণ্ডে আমরা এককেন্দ্রিক সরকার দেখিতে পাই ; কিন্তু, আমেরিকায় আমরা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার দেখিতে পাই। সুতরাং আমেরিকার এবং ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। ইংলণ্ডে সরকার মন্ত্রীসভা চালিত এবং মন্ত্রীসভা নিজের কাজের জন্য পার্লামেন্টের নিকট দায়ী। কিন্তু, আমেরিকায় আমরা রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকার দেখিতে পাই এবং সেখানে শাসন বিভাগ কোনও কাজের জন্য আইনপরিষদের নিকট দায়ী নহে। আমেরিকায় ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ করা হইয়াছে এবং ইহার ফলে বিচার বিভাগ যথেষ্ট পরিমাণে স্বাধীন হইতে পারিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, আমেরিকায় শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য স্বীকার করা হইয়াছে, কিন্তু ইংলণ্ডে রাজা-সমেত পার্লামেন্টের (King-in-Parliament) প্রাধান্য স্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং, ইংলণ্ডে আইনপরিষদই প্রধান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রই প্রধান ("In England, legislature is supreme ; in the U. S. A., the constitution is supreme")। ইংলণ্ড সরকারের ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ করা হয় নাই। ইংলণ্ডের বিচার বিভাগও আমেরিকার বিচার বিভাগের ন্যায় স্বাধীনতা ভোগ করে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সিনেটে প্রত্যেকটি মূলরাষ্ট্রের সমান প্রতিনিধিত্ব থাকে, এবং জনপ্রতিনিধি সভায় (House of Representatives) স্পীকারই দলীয় নেতার ভূমিকা গ্রহণ করেন। অপর দিকে ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের উচ্চতর কক্ষ লর্ড অর্থাৎ অভিজাত সম্প্রদায়ের ও রাজপরিবারের সহিত যুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত। ইংলণ্ডের কমন্সসভার স্পীকার দল-নিরপেক্ষ ব্যক্তি

হিসাবে কাজ করেন। ইংলণ্ডে যেমন কতিপয় প্রথাগত বিধান (conventions) আছে, আমেরিকার শাসনতন্ত্রেও কতিপয় প্রথাগত বিধান গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু, ইংলণ্ডে যেমন কতিপয় আইনের অনুশাসন (Rule of Law) আছে আমেরিকায় সেইরূপ আইনের অনুশাসন নাই। কিন্তু, আমেরিকার শাসনতন্ত্রে নাগরিকদের কতিপয় মৌলিক অধিকারের বিধান আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আমেরিকার শাসনতন্ত্রের সহিত ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রের মূলগত পার্থক্য রহিয়া গিয়াছে।

সংক্ষিপ্তসার

আমেরিকায় ১৭৭৭ সালে একটি রাষ্ট্র সমবায় (Confederation) গঠিত হয়। পরে ১৭৮৭ সালে নূতন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র গৃহীত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখযোগ্য :—

(১) মার্কিন শাসনতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রীয়, লিখিত এবং অনমনীয়। (২) মার্কিন শাসনতন্ত্রে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি মোটামুটিভাবে অনুসৃত হইয়াছে। (৩) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমরা রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার দেখিতে পাই। (৪) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমরা শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য এবং বিচারবিভাগের স্বাধীনতা দেখিতে পাই। (৫) শাসনতন্ত্র অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্য-সরকারগুলি এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন হইয়াছে। (৬) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বৈত নাগরিকতা দেখিতে পাওয়া যায়, এবং নাগরিকদের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কতিপয় মৌলিক অধিকার আছে। শাসনতন্ত্রের দিক হইতে চিন্তা করিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার মূলরাষ্ট্রগুলি অপেক্ষা দুর্বল। তুলনামূলকভাবে বলা যাইতে পারে ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রটি অলিখিত, নমনীয় এবং এককেন্দ্রিক।

Exercises

1. "The American Constitution is a living organism. It is a Darwinian and not a Newtonian affair." (Munro).
—Discuss the Statement.
(৭৯—৮০ পৃষ্ঠা)

2. Indicate the salient features of the Constitution of the U. S. A.. Contrast the salient features of the Constitution of Great Britain and the United States. (৮০—৮৪ পৃষ্ঠা)

3. An American writer has said that the Constitution of the U. S. A. is more flexible than the British one. How would you justify this view-point ?

[**উত্তর সংকেত :** শাসনতন্ত্রের শ্রেণী-বিভাগ আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই ব্রিটেনের শাসনতন্ত্র নমনীয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র অনমনীয়। কারণ, সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রেব সংশোধন অথবা পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের সংশোধন অথবা পরিবর্তন করিতে হইলে অধিকতর জটিল পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু, এই জটিল পদ্ধতি ছাড়াও অন্য একটি উপায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করা যায়। এমনিতে এই পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের খুব অল্প পরিমাণ, সর্বসমেত মাত্র ২২টি, নিয়মতান্ত্রিক সংশোধন করা হইয়াছে। কিন্তু তবুও শাসনতন্ত্রের অনেক পরিবর্তন আমরা দেখিতে পাই এবং তাহা সম্ভবপর হইয়াছে আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত দ্বারা। যখনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সরকার নিজেদের ক্রিয়াকলাপে শাসনতান্ত্রিক বিধিনিষেধের সম্মুখীন হয়, তখনই সুপ্রীম কোর্টের নিকট হইতে শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন বিধানের ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হয়। তখন সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত অথবা ব্যাখ্যা অনুযায়ী শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা যাইতে পারে এবং সেই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রের উল্লিখিত সংশোধনের জটিল পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয় না। অপরদিকে, ইংলণ্ডে উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন হয় না বলিয়া সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে শাসনতন্ত্রের সংশোধন করিতে হয়। কিন্তু, তাহা সহজ পদ্ধতি হইলেও সময়-সাপেক্ষ। পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষেই সংশোধনী বিলটি পাস করাইয়া লইতে হয়। অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে খুবই অল্পসময়ে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা যায় এবং সেইক্ষেত্রে কংগ্রেসেব অথবা রাজ্য-আইনসভাগুলির সম্মতির প্রয়োজন হয় না। এই দিক হইতে বিবেচনা করিয়া বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র অপেক্ষাও নমনীয়। অবশ্য শাসনতান্ত্রিক বিধানের দিক হইতে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র নমনীয় এবং মার্কিন শাসমতন্ত্র অনমনীয়। আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ট কার্যক্ষেত্রে কোন আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া কার্যতঃ সংশোধনের কাজ করিতে পারে। কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট কোন সংবিধানের কোন ধারা বাতিল করিতে পারে না; অথচ সংশোধনের মাধ্যমে কোন ধারা বাতিল করিয়া দেওয়া যায়। মার্কিন শাসনতন্ত্রের অনমনীয়তা কখনই শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের প্রয়োজন হইলে কোনরকম বাধার সৃষ্টি করে নাই।]

নবম অধ্যায়

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন বিভাগ (Executive in the American Federation)

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করিবার নিয়ম (Process of Presidential election.)

শাসনতন্ত্রের দিক হইতে বিবেচনা করিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি একটি পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী (electoral college) কর্তৃক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। প্রত্যেকটি মূলরাষ্ট্র রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য কংগ্রেসে ঐ রাজ্যের প্রতিনিধির সমানসংখ্যক নির্বাচক নির্বাচন করে। কংগ্রেসের কোন কক্ষের কোন সভ্য অথবা জাতীয় সরকারের কোন কর্মচারী এই মধ্যবর্তী নির্বাচকমণ্ডলীর সভ্য হইতে পারেন না। এই নির্বাচকগণ নিজ নিজ মূলরাষ্ট্রে একটি নির্দিষ্ট দিনে রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের জন্য ভোট প্রদান করেন। রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীগণের মধ্যে (House of Representatives) মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করা হয়। ভোট প্রদানের কাজ সর্বদাই গোপনে অনুষ্ঠিত হয়।

বর্তমানে রাজনৈতিক দল-ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় রাষ্ট্রপতির নির্বাচন বাস্তবক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ হইয়া গিয়াছে। কেননা, বর্তমানে রাষ্ট্রপতির নির্বাচকগণ সকলেই দলীয় ভিত্তিতে নির্বাচিত হন এবং তাঁহারা রাষ্ট্রপতিপদের জন্য দলীয় প্রার্থীকেই সমর্থন করিবার জন্য প্রতিশ্রুতি থাকেন। ১৭৯৬ সালের পর হইতে এখন পর্যন্ত এই প্রতিশ্রুতি কখনই ভংগ করা হয় নাই।

রাষ্ট্রপতি পদের যোগ্যতা (Qualifications of the President)

রাষ্ট্রপতিকে অন্ততঃ ৩৫ বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে, জন্মসূত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হইতে হইবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অন্ততঃ ১৪ বৎসর বসবাস করিতে হইবে। রাষ্ট্রপতি চার বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। পূর্বে রাষ্ট্রপতি পুনর্নির্বাচিত হওয়ার পথে শাসনতান্ত্রিক কোন বাধা ছিল না। কিন্তু জর্জ ওয়াশিংটন যখন তৃতীয়বার রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন, তখন হইতে একটি প্রথাগত বিধান গড়িয়া উঠে যে রাষ্ট্রপতি দুইবারের বেশী উক্ত পদে নির্বাচিত হইবে না। কিন্তু রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের আমলে এই প্রথাগত বিধান ভংগ করা হয়। রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট পর পর চারবার রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত হন। ১৯৫৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র সংশোধন করিয়া

স্থির করা হইয়াছে যে কোন ব্যক্তিই দুইবারের বেশী রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত হইতে পারিবেন না। চার বৎসরের মধ্যে রাষ্ট্রপতিকে স্বাভাবিক অবস্থায় পদচ্যুত করা যায় না; তবে তিনি যদি শাসনতন্ত্র লংঘন, দেশদ্রোহিতা, উৎকোচ গ্রহণ এবং অন্যান্য দুর্নীতিমূলক কাজের অভিযোগে অপরাধী প্রমাণিত হন, তবে তাঁহাকে শাস্তি প্রদানস্বরূপ অপসারণ (impeachment) করা যায়। সাধারণতঃ জনপ্রতিনিধি সভায় (House of Representatives) শাস্তিমূলক অপসারণ প্রস্তাবটি উত্থাপিত হয় এবং সিনেট সভা ইহার বিচার করে। সিনেট সভা যখন এই প্রস্তাবের বিচার করে, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি সিনেটের সভায় সভাপতিত্ব করেন। যদি সিনেটের উপস্থিত সদস্যগণের দুই-তৃতীয়াংশ এই অভিযোগ সমর্থন করেন, তবেই রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করা যায়।

কার্যকাল শেষ হইয়া যাইবার পূর্বে যদি রাষ্ট্রপতির মৃত্যু হয় অথবা তিনি যদি পদচ্যুত হন, তবে রাষ্ট্রপতির কাজ চালাইবার ভার পড়ে উপ-রাষ্ট্রপতির (Vice-President) উপর।

রাষ্ট্রপতির মর্যাদা, ক্ষমতা ও কার্যাবলী (Position, Powers and Functions of the President)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি শুধু নামেমাত্র রাষ্ট্রের প্রধান নহেন, বাস্তবেও তিনিই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান শাসনকর্তা। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের রাষ্ট্র-প্রধানগণের মধ্যে (শুধু জরুরী সময়ে ভারতীয় রাষ্ট্রপতি ব্যতীত) আমেরিকার রাষ্ট্রপতিই সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন। বিচারপতিগণ কর্তৃক শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা, কংগ্রেস কর্তৃক প্রণীত আইন এবং প্রথাগত বিধানগুলির জন্যই রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে।

রাষ্ট্রপতির শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতাগুলির (executive and administrative powers) আলোচনা করিলেই রাষ্ট্রপতির মর্যাদা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। শাসনকর্তা হিসাবে রাষ্ট্রপতির প্রথম কাজ হইল যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র, কংগ্রেস কর্তৃক প্রণীত আইন, পররাষ্ট্র সমূহের সহিত সম্পাদিত বিভিন্ন চুক্তি ও সন্ধি এবং বিচার বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন নির্দেশ ও রায় কার্যকরী করা। এই উদ্দেশ্যে সরকারের যাবতীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং বিভিন্ন সচিবকে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করিয়া থাকেন। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন দেশের জন্য রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করা, এবং সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতিগণকে নিয়োগ করাও তাঁহার কাজ। এই সব নিয়োগ অনুমোদন করিবার দায়িত্ব হইতেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের। কিন্তু বর্তমান "সিনেটের উপযুক্ত ভদ্রতা" (Senatorial courtesy) এই প্রথাগত

শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা

বিধানটি গড়িয়া উঠায় সিনেট সাধারণতঃ এই নিয়োগগুলিতে আপত্তি করে না। শাসনবিভাগের (বিচার বিভাগের নহে) যে কোন কর্মচারীকে তিনি পদচ্যুত করিতে পারেন। এইজন্য সিনেটের সম্মতি লইবার প্রয়োজন হয় না। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সচিব রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন, তাঁহারা কংগ্রেসের সদস্য নহেন। তাঁহারা নিজেদের কাজের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকটেই দায়ী থাকেন। সচিবমণ্ডলীর (cabinet) সভায় সভাপতিত্ব করেন রাষ্ট্রপতি স্বয়ং ; তবে পররাষ্ট্রসচিবই (Secretary of State) সচিবমণ্ডলীর মধ্যে প্রধান বলিয়া বিবেচিত হন। কিন্তু তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রী নামে অভিহিত করা যায় না। কূটনৈতিক বিষয়ে রাষ্ট্রপতির বিশেষ ক্ষমতা আছে। তিনি বৈদেশিক রাষ্ট্রের দূতগণকে গ্রহণ করেন এবং সিনেটের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতিতে যে কোন রাষ্ট্রের সহিত কোন চুক্তি সম্পাদন করিতে পারেন। রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের সমুদয় রক্ষিবাহিনীর (armed forces) সর্বাধিনায়ক এবং যুদ্ধের সময় তিনি সর্বাধিনায়ক (commander-in-chief) হিসাবে শত্রুপক্ষকে পরাস্ত করিবার জন্য যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন। তবে কংগ্রেসের উভয় কক্ষের সম্মতি ব্যতীত রাষ্ট্রপতি যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারেন না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের প্রকৃত প্রধান ; কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের রাজার ন্যায় তিনি নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসাবেও যে কাজ করেন না তাহা নহে। এইজন্যই বলা হয়, "The President is the nearest and the dearest substitute for a royal ideal which the American possesses."

বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতির কিছু বিচারবিভাগীয় ক্ষমতাও (Judicial Powers) যে নাই, তাহা নহে। যাহারা পদচ্যুত হইয়াছে তাহারা ব্যতীত যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন ভংগের অপরাধী সকলকেই রাষ্ট্রপতি ক্ষমা প্রদর্শন করিতে পারেন। তিনি শুধু সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতিদের নিযুক্ত করিতে পারেন ; কিন্তু তাঁহাদের পদচ্যুত করিতে পারেন না। মূল রাষ্ট্রের আদালতগুলির বিচারকদেব তিনি নিয়োগ করিতে পারেন না।

রাষ্ট্রপতির আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতাগুলি (Legislative Powers) আলোচনা করিতে গেলে মার্কিন কংগ্রেসের সহিত রাষ্ট্রপতির কি সম্পর্ক, তাহা আমাদের বিবেচনা করিতে হইবে।

কংগ্রেসের সহিত রাষ্ট্রপতির সম্পর্ক (Position of the **President in relation to the Congress)**

শাসনতন্ত্রের দিক হইতে বিবেচনা করিলে রাষ্ট্রপতির আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা (legislative powers) খুবই অল্প। ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ হওয়ায়

সরকারের শাসনবিভাগ এবং আইনপ্রণয়ন বিভাগের কার্যক্ষেত্র যতদূর সম্ভব আলাদা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি মার্কিন কংগ্রেসের কোন কক্ষের সদস্য হইতে পারেন না, কংগ্রেসের কোন অধিবেশন ভাংগিয়া দিতে পারেন না এবং ইচ্ছামত কংগ্রেসের কোন কক্ষের কোন অধিবেশনে বক্তৃতাও প্রদান করিতে পারেন না অথবা স্বয়ংপ্রবৃত্ত হইয়া আইন প্রণয়নের জন্য কোনও বিল উত্থাপন করিতে পারেন না। তিনি কোনও গুরুতর অপরাধ না করিলে (যেমন শাসনতন্ত্র লংঘন, দেশদ্রোহিতা, উৎকোচ গ্রহণ, ইত্যাদি) মার্কিন কংগ্রেস নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে তাঁহাকে পদচ্যুতও করিতে পারে না।

কিন্তু দলীয় শাসনব্যবস্থায় পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রপতি কিছু পরিমাণে মার্কিন কংগ্রেসকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন। শুধু তাহাই নহে, রাষ্ট্রপতি বাস্তবক্ষেত্রে বর্তমানে আইন পরিষদের কার্যপরিচালনার অন্যতম পরিচালক হইয়া গিয়াছেন।

পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রপতি মার্কিন কংগ্রেসকে কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করেন।

শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি মাঝে মাঝে কংগ্রেসে বাণী (messages) পাঠাইতে পারেন। এই বাণীর মধ্য দিয়াই আইন প্রণয়ন অথবা আইন সংশোধন ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসকে কতিপয় সুপারিশ এবং পরামর্শ প্রদান করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ দেখা যায়, মার্কিন কংগ্রেসে যে দল সংখ্যাধিক্য অর্জন করেন রাষ্ট্রপতিও সেই দলেরই নেতা থাকেন। (অবশ্য ইহার যে ব্যতিক্রম হইতে পারে না, তাহা নহে,) যদিও রাষ্ট্রপতি ব্যক্তিগতভাবে কংগ্রেসে আইন প্রণয়নের জন্য কোন বিল উত্থাপন করিতে পারেন না, তিনি তাঁহার দলীয় সদস্যদের মাধ্যমে সেই বিল কংগ্রেসে উত্থাপিত করাইতে পারেন। তাঁহার দলীয় সদস্যগণের তিনিই নেতা। সুতরাং, দলীয় ব্যবস্থার অনমনীয়তার (rigidity) দরুণ তিনি নিজের দলের সদস্যদের কার্যসূচী নিজেই তৈয়ারী করিয়া দিতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় বিলগুলি কংগ্রেসে উত্থাপিত করিতে তাঁহাদিগকে বাধ্য করিতে পারেন। তাহা ছাড়া রাষ্ট্রপতির ভেটো প্রদান করিবার সীমিত ক্ষমতা (limited veto power) আছে এবং ইহা প্রয়োগ করিয়া তিনি সাময়িকভাবে একটি বিলের আইনে পরিণত হওয়া বন্ধ করিতে পারেন এবং ইহাকে পুনরায় দশদিনের মধ্যে কংগ্রেসে ফেরত পাঠাইতে পারেন। রাষ্ট্রপতির দুইপ্রকার ভেটো ক্ষমতা আছে। প্রথমতঃ, যদি কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হইতে চলিয়াছে এইরকম সময়ে কোন বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরিত হইলে রাষ্ট্রপতি বিলটিতে সম্মতি প্রদান করা সম্পর্কিত কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াই সময় কাটাইয়া দিতে পারেন। অর্থাৎ, সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকিয়াই রাষ্ট্রপতি বিলটি নষ্ট করিয়া দিতে পারেন, ইহাকে *Pocket veto* বলা হয়। দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্রপতি ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া বিলটি কংগ্রেসে দশদিনের মধ্যে ফেরৎ পাঠাইতে পারেন। রাষ্ট্রপতির

ভেটো ক্ষমতা সম্বন্ধে অধ্যাপক মুনরো বলেন, "Enabling each President to set up his own judgment to that of the legislature, it has developed the Presidency into something *like a third Chamber* of Congress, thus making the chief executive a more active figure in legislation than he was originally intended to be." কিন্তু এই বিলটি যদি দ্বিতীয়বার কংগ্রেসে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতিতে পুনরায় অনুমোদিত হয়, তবে রাষ্ট্রপতি ইহাতে সম্মতি প্রদান করিতে বাধ্য থাকেন। প্রথমবার বিলটি পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরৎ পাঠাইবার পর দ্বিতীয়বার বিলটি কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত হইবার মধ্যে যে সময়ের ব্যবধান থাকে, ইহার মধ্যে রাষ্ট্রপতি সাংবাদিক সম্মেলন, বেতার বক্তৃতা, কংগ্রেসে বাণী প্রেরণ এবং বিবৃতি প্রকাশ করিয়া জনমতকে এই বিলটি সম্বন্ধে অবহিত করিতে পারেন এবং কংগ্রেসের কাজকর্মের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। কংগ্রেস যদি কখনও রাষ্ট্রপতির মতের বিরুদ্ধে কোন আইন প্রণয়ন করিতে চাহে, রাষ্ট্রপতি তাঁহার দলীয় সদস্যদের সাহায্যে ইহাতে বাধার সৃষ্টি করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতির হাতে যে অনেকগুলি উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী নিয়োগের ভার রহিয়াছে, তাহার সাহায্যেও তিনি কংগ্রেসের অনেক সদস্যকে নিজের দলে টানিয়া আনিতে পারেন। শুধু চাকরি বিতরণের সাহায্যেই কংগ্রেসের অনেক সদস্যকে তিনি নিজের দলভুক্ত করিতে পারেন।

পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রপতি আইন প্রণয়ন ব্যাপারে কংগ্রেসের উপর প্রভাব বিস্তার করিলেও রাষ্ট্রপতিকে অনেক ব্যাপারে সিনেটের উপর নির্ভর করিতে হয়। প্রথমতঃ রাষ্ট্রপতি যেসকল উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ করেন, সেইগুলিতে সিনেটের সম্মতির প্রয়োজন হয়। যদি সিনেট কখনও এই নিয়োগগুলি অনুমোদন না করে, তবে রাষ্ট্রপতিকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতি শাসনবিভাগের কর্ণধার হিসাবে যে টাকা খরচ করেন, তাহা বরাদ্দ করিবার দায়িত্ব হইল সিনেটের। সিনেট যদি সরকারের প্রণীত বাজেটের বরাদ্দ কমাইয়া দেয়, তবেই রাষ্ট্রপতিকে অসুবিধায় পড়িতে হয়। তৃতীয়তঃ, সিনেটের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতি ব্যতীত রাষ্ট্রপতি কখনও কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত চুক্তি অথবা সন্ধি সম্পাদন করিতে পারেন না। সেইজন্য শাসনব্যবস্থার সুষ্ঠু কাজের জন্য রাষ্ট্রপতি ও সিনেটের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতার প্রয়োজন। অধ্যাপক লাস্কি বলেন, "Unaided by the Senate, the American President is a sailor on an uncharted sea." কিন্তু রাষ্ট্রপতি আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কোন ক্ষমতা ভোগ করেন না, একথা তত্ত্বের দিক হইতে

রাষ্ট্রপতিকে সিনেটের উপর নির্ভর করিতে হয়

সত্য নহে। "রাষ্ট্রপতি উইলসন একাধারে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ভোগ করিয়াছিলেন।" ("To say that the U. S. A. President is an executive officer and has nothing to do with law-making is to talk philosophy, not facts. Mr. Woodrow Wilson was President and Prime Minister combined."—Munro.)।

আমেরিকার রাষ্ট্রপতি এবং ইংলণ্ডের রাজার মধ্যে তুলনা (Comparison of the American President and the British King):

অনেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি এবং ইংলণ্ডের রাজার মধ্যে তুলনা করেন। ইংলণ্ডের রাজা রাষ্ট্রের প্রধান। অনুরূপভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিও রাষ্ট্রের প্রধান। কিন্তু দুইজনের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। অধ্যাপক লাস্কি বলেন, "The President of the United States is more or less tham a king; he is also both 'more or less than a Prime Minister." একজন উত্তরাধিকারসূত্রে রাজত্ব করেন, আরেকজন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হইয়া চারি বৎসরের জন্য রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ইংলণ্ডের রাজা সবদিক হইতেই রাষ্ট্রের প্রধান। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নামে রাষ্ট্রের প্রধান হইলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি শাসন বিভাগের প্রধান। আইন পরিষদের উপর তাঁহার প্রত্যক্ষ কোন ক্ষমতা নাই,—বিচার বিভাগকেও তিনি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন না। সুতরাং এই দিক হইতে ইংলণ্ডের রাজার স্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির স্থান অপেক্ষা অনেক উচ্চে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ইংলণ্ডের রাজা অপেক্ষা বেশী ক্ষমতা ভোগ করেন। স্যার হেন্‌রী মেইন বলেন, "ইংলণ্ডের রাজা রাজত্ব করেন, কিন্তু শাসন করেন না; আমেরিকার রাষ্ট্রপতি রাজত্ব করেন না, কিন্তু শাসন করেন।" ("The English King reigns, but does not govern, the American President governs but does not reign"—Sir Henry Maine) রাজা প্রকৃতপক্ষে শাসন বিভাগে কোন কাজই পরিচালনা করেন না। ক্যাবিনেটের সদস্যগণের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি কাজ করেন। সরকারী কাজের জন্য রাজার কোন দায়িত্ব নাই,—সব ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের দায়িত্ব থাকে। ইংলণ্ডের রাজা বা রাণী কোন অন্যায় করিতে পারেন না। কেন না, রাজশক্তির পক্ষ হইতে যাহা কিছু করা হয়, তাহার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীই দায়ী থাকেন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতিই প্রকৃত শাসনকর্তা। অন্ততঃ চারি বৎসরের জন্য শাসনবিভাগের সমুদয় কাজ রাষ্ট্রপতি নিজেই পরিচালনা করেন। তাঁহাকে কাজে সাহায্য করিবার জন্য তিনি নিজেই কয়েকজন সচিব

নিযুক্ত করেন। সচিবগণ তাঁহার কাছেই নিজেদের কাজের জন্য দায়ী থাকেন। যুদ্ধের সময় রাষ্ট্রপতিই রক্ষিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হন। স্বাভাবিক সময়েও তিনি শাসনবিভাগের প্রতিটি দপ্তরের কাজ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন। ইংলণ্ডের শাসকের ন্যায় তিনি শুধু নামেমাত্র প্রধান নহেন। কার্যক্ষেত্রেও তিনি শাসনবিভাগের সর্বপ্রধান এবং রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান। শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রপতিকে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। কিন্তু, রাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে আইন-পরিষদকে নিয়ন্ত্রণ করেন। রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে তিনি অপরধীদের প্রতি প্রয়োজন হইলে ক্ষমা প্রদর্শনও করিতে পারেন। তিনি কাহারও পরামর্শ লইয়া কাজ করিতে বাধ্য নহেন। সাধারণতঃ, তিনি কাহারও পরামর্শের প্রত্যাশী থাকেন না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মার্কিন রাষ্ট্রপতি প্রকৃতই শাসনক্ষমতা ভোগ করেন। তিনি ইংলণ্ডের রাজার ন্যায় নামেমাত্র শাসক নহেন। এইদিক হইতে বিচার করিলে তিনি ইংলণ্ডের রাজা অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা ভোগ করেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি এবং ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে তুলনা। (Comparison of the American President and the British Prime Minister.)

তত্ত্বের দিক হইতে বিচার করিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি এবং বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উভয়েই পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। কিন্তু, বাস্তবে উভয়েই প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন ; কারণ, আমেরিকায় জনসাধারণ যখন রাষ্ট্রপতির নির্বাচকদের নির্বাচিত করে, তখনই বুঝা যায় রাষ্ট্রপতি কে হইবেন। কারণ, নিবাচকগণ রাজনৈতিক দলের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন। যে দলের নির্বাচকসংখ্যা বেশী হয়, সেই দলের নেতা অথবা পূর্ব হইতেই মনোনীত প্রার্থী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ইংলণ্ডেও সাধারণ নির্বাচনে যখন নাগরিকগণ ভোট প্রদান করে, তখন তাহারা জানে যে, তাহারা যে দলকে সমর্থন করিতেছে, সেই দল কমন্সসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিলে প্রধানমন্ত্রী কে হইবেন।

দ্বিতীয়তঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি এবং বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উভয়েই শাসনবিভাগের প্রকৃত পরিচালক। কিন্তু, তত্ত্বের দিক হইতে মার্কিন রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের প্রধান, কিন্তু বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রের প্রধান নহেন। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ও তাঁহার ক্যাবিনেটের সহকর্মীদের পদমর্যাদা সমান ; প্রধানমন্ত্রী শুধু সমান ক্ষমতা সম্পন্ন ক্যাবিনেট সদস্যদের মধ্যে অগ্রণী (Chief among equals)। মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যগণ তাঁহার সহকর্মী ; তাঁহারা তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারী নহেন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সচিবগণ রাষ্ট্রপতির অধীনস্থ কর্মচারী।

রাষ্ট্রপতি নিজের ইচ্ছানুযায়ী তাঁহাদের নিযুক্ত করেন এবং প্রয়োজন হইলে তিনি তাঁহাদের বরখাস্ত করিতে পারেন। সুতরাং, রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি যে পদমর্যাদার অধিকারী, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী তাহা পাইতে পারেন না। শাসনবিভাগের কোন কাজের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিকে মার্কিন কংগ্রেসের নিকট দায়ী থাকিতে হয় না এবং মার্কিন কংগ্রেসের সদস্যগণ রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারেন না এবং গুরুতর অপরাধের অভিযোগ ব্যতীত (যেমন শাসনতন্ত্র লংঘন দেশদ্রোহিতা, উৎকোচগ্রহণ, ইত্যাদি) অন্য কোন কারণে চারি বৎসর আগে রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করিতে পারেন না। এই দিক হইতে বিচার করিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর পদমর্যাদা অপেক্ষা অনেক বেশী।

কিন্তু, কার্যক্ষেত্রে শাসন পরিচালনার ব্যাপারে, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি অপেক্ষা কম ক্ষমতাশালী ত নহেনই, বরং কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি অপেক্ষাও অনেক বেশী সুবিধা ভোগ করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত কোন ক্ষমতা নাই; কিন্তু বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর তাহা আছে। শুধু তাহাই নহে, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী সম্পূর্ণভাবে বৃটিশ কমন্সসভাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে সমর্থ এবং এমন কি প্রয়োজন হইলে তিনি রাজা বা রাণীকে দিয়া কমন্সসভা ভাংগিয়া দিতে পারেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ থাকায় যদি কংগ্রেস কখনও রাষ্ট্রপতির ইচ্ছানুযায়ী কোন আইন প্রণয়ন না করে, তবে রাষ্ট্রপতির কিছু করার নাই। কিন্তু ইংলণ্ডে যদি কখনও কমন্সসভার সদস্যগণ প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন আইন প্রণয়ন করিতে চাহে, তখন প্রধানমন্ত্রী কমন্সসভা ভাংগিয়া দিবার ভয় দেখাইয়া সেই আইন প্রণয়ন করা বন্ধ রাখিতে পারেন। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হইতে কার্যক্ষেত্রে অধিকতর ক্ষমতা ভোগ করেন। পুনরায়, কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি কোন চুক্তি সম্পাদন অথবা সন্ধি স্থাপন করিতে চাহেন, তবে সিনেটের দুই-তৃতীয়াংশের সভ্যের সম্মতির প্রয়োজন হয় না। কাবিনেটের অধিকাংশ সভ্যের সম্মতি লইয়া বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীর পক্ষে যে কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত যে কোন প্রকার চুক্তি সম্পাদন করিতে পারেন এবং পরে কমন্সসভায় নিজের দলের সংখ্যাধিক্যের জোরে তাহা অনুমোদিত করাইয়া লইতে পারেন। ক্যাবিনেট সদস্যদের সমর্থন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী সর্বদাই পাইয়া থাকেন; কেননা, ক্যাবিনেটের সদস্যগণ তাঁহারই নিজের দল হইতে মনোনীত ব্যক্তি। দেখা যাইতেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী অপেক্ষা বেশী হইলেও এবং তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনবিভাগের সর্বপ্রধান হইলেও কার্যক্ষেত্রে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এমন কয়েকটি বিশেষ ক্ষমতা ও সুবিধা ভোগ করেন যাহার ফলে তিনি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্ষমতাশালী শাসকদের মধ্যে অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হন। তাহা ছাড়া, জাতীয় সংকটের সময় বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী সম্মিলিত জাতীয় সরকারের নেতৃত্ব করেন। তবুও, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীকে পার্লামেণ্টের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইতে হয় ও নিজের কাজের জন্য পার্লামেণ্টের নিকট জবাবদিহি করিতে হয়, এবং সর্বদা পার্লামেণ্টের সদস্যদের আস্থাভাজন থাকিবার জন্য চেষ্টা করিতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিকে কংগ্রেসের সদস্য হইতে হয় না এবং শাসনবিভাগের কাজের জন্য কাহারও নিকট জবাবদিহি করিতে হয় না অথবা কংগ্রেসের সদস্যদের আস্থাভাজন থাকিবার জন্য সর্বদা চেষ্টা করিতে হয় না। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ও ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী একই সংগে ক্ষমতার দিক হইতে পরস্পর হইতে ছোট এবং পরস্পর হইতে বড়। অধ্যাপক অগ্ (Ogg) এবং অধ্যাপক (Ray) মনে করেন, একনায়কগণকে বাদ দিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি সর্বাধিক ক্ষমতাসম্পন্ন শাসকদের মধ্যে প্রধান। অপর দিকে এ্যাস্‌কুইথের মতে, ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর কাজ এবং ক্ষমতা কি হইবে, তাহা তিনি নিজেই স্থির করেন। ("The office of the Prime Minister in England is what is holder chooses to make it"—Asquith)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাবিনেট (The Cabinet in the U. S. A.)

সাধারণতঃ ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায় আমরা যে ধরনের ক্যাবিনেট দেখিতে পাই, আমেরিকায় সেই ধরণের ক্যাবিনেট দেখিতে পাওয়া যায় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাবিনেট হইল রাষ্ট্রপতির ক্যাবিনেট,—প্রথাগত বিধানের উপর ভিত্তি করিয়া এই ক্যাবিনেট গড়িয়া উঠিয়াছে। রাষ্ট্রপতি নিজের ইচ্ছানুযায়ী ক্যাবিনেটের সদস্যগণকে নিযুক্ত করেন। তাঁহারা সাধারণতঃ বিভিন্ন দপ্তরের সচিবরূপে (secretaries) অভিহিত হন। তাঁহাদের কার্যকাল রাষ্ট্রপতির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে এবং তাঁহারা তাঁহাদের বিভিন্ন কাজের জন্য শুধু রাষ্ট্রপতির নিকটই দায়ী থাকেন। সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাগণকে লইয়াই ক্যাবিনেট গঠিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাবিনেটের সদস্যগণ রাষ্ট্রপতির অধীনস্থ সরকারী কর্মচারী মাত্র, তাঁহারা সহকর্মী নহেন। তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করা বা না করা রাষ্ট্রপতির ইচ্ছাধীন। ক্যাবিনেটকে

ক্যাবিনেট এবং রাষ্ট্রপতির মধ্যে সম্বন্ধ

কোন কাজের জন্য কংগ্রেসের নিকট জবাবদিহি করিতে হয় না অথবা কংগ্রেসের নিকট দায়ী হইতে হয় না। কিন্তু, ক্যাবিনেটকে নিজের কাজের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকিতে হয়। ক্যাবিনেটের পূর্ণ অধিবেশনে রাষ্ট্রপতিই সভাপতিত্ব করেন। ক্যাবিনেটের সদস্যগণের মধ্যে অগ্রণী হইতেছেন পররাষ্ট্র সচিব (Secretary of State)। সুতরাং ইউরোপের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আমরা যে দায়িত্বশীল সরকার দেখিতে পাই, আমেরিকার ক্যাবিনেট সেই রকম দায়িত্বশীল সরকারের নিয়মানুযায়ী কাজ করে না। আমেরিকার ক্যাবিনেট সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের কাঠামোয় কাজ করে। সুতরাং ক্যাবিনেটের সদস্যগণ শুধু রাষ্ট্রপতির নিকটই দায়ী থাকেন এবং রাষ্ট্রপতির নির্দেশেই পরিচালিত হন।

বৃটিশ ক্যাবিনেট এবং আমেরিকার ক্যাবিনেটের মধ্যে তুলনা ঃ
(Comparison of the British Cabinet and the American Cabinet.)

বৃটিশ ক্যাবিনেট এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাবিনেটের মধ্যে আমরা নিম্নলিখিত সাদৃশ্য দেখিতে পাই :—

বৃটিশ ক্যাবিনেট ও আমেরিকার ক্যাবিনেটের মধ্যে তুলনা

(১) উভয় দেশেই ক্যাবিনেট প্রথাগত বিধানের ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিয়াছে। (২) ইংলণ্ডের ক্যাবিনেটের সদস্যগণ, কমন্সসভার যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়াছে, সেই রাজনৈতিক দল হইতে নির্বাচিত হন। আমেরিকায়ও ক্যাবিনেট সদস্যগণ একই রাজনৈতিক দল (তাহা হইতেছে রাষ্ট্রপতির নিজের দল) হইতে মনোনীত হন। (৩) ইংলণ্ডের ন্যায় আমেরিকায় গুরুত্বপূর্ণ সরকারী দপ্তরগুলির কর্ম-কর্তাগণ ক্যাবিনেটের সদস্য হন। (৪) ইংলণ্ডে যেমন রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে রাজা (বা রাণী) ক্যাবিনেট সদস্যগণকে নিযুক্ত করেন, আমেরিকায়ও সেইপ্রকার রাষ্ট্রপতি ক্যাবিনেট-সদস্যগণকে নিযুক্ত করেন। (৫) যদিও ইংলণ্ডে ক্যাবিনেটের বিভিন্ন সদস্য প্রধানমন্ত্রীর সমমর্যাদাসম্পন্ন এবং তাঁহার সহকর্মী, তবুও প্রধানমন্ত্রী তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী এবং তাঁহাদের মনোনয়ন করেন। আমেরিকায়ও সেই প্রকার রাষ্ট্রপতি ক্যাবিনেটের সদস্যদের নিযুক্ত করেন। কিন্তু, ক্যাবিনেটের সদস্যগণ রাষ্ট্রপতির সমমর্যাদাসম্পন্ন সহকর্মী নহেন, তাঁহার অধস্তন কর্মচারী মাত্র।

বৃটিশ মন্ত্রিসভা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিসভার মধ্যে আমরা নিম্নলিখিত পার্থক্য দেখিতে পাই :—

(১) ইংলণ্ডের ক্যাবিনেটের সদস্যদের পার্লামেন্টের সদস্য হইতে হয়। যদি ক্যাবিনেটের কোনও সদস্য পার্লামেন্টের সদস্য না হন তবে ক্যাবিনেটের সদস্য হইবার ছয়মাসের মধ্যে তাঁহাকে পার্লামেন্টের সদস্য হইতে হয়। পক্ষান্তরে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাবিনেটের সদস্যগণকে মার্কিন কংগ্রেসের সদস্য হইতে হয় না। তাঁহারা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত সরকারী কর্মচারী মাত্র। (২) বৃটিশ ক্যাবিনেটের সদস্যগণকে নিজেদের কাজের জন্য পার্লামেন্টের নিকট দায়ী থাকিতে হয় এবং জবাবদিহি প্রদান করিতে হয়। যতক্ষণ ক্যাবিনেটের সদস্যগণ কমন্সসভার সদস্যদের আস্থাভাজন থাকেন, ততক্ষণই তাঁহারা ক্যাবিনেটের সদস্য হিসাবে থাকিতে পারেন। যদি কমন্সসভা কোন ক্যাবিনেট সদস্যের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব অথবা নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করে, তবে যৌথ দায়িত্বের ফলস্বরূপ সমগ্র ক্যাবিনেটকেই পদত্যাগ করিতে হয়। এই যৌথ দায়িত্বের জন্য বৃটিশ ক্যাবিনেটের সদস্যদের নিজেদের মধ্যে পূর্ণ মতৈক্য ও সংহতি বজায় রাখিতে হয়: কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাবিনেটের সদস্যদের মধ্যে সেইপ্রকার মতৈক্য ও সংহতি থাকে না। ক্যাবিনেটের বিভিন্ন কর্মসূচীর চূড়ান্তরূপ একমাত্র রাষ্ট্রপতির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। (৩) বৃটিশ ক্যাবিনেটের বৈঠকে সংখ্যাধিক্যের মতের ভিত্তিতে ক্যাবিনেটের কর্মসূচী প্রণীত হয়। প্রধানমন্ত্রী কোন একটি বিশেষ নীতি গ্রহণ করিবার জন্য ক্যাবিনেটের সদস্যগণকে অনুপ্রাণিত করিতে পারেন, কিন্তু বাধ্য করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাবিনেটের শাসনসংক্রান্ত নীতির চূড়ান্তরূপ সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রপতির উপর নির্ভর করে। তবে রাষ্ট্রপতি ক্যাবিনেটের সদস্যগণের সহিত বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ করিতে পারেন; কিন্তু কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বা না করা তাঁহার নিজের উপর নির্ভর করে। প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্রপতি ক্যাবিনেটের সদস্যগণের উপর শাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে আদেশ জারী করিতে পারেন। (৪) ইংলণ্ডে ক্যাবিনেটই হইল প্রকৃতপক্ষে শাসন পরিচালনার সংস্থা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্যাবিনেটের ভূমিকা হইল অনেকটা উপদেষ্টা পরিষদের ন্যায়; কোন কিছু করা বা না করা রাষ্ট্রপতির উপর নির্ভর করে।

বৃটিশ ক্যাবিনেট ও আমেরিকার ক্যাবিনেটের মধ্যে বৈসাদৃশ্য

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইংলণ্ডের ক্যাবিনেট এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাবিনেটের মধ্যে মূলগত পার্থক্য আছে। একটি হইতেছে দায়িত্বশীল সরকারের ক্যাবিনেট, অপরটি হইতেছে রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারের ক্যাবিনেট—এইজন্য এই দুইটি ক্যাবিনেটের মধ্যে মূলগত পার্থক্য দেখা যায়।

সংক্ষিপ্তসার

১। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি একটি পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী (Eelectoral college) কর্তৃক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। প্রত্যেকটি মূলরাষ্ট্র রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য কংগ্রেসে ঐ রাজ্যের প্রতিনিধির সমান সংখ্যক নির্বাচক নির্বাচন করে। এইভাবে এই নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হয়। মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে অন্ততঃ ৩৫ বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে। কোন রাষ্ট্রপতিই দুইবারের বেশী রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত হইতে পারে না। চারি বৎসরের মধ্যে সাধারণভাবে রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করা যায় না। তবে যদি তিনি শাসনতন্ত্র লংঘন, দেশদ্রোহিতা, উৎকোচগ্রহণ এবং অন্যান্য দুর্নীতিমূলক কাজের অভিযোগে অপরাধী প্রমাণিত হন, তবে তাঁহাকে শাস্তি প্রদান স্বরূপ অপসারণ (impeach) করা যায়।

২। মার্কিন রাষ্ট্রপতি শুধু নামেমাত্র রাষ্ট্রের প্রধান নহেন, বাস্তবেও তিনি প্রধান শাসনকর্তা। শাসনকর্তা হিসাবে তাঁহার প্রথম কাজ হইল যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র, কংগ্রেস কর্তৃক প্রণীত আইন, পররাষ্ট্র সমূহের সহিত সম্পাদিত বিভিন্ন চুক্তি ও সন্ধি এবং বিচার বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন নির্দেশ ও রায় কার্যকরী করা। তাহা ছাড়া, সিনেটের অনুমোদন সাপেক্ষে বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করা, এবং সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ করাও রাষ্ট্রপতির কাজ। সিনেট সাধারণতঃ এই নিয়োগগুলিতে আপত্তি করেন না। রাষ্ট্রপতি তাঁহার সচিবমণ্ডলীকে নিয়োগ করেন। সিনেটের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতিতে রাষ্ট্রপতি যে কোন রাষ্ট্রের সহিত কোন চুক্তি সম্পাদন করিতে পারেন। রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের সমুদয় রক্ষিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। তবে কংগ্রেসের উভয় কক্ষের সম্মতি ব্যতীত রাষ্ট্রপতি কখনও যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারেন না। বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা হিসাবে যাহারা পদচ্যুত হইয়াছে তাহাদের ব্যতীত যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন ভংগের অপরাধী সকলকেই রাষ্ট্রপতি ক্ষমা প্রদর্শন করিতে পারেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মোটামুটিভাবে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা হইয়াছে। তবুও কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসকে কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন। যেমন, কংগ্রেস কর্তৃক কোনও বিল অনুমোদিত হইলে রাষ্ট্রপতি Pocket veto প্রয়োগ করিয়া ইহাকে আইনে পরিণত হওয়ার পথে সাময়িক বাধার সৃষ্টি করিতে পারেন। অবশ্য এই বিলটি যদি দ্বিতীয়বার কংগ্রেসে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতিতে পুনরায় অনুমোদিত হয় তবে রাষ্ট্রপতি ইহাতে সম্মতি-প্রদান করিতে বাধ্য থাকেন। আবার শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি মাঝে মাঝে কংগ্রেসে বাণী (messages) পাঠাইতে পারেন। তবে রাষ্ট্রপতিকে সিনেটের উপর নির্ভর করিতে হয়।

৩। অন্যান্যদেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সহিত মার্কিন রাষ্ট্রপতির তুলনা করা যায়। ইংলণ্ডের রাজা কেবল রাজত্বই করেন, শাসন করেন না। কিন্তু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি শাসন করেন, রাজত্ব করেন না। ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থায় রাজার কোনরূপ দায়িত্ব নাই; তাহার পক্ষে শাসনকাজের সব দায়িত্ব গ্রহণ করে মন্ত্রীসভা এবং বিশেষতঃ প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি প্রকৃতই শাসক। যদিও তাহাকে কোন কাজের জন্য কংগ্রেসের নিকট দায়ী থাকিতে হয় না, তবুও তাঁহার কাজের গুরুত্ব খুবই বেশী। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর সহিত যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির তুলনা করা যায়, তবে দেখা যায় কোন কোন ক্ষেত্রে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বেশী এবং আবার কোন কোন ক্ষেত্রে মার্কিন রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বেশী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ক্ষমতাসীন থাকেন; আইনসভার কাছে তাহাকে জবাবদিহি করিতে হয় না অথবা আইনসভার আস্থা-অনাস্থার উপর তাঁহার কার্যকাল নির্ভর করে না। কিন্তু, বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রীর ক্ষেত্রে ইহা সম্পূর্ণ বিপরীত। জরুরী অবস্থায় ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী অনেক বেশী ক্ষমতা ভোগ করেন। তখন একটি সর্বদলীয় মন্ত্রীসভা গঠিত হয় বলিয়া বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীকে পার্লামেণ্টে কোন সংকটের সম্মুখীন হইতে হয় না। স্বাভাবিক অবস্থায়ও বৃটিশপ্রধানমন্ত্রী রাজাকে কমন্সসভা ভাংগিয়া দেওয়ার পরামর্শ প্রদান করিতে পারেন। মার্কিন রাষ্ট্রপতি কংগ্রেস ভাংগিয়া দেওয়ার ক্ষমতা ভোগ করেন না। তবে মর্যাদার দিক হইতে মার্কিন রাষ্ট্রপতি বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী অপেক্ষা অধিকতর উচ্চ পদে থাকেন।

৪। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাবিনেট গঠিত হয় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাবিনেটের সদস্যগণ কংগ্রেসের সদস্য থাকেন না, অথবা কংগ্রেসের নিকট তাহাদের জবাবদিহি করিতে হয় না। তাঁহারা রাষ্ট্রপতির কাছেই নিজেদের কাজের জন্য দায়ী থাকেন এবং রাষ্ট্রপতি যখন খুশী তখনই তাঁহাদের পদচ্যুত করিতে পারেন। অবশ্য মার্কিন ক্যাবিনেটের সদস্যগণ কংগ্রেসের অধিবেশনে বিতর্কে অংশগ্রহণ না করিলেও উপস্থিত থাকিতে পারেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোন প্রধানমন্ত্রী নাই। ইংলণ্ডের ক্যাবিনেট গঠিত হয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক। ইংলণ্ডের ক্যাবিনেটকে নিজের কাজের জন্য কমন্সসভার নিকট দায়ী থাকিতে হয় এবং কমন্সসভা মন্ত্রী-সভার উপরে অথবা যে কোনও একজন মন্ত্রীর উপর অনাস্থা প্রকাশ করিলে সমগ্র মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করিতে হয়।

Exercises

1. Explain the process of Presidential election and discuss the position and powers of the President of the U. S. A.
(৮৬—৯১ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the position of the President in relation to the Congress in the U. S. A. and elucidate the statement, "Unaided by the Senate, the American President is sailor on an uuchanted sea." (৮৮—৯১ পৃষ্ঠা)

3. "The President of the U. S. A. is both more or less than a king. He is also at the same time both more or less than a Prime Minister." (Laski)—Discuss the statement. (৯১—৯৪ পৃষ্ঠা)

4. Compare the position of the Prime Minister of England in the Britsh Cabinet with that of the President of U. S. A. in the American Cabinet. (৯২—৯৪ পৃষ্ঠা)

5. "The Cabinet in the U. S. A. hardly corresponds to the classic idea of a Cabinet to which representative government in Europe has accustomed us." (Laski)—Examine the statement. (৯২—৯৬ পৃষ্ঠা)

6. Write a note on the Cabinet System in U. S. A. and compare the Cabinet in the U. S. A. with that in Britain.
(৯৪—৯৬ পৃষ্ঠা)

7. Discuss the position of the President of the U. S. A. in relation to the Cabinet. (৯৪—৯৫ পৃষ্ঠা)

[**উত্তর-সংকেত :** এই প্রশ্নের উত্তর করিবার জন্য আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ও ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে তুলনা এবং বৃটিশ ক্যাবিনেট ও আমেরিকান ক্যাবিনেটের মধ্যে তুলনা সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা হইতে সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে।]

দশম অধ্যায়

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস এবং দলীয় ব্যবস্থা
(Congress in the U. S. A. and the Party System)

লর্ড ব্রাইসের মতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস যতটা দ্রুত আইন প্রণয়নকারী সংস্থা হিসাবে পরিণত হইবে, আশংকা উন্মাদনার ঝড় ইহার উপর কদাচিৎ বহিয়া যায়। কিন্তু, বিশৃংখলার দৃশ্য যে দেখা যায় না তাহা নহে, ইহার অভ্যন্তরে দলীয় শৃংখলা খুবই কঠোর।

মার্কিন কংগ্রেসের দুইটি কক্ষ আছে।[১] উচ্চতর কক্ষকে সিনেট (Senate) বলা হয় এবং নিম্ন কক্ষকে জনপ্রতিনিধি সভা (House of Representatives) বলা হয়। সিনেটে প্রত্যেক মূলরাষ্ট্র হইতে দুইজন করিয়া মনোনীত প্রতিনিধি প্রেরিত হন। পঞ্চাশটি রাজ্যের ১০০ জন প্রতিনিধি লইয়া সিনেট গঠিত। জনপ্রতিনিধি সভা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত হয়। অন্ততঃ ত্রিশ হাজার জনসংখ্যা পিছু একজন করিয়া প্রতিনিধি দুই বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন।

সিনেটের ক্ষমতা ও কাজ (Powers and functions of the Senate)

সিনেটের কার্যকাল ছয় বৎসর। প্রতি দুই বৎসর অন্তর সিনেটের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করেন। সিনেটের সদস্যপদ প্রার্থীদের অন্ততঃ ২৫ বৎসর বয়স্ক হইতে হয়, অন্ততঃ নয় বৎসর যাবৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে থাকিতে হয় এবং যে রাজ্য হইতে নির্বাচনপ্রার্থী সেই রাজ্যের বাসিন্দা হইতে হয়। সিনেটের সদস্যগণ মার্কিন

১। "It (Congres) is 'not the hasty and 'turbulent body which the fathers of the constitution feared they might be creating. Storms of passion rarely sweep over it. Scenes of disorder are not unknown. Party discipline is strict : an atmosphere of good fellowship prevails ; the rules of procedure are obeyed , powers rest comparatively with few persons. It is eager, even unduly eager, to discover and obey the wishes of its constituents or at least of the party organisation."—Bryce.

যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী কর্মচারীর পদ গ্রহণ করিতে পারেন না। আমেরিকার উপ-রাষ্ট্রপতি সিনেটের সভায় সভাপতিত্ব করেন। মার্কিন সিনেটকে পৃথিবীর বিভিন্ন আইনপরিষদের উচ্চতর কক্ষগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী মনে করা হয়। সিনেট অর্থসংক্রান্ত বিল উত্থাপন করিতে না পারিলেও ইহার সংশোধন করিতে পারে। পক্ষান্তরে ইংলণ্ডের লর্ডসভা অর্থসংক্রান্ত বিল সংশোধন করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতি যাহাতে স্বৈরাচারী না হইতে পারেন সেইজন্য সিনেটকে কতিপয় শাসন-বিভাগীয় ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্পাদিত বিভিন্ন সন্ধির চূড়ান্ত অনুমোদন করিবার ক্ষমতা একমাত্র সিনেটেরই আছে। ইহা সুবিদিত যে ১৯১৯ সালের ভার্সাইয়ের সন্ধিতে আমেরিকার যোগদান সিনেট অনুমোদন করে নাই। তবুও ইহা মনে রাখিতে হইবে, আজ পর্যন্ত সিনেটের অনুমোদনের জন্য প্রায় ১১০০-এর বেশী যে চুক্তি আনা হইয়াছে, তাহার মধ্যে ৯০০টির বেশী চুক্তি সিনেটের অনুমোদন লাভ করিয়াছে। কোন বৈদেশিক শক্তির সহিত যাহাতে রাষ্ট্রপতি আলাপ-আলোচনা চালান, সেই মর্মে সিনেট রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করিতে পারে। রাষ্ট্রপতি যে সকল সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগ করেন, তাঁহাদের নিয়োগ চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করিবার একমাত্র অধিকারী হইল সিনেট। অবশ্য বর্তমানে সিনেটের ভদ্রতা বা **senatorial courtesy** হিসাবে যে প্রথাগত বিধান গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির সব নিয়োগেই সিনেটের অনুমোদন থাকে। চতুর্থতঃ, রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি অথবা অন্য কোন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীকে অপসারণ (**impeachment**) করিতে হইলে অভিযোগের বিচার একমাত্র সিনেট করিয়া থাকে। উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে যদি কোন প্রার্থীই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন না করিতে পারেন, তখন সিনেটই উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন করিতে পারে। সিনেটের এই ক্ষমতাগুলি শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। সিনেট একরূপ চিরস্থায়ী পরিষদ। কেননা, প্রতি দুই বৎসর অন্তর ইহার এক-তৃতীয়াংশ সদস্যপদ অবসর গ্রহণ করে,—কিন্তু, এইজন্য ইহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না। সিনেটের সদস্যগণ বর্তমানে মূলরাষ্ট্র হইতে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হওয়ায়, তাঁহারা শুধু মূলরাষ্ট্রের প্রতিনিধিই নহেন, জনগণেরও প্রতিনিধি। মূলরাষ্ট্র হইতে যে দুইজন সদস্য সিনেটে নির্বাচিত হন, তাঁহারা একই সময়ে নির্বাচিত না হইয়া বিভিন্ন সময়ে নির্বাচিত হন বলিয়া সর্বদাই জনগণের স্বার্থ ও আশা-আকাংখার প্রতিনিধিত্ব সিনেটে দেখিতে পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার বলিয়া সিনেটের সকল সদস্যই বিভিন্ন বিলের খুঁটিনাটি আলোচনা করিতে পারে। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ সিনেটের সদস্যপদকে জন-

সিনেটের শাসন-বিভাগীয় ক্ষমতা

প্রতিনিধি সভার সদস্যপদ হইতে অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন বলিয়া মনে করেন। সিনেটের ভূমিকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইহা একদিকে জনপ্রতিনিধি সভাকে স্বৈরাচারী হইতে বাধা দেয়, অপরদিকে ইহা রাষ্ট্রপতির ক্রমবর্ধমান ক্ষমতাকে সীমিত করে।[১] জর্জ ওয়াশিংটন একবার বলিয়াছিলেন, "The Senate is the saucer in which the boiling tea of the House is cooled."

জনপ্রতিনিধির সভার ক্ষমতা ও কাজ (Powers and functions of the House of Representative)—জনপ্রতিনিধি সভা মার্কিন কংগ্রেসের নিম্ন কক্ষ। প্রত্যেকটি মূলরাষ্ট্র হইতেই অন্ততঃ ত্রিশ হাজার নাগরিকের পক্ষ হইতে একজন করিয়া প্রতিনিধি সভায় দুই বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। নির্বাচনের নিয়ম ও ভোটদানের পদ্ধতি প্রত্যেকটি মূলরাষ্ট্র আলাদাভাবে স্থির করে। জনপ্রতিনিধি সভার সদস্য হইতে হইলে সদস্য-প্রার্থীকে অন্ততঃ ২০ বৎসর বয়স্ক মার্কিন নাগরিক হইতে হইবে, অন্ততঃ ৭ বৎসর ধরিয়া যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হইতে হইবে এবং যে মূলরাষ্ট্র হইতে তিনি নির্বাচিত হইবার চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাকে সেই মূলরাষ্ট্রের বাসিন্দা হইতে হইবে। প্যাটারসনের (Patterson) মতে "The House of Representatives is the nation in miniature..........It is thoroughly American in its temperament." বর্তমানে জনপ্রতিনিধি সভার মোট সদস্যসংখ্যা হইল ৪৩৫ ; প্রথমে ইহা ছিল ৬৫। জনপ্রতিনিধি সভার কোন সদস্য কোনও সরকারী পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন না। জনপ্রতিনিধি সভার একটি বিশেষ ক্ষমতা হইল এই যে, ইহাই একমাত্র অর্থসংক্রান্ত বিল উত্থাপন করিতে পারে। অন্যান্য বিলগুলি অবশ্য এই সভায় অথবা সিনেটে, যে কোন কক্ষেই উত্থাপিত হইতে পারে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে যদি কোনও প্রার্থী সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন না করিতে পারে, তবে জনপ্রতিনিধিসভা প্রথম তিনজন প্রার্থীর মধ্য হইতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করেন। জনপ্রতিনিধি সভায়ও

১। লর্ড ব্রাইস মার্কিন সিনেট সম্বন্ধে বলেন, "It has succeeded by effecting the chief object of the fathers of the constitution viz, the creation of a centre of gravity in the government, an authority able to correct and check on the one hand the democratic recklessness of the House, on the other monarchical ambition of the President. Place dbetween the two, the Senate is neccessarily the rival and often the opponent of both. The House can accomplish nothing without its concurrence. The President can he checkmated by its resistance. These are, so to speak, the negative success. ; on its positive side, it has succeeded in making itself eminent and respected."

বৃটিশ কমন্সসভার ন্যায় আমরা কমিটি ব্যবস্থা (Committee System) দেখিতে পাই। জনপ্রতিতিনিধি সভার মোট ৬০টি কমিটি আছে,—তন্মধ্যে ১৯টি হইল স্থায়ী কমিটি। তাহা ছাড়া "সমগ্র কক্ষ কমিটি" (Committee of the Whole House) আছে। ইহার সভাপতিত্ব করেন স্পীকার কর্তৃক মনোনীত কোন সদস্য। তবে ক্ষমতার দিক হইতে বিচার করিলে জন-প্রতিনিধি সভার ক্ষমতা অপেক্ষা সিনেটের ক্ষমতা অনেক বেশী।

ইংলণ্ড ও আমেরিকার কমিটি ব্যবস্থার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। প্রথমতঃ ইংলণ্ডে কমিটিগুলি নির্বাচিত হয় নির্বাচনী কমিটি (Committee of Selection) কর্তৃক। প্রত্যেকটি রাজনৈতিকদলের প্রতিনিধিদের লইয়া এই কমিটি গঠিত হয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলগুলির পরিচালকমণ্ডলী একটি কমিটি মনোনয়ন করেন এবং সেই কমিটি প্রত্যেক দলের সদস্যগণকে লইয়া নির্বাচনী কমিটি গঠন করে। দ্বিতীয়তঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিটি বিল আলোচনার পূর্বেই কমিটিতে প্রেরিত হয়। তাহাতে কমিটি বিলগুলির প্রভূত পরিবর্তন করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু ইংলণ্ডে প্রত্যেকটি বিলের দ্বিতীয় পাঠ এবং বিতর্কমূলক আলোচনা শেষ হইয়া গেলে বিলটি কমিটিতে প্রেরিত হয়। তৃতীয়তঃ, ইংলণ্ডে সরকারী বিল এবং বেসরকারী বিলের মধ্যে পার্থক্য করা হয় এবং ইহাদের জন্য আলাদা কমিটি করা থাকে। কিন্তু মার্কিন কংগ্রেসে সরকারী বলিয়া বিলগুলির কোন শ্রেণীবিভাগ নাই। কমন্সসভার কমিটিগুলির সভাপতিগণ বিলগুলি সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকেন। কিন্তু মার্কিন কংগ্রেসের বিভিন্ন কমিটির সভাপতিগণ বিলগুলি-সম্বন্ধে নিরপেক্ষ ত' থাকেনই না, বরং নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী তাঁহারা বিলগুলির পরিবর্তন করিয়া থাকেন। অনেক সময় কমিটির সভাপতির নামে আইনের নামকরণ হয়, যেমন, স্যারম্যান আইন, রোজার আইন, ইত্যাদি।

আইনপরিষদের প্রাধান্য বনাম শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য (Supremacy of the legislature vs. supremacy of the constitution)—

সাধারণতঃ, পার্লামেণ্টারী শাসনে আইনপরিষদের প্রাধান্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে রাজাসমেত পার্লামেণ্ট (King-in-Parliament) হইতেছে সার্বভৌম আইন-পরিষদ। ইংলণ্ডে রাষ্ট্রের আইনগত সার্বভৌমত্ব ইহার হাতে ন্যস্ত। ইংলণ্ডে পার্লামেণ্টের প্রণীত আইনের বৈধতা লইয়া কেউ প্রশ্ন তুলিতে পারে না। ইংলণ্ডের রাজা-সমেত-পার্লামেণ্ট শুধু যে আইনগত সার্বভৌম, তাহাই নহে। দেশের শাসনব্যবস্থায় ইহার রাজনৈতিক গুরুত্বের আরও অনেক দিক আছে। মন্ত্রীগণ নিজেদের কাজের জন্য পার্লামেণ্টের কাছে দায়ী থাকেন এবং পার্লামেণ্টও মন্ত্রীসভার

বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক অথবা অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করিতে পারে। ইংলণ্ডে শাসনতন্ত্রের কোনও প্রাধান্য নাই। কারণ পার্লামেণ্ট যে কোন সময়েই প্রয়োজন অনুযায়ী শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করিতে পারে। তাহা ছাড়া শাসনতন্ত্রটি অলিখিত অনেক প্রথাগত বিধানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহা ছাড়া, ইংলণ্ডে আইনপরিষদ বা পার্লামেণ্টের উচ্চকক্ষ বিচার বিভাগের আপীল আদালত হিসাবে কাজ করে; কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্রেব প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। সেইজন্য শাসনতন্ত্রটি লিখিত এবং অনমনীয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন মূলরাষ্ট্রগুলি শাসনতন্ত্র হইতেই ইহাদের নিজস্ব ক্ষমতা লাভ করে। ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ হওয়ায় আইনপরিষদের প্রাধান্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বীকৃত হয় নাই। শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা করা এবং ইহাকে রক্ষা করার দায়িত্ব হইতেছে বিচার বিভাগের। সেইজন্যই আমেরিকায় শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়।

মার্কিন শাসনতন্ত্র সংশোধন করার উপায়—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা খুব দুরূহ ব্যাপার। দুই উপায়ে শাসনতন্ত্রটি সংশোধন করা যায়। শাসনতন্ত্র সংশোধনের প্রস্তাব করে একটি সভা এবং ইহা অনুমোদন করে অপর একটি সভা। মার্কিন কংগ্রেসের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাধিক্যে শাসনতন্ত্র সংশোধনের একটি প্রস্তাব গৃহীত হইতে পারে; অথবা মূলরাষ্ট্রগুলির দুই-তৃতীয়াংশের (অর্থাৎ ৩২টি মূলরাষ্ট্রের) অনুরোধে কংগ্রেস একটি বিশেষ সম্মেলন (Convention) ডাকিয়া শাসনতন্ত্র সংশোধনের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারে। এইভাবে গৃহীত প্রস্তাবের চূড়ান্ত অনুমোদন করিতে পারে, (১) তিন-চতুর্থাংশ মূলরাষ্ট্রের আইনপরিষদ, অথবা (২) তিন-চতুর্থাংশ মূলরাষ্ট্রের (অর্থাৎ, ৩৬টি মূলরাষ্ট্রের) এক বিশেষ সম্মেলন। আমেরিকার শাসনতন্ত্রের সংশোধন এযাবৎ খুব কম হইয়াছে (মোট ২২টি)। এই সংশোধনগুলির বেশীর ভাগই মার্কিন কংগ্রেস কর্তৃক প্রস্তাবিত হইয়াছে এবং তিন-চতুর্থাংশ মূলরাষ্ট্রের আইনপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি (Legislative procedure in the U.S.A) **:** অর্থ সংক্রান্ত বিল ছাড়া অন্য যে কোন বিল মার্কিন কংগ্রেসের যে কোন কক্ষে উত্থাপন করা যায়। কিন্তু অর্থসংক্রান্ত বিলগুলি জনপ্রতিনিধি সভায় উত্থাপন করা হয়। কংগ্রেসে সরকারী বিল অথবা বেসরকারী বিল—এইভাবে বিলগুলির শ্রেণীবিভাগ করা হয় না। বেসরকারী সদস্যগণ যে বিলগুলির উত্থাপন করেন, সেই বিলগুলি সবই জনস্বার্থ-সম্মত। রাষ্ট্রপতি অথবা সচিবমণ্ডলীর সদস্যগণ হয়ত কোন বিল উত্থাপনে প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। কিন্তু শাসন বিভাগের কোন কর্মচারী কর্তৃক কোন

বিল উত্থাপিত হইতে পারে না; কেননা, কংগ্রেসের সদস্যগণ শাসন বিভাগের কর্মচারী হিসাবে কাজ করিতে পারে না। ইংলণ্ডের কমন্সসভায় কোন বিলের দ্বিতীয় পাঠ (second reading) শেষ হইবার পর ইহাকে কমিটির নিকট পাঠান হয়। কিন্তু মার্কিন কংগ্রেস কোন বিলের প্রথম পাঠ (first reading) শেষ হইয়া গেলেই বিলটিকে কমিটিতে পাঠান হয়। কমিটি পর্যায়ে শুধু বিলটির আলোচনাই হয় না, সংশোধনও হয়। কমিটির রিপোর্ট আইন-পরিষদে দাখিল হইবার পর বিলটির দ্বিতীয় পাঠ হয়। তখন বিরোধী দল বিলটি লইয়া বিতর্কের অবতারণা এবং ভোটগণনার দাবী করিতে পারে। দ্বিতীয় পাঠে বিলটি অনুমোদিত হইবার পর ইহার তৃতীয় পাঠ (third reading) আরম্ভ হয়। তৃতীয় পাঠটি একটি আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র। তৃতীয় পাঠের পর স্পীকার কর্তৃক চূড়ান্তভাবে বিলটি লইয়া ভোট গ্রহণ করা হয়। প্রথম কক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হইল অপর কক্ষ কর্তৃক বিলটিকে অনুমোদিত হইতে হয়। তাহার পর ইহা রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরিত হয়। রাষ্ট্রপতি তাঁহার সীমাবদ্ধ ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া তাঁহার সম্মতি দেওয়া বন্ধ করিতে পারেন এবং পুনর্বিবেচনার জন্য বিলটি কংগ্রেসে ফেরত পাঠাইতে পারেন। দ্বিতীয়বার যদি বিলটি কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত হয়, তবে রাষ্ট্রপতির সম্মতি না পাইলেও বিলটি স্বাভাবিকভাবেই আইনে পরিণত হয়।

অর্থসংক্রান্ত বিল (Money Bills)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থসংক্রান্ত বিলগুলি ১৯২১ সালের বাজেট এবং একাউন্টিং আইন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত। প্রথমতঃ, বাজেটের পরিচালক (director of the budget) বিভিন্ন সরকারী দপ্তর হইতে সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের হিসাব গ্রহণ করেন এবং সরকারের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত সমুদয় তথ্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করেন। রাষ্ট্রপতির দায়িত্বে অর্থসংক্রান্ত বিলের খসড়া তৈয়ারী করা হয়। অর্থ-সংক্রান্ত বিলগুলি শুধু জনপ্রতিনিধি সভায় (House of Representatives) উত্থাপিত হয়, এবং এইগুলি উত্থাপিত হওয়ার আগে এইগুলিকে আয়-ব্যয় সংক্রান্ত কমিটির (Committee on Appropriations) নিকট পাঠাইতে হয়। সংশ্লিষ্ট কমিটি অর্থ-সংক্রান্ত বিলটি অনুমোদিত হইবার পর ইহাকে সিনেটে প্রেরণ করা হয়। সিনেটেও অনুরূপভাবে বিলটি অনুমোদিত হয়; সিনেট বিলটি সংশোধন করিতে পারে।

রাজস্ব সংক্রান্ত কোন প্রস্তাব জনপ্রতিনিধি সভায় রাষ্ট্রপতির পক্ষে রাজস্ব-সচিব (Secretary of the Treasury) কর্তৃক উত্থাপিত হয়, যদিও সভার অন্য কোনও সদস্য কর্তৃক বিলটি উত্থাপনে শাসনতান্ত্রিক কোন বাধা নাই। ইংলণ্ডে বাজেট তৈয়ারীর দায়িত্ব অর্থদপ্তরে কেন্দ্রীভূত। কিন্তু, মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রে ইহা বিকেন্দ্রীভূত হইয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডে অর্থমন্ত্রী সরকারী দলের সংখ্যাধিক্যের জোরে কমন্সসভায় যে কোন অর্থসংক্রান্ত বিল বিনা অসুবিধায় অনুমোদিত করাইয়া লইতে পারেন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনবিভাগ কর্তৃক অর্থসংক্রান্ত বিলটি উত্থাপিত হইলেও কংগ্রেস ইহার সংশোধন অথবা পরিবর্তন করিতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপরাষ্ট্রপতি (Vice-President of the U. S. A.)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি যেইভাবে একটি নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা নির্বাচিত হন, উপরাষ্ট্রপতিও সেইভাবে নির্বাচিত হন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপরাষ্ট্রপতি শাসনবিভাগের লোক হইলেও তিনি কংগ্রেসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। কারণ তিনি সিনেটের সভায় সভাপতিত্ব করেন। তাঁহার মর্যাদা অনেকটা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের উপরাষ্ট্রপতির মত। ভারতের উপরাষ্ট্রপতিও অনুরূপভাবে রাজ্য-সভার সভায় সভাপতিত্ব করেন। রাষ্ট্রপতির মৃত্যু হইলে অথবা রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করিলে উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি-পদে নিযুক্ত হন। ১৯৪৫ সালে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের মৃত্যু হইলে উপরাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান রাষ্ট্রপতিপদে নিযুক্ত হন। উপরাষ্ট্রপতি সিনেটের সভায় দল-নিরপেক্ষ হইয়া কাজ করেন।

স্পীকার (Speaker)—জনপ্রতিনিধি সভার সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে স্পীকারের কাজে নির্বাচিত করেন। সাধারণতঃ, জন-প্রতিনিধিসভায় যেদল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, সেই দলের একজন নেতৃস্থানীয় সদস্য স্পীকারের পদে নির্বাচিত হন। ইংলণ্ডে কিন্তু স্পীকার দল-নিরপেক্ষ থাকেন। সাধারণতঃ ইংলণ্ডে স্পীকার নিজের নির্বাচনকেন্দ্র হইতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। কিন্তু, আমেরিকায় স্পীকার দলীয় রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন এবং নিজের সক্রিয় চেষ্টায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল কর্তৃক আনীত বিল আইনে পরিণত করাইতে চেষ্টা করেন। অধ্যাপক মুনরো বলেন, "Beginning with Henry, the Speaker gradually became the recognised leader of the majority party and hence of the House as a whole. He became the man on whom the majority depended for getting its measures safely through the maze of rules. More and more authority was absorbed into his hands until he became a virtual dictator." বর্তমানে জনপ্রতিনিধি সভায় স্পীকারের অপ্রতিহত ক্ষমতা দেখা যায়। সেইজন্য অধ্যাপক অগ্ (Prof. Ogg) স্পীকারের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন, "A simple

chairmanship grew into a vital dictatorship carrying the power over life and death over almost everything that the House undertook to do." স্পীকারের এই ক্ষমতা সম্বন্ধে বিরূপ আলোচনা হইবার ফলে ১৯১০ সালে Rules Committee হইতে স্পীকারকে সরাইয়া লওয়া হয়। ১৯১১ সালে বিভিন্ন কমিটির সদস্যদের এবং সভাপতিদের নিয়োগ করার ক্ষমতাও স্পীকারের হাত হইতে সরাইয়া লওয়া হয়। তাহা সত্ত্বেও জনপ্রতিনিধি-সভার স্পীকারের ক্ষমতা মোটেই কমে নাই। জনপ্রতিনিধি-সভার অধিবেশন সময়মত আরম্ভ করা, সভার বিতর্কের সময় কার্য-প্রণালী সম্বন্ধে অথবা শাসনতন্ত্রের খুঁটিনাটি বিধান সম্বন্ধে ব্যাখ্যা প্রদান করা, সভার অধিবেশন বিবরণীতে নিজের সহি-প্রদান করা, বিভিন্ন প্রস্তাবে অনুমোদন-সূচক সহি-প্রদান করা, সভায় বিতর্কমূলক বিষয়গুলির উপর ভোট আহ্বান করা, প্রভৃতি সব কাজই স্পীকার নির্বাহ করিয়া থাকেন, কিন্তু এত কাজের মধ্যেও তিনি মনেপ্রাণে একজন রাজনৈতিক দলের সদস্য। এইজন্য ডক্টর ফাইনার (Dr. Finer) বলেন, "He (Speaker) still remains in intention and practice a party man."

ইংলণ্ডের হাউস্ অফ্ কমন্সের স্পীকার এবং আমেরিকার জনপ্রতিনিধি সভার স্পীকারের মধ্যে পার্থক্য

আমেরিকার জনপ্রতিনিধি সভার স্পীকার এবং ইংলণ্ডের হাউস্ অফ্ কমন্সের স্পীকারের মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য আছে। প্রথমতঃ, আমেরিকার জনপ্রতিনিধি সভার স্পীকারের কার্যকাল ২ বৎসর; কিন্তু হাউস্ অফ্ কমন্সের স্পীকার সর্বদা দল-নিরপেক্ষ থাকেন; এমন কি নিজের নির্বাচনকেন্দ্র হইতে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। কমন্সসভার বাহিরেও তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করেন না। অথবা রাজনৈতিক দলগুলির সভা-সমিতিতে যোগদান করেন না। যদি কমন্সসভার অধিবেশনে কোনও আইন প্রণয়নের ব্যাপারে অথবা কোনও প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে সমানসংখ্যক ভোটসংখ্যা হয় তখন তিনি তাঁহার নির্ণায়ক ভোট (Casting vote) প্রদান করিয়া কমন্স সভার অচল অবস্থার অবসান করেন। কিন্তু, জনপ্রতিনিধিসভার স্পীকার দল-নিরপেক্ষ থাকেন না। তিনি প্রকৃতপক্ষে জনপ্রতিনিধিসভার সংখ্যা-গরিষ্ঠদলের নেতার ভূমিকা গ্রহণ করেন।

ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহার প্রয়োগ (Theory of Separation of Powers and its applicability in the U. S. A.)

সরকারের ক্ষমতাগুলি তিনভাগে বিভক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অতি প্রাচীনকালের লেখকগণও অনুভব করিয়াছিলেন। গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল

সরকারের বিভিন্ন বিভাগকে গণ-পরিষদ (Public Assembly), ম্যাজিস্ট্রেট্‌স্ (Magistrates) এবং বিচার বিভাগ (Judiciary) এই তিনভাগে বিভক্ত করেন। পলিবিয়াস (Polybius) এবং সিসারো (Cicero) সরকারের ক্ষমতার "প্রতিষেধক এবং ভারসাম্য"কেই (checks and balances) রোম প্রজাতন্ত্রের শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষতার কারণ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

চতুর্দশ শতাব্দীতে মার্সিগ্‌লিও (Marsiglio of Padua) সরকারের আইন প্রণয়ন এবং শাসন পরিচালনার কাজের মধ্যে একটি সীমারেখা টানিয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে জ্যাঁ বোডিন (Jean Bodin) রাজার হাতে বিচার বিভাগের ক্ষমতা প্রদান করিবার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী করিয়াছিলেন এবং স্বাধীন ম্যাজিস্ট্রেট্‌দের হাতে বিচার বিভাগের কাজ ন্যস্ত করিবার জন্য সুপরিকল্পনা করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে পিউরিটান বিপ্লবের সময় আইন প্রণয়ন এবং শাসন পরিচালন বিভাগের কাজে স্বাতন্ত্র্য বিধানের উপর যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া হয়। জেম্‌স্ হ্যারিংটন (James Harrington) আইন প্রণয়ন এবং পরিচালন বিভাগে ক্ষমতার সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যবিধানের সুপারিশ করেন। জন লক (John Locke) সরকারের ক্ষমতাগুলি আইন প্রণয়ন, পরিচালন এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় এই তিনভাগে বিভক্ত করেন। সরকারের যুক্তরাষ্ট্রীয় বিভাগ বলিতে রাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্কের উৎস বুঝায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান তত্ত্বটিকে মূলনীতি হিসাবে প্রথম বিবেচনা করেন মণ্টেস্কু (Montesquieu)। বৃটিশ সরকারের গঠন বিবেচনা করিয়া মণ্টেস্কু এই অভিমত প্রকাশ করেন যে সরকারের ক্ষমতাগুলির তিনটি বিভাগ আছে—আইন প্রণয়ন, শাসন পরিচালন এবং বিচার ব্যবস্থা। যদি এই ক্ষমতাগুলি এবং এইগুলির যে কোনও দুইটি শুধুমাত্র একজনের হাতে ন্যস্ত থাকে, তবে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। সেইজন্য তিনি সরকারের ক্ষমতাগুলির বিভিন্ন স্বাধীন বিভাগের হাতে অর্পণ করিবার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। ইংলণ্ডে যদিও মণ্টেস্কুর সুপারিশ অনুযায়ী সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা হয় নাই, কিন্তু, তাঁহার তত্ত্বের মূলনীতিগুলি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে আমেরিকান এবং ফরাসী বিপ্লবের সময় এই তত্ত্বটি রাষ্ট্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭৬৫ সালে ব্লাকস্টোন তাঁহার "Commentaries on the laws of England" বইয়ে বলেন যে একই ব্যক্তি যদি যুগপৎ আইন প্রণয়ন বিভাগ এবং পরিচালন বিভাগের ক্ষমতা লাভ করেন, তবে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়।

ম্যাডিসনও (Madison) বলেন যে একই হাতে আইন প্রণয়ন, পরিচালন এবং বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা ন্যস্ত হওয়াই হইল স্বৈরতন্ত্রের প্রকৃত সংজ্ঞা।

ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধানের পক্ষে প্রধান যুক্তি হইল, ইহাতে নাগরিকদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে, এবং সরকারের শাসনপরিচালন বিভাগ যথেচ্ছভাবে শাসনকাজ চালাইতে পারে না। তাহা ছাড়া, যদি সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান সম্পূর্ণভাবে করা হয়, তবে সরকারের কর্মকুশলতাও বাড়িয়া যায়। কিন্তু, বর্তমানকালের লেখকদের মতে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হইতেছে সচেতন জনমত, সরকারী ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নহে। বর্তমানকালে সরকারের কর্মপরিধি এত বাড়িয়া গিয়াছে যে ক্ষমতার সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যবিধান করা সম্ভবপরও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। সরকারের বিভিন্ন বিভাগ পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত। বিশেষতঃ, আইন প্রণয়ন বিভাগ এবং শাসন পরিচালন-বিভাগকে পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। নাগরিকদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা উচিত, এই যুক্তির কোনও সার্থকতা নাই। গণতান্ত্রিক সরকারের যে বিভাগ জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে সেই বিভাগের হাতে যদি সমুদয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়, তবে সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করিলে যতটা নাগরিকদের স্বাধীনতা রক্ষিত হয় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী স্বাধীনতা সেক্ষেত্রে অর্জিত ও রক্ষিত হয়।

ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্য বিধানের পক্ষে যুক্তি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতির প্রয়োগ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান-নীতি যথেষ্ট পরিমাণে কার্যকরী হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইন প্রণয়ন বিভাগ, শাসনবিভাগ এবং বিচার বিভাগ পরস্পর হইতে পৃথক। রাষ্ট্রপতি শাসন বিভাগ পরিচালনা করেন এবং তাঁহাকে শাসনকাজে সাহায্য কবিবার জন্য তিনি কয়েকজন সচিব (secretaries) নিযুক্ত করেন। এই সচিবমণ্ডলীকে মন্ত্রীসভা বলা হয়। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি এবং সচিবমণ্ডলীর সদস্যগণ আইনসভার সদস্য নহেন এবং আইনসভার নিকট নিজেদের কাজের জন্য দায়ী নহেন। আইনসভাও অনাস্থা প্রস্তাব করিয়া সচিব-মণ্ডলীকে পদচ্যুত করিতে পারে না। আইনসভা ও বিচার বিভাগও পরস্পরের নিকট হইতে পৃথক। কিন্তু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী হয় নাই। অধ্যাপক লাস্কি বলেন, "Unaided by the Senate, the American President is a sailor on an uncharted ocean." প্রথমতঃ, সরকারের শাসন বিভাগ যে টাকা খরচ করে, তাহা মঞ্জুর করিবার দায়িত্ব হইতেছে আইনসভার।

আমেরিকায় এই নীতি কিছু পরিমাণে কার্যকরী, সম্পূর্ণভাবে নয়

সিনেটের সম্মতি ব্যতীত রাষ্ট্রপতি কোনও সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে পারেন না। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রপতি যে সকল সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করেন, সেইগুলি আইনসভার উচ্চ পরিষদ বা সিনেট কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া চাই। অপরদিকে আইনসভা যে আইন প্রণয়ন করে, তাহাতে রাষ্ট্রপতির সম্মতি থাকা চাই। অবশ্য রাষ্ট্রপতি যদি কোনও বিল আইনে পরিণত হইবার সময় তাঁহার অসম্মতি জ্ঞাপন করেন, আইনসভা সেক্ষেত্রে বিলটি দ্বিতীয়বার অনুমোদন করিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করিতে পারে এবং সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি বড়জোর ১৪ দিন পর্যন্ত তাঁহার সম্মতি প্রদান করা হইতে বিরত থাকিতে পারেন। ইহার পর এই বিলটি অবশ্যই আইনে পরিণত হইবে। রাষ্ট্রপতি আবার অনেক সময় আইনসভায় বক্তৃতা প্রদান করিতে অথবা বাণী প্রেরণ করিতে পারেন। ইহাতেও আইনসভার সদস্যগণ শাসনবিভাগ কর্তৃক কিছু পরিমাণে প্রভাবিত হন। রাষ্ট্রপতি বিচারপতিগণকে নিযুক্ত করেন, কিন্তু তাঁহাদের বিতাড়িত করিতে পারেন না, এবং বিচারপতিগণও রাষ্ট্রপতির নির্দেশ বাতিল করিতে পারেন। আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন বাতিল করিয়া দিবার (অবশ্য যদি ইহা শাসনতন্ত্রের বিরোধী হয়) অধিকার বিচার-বিভাগের আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আমেরিকার শাসনতন্ত্রেও সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধানের নীতি সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী হয় নাই।

এইক্ষেত্রে গ্রেটবৃটেনে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি কতদূর কার্যকরী হইয়াছে তাহা বিবেচনা করা যাইতে পারে।

গ্রেট বৃটেনে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করিয়া সরকারের তিনটি প্রধান বিভাগের কাজ পরিচালিত হয়, মণ্টেস্কু এই প্রকার অনুমান করিয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই গ্রেট বৃটেনে সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি খুবই অল্প অনুসৃত হইয়াছে। মন্ত্রীসভার সকলেই আইনসভার সদস্য এবং আইন প্রণয়নে তাঁহাদের পূর্ণ ক্ষমতা আছে। মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী রাজা সব কাজ করেন এবং মন্ত্রীসভাই প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের শাসন-পরিচালন বিভাগের সর্বেসর্বা। লর্ডসভা বৃটিশ আইনসভার উচ্চতর কক্ষ; কিন্তু, ইহার কিছু কিছু বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা আছে। ইহাকেই ইংলণ্ডে বিচার বিভাগের প্রধান কর্তৃপক্ষ বলা হয়। ইংলণ্ডের রাজা একাধারে রাষ্ট্রের প্রধান এবং শাসন বিভাগের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ। কিন্তু, তিনি আইনসভার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইংলণ্ডের যিনি লর্ড চ্যান্সেলার তিনি একাধারে লর্ডসভার সভাপতি, মন্ত্রীসভার সদস্য এবং ইংলণ্ডের প্রধান বিচারালয়ের বিচারপতি। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইংলণ্ডে সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি কখনই কার্যকরী হয় নাই।

গ্রেট বৃটেনের এই নীতি কাযকরী নয়

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলীয় ব্যবস্থা (**Working of the Party System in U. S. A.**)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমরা দ্বি-দলীয় শাসনব্যবস্থা দেখিতে পাই। কিন্তু দুইটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে পার্থক্য হইতেছে প্রধানতঃ সংগঠন সম্পর্কে, নীতি সম্পর্কে নহে। নীতিগতভাবে আমেরিকার ডেমোক্র্যাটিক দল (Democratic Party) এবং রিপাব্‌লিকান দলের (Republican Party) মধ্যে পার্থক্য খুবই অল্প। ইংলণ্ডেও আমরা দ্বি-দলীয় শাসনব্যবস্থা দেখিতে পাই। কিন্তু ইংলণ্ডে রক্ষণশীল দল এবং শ্রমিক দলের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য বিশেষভাবে দেখা যায়। আমেরিকার দুইটি আদিম রাজনৈতিক দল একটি যুক্তরাষ্ট্রে সমর্থনকারী দল (Federalists) এবং অপরটি জেফারসনের সাধারণ-তন্ত্রী দল (Jeffersonian Republicans) বর্তমানে ডেমোক্র্যাটিক এবং রিপাবলিকান এই দুইটি রাজনৈতিক দলে পরিণত হইয়াছে। বর্তমানে সরকারের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে দুই দলের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নাই। দেশের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থাসম্পর্কেও দুই দলের নির্বাচনী ইস্তাহার এবং কার্যসূচী প্রায় একরূপ। ইংলণ্ডের ন্যায় আইনপরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী রাজনৈতিক দল আমেরিকায় মন্ত্রীসভা গঠন করেন না। আমেরিকায় রাষ্ট্রপতি সচিবমণ্ডলী নিযুক্ত করেন। রাষ্ট্রপতি যে রাজনৈতিক দলের সদস্য, সিনেটে সেই দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নাও অর্জন করিতে পারে। বর্তমানে প্রেসিডেন্ট কেনেডি ডেমোক্র্যাটিক দলের সদস্য; সিনেটেও ডেমোক্র্যাটিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়াছে। উভয় দলেরই বর্তমানে একমাত্র উদ্দেশ্য নির্বাচনে জয়লাভ করা। সেইজন্য উভয় দলই নিজেদের নির্বাচনী ইস্তাহারে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

আমেরিকায় ডেমোক্র্যাটিক পার্টি বিশেষতঃ কৃষি-শ্রমিক এবং শিল্প-শ্রমিকদের স্বার্থকে উপরে স্থান দেয়। দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলিতে ইহার প্রভাব অপেক্ষাকৃত বেশী। ডেমোক্র্যাটিক পার্টি সাধারণতঃ শিল্প-বাণিজ্যের সংরক্ষণের উপর কম গুরুত্ব আরোপ করে, কিন্তু রিপাবলিকান পার্টি শিল্প-বাণিজ্য সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। দেশরক্ষানীতি, পররাষ্ট্র এবং স্বরাষ্ট্র নীতিতে এই দুইটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে নীতিগত প্রভেদ খুবই অল্প। এই দুইটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল ছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিক দল (Labour Party) নামে একটি ছোটদল আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহার রাজনৈতিক গুরুত্ব নাই বলিলেই চলে।

ইংলণ্ডে ও আমেরিকার দলীয় শাসন ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্যের প্রধান কারণ হইতেছে এই যে ইংলণ্ডে পার্লামেন্টারী শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত; কিন্তু আমেরিকায় রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত। তাহা ছাড়া, ইংলণ্ডে

নমনীয় এবং অলিখিত শাসনতন্ত্র থাকায়, যখনই যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতাসীন হইয়াছে, তখনই সেইদল পার্লামেন্টে নিজের সংখ্যাধিক্যের জোরে শাসনতন্ত্রের সংশোধন করিয়াছে। কিন্তু আমেরিকায় তাহা সম্ভব নয়। কেননা, রাষ্ট্রপতি অথবা সচিবমণ্ডলী ইচ্ছা করিলে শাসনতন্ত্র সংশোধন করিতে পারেন না। কেননা, আমেরিকার শাসনতন্ত্র লিখিত ও অনমনীয়। দুই দেশের মধ্যে এই মূলগত পার্থক্য থাকায় দলীয় ব্যবস্থাও দুই দেশে দুইভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। দুই দেশেই আমরা প্রথাগত বিধান দেখিতে পাই। কিন্তু, আমেরিকায় প্রথাগত বিধানগুলি গড়িয়া উঠিবার পিছনে রাজনৈতিক দলগুলির যত অবদান, ইংলণ্ডে প্রথাগত বিধানগুলি গড়িয়া উঠিবার পিছনে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক দলগুলির অবদান তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। তবে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, আমেরিকার দল ব্যবস্থাও ইংলণ্ডের দল-ব্যবস্থার ন্যায় অত্যন্ত অনমনীয় (rigid)।

সংক্ষিপ্তসার

মার্কিন কংগ্রেসের ক্ষমতা—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভাকে কংগ্রেস বলা হয়। কংগ্রেসের দুইটি কক্ষ আছে। নিম্নকক্ষের নাম জনপ্রতিনিধিসভা এবং উচ্চকক্ষের নাম সিনেট। প্রত্যেকটি রাজ্য হইতে সিনেটে দুইজন করিয়া প্রতিনিধি থাকেন। সিনেটের কার্যকাল ছয় বৎসর। প্রতি দুই বৎসর অন্তর সিনেটের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপ-রাষ্ট্রপতি সিনেটের সভায় সভাপতিত্ব করেন। সিনেটের কতিপয় বিশেষ ক্ষমতা আছে। সিনেটে অর্থসংক্রান্ত বিল উত্থাপিত না হইলেও সিনেট সেই বিল সংশোধন করিতে পারে। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্পাদিত বিভিন্ন সন্ধির চূড়ান্ত অনুমোদন অথবা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত বিভিন্ন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগ অনুমোদন করার ক্ষমতা সিনেটের আছে।

জনপ্রতিনিধিসভায় অর্থসংসক্রান্ত বিল সর্বপ্রথমে উত্থাপিত হয়। অন্যান্য বিল যে কোন কক্ষেই উত্থপিত হইতে পারে। যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা হইয়াছে, তবুও রাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে কংগ্রেসকে প্রভাবিত করিতে পারেন এবং তাহা সম্ভবপর হয় কংগ্রেসে বাণী (Message) পাঠাইয়া অথবা বিশেষ ক্ষেত্রে কংগ্রেসের অধিবেশনে বক্তৃতা প্রদান করিয়া। কোন বিল কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত হইলে রাষ্ট্রপতি যদিও Pocket Veto প্রয়োগ করিতে পারেন, তবুও যদি সেই বিলটি দ্বিতীয়বার কংগ্রেসের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতিতে অনুমোদিত হয়, তবে ইহা আপনা হইতেই

আইনে পরিণত হইবে। শাসনব্যবস্থার প্রধান হিসাবে রাষ্ট্রপতি যে অর্থ খরচ করেন, তাহার বরাদ্দও কংগ্রেসই করিয়া থাকে। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের ন্যায় মার্কিন কংগ্রেসেও কমিটি ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডের কমন্স সভার স্পীকার যেমন দল-নিরপেক্ষ থাকেন, মার্কিন কংগ্রেসের জনপ্রতিনিধিসভার স্পীকার সেইরূপ দল-নিরপেক্ষ থাকেন না।

Exercises

1. What are the powers of the Congress in the U. S. A.? How does the President influence legislation?

(১০০—০৩ পৃষ্ঠা ; ৮৮—৯১ পৃষ্ঠা)

2. How far is it justifiable to regard the Senate of the U. S. A. as the most powerful second chamber of the world?

(১০০—১০২ পৃষ্ঠা)

3. Discuss the powers of the House of Representatives of the U. S. A. (১০২—১০৩ পৃষ্ঠা)

4. Discuss the powers and position of the Speaker of the House of Representatives in the U. S. A. Compare the Speaker of the House of Commons and the House of Representatives.

(১০৬—০৭ পৃষ্ঠা)

5. Discuss the American Committee System.

6. "In England, the legislature is Supreme, in the United States, the Constitution is Supreme." Examine the proposition.

What are the methods of amendment of the Constitution of the U. S. A.? (১০৫—১০৪ পৃষ্ঠা)

7. Write a note on the law-making process in the U. S. A,

(১০৪—১০৬ পৃষ্ঠা)

8. Compare the place of parties in the working of the Constitution of the United States and Great Britain.

(C. U. B. A. Part I 1962)

(১১১—১২ পৃষ্ঠা)

9. To what extent is the Theory of Separation of Powers applied to the British and the American (U. S. A.) Systems of Government. (C. U. B. A. Part I. 1962).

(১০৭—১১০ পৃষ্ঠা)

একাদশ অধ্যায় | মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ (Judiciary in the U.S.A.)

লর্ড ব্রাইসের মতে "No feature of the Government of the United States has awakened so much curiosity in the European mind, caused so much discussion, received so much admiration, and been more frequently misunderstood, than the duties assigned to the Supreme Court and the functions which it discharges in guarding the arc of the constiution."

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ (Judicial System in the U. S. A.)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার-বিভাগকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। একটি হইতেছে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচার-ব্যবস্থা (Federal Judiciary) এবং অপরটি হইতেছে মূলরাষ্ট্রগুলির বিচার-ব্যবস্থা (Judicial system of the States)। বিভিন্ন মূলরাষ্ট্রের অনেক বিচারালয় আছে, সেগুলির বিচারপতিগণ জনগণ কর্তৃক নিযুক্ত হন। এই বিচারালয়গুলি সংশ্লিষ্ট যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্যের ব্যাখ্যা করে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচার ব্যবস্থায় (Federal Judiciary) আমরা দুই প্রকার নিম্নতন বিচারালয় দেখিতে পাই ; যথা, (ক) জিলা বিচারালয় এবং (খ) ভ্রাম্যমাণ আপীল আদালত। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচার ব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যার সহিত জড়িত মামলা, যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন ও সন্ধি, নৌবাহিনী ও পোত সংক্রান্ত, অথবা রাষ্ট্রদূত, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারী কর্মচারী এবং কন্সালের সহিত মামলাগুলির বিচার হয়। শাসনতন্ত্রের সংশোধন অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতে একটি মূলরাষ্ট্রের নাগরিকের দ্বারা অন্য মূলরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আনীত অথবা কোন বহিঃরাষ্ট্রের নাগরিকের দ্বারা আনীত মামলার বিচার হয় না। বিচার অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের ক্ষমতা শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত হইয়াছে। এই নির্ধারিত বিষয়গুলি ছাড়া অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচার ব্যবস্থা ও মূলরাষ্ট্রগুলির বিচারালয়ের যুগ্ম ক্ষমতা থাকে।

সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকা—(Role of the Supreme Court)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থায় সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচার ব্যবস্থার শীর্ষস্থানে ইহা অধিষ্ঠিত। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতির সংখ্যা নয়জন। রাষ্ট্রপতি তাঁহাদের নিযুক্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু বিচারকদের একমাত্র 'ইম্‌পিচমেণ্ট' ছাড়া অন্য কোনও উপায়ে পদচ্যুত করা যায় না। সুপ্রীম কোর্টের মূল ক্ষমতা (original powers), এবং আপীল মামলার রায় প্রদান করার ক্ষমতা (appellate powers) উভয়ই আছে। শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কোন মূলরাষ্ট্র যদি কোন মামলায় জড়িত হইয়া পড়ে, অথবা যে সকল মামলা রাষ্ট্রদূত, কোন সরকারী মন্ত্রী অথবা কোন কন্সালের সহিত জড়িত, সেইগুলি সুপ্রীম কোর্টের মূল এলাকার ভিতর পড়ে এবং শাসনতন্ত্র এই এলাকার পরিবর্তন করিতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রীয় মামলার বিচার করিতে যাইয়া সুপ্রীম কোর্ট অনেকক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইনের ব্যাখ্যাও প্রদান করিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। এই শাসনতন্ত্রের অভিভাবক হইতেছে সুপ্রীম কোর্ট। সুপ্রীম কোর্টের অধিকাংশ কাজ হইল আপীল বিচার সংক্রান্ত। ইহা নিম্নতম বিচারালয় অথবা মূলরাষ্ট্রগুলির উচ্চতম বিচারালয় হইতে যুক্তরাষ্ট্রীয় স্বার্থের সহিত জড়িত মামলাগুলি সম্পর্কে আপীল বিচার করে। সুপ্রীম কোর্ট শুধু শাসনতন্ত্রের অভিভাবক নয়, ইহা জাতীয় প্রগতি ও প্রধান্যের প্রতিরক্ষক এবং মূলরাষ্ট্রগুলির অধিকারসমূহের সংরক্ষক। মার্কিন কংগ্রেস কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইনের অথবা শাসন বিভাগ কর্তৃক অনুষ্ঠিত যে কোন কাজের বৈধতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের আছে। অনেক ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের ব্যাখ্যায় শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের কাজ হইয়া যায়। যখন সরকাররে বিভিন্ন দপ্তর জনমতের পরিবর্তনের জন্য নিজেদের কর্মসূচীর পরিবর্তন করে, তখন শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য সর্বাগ্রে বজায় রাখার দায়িত্ব হইল সুপ্রীম কোর্টের। বর্তমানের সুপ্রীম কোর্ট রাষ্ট্রের বিভিন্ন কার্যকলাপের সহিত নিজেকে অনেক ক্ষেত্রেই জড়াইয়া ফেলিয়াছে। যেমন, সুপ্রীম কোর্ট অনেকক্ষেত্রে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাবলী লইয়াও আলোচনা করিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বৈশিষ্ট্য ইহার স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা। যখনই গণ-অধিকার বিপন্ন হইবার কারণ ঘটিয়াছে, তখনই সুপ্রীম কোর্ট জনগণের অধিকার রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ও সক্রিয় ভূমিকা অবলম্বন করিয়াছে। অনেকে মনে করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট বর্তমানে আইনসভার তৃতীয় কক্ষে পরিণত হইয়াছে। কেননা, কার্যক্ষেত্রে বিভিন্ন আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া সুপ্রীম কোর্ট অনেক নূতন আইনের সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছে। সুপ্রীম

সুপ্রীম কোর্টের মূল ক্ষমতা এবং আপীল সংক্রান্ত ক্ষমতা

কোর্টের বিরোধিতার জন্য রুজভেল্ট তাঁহার "New Deal" পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী করিতে পারেন নাই। বিভিন্ন ক্ষেত্রে শাসন বিভাগ ও আইন সভার ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের ব্যাখ্যা ও হস্তক্ষেপের ফলে সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী হয় না। সেইজন্য অনেকে মনে করেন সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলীর কিছু সংশোধন হওয়া উচিত। আইন প্রণয়নের বিচার-বিভাগীয় পর্যালোচনা (Judicial review of legislation) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। আইনপরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইনের কার্যকারিতা সুপ্রীম কোর্ট নষ্ট করিয়া দিতে পারে যদি উক্ত আইন সুপ্রীম কোর্টের মতে শাসনতন্ত্রের কোন বিধানের বিপক্ষে যায়। ইহার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেসের ক্ষমতা অনেক কমিয়া গিয়াছে।

Exercises

1. Give a brief outline of the Judicial System of the U. S. A.. With special reference to the Supreme Court.

(১১৪—১৬ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the position and functions of the Supreme Court of the U. S. A. as the Guardian of its Constitution.

(১১৪—১৬ পৃষ্ঠা)

তৃতীয় খণ্ড ঃ সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা

দ্বাদশ অধ্যায়

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য (Features of the Soviet Constitution)

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য (Salient characteristics of the constitution of the U,S. S. R)

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রকে সম্মিলিত সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (Union of Soviet Socialist Republic) বলা হয়। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বর্ত্তমান সরকার ১৯৩৬ সালের "স্ট্যালিন শাসনতন্ত্রের" (Stalin Constitution) ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই শাসনতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নীচে আলোচনা করা হইল।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা

১। সোভিয়েট শাসনব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federal) শাসনতন্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার ষোলটি ইউনিয়ন রিপাবলিক (Union Republics), কতিপয় স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন রিপাবলিক (Autonomous Republics) এবং কতিপয় স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন অঞ্চল ও জাতীয় এলাকা আছে। ইউনিয়ন রিপাবলিকগুলির সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক বিচ্ছেদ করার অধিকার (Right to secede) আছে। অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রে, যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রে, আমরা মূলরাষ্ট্রগুলির এই অধিকার দেখিতে পাই না। প্রত্যেকটি রিপাবলিকের আলাদা আলাদা শাসনতন্ত্র আছে, এবং ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ অন্যান্য বিদেশী রাজ্যের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন অথবা দূত বিনিময় করিতে পারে। কোনও রিপাবলিকের সীমানার পরিবর্ত্তন ইহার সম্মতি ছাড়া করা যায় না। প্রত্যেকটি মূল রাষ্ট্রেই আলাদা সরকারী ব্যবস্থা আছে।

২। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রটি সমাজতন্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সমাজতন্ত্রের মূলনীতি অনুযায়ী যাঁহার যতটা ক্ষমতা সে সমাজকে ততটা দিবে এবং

কাজের পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী সে সামাজিক উৎপাদনে অংশ ভোগ করিবে। এই নীতিটি সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের মধ্যেও অনুসৃত হইয়াছে।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক

সেইজন্য আমরা সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে কতিপয় অর্থনৈতিক বিধান (Economic Provisions) দেখিতে পাই। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তিই হইল উৎপাদনের উপকরণগুলির উপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা এবং সবরকম শোষণের উচ্ছেদ। "যে কাজ করিবে না, সে খাইতে পারিবে না"—এই নীতি অনুসরণ করিয়া রাষ্ট্রই জনসাধারণের জন্য কর্ম সংস্থান করিয়া দেয় এবং জনসাধারণও তাহাদের উপর ন্যস্ত কর্মভার গ্রহণ করে। অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা এবং ব্যক্তিগত মুনাফা ও সম্পত্তির বিলোপ সাধন করিয়া সামাজিক মুনাফা বৃদ্ধির চেষ্টা করাই সেভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কর্মসূচীর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আইনগুলি ব্যাখ্যা করিবার ভার সর্বোচ্চ আদালতের নাই। এই আইনগুলি ব্যাখ্যা করিবার ভার প্রদান করা হইয়াছে রাষ্ট্রপতিমণ্ডলীকে (Presidium)। সুতরাং সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ হয় নাই এবং শাসনবিভাগকে সরকারের অন্যান্য বিভাগের তুলনায় বেশী ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

৪। অন্যান্য দেশে যেমন একজন রাষ্ট্রপতি অথবা রাজা অথবা যে কোন একজন রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন, সেভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে সেই প্রকার বিশেষ একজন

রাষ্ট্রপতিমণ্ডলী

রাষ্ট্রপতি নাই। শাসনবিভাগের প্রধান হইলেন রাষ্ট্রপতিমণ্ডলী (Presidium)। তেত্রিশজন সদস্য লইয়া ইহা গঠিত। এই রাষ্ট্রপতিমণ্ডলীর সভাপতি আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপতি অথবা নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধানের কাজ করেন। রাষ্ট্রপতিমণ্ডলীর সদস্যগণ একটি বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলী (electoral college) কর্তৃক নির্বাচিত হন না। তাঁহারা নির্বাচিত হন সুপ্রীম সোভিয়েটের (Supreme Soviet) দুই কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে উভয় কক্ষের সদস্যগণ কর্তৃক। এই ক্ষেত্রে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিমণ্ডলী নির্বাচন এবং সুইজারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিষদের (Federal Council) নির্বাচনের মধ্যে সাদৃশ্য আছে।

৫। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা ও রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসনব্যবস্থার কিছু সংমিশ্রণ দেখা যায়। যেমন, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে একটি

পার্লামেণ্টরী শাসন ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রপতি চালিত শাসনব্যবস্থা

মন্ত্রীসভা থাকে; এই মন্ত্রীসভা নিযুক্ত হয় সুপ্রীম সোভিয়েট কর্তৃক এবং ইহা সরকারের বিভিন্ন কাজের জন্য সুপ্রীম সোভিয়েটের নিকট দায়িত্বশীল থাকে। অবশ্য সুপ্রীম সোভিয়েটের অধিবেশন না থাকিলে মন্ত্রীসভাকে রাষ্ট্র-মণ্ডলীর নিকট দায়ী থাকিতে হয়। কিন্তু, মনে রাখিতে হইবে, সোভিয়েট

যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র শাসনব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক দল। এই রাজনৈতিক দলের সংগঠন সরকারের ন্যায় ক্ষমতাশালী, এবং এই দলের কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পলিটব্যুরো (Politbureau) সমগ্র সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৬। এক দলীয় ব্যবস্থা সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার আরেকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আমরা এইপ্রকার একদলীয় শাসনব্যবস্থা দেখিতে পাই না। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র রচয়িতাগণের মতে এই দলটি হইল সর্বহারাদের দল। "সর্বহারাদের" অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কতন্ত্র (Dictatorship of the Proletariat) প্রতিষ্ঠা করাই সমাজতন্ত্রের অন্যতম উদ্দেশ্য।

অনমনীয় শাসনতন্ত্র

৭। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রটি অনমনীয় (rigid)। সুপ্রীম সোভিয়েট অথবা উচ্চ আইনসভার প্রত্যেক কক্ষে দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতি থাকিলেই শাসনতন্ত্রের সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদন করা সম্ভবপর হয় এবং শাসনতন্ত্রটিকে সংশোধন করা যায়।

সুপ্রীম সোভিয়েট

৮। সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সংস্থা হইল সুপ্রীম সোভিয়েট বা (Supreme Soviet) উচ্চ আইনসভা। কেন্দ্রের সমুদয় আইনপ্রণয়ন করার ক্ষমতা ইহার আছে। ইহার দুইটি কক্ষ। একটির নাম যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েট (The Soviet of the Union) এবং অপরটির নাম হইতেছে জাতিসমূহের সোভিয়েট (The Soviet of Nationalities)। সোভিয়েট দেশে অনেক জাতি আছে এবং সেইগুলির স্বার্থ বিভিন্ন প্রকার। যাহাতে সবগুলি জাতির স্বার্থ এবং রাষ্ট্রের সামগ্রিক স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় ঘটান যায় সেইজন্যই সুপ্রীম সোভিয়েটের দুইটি কক্ষ করা হইয়াছে। প্রথম কক্ষটির সদস্যগণ জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় কক্ষটির সদস্যগণের নির্বাচন জাতীয়তাবাদের নীতির উপর ভিত্তিশীল। জাতীয় ভিত্তিতে গঠিত ইউনিয়ন রিপাব্লিক হইতে ২৫ জন, প্রতিটি স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন রিপাবলিক (Autonomous Republics) হইতে ১১ জন, প্রতিটি স্বাতন্ত্র্য অঞ্চল (Autonomous Regions) হইতে ৫ জন এবং প্রতিটি জাতীয় এলাকা (National Area) হইতে ১ জন করিয়া প্রতিনিধি উক্ত কক্ষের সদস্য নির্বাচিত হন।

৯। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইল, শাসনতন্ত্রে নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্যগুলি উল্লেখ করা হইয়াছে। অনেক শাসনতন্ত্রেই আমরা নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের বিধান দেখিতে পাই। কিন্তু, অন্যান্য শাসনতন্ত্রে আমরা নাগরিকদের কর্তব্যের বিধান দেখিতে পাই না। একদিকে যেমন নাগরিকদের কাজের অধিকার, বিশ্রামের অধিকার,

আশ্রয় লাভের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, মতপ্রকাশের ও সভা-সমিতি সংগঠনের অধিকার দেওয়া হইয়াছে, অপরদিকে তেমনি শাসনতন্ত্র পালন, রাষ্ট্রের আইন পালন, রাষ্ট্রের স্বার্থের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ না করা অথবা সভাসমিতির সংগঠন না করা, সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি সংরক্ষণ, প্রয়োজন হইলে বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ ও দেশরক্ষার কাজে অগ্রসর হওয়া প্রভৃতি নাগরিক কর্তব্যের বিধানও শাসনতন্ত্রে দেওয়া হইয়াছে।

নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য

১০। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিচার-ব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য হইল বিচারপতিগণ নির্বাচিত হন এবং প্রয়োজন হইলে প্রত্যাগমনের আদেশ দিয়া তাঁহাদের অপসারণ করা যায়। সবরকমের বিচারবিভাগীয় কাজ এ্যাসেসরদের (Assessors) সাহায্যে সম্পাদিত হয়। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হইল ইহার প্রোকিউরেটার জেনারেলের (Procurator General) দপ্তরখানা। ইহাতে রাষ্ট্রের অথবা শাসনবিভাগের কোন সংস্থা অথবা কোন সরকারী কর্মচারী যাহাতে রাষ্ট্রের স্বার্থবিরোধী কাজ না করিতে পারে অথবা শাসনতন্ত্র কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি-স্বাধীনতা যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেইদিকে দৃষ্টি রাখা হয়।

বিচার বিভাগের বৈশিষ্ট্য

১১। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে মাত্র একটি রাজনৈতিক দল স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। তাহা হইতেছে কমিউনিস্ট অথবা সাম্যবাদী দল। শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কমিউনিস্ট দল হইতেছে শ্রমিকশ্রেণী এবং অন্যান্য মেহনতী জনসমাজের প্রতিষ্ঠান। বস্তুতঃ, সোভিয়েট শাসনব্যবস্থা সমগ্রভাবে কমিউনিস্ট দলই পরিচালনা করে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে অন্য কোন রাজনৈতিক দলকে টিঁকিয়া থাকিতে দেওয়া হয় না।

একটিমাত্র রাজনৈতিক দল

১২। যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতাগুলি চারিভাগে বিভক্ত। যথা,—বৈদেশিক সম্পর্ক ও দেশরক্ষার সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার সহিত জড়িত বিভিন্ন বিষয়সমূহ দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই ক্ষমতায় যুক্তরাষ্ট্র সমস্ত দেশের একত্রিত রাষ্ট্রীয় বাজেট, বিভিন্ন কর স্থাপন অথবা সরকারী ব্যয়ের নিয়ন্ত্রণ, ব্যবসায় বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রা ব্যবস্থা পরিচালনা, রাষ্ট্রবীমা নিয়ন্ত্রণ, ঋণদান ও ঋণের চুক্তিকরণ, সোভিয়েট অর্থব্যবস্থায় এই প্রকার নানাবিধ সমস্যাসমূহ সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের আয়ত্তাধীন। শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ও শ্রমিক আইন সম্পর্কিত বিষয়গুলি তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। ইউনিয়ন রিপাবলিকগুলির সহিত যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কিত বিষয়গুলি চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্গত। যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতাবণ্টন নীতির দুইটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে।

যুক্তরাষ্ট্রের চারপ্রকার ক্ষমতা

প্রথমতঃ, কতিপয় কেন্দ্রীয় বিষয় সম্পর্কে মূলনীতি ধার্য করিবার দায়িত্ব হইতেছে কেন্দ্রীয় সরকারের। কিন্তু মূলরাষ্ট্রগুলি এই মূলনীতিসমূহ মানিয়া লইয়া নিজের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও মূলরাষ্ট্রগুলির প্রত্যেকটির দুই জাতীয় মন্ত্রীদপ্তর থাকে। একটি হইতেছে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রীদপ্তরসমূহ এবং অপরটি হইতেছে ইউনিয়ন রিপাবলিকের মন্ত্রীদপ্তরসমূহ।

বিভিন্নজাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এইজন্য সমগ্র দেশে আমরা ১০টি জাতীয় এলাকা (National Areas) দেখিতে পাই। জাতীয় এলাকাগুলির স্বায়ত্তশাসনের অধিকার আছে। ইউনিয়ন রিপাব্লিকগুলিকে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার, অন্যান্য বিদেশীরাষ্ট্রগুলির সহিত সরাসরি কূট-নৈতিক সম্পর্ক স্থাপন অথবা দূতবিনিময় করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, এই রিপাবলিকগুলির নিজস্ব শাসনতন্ত্র গ্রহণ ও পরিবর্তন করিবার অধিকার আছে। দেখা যাইতেছে, প্রত্যেকটি রিপাবলিকেরই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তাহা ছাড়া প্রত্যেকটি রিপাবলিকেই আলাদা রাষ্ট্রীয় ভাষা আছে। সেইজন্য সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রকে একটি বহুজাতিসম্পন্ন সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র বলা যায়।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের গঠন (Structure of the U.S.S.R.):

সোভিয়েট শাসনতন্ত্রের ১৩ নম্বর ধারায় বলা হইয়াছে, ইহা একটি যুক্তরাষ্ট্র। এই যুক্তরাষ্ট্রের গঠন আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই ইহার ১৬টি ইউনিয়ন রিপাবলিক, ১৬টি স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন রিপাবলিক (Autonomous Republics), ৯টি স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন অঞ্চল (Autonomous Regions) এবং ১০টি জাতীয় এলাকা (National Areas) আছে। ১৬টি ইউনিয়ন রিপাবলিক হইল (১) রুশ সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রীয় সমাজতান্ত্রিক রিপাবলিক (The Russian Seviet Federative Socialist Republic); (২) ইউক্রেনের রিপাবলিক, (৩) বাইলোরাশিয়ার রিপাবলিক, (৪) উজবেক রিপাবলিক, (৫) কাজাক রিপাবলিক, (৬) জর্জিয়ার রিপাবলিক, (৭) আজারবাইজান রিপাবলিক, (৮) লিথুয়ানিয়ার রিপাবলিক, (৯) মোল্ডেভিয়ার রিপাবলিক, (১০) ল্যাটভিয়ার রিপাবলিক, (১১) কিরঘিজ রিপাবলিক, (১২) তাজিক রিপাবলিক, (১৩) আর্মেনিয়ার রিপাবলিক, (১৪) তুর্কমেন রিপাবলিক, (১৫) এস্তোনিয়ার রিপাবলিক এবং (১৬) কারেলোফিনিশ রিপাবলিক।

এই ১৬টি ইউনিয়ন রিপাবলিক ছাড়াও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ১৬টি স্বাতন্ত্র্য-

সম্পন্ন রিপাবলিক, ৯টি স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন অঞ্চল এবং ১০টি জাতীয় এলাকা (National Areas) আছে।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান সুপ্রীম সোভিয়েটের উচ্চকক্ষে প্রতিটি ইউনিয়ন রিপাবলিক হইতে ২৫ জন, প্রত্যেক স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন রিপাবলিক হইতে ১১ জন, প্রত্যেক স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন অঞ্চল হইতে ৫ জন এবং প্রত্যেক জাতীয় এলাকা হইতে ১ জন করিয়া প্রতিনিধি পাঠান হয়। রিপাবলিকগুলি সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র হইতে যে কোন সময়েই বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ইহা ফলপ্রসূ হয় না। ইউক্রেন এবং বাইলোরাশিয়াকে রাষ্ট্রসংঘে আলাদা প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল। শাসনতন্ত্রের ২০ নম্বর ধারায় বলা হইয়াছে যদি ইউনিয়ন রিপাবলিক, স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন রিপাবলিক, স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন অঞ্চল এবং জাতীয় এলাকাগুলির মধ্যে বিভিন্ন আইন লইয়া অসামঞ্জস্য দেখা যায়, তবে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনগুলিই কার্যকরী হইবে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদপ্তর সমূহের দুইটি ভাগ আছে। একটি হইতেছে, সমগ্র ইউনিয়ন মন্ত্রীদপ্তরসমূহ (All Union Ministries) এবং অপরটি হইতেছে, ইউনিয়ন রিপাবলিকের মন্ত্রীদপ্তরসমূহ (The Union Republican Ministries)। বিভিন্ন ইউনিয়ন রিপাবলিকের স্বতন্ত্র মন্ত্রীদপ্তর সমূহ ইউনিয়ন রিপাবলিকের স্বতন্ত্র মন্ত্রীপরিষদ এবং সমগ্র সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিয়ন রিপাবলিকের মন্ত্রীদপ্তরসমূহের (The Union Republican Ministries) অধীনে কাজ করে। কিন্তু বিভিন্ন রিপাবলিকের মন্ত্রীদপ্তরগুলি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন রিপাবলিকের মন্ত্রীপরিষদের (The Council of the Union Republie) নিকট দায়ী থাকে।

সোভিয়েট নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য (Fundamental Rights and Duties of the Soviet Citizens)

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকদের কতিপয় মৌলিক অধিকার দেওয়া হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, নাগরিকদের কতিপয় কর্তব্যের কথাও শাসনতন্ত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে। পৃথিবীর অন্য কোন শাসনতন্ত্রে নাগরিক কর্তব্যের কোন বিধান দেওয়া হয় নাই। সোভিয়েট নাগরিকগণ নিম্নলিখিত মৌলিক অধিকার ভোগ করে।

১। কাজের অধিকার (Right to work)—শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সব নাগরিকই কাজ পাইবার অধিকারী। সুতরাং সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে বেকার-সমস্যার সৃষ্টি হয় না। অর্থনৈতিক সাম্য আনয়ন করা সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার অন্যতম কর্মসূচী এবং ইহার প্রথম পদক্ষেপই হইল নাগরিকদের জন্য কর্মসংস্থান করা।

২। বিশ্রাম ও অবসরের অধিকার (Right to rest and leisure)—কাজের সময় কমাইয়া, পুরা বেতনে ছুটির ব্যবস্থা করিয়া এবং শ্রমিকদের জন্য বিশ্রামাগার, স্বাস্থ্যকর আবাস ও ক্লাবের ব্যবস্থা করিয়া এই অধিকার শ্রমিকদের দেওয়া হইইয়াছে।

৩। শিক্ষার অধিকার (Right to education)—নাগরিকদের শিক্ষার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। বিনা বেতনে সকলেই প্রাথমিক শিক্ষা পাইয়া থাকে। ১৯৪০ সালের পূর্ব পর্যন্ত সব রকম শিক্ষাই বিনা পয়সায় অর্জন করা যাইত এবং রাষ্ট্র সেই ব্যবস্থা করিয়া দিত। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার পর সকলকেই কিছু কিছু শিক্ষার জন্য ব্যয় করিতে হয়। তবে যাহাতে শিক্ষা ব্যবস্থায় নাগরিকদের কোন রকম অসুবিধায় না পড়িতে হয়, রাষ্ট্র সেইদিকে দৃষ্টি রাখে।

৪। জাতীয়তা ও স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমান অধিকার (Equality of rights regardless of nationality, race and sex)—জাতীয়তা ও স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে সমান অধিকার শাসনতন্ত্রে প্রদান করা হইয়াছে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন জাতির ও সম্প্রদায়ের লোকদের সমান অধিকার প্রদান করা হইয়াছে। প্রত্যেক জাতিকেই নিজস্ব ভাষা বজায় রাখিবার এবং তাহা আরও উন্নত করার সমান অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

৫। বিবেকের স্বাধীনতা (Freedom of conscience)—শাসনতন্ত্র প্রত্যেক নাগরিককেই ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান করিবার অধিকার এবং ধর্ম বিরোধী প্রচার করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছে। তাহা ছাড়া, জাতি ও ধর্ম-নির্বিশেষে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককেই ভোটের অধিকার প্রদান করা হইয়াছে।

৬। কথা বলার ও মতামত প্রকাশ করার স্বাধীনতা (Freedom of speech and expression)—প্রত্যেক দেশের নাগরিকদের পক্ষেই ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রেও নাগরিকগণকে এই অধিকার দেওয়া হইয়াছে এই সর্তে যে তাহারা এমন কোন কথা বলিবেন না অথবা মতামত প্রকাশ করিবেন না যাহা রাষ্ট্রের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়। যাঁহারা সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার সমালোচনা করেন, তাঁহাদের মতে একদলীয় শাসন ব্যবস্থায় এই স্বাধীনতার কোন সার্থকতা নাই।

৭। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং পারিবারিক স্বাধীনতার অধিকার (Personal Freedom and inviolability of Homes)—কোন নাগরিককেই আদালতের সিদ্ধান্ত ব্যতীত গ্রেপ্তার করা যায় না। অনুরূপভাবে নাগরিকদের গৃহ-সম্পর্কিত স্বাধীনতা এবং নিজস্ব চিঠি-পত্র অথবা মত বিনিময়ের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকারও দেওয়া হইয়াছে। রাশিয়ার

নাগরিকদের এই স্বাধীনতার কার্যকারিতা সম্বন্ধে সহজেই সন্দেহের উদ্রেক হয়। কারণ যদি কোন নাগরিক কখনও কমিউনিস্ট দলের প্রতি আনুগত্য স্বীকার না করে তবে তাহাকেই রাষ্ট্রদ্রোহী হিসাবে বিচার করা হয়,—এই রকম ঘটনা সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে বিরল নয়।

৮। আশ্রয় প্রাপ্তির অধিকার (Right of asylum)—যে সকল বিদেশী শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে কাজ করায় অথবা জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সহিত যুক্ত থাকায় নিজেদের রাষ্ট্র কর্তৃক বিতাড়িত হইয়াছে, তাহাদের সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় পাইবার স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে।

৯। সংঘ গঠন করিবার অধিকার (Freedom to form organisation)—সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের সংগঠন করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে এই সর্তে যে কোন সংঘই রাষ্ট্রের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাইবে না। সেজন্যই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র কমিউনিস্ট দল ব্যতীত অন্য কোন রাজনৈতিক দল দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে জনসাধারণকে সমবায় সমিতি, শ্রমিক সংঘ, যুব সংঘ, বৈজ্ঞানিক গবেষণা সমিতি ইত্যাদি গঠন করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

১০। স্ট্যালিন শাসনতন্ত্রে কিছু পরিমাণ সম্পত্তিরক্ষার অধিকারও (Right to property) দেওয়া হইয়াছে। শাসনতন্ত্রে তিন প্রকার সম্পত্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ; যথা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি, সমবায় এবং যৌথ খামারের সম্পত্তি এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি। জনসাধারণের ব্যক্তিগত সম্পত্তি যে থাকিবে না, তাহা নহে, তবে সেই সম্পত্তি হইবে নিজেদের কাজ হইতে প্রাপ্ত আয় এবং সঞ্চয় হইতে, বাসগৃহ হইতে এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পাইবার অধিকার হইতে। কিন্তু, ব্যক্তিগত সম্পত্তি শুধু জনসাধারণ নিজেরাই ভোগ করিবে। ইহা খাটাইয়া কাহাকেও শোষণ করা চলিবে না।

সোভিয়েট নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্য (Fundamental Duties of the Soviet Citizens) :

কতিপয় মৌলিক অধিকারের ন্যায় সোভিয়েট নাগরিকদের কতিপয় মৌলিক কর্তব্যের কথাও শাসনতন্ত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে।

প্রত্যেক নাগরিকেরই সাধারণতঃ নিম্নলিখিত কর্তব্য আছে :

(১) কাজ করা (to work)—নাগরিকদের কাজ করিবার অধিকার যেমন প্রদত্ত হইয়াছে, সেই প্রকার নাগরিকদেরও উচিত সরকার যে কাজ করিবার নির্দেশ দিবে, সেই কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা।

(২) আইন এবং শাসনতন্ত্র মানিয়া চলা (To abide by law and the constitution)—প্রত্যেক নাগরিকেরই রাষ্ট্রীয় আইন এবং শাসনতন্ত্র মানিয়া চলা উচিত। রাষ্ট্র নাগরিকদের যে অধিকারগুলি দেয় সেইগুলির

যথাযথ মর্যাদা দেওয়া প্রত্যেক নাগরিকেরই কর্তব্য। নাগরিকগণ যদি রাষ্ট্রীয় আইন এবং শাসনতন্ত্র মানিয়া চলে, তবে অধিকার প্রাপ্তি হেতু ন্যস্ত কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইবে।

(৩) জনসাধারণের সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি রক্ষা করা (To protect and fortify the public socialist property)—সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় উৎপাদন উপকরণগুলির উপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং রাষ্ট্র অনেক শিল্প জাতীয়করণ করিয়া লয়। জনসাধারণের উচিত যেন এই সামাজিক সম্পত্তিগুলির কোনরূপ ক্ষতি না হয়, সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়া।

(৪) পিতৃভূমির প্রতিরক্ষার জন্য সেনাদলে কাজ করা (To serve in the army for the defence of the Fatherland)—পিতৃভূমির নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সেনাবাহিনীতে যোগদান করা এবং সামরিকশিক্ষা গ্রহণ করা সোভিয়েট নাগরিকদের একটি পবিত্র কর্তব্য। ইহার ফলে রাষ্ট্রের নির্দেশে প্রত্যেক নাগরিকই সামরিক শিক্ষা গ্রহণে বাধ্য থাকে।

পিতৃভূমির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ না করা, বিদেশীরাষ্ট্রের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তি করা, সেনাবাহিনী হইতে পলায়ন করা অথবা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য সূচিত হয় না এইরকম কোন কাজ করা সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে গুরুতর অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হয় এবং এইগুলি কঠোর হস্তে দমন করা হয়।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্যগুলি আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে এইগুলি অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের মৌলিক অধিকারগুলির মত নহে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকদের স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করিবার এবং সংঘ গঠন করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে বটে; কিন্তু ইহার একটি সর্ত হইতেছে এই যে রাষ্ট্রের স্বার্থের বিরুদ্ধে কিছু বলা চলিবে না এবং রাষ্ট্রের স্বার্থের বিরুদ্ধে কোন সংঘ গঠন করা চলিবে না। রাষ্ট্রের স্বার্থ এবং কমিউনিস্ট দলের স্বার্থ বর্তমানে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে এক হইয়া গিয়াছে। শাসনতন্ত্রেও কমিউনিস্ট দলকেই একমাত্র রাজনৈতিক দল বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। নাগরিকদের কর্তব্য হইতেছে শাসনতন্ত্রের বিধান মানিয়া চলা; অর্থাৎ শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী নাগরিকগণ কমিউনিস্ট দল ব্যতীত অন্য কোন রাজনৈতিক দলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ত' করিতেই পারে না, তাহারা অন্য কোন রাজনৈতিক দলও গঠন করিতে পারে না। সুতরাং মৌলিক অধিকারগুলিতে পূর্ণ গণতন্ত্রের মূল্য দেওয়া হয় নাই।

অন্যান্য দেশের নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের সংগে সোভিয়েট নাগরিকের মৌলিক অধিকারের পার্থক্য

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র কতটা সমাজতান্ত্রিক ঃ

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের ১ নম্বর ধারায় সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের "শ্রমিক ও কৃষকদের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র" (Socialist State of workers and peasants") রূপে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহার রাষ্ট্রনৈতিক ভিত্তি হইতেছে শ্রমিকদের ও কৃষকদের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত সোভিয়েটসমূহ।

সমাজতন্ত্রের সমর্থকগণের মতে শ্রেণীসংগ্রামের (class struggle) অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হইতেছে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিলোপ এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অভ্যুদয়। তাঁহাদের মতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে দুইটি জিনিস একান্ত আবশ্যক। প্রথমটি হইতেছে একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যাহার ফলে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিলোপ হইবে। দ্বিতীয়টি হইতেছে মেহনতী শ্রমিক ও কৃষকদের একনায়কত্ব। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র রচয়িতাগণের মতে সেই দেশে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব (Dictatorship of the Proletariat) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং মেহনতী কৃষক ও শ্রমিকদের লইয়া একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। উৎপাদনের উপকরণ এবং সমুদয় বেসরকারী শিল্প ও সম্পত্তি এখন সামাজিক মালিকানায় চলিয়া আসিয়াছে। সমাজে আয় ও ধনের বৈষম্য নাই শুধু তাহাই নহে, সমাজের লোকেরা কাজ পাইয়াছে, এবং মালিক ও শ্রমিক বিরোধের অবসান হইয়াছে; কেননা, সমাজ নিজেই এখন সব কিছুর মালিক। যাহা সামাজিক সম্পত্তি তাহাতে শ্রমিকদেরও পূর্ণ অধিকার আছে। ব্যক্তিগত মুনাফার স্থলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সামাজিক মুনাফা এবং মেহনতী জনসমাজও সেই মুনাফার অংশীদার। মালিক শ্রেণীর বিলোপ সাধন করিয়া মেহনতী জনসাধারণ অর্থাৎ শ্রমিক ও কৃষকগণ বর্তমানে অন্যান্য ব্যক্তিদের ন্যায় সমানভাবে উৎপাদন যন্ত্রের মালিক। কৃষিব্যবস্থায় যৌথ খামারের সম্পত্তি (Collective Farm Property) এবং শিল্প ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি (State property) সোভিয়েট দেশের সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু, এইজন্য কৃষকদের ও শ্রমিকদের যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি নাই তাহা নহে। কিন্তু সেই সম্পত্তির সৃষ্টি হইয়াছে তাহাদের কাজ হইতে অর্জিত আয় ও সঞ্চয়ের ফলে। এই সম্পত্তি নিছক ব্যক্তিগত ব্যবহার অথবা ভোগের জন্য নহে।

ব্যক্তিগত মুনাফার স্থানে সামাজিক মুনাফা

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক গ্রামে, শহরে, জেলায়, জাতীয় এলাকায়, অঞ্চলে এবং বিভিন্ন রিপাবলিকে একটি করিয়া সোভিয়েট আছে। ইহা শ্রমিক ও কৃষকগণের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত হয়। এই প্রতিনিধিগণকে শ্রমিক ও কৃষকগণ ইচ্ছা করিলেই অপসারণ করিতে পারে। এই সোভিয়েটগুলি কাজের পরিচালনার জন্য কতিপয় স্থায়ী কমিটি নির্বাচিত করে। স্থায়ী

কমিটিগুলি কৃষক ও শ্রমিকদের সহিত রাষ্ট্রের যোগাযোগ স্থাপন করে। এইভাবে কৃষক ও শ্রমিকগণ রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপে অংশ গ্রহণ করে। তাহা ছাড়া, প্রতিটি সোভিয়েট রিপাবলিক সোভিয়েট সমূহের সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান এবং ইহা জাতিগত ভিত্তির উপর গঠিত। সমগ্রভাবে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র হইতেছে একটি বহুজাতি সম্পন্ন যুক্তরাষ্ট্র।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে অনেক পরিমাণে কৃষক ও শ্রমিকদের একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

নীতিগতভাবে বেসরকারী উদ্যোগের স্থান নাই; কিন্তু, কিছু পরিমাণে ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকে

নীতিগতভাবে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পক্ষেত্রে অথবা কৃষিক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগের প্রশ্ন উঠে না; কৃষিক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই যৌথ-খামারের প্রতিষ্ঠা, শিল্পক্ষেত্রেও আমরা দেখিতে পাই পূর্ণ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব। বেসরকারীভাবে শিল্পোন্নয়নের প্রয়াস সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে দেখা যায় না। তবে জনগণের কিছু না কিছু ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকিতে পারে। সেই সম্পত্তির সদ্ব্যবহার জনসাধারণ করিতে পারে শুধু নিজের ভোগের জন্য। কেননা, ব্যক্তিগত সম্পত্তির সাহায্যে কাহাকেও শোষণ করিবার অধিকার কেহ পায় না। যৌথ খামারের অথবা সমবায় সমিতিগুলিতে যখন মেহনতী জনগণ কাজ করে, তখন তাহাদের যথেষ্ট ব্যক্তিগত উদ্যম থাকে। কেননা, অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উৎপাদনের মজুরীর উপর রাষ্ট্র মজুরী হার নির্ধারণ করিয়া দেয়। এই পর্যন্তই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ব্যক্তিগত অথবা বেসরকারী উদ্যোগ আমরা দেখিতে পাই। তবে ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে ব্যক্তিগত উদ্যোগ বলিতে যাহা বুঝায়, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে তাহা দেখা যায় না। কারণ, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র হইতেছে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ("Socialist State of workers and peasants.")।

সংক্ষিপ্তসার

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

(১) সোভিয়েট শাসন ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। (২) সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র সমাজতন্ত্রের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। (৩) সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ হইতেছে সুপ্রীম সোভিয়েট এবং আইনগুলি ব্যাখ্যা করিবার ভার প্রদান করা হইয়াছে রাষ্ট্রপমিণ্ডলীকে। (৪) সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে আমরা একজন রাষ্ট্রপতির পরিবর্তে তেত্রিশজনের

একটি রাষ্ট্রপতিমণ্ডলী দেখিতে পাই। (৫) সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রপতিচালিত শাসন ব্যবস্থার সংমিশ্রণে দেখিতে পাওয়া যায়। (৬) একদলীয় ব্যবস্থা সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার আরেকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। (৭) সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রটি অনমনীয়। (৮) সোভিয়েট শাসন ব্যবস্থায় নাগরিকদের শুধু মৌলিক অধিকারই নহে, মৌলিক কর্তব্যগুলিও বিধিবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। (৯) সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিচারপতিগণ নিযুক্ত না হইয়া নির্বাচিত হন এবং প্রয়োজন হইলে বিচারপতিগণকে প্রত্যাগমনের আদেশ দিয়া অপসারণ করা যায়। (১০) সোভিয়েট সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতাগুলি চারিভাগে বিভক্ত। সর্বশেষে, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন জাতীয় জনসমষ্টির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে আমরা ১৬টি ইউনিয়ন রিপাবলিক, ১৬টি স্বাতন্ত্র্য-সম্পন্ন রিপাবলিক, ৯টি স্বাতন্ত্র্য-সম্পন্ন অঞ্চল এবং ১০টি জাতীয় এলাকা দেখিতে পাই।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকগণ নিম্নলিখিত মৌলিক অধিকার ভোগ করে। (১) কাজের অধিকার, (২) বিশ্রাম ও অবসর লইবার অধিকার, (৩) শিক্ষার অধিকার, (৪) জাতীয়তা ও স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমান অধিকার, (৫) বিবেকের স্বাধীনতা, (৬) কথা বলার ও মতামত প্রকাশ করার স্বাধীনতা, (৭) ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং পারিবারিক স্বাধীনতার অধিকার (৮) আশ্রয় প্রাপ্তির অধিকার, (৯) সংঘ গঠন করিবার অধিকার, (১০) ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য সম্পত্তি রক্ষার অধিকার। উপরোক্ত সমুদয় অধিকার ততক্ষণই নাগরিকরা ভোগ করিতে পারে যতক্ষণ এই অধিকারগুলি পালন করিবার সময় রাষ্ট্রের আদর্শ অথবা কমিউনিস্ট দলের আদর্শের সহিত কোনরূপ সংঘাতের সৃষ্টি না হয়।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকদের কতিপয় মৌলিক কর্তব্যও আছে। সেইগুলি হইতেছে, কাজ করা, আইন এবং শাসনতন্ত্র মানিয়া চলা, জনসাধারণের সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি রক্ষা করা এবং পিতৃভূমির প্রতিরক্ষার জন্য সেনাদলে কাজ করা।

Exercises

1. Describe the unique features of the Constitution of the U. S. S. R. (১১৭—২১ পৃষ্ঠা)

2. Give in brief the unique characteristics of the Soviet Federalism. To what extent has the principle of nationality been respected in the constitutional system of the U. S, S. R.

(১১৭—২১ পৃষ্ঠা)

3. Broadly indicate the structure of the State in the U. S. S. R. (১২১—২২ পৃষ্ঠা)

4. Discuss the nature of the basic rights ann duties of the Citizens in Soviet Union. (১২২—২৫ পৃষ্ঠা)

5. Discuss how far the U. S. S. R. is a Socialist State of workers and peasants. Is there any scope for private enterprise in the U. S. S. R. ? (১২৬—২৭ পৃষ্ঠা)

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সোভিয়েট সরকারের বিভিন্ন বিভাগ
(Different Organs of the Government of the U. S. S. R.)

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডিয়াম বা রাষ্ট্রপতিমণ্ডলী (The Presidium of the Soviet Union) :

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে কোন নির্দিষ্ট রাষ্ট্রপ্রধান নাই, তাঁহার স্থানে আছেন একটি প্রেসিডিয়াম বা রাষ্ট্রপতিমণ্ডলী। প্রেসিডিয়ামের (Presidium) যিনি সভাপতি, তিনিই আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতিনিধিত্ব করেন। প্রেসিডিয়াম যে শুধু শাসনবিভাগেরই প্রধান তাহা নহে, সুপ্রীম সোভিয়েটের অধিবেশন না থাকিলে ইহা সুপ্রীম সোভিয়েটের পক্ষে কতিপয় আইন ও অর্থ-সংক্রান্ত কাজকর্ম করিয়া থাকে। প্রেসিডিয়ামের সদস্য সংখ্যা হইতেছে তেত্রিশ, ইহার-সহ-সভাপতির সংখ্যা হইতেছে ষোল। ষোলজন সহ-সভাপতি ষোলটি ইউনিয়ন রিপাবলিকের প্রতিনিধিত্ব করেন। তাহা ছাড়া, ১৫ জন সাধারণ সদস্য এবং একজন কর্মসচিব থাকেন। কোন বিশেষ একজন রাষ্ট্রপতি না থাকায় প্রেসিডিয়াম একযোগে রাষ্ট্রপতির কাজ করেন। সেজন্য ইহাকে "a Collegium President of the U. S. S. R." বলা হয়।

প্রেসিডিয়ামের তেত্রিশজন সদস্য সুপ্রীম সোভিয়েটের উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে নির্বাচিত হন। তাঁহাদের কার্যকাল চারি বৎসর। যদি সুপ্রীম সোভিয়েট চারি বৎসরের আগে ভাংগিয়া যায় তবে রাষ্ট্রপতিমণ্ডলীও চারি বৎসরের আগে ভাংগিয়া যাইতে পারে, তবে নূতন সুপ্রীম সোভিয়েট নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত প্রেসিডিয়াম কাজ চালাইয়া যাইতে পারে। প্রেসিডিয়ামকে নিজের কাজের জন্য সুপ্রীম সোভিয়েটের নিকট দায়ী থাকিতে হয়।

প্রেসিডিয়ামের বিভিন্ন ক্ষমতা ও কাজ (Powers and Functions of the Presidium) : প্রেসিডিয়ামের ক্ষমতাগুলি নিম্নরূপ :

প্রথমতঃ, প্রেসিডিয়াম বৎসরে দুইবার সুপ্রীম সোভিয়েটের অধিবেশন আহ্বান করে এবং সুপ্রীম সোভিয়েটের উভয় কক্ষের মধ্যে মতভেদ হইলে ইহা ভাংগিয়া দিতে পারে। সুপ্রীম সোভিয়েট ভাংগিয়া দিবার দুই মাসের মধ্যে

অথবা ইহার স্বাভাবিক স্থিতিকাল অতিক্রান্ত হইবার পর প্রেসিডিয়াম নূতন সুপ্রীম সোভিয়েট নির্বাচনের জন্য আদেশ দিতে পারে। নব-নির্বাচিত সুপ্রীম সোভিয়েটের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করে প্রেসিডিয়াম।

দ্বিতীয়তঃ প্রেসিডিয়াম সমগ্র সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের আইনের ব্যাখ্যা করিতে পারে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী আদেশ (decrees) জারী করিতে পারে। কিন্তু প্রেসিডিয়াম আইন প্রণয়ন করে না। তবে প্রেসিডিয়াম যে আদেশ জারী করে তাহা আইনের ন্যায় কার্যকরী হয়। সুপ্রীম সোভিয়েটের অধিবেশন খুব অল্পকালের জন্য হয় বলিয়া প্রেসিডিয়াম আদেশ জারী করিবার জন্য মিলিত হয়।

তৃতীয়তঃ, প্রেসিডিয়াম সুপ্রীম সোভিয়েটের অধিবেশনের অন্তবর্তীকালে মন্ত্রীপরিষদের সভাপতির (অথবা প্রধানমন্ত্রী) পরামর্শ অনুযায়ী সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রীদের নিয়োগ ও পরিবর্তন করে, সম্মানসূচক উপাধি প্রদান করে, অপরাধীদের (রাষ্ট্রদ্রোহী ব্যতীত) প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার প্রয়োগ করে, সশস্ত্র বাহিনীর অধিনায়কদের নিয়োগ অথবা অপসারণ করে, দেশরক্ষার স্বার্থে সৈন্য সমাবেশ ও যুদ্ধাবস্থা ঘোষণা করে, প্রয়োজন হইলে দেশের বিভিন্ন অংশে সামরিক আইন জারী করে, আন্তর্জাতিক সন্ধি অথবা চুক্তিসমূহ অনুমোদন অথবা প্রত্যাখ্যান করে এবং বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া রাষ্ট্রদূত নিয়োগ ও প্রত্যাগমনের ব্যবস্থা করে।

চতুর্থতঃ, সুপ্রীম সোভিয়েট কর্তৃক অবলম্বিত ব্যবস্থাগুলি সুপ্রীম সোভিয়েটের সভাপতি ও কর্মসচিবের সহিত সম্বলিত বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করা হয়। প্রেসিডিয়াম এইগুলি প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না, তবে নিজের উদ্যোগে অথবা কোন ইউনিয়ন রিপাবলিকের দাবীতে এইগুলি গণভোটের জন্য প্রেরণ করিতে পারে।

পঞ্চমতঃ, কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীপরিষদ অথবা, ইউনিয়ন রিপাবলিকগুলির মন্ত্রীপরিষদের কোন সিদ্ধান্ত যদি সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের কোন আইনের পরিপন্থী হয় তবে তাহা বাতিল করিয়া দিবার অধিকার প্রেসিডিয়ামের আছে।

সোভিয়েট ডেপুটিগণকে সুপ্রীম সোভিয়েটের সম্মতি ব্যতীত, অথবা ইহার দুইটি অধিবেশনের অন্তবর্তী সময়ে গ্রেপ্তার করা যায় না। আবার, প্রেসিডিয়ামের অনুমতি ব্যতীত কোন ডেপুটিকে গ্রেপ্তার করা যায় না।

প্রেসিডিয়ামের ক্ষমতা ও ক্রিয়াকলাপ আলোচনা করিলে যে প্রশ্নটি স্বতঃই মনে হয়, তাহাই হইতেছে, ইহা প্রকৃতই একটি আইন-প্রণয়ন কর্তৃপক্ষ কিনা অথবা একটি শাসনকর্তৃপক্ষ কিনা। অথবা, এমনও প্রশ্ন উঠে ইহা প্রকৃতই সম্মিলিতভাবে রাষ্ট্রপ্রধান কিনা। প্রেসিডিয়ামের গঠন, ক্ষমতা ও ক্রিয়াকলাপ

আলোচনা করিলে দেখা যায়, প্রথমতঃ, ইহাকে আইনসভার একটি সক্রিয় অংগ হিসাবে গঠন করা হইয়াছিল। সুপ্রীম সোভিয়েট যদিও সর্বোচ্চ আইন-প্রণয়ন সংস্থা, তবুও (১) সুপ্রীম সোভিয়েটের অধিবেশন স্বল্পকাল স্থায়ী হওয়ায় এবং (২) ইহার অধিবেশন আহ্বান করা, স্থায়ী রাখা ও ভাংগিয়া দেওয়ার অধিকার প্রেসিডিয়ামের থাকায়, এবং (৩) সর্বোপরি সুপ্রীম সোভিয়েটের অধিবেশন না চলার সময় প্রেসিডিয়ামের আইনসংক্রান্ত আদেশ (decree) জারী করার ক্ষমতা থাকায়, প্রেসিডিয়াম ক্রমেই সুপ্রীম সোভিয়েটের ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশরূপে বিবেচিত হইতেছে। প্রেসিডিয়াম সুপ্রীম সোভিয়েট কর্তৃক নির্বাচিত এবং ইহা সুপ্রীম সোভিয়েটের নিকট নিজের কাজের জন্য দায়ী, তবুও ইহা সুপ্রীম সোভিয়েটকে ভাংগিয়া দিতে পারে। ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়, কমিউনিস্ট দল নিজের ক্ষমতা ও প্রাধান্য সরকারের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যই প্রেসিডিয়ামকে অবলম্বন করিয়াছে। কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক শাসন-ক্ষমতা, আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত ও আইনের ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতা, বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা এবং সর্বোপরি কমিউনিষ্ট দলের নেতৃত্ব সবই প্রেসিডিয়ামের হাতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। মন্ত্রীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা, আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া বিচার বিভাগের কাজ সংকুচিত করা, যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনের সহিত ইউনিয়ন রিপাবলিকগুলির আইনের সংঘাত সৃষ্টি হইলে শেষোক্ত আইনকে বাতিল করিয়া দেওয়া, বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত চুক্তি অনুমোদন করা,—প্রেসিডিয়ামের এইসব ক্ষমতার কাজ কমিউনিস্ট দলের পলিটব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত হয়। কমিউনিস্ট দলের মতে প্রেসিডিয়ামের প্রাধান্য মেহনতী জনতার প্রতিনিধিদেরই প্রাধান্য,—প্রেসিডিয়াম শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব ঘোষণা করে।

মন্তব্য

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রী পরিষদ—(The Council of Ministers of the U. S. S. R.):

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রীপরিষদই হইল শাসন পরিচালনার প্রকৃত সংস্থা। ইহা সুপ্রীম সোভিয়েট কর্তৃক নিযুক্ত হয় এবং সুপ্রীম সোভিয়েটের নিকট এবং ইহার অধিবেশন না চলিতে থাকিলে প্রেসিডিয়ামের নিকট কাজের জন্য দায়ী থাকে। মন্ত্রী-পরিষদ নিম্নলিখিত সদস্যদের লইয়া গঠিত :—(১) মন্ত্রী-পরিষদের সভাপতি বা প্রধানমন্ত্রী, (২) মন্ত্রী পরিষদের সহসভাপতিবৃন্দ (৩) মন্ত্রী-পরিষদের রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিটির সভাপতি, (৪) জাতীয় অর্থ ব্যবস্থার উপকরণ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ সংক্রান্ত মন্ত্রী-পরিষদের রাষ্ট্রীয় কমিটির সভাপতি, (৫) রাষ্ট্রীয় গঠন সংক্রান্ত মন্ত্রী-পরিষদের রাষ্ট্রীয় কমিটির সভাপতি,

(৬) সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রীগণ এবং (৭) ললিতকলা সংক্রান্ত মন্ত্রীপরিষদের রাষ্ট্রীয় কমিটির সভাপতি।

মন্ত্রী-পরিষদ যে সমস্ত নীতি অবলম্বন করে এবং আদেশ জারী করে সেইগুলিই প্রচলিত আইনের ভিত্তি হিসাবে পরিগণিত হয়। শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন বিধান অনুযায়ী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদপ্তরসমূহ এবং অন্যান্য অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থার ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সামঞ্জস্য আনয়ন করার দায়িত্ব মন্ত্রী-পরিষদের। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে সফল করা এবং আর্থিক ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিবার জন্যও মন্ত্রী-পরিষদ বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রীয় আইনগুলি কার্যকরী করিয়া দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব মন্ত্রী-পরিষদের হাতে। সামরিক শক্তির বৃদ্ধিকল্পে কতজন নাগরিককে আহ্বান করিতে হইবে তাহাও মন্ত্রী-পরিষদ স্থির করেন। ইহা ব্যতীত শাসনকাজে ও জাতীয় অর্থ-ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেখানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-পরিষদের কর্তৃত্ব রহিয়াছে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-পরিষদ সোভিয়েট ইউনিয়নের মন্ত্রীদের বিভিন্ন আদেশ ও নির্দেশ বাতিল করিতে পারে, এবং ইউনিয়ন-রিপাবলিকের মন্ত্রী-পরিষদগুলির গৃহীত ব্যবস্থা ও নির্দেশগুলি বাতিল করিতে পারে।

মন্ত্রীপরিষদের নীতি হইতেছে প্রচলিত আইনের ভিত্তি

সোভিয়েট ইউনিয়নের মন্ত্রীগণ নিজ নিজ দপ্তরের এলাকায় প্রচলিত আইন কার্যকরী করে এবং মন্ত্রী-পরিষদের গৃহীত ব্যবস্থা ও নির্দেশের ভিত্তিতে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নির্দেশ প্রদান করেন।

শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন রিপাবলিকগুলির দুই জাতীয় মন্ত্রী-দপ্তর আছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-পরিষদের দপ্তরগুলি হইল, (১) সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের দপ্তরসমূহ (All-Union Ministries) এবং (২) ইউনিয়ন রিপাবলিকের মন্ত্রী-দপ্তরসমূহ (Union-Republican Ministries)। আবার অন্যান্য রিপাবলিকগুলির মন্ত্রীদপ্তর-সমূহের ভাগ হইল: (১) রিপাবলিকের মন্ত্রী-দপ্তরসমূহ (Republican Ministries) এবং (২) ইউনিয়ন রিপাবলিকের মন্ত্রী-দপ্তরসমূহ (Union-Republican Ministries)। রিপাবলিকের মন্ত্রী-দপ্তরসমূহ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন-রিপাবলিকের মন্ত্রী-পরিষদের নিকট নিজেদের নীতি ও কাজের জন্য দায়ী থাকে। আবার বিভিন্ন রিপাবলিকের ইউনিয়ন রিপাবলিকের মন্ত্রী-দপ্তরসমূহ, ইউনিয়ন-রিপাবলিকের মন্ত্রী-পরিষদ এবং সমগ্র সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিয়ন-রিপাবলিকের মন্ত্রী-দপ্তর সমূহের অধীনে থাকিয়া বিভিন্ন কাজ করে।

দুই জাতীয় মন্ত্রীদপ্তর

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে যদিও মন্ত্রী-পরিষদ নিজের কাজের জন্য সুপ্রীম সোভিয়েটের নিকট দায়ী, তবুও সুপ্রীম সোভিয়েটের অধিবেশন খুব অল্পকাল স্থায়ী হওয়ায় প্রেসিডিয়াম মন্ত্রী-পরিষদের উপর কর্তৃত্ব করে। প্রেসিডিয়ামের

মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে কমিউনিস্ট দলের পলিটব্যুরোই মন্ত্রী-পরিষদকে নিয়ন্ত্রিত করে। অনেক সময় মন্ত্রী-পরিষদের সভাপতি এবং কমিউনিস্ট দলের প্রধান কর্মসচিব পদে একই ব্যক্তি নিযুক্ত হন (যেমন, পূর্বে স্ট্যালিন কিছুকাল ছিলেন, এবং পরে ক্রুশ্চেভ হইয়াছেন) এই ব্যবস্থায় প্রকৃতপক্ষে কমিউনিস্ট দলই দেশের শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করেন। মন্ত্রী-পরিষদের সদস্যগণ হইতেই একটি ক্যাবিনেট (inner cabinet) গঠিত হয় এবং উচ্চপদস্থ মন্ত্রীগণ এই ক্যাবিনেটের সদস্য নিযুক্ত হন। যাঁহারা ক্যাবিনেট-সদস্য, তাঁহাদের প্রায় সকলেই পলিটব্যুরোর সদস্য। সুতরাং মন্ত্রী-পরিষদের শাসনের অন্তরালে প্রকৃতপক্ষে কমিউনিস্ট দলের পলিটব্যুরোই দেশের শাসন পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম সোভিয়েট (Supreme Soviet of the U.S.S.R.) :

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সংস্থা হইতেছে সুপ্রীম সোভিয়েট। ইহার দুইটি কক্ষ আছে, একটির নাম যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েট (The Soviet of the Union) এবং অপরটির নাম জাতিসমূহের সোভিয়েট (The Soviet of the Nationalities)। দুই কক্ষের সদস্যগণ নাগরিকদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। অন্ততঃ প্রতি তিন লক্ষ লোকের জন্য একজন প্রতিনিধি থাকে। জাতিসমূহের সোভিয়েটের নির্বাচন-পদ্ধতি হইতেছে এই যে, প্রত্যেক ইউনিয়ন রিপাবলিক হইতে ২৫ জন প্রতিনিধি, প্রত্যেক স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন রিপাবলিক (Autonomous Republics) হইতে ১১ জন প্রতিনিধি এবং প্রত্যেক স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন অঞ্চল (Autonomous Regions) হইতে ৫ জন প্রতিনিধি এবং প্রত্যেক জাতীয় এলাকা (National Area) হইতে ১ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। জাতি, ধর্ম, শিক্ষা, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ১৮ বৎসর বয়স্ক যে কোন নাগরিকেরই সুপ্রীম সোভিয়েটের প্রতিনিধি হইবার অধিকার রহিয়াছে। গোপন ব্যালট প্রথায় (Secret ballot system) ভোট গ্রহণ করা হয়। সুপ্রীম সোভিয়েটের কার্যকাল চারি বৎসরের জন্য, যদি এই সময়ের পূর্বে দুই কক্ষের মধ্যে মতিবিরোধ হওয়ার ফলে প্রেসিডিয়াম ইহা ভাংগিয়া না দেয়। সুপ্রীম সোভিয়েটের মোট সদস্যসংখ্যা প্রায় দুই হাজার। সুতরাং এত বড় পরিষদের পক্ষে প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ করা এবং ইহা কার্যকরী করা সম্ভবপর হয় না। সুপ্রীম সোভিয়েটের উভয় কক্ষকেই আইন প্রণয়নে সমান ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। অর্থসংক্রান্ত বিল এবং অন্যান্য বিলের মধ্যে কোন পার্থক্য আইন-প্রণয়নের সময়ে করা হয় না। যদি কখনও দুই কক্ষের মধ্যে মতবিরোধ হয়, এবং প্রত্যেক কক্ষ হইতে সমসংখ্যক সদস্য লইয়া গঠিত মীমাংসা কমিশন

(Conciliation Commission) ইহার মীমাংসা করিতে ব্যর্থ হয়, তখনই প্রেসিডিয়াম সুপ্রীম সোভিয়েট ভাংগিয়া দিতে পারে। কিন্তু, সুপ্রীম সোভিয়েটের উভয় কক্ষ একই রাজনৈতিক দল কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় ইহাদের মধ্যে মতভেদের কোন অবকাশ থাকে না। বৎসরে দুইবার সুপ্রীম সোভিয়েটের অধিবেশন বসে এবং জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হইলে দুইবারের বেশী অধিবেশন বসিতে পারে। সুপ্রীম সোভিয়েটের অধিবেশন বন্ধ থাকাকালীন অবস্থায় প্রেসিডিয়ামই প্রকৃতপক্ষে ইহার বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করে।

সুপ্রীম সোভিয়েটই সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে আইন-প্রণয়নের জন্য সর্বোচ্চ সংস্থা। ইহার আইন একমাত্র গণভোটের সাহায্যে রদবদল করা চলে। কোন সংস্থারই ক্ষমতা নাই সুপ্রীম সোভিয়েটের আইন রদবদল করিবার। প্রেসিডিয়াম সুপ্রীম সোভিয়েটের আইনগুলি ব্যাখ্যা করিতে পারে। কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়াম নিয়োগ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীপরিষদ নিয়োগ, প্রোকিউরেটর-জেনারেল নিয়োগ এবং সর্বোচ্চ আদালত ও বিশেষ আদালত সমূহের (The Special Courts) বিচারপতি নির্বাচনে ইত্যাদি সব কাজই সুপ্রীম সোভিয়েটকে সম্পন্ন করিতে হয়। সুপ্রীম সোভিয়েটেরই একমাত্র অধিকার আছে শাসনতন্ত্র সংশোধন করিবার। আলাদাভাবে সুপ্রীম সোভিয়েটের উভয় ক্ষেত্রে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের সংখ্যাধিক্যে যদি সংশোধনী প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়, তবেই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রটির সংশোধন করা যায়। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে নূতন রিপাবলিকের স্বীকৃতি অথবা নূতন স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন রিপাবলিক, স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন অঞ্চল এবং জাতীয় এলাকা সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে একমাত্র সুপ্রীম সোভিয়েটের। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন রিপাবলিকের মধ্যে যদি সীমানার পরিবর্তন হয়, সেইগুলি অনুমোদন করিবার একমাত্র কর্তৃপক্ষ হইল সুপ্রীম সোভিয়েট। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের বাজেট অনুমোদন করা এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন রিপাবলিকের মধ্যে রাজস্ব বণ্টন ব্যবস্থা অনুমোদন করার একমাত্র অধিকারী হইতেছে সুপ্রীম সোভিয়েট। বৈদেশিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ, দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনী সংগঠন, যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা ও বিদেশীদের অধিকার সম্বন্ধে নিয়ম-কানুন প্রণয়ন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার তত্ত্বাবধান প্রভৃতি ব্যাপারে সুপ্রীম সোভিয়েট কর্তৃত্ব করিতে পারে।

শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী সুপ্রীম সোভিয়েটের ক্ষমতা প্রচুর। কিন্তু, ইহার আকৃতি খুব বড় বলিয়া ইহার ঘন ঘন অধিবেশন করা সম্ভবপর হয় না। ইহার ফলে সুপ্রীম সোভিয়েটের অধিবেশন বন্ধ থাকাকালীন সময়ে কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়াম ইহার পক্ষে সমুদয় কাজ করে। যে অল্প কয়দিনের জন্য সুপ্রীম সোভিয়েটের অধিবেশন বসে সেই সময় ইহা শুধু প্রেসিডিয়াম ও

মন্ত্রী-পরিষদ কর্তৃক অবলম্বিত ব্যবস্থাগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখে ও অনুমোদন করে।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিচার-ব্যবস্থা (**Judicial system of the U.S.S.R.**) **:**

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ আদালত হইল সুপ্রীম কোর্ট (the Supreme Court)। এই আদালতে প্রায় ত্রিশ জন বিচারপতি আছেন। সুপ্রীম সোভিয়েটের উভয় কক্ষ যুক্তঅধিবেশনে পাঁচ বৎসরের জন্য বিচারপতিগণকে নির্বাচিত করে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ আদালতের নীচে প্রত্যেকটি রিপাবলিকের আলাদা সুপ্রীম কোর্ট আছে। সংশ্লিষ্ট রিপাবলিকের সোভিয়েটগণ বিচার কাজে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের বিচারপতি হিসাবে মনোনীত করেন। ইহার নীচে আমরা দেখিতে পাই আঞ্চলিক আদালত (Regional Courts); সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সোভিয়েটগণ ইহাদের বিচারপতি নির্বাচিত করেন। ইহাদের নীচে আছে প্রতি জিলার জনগণের আদালত (People's Court)। জিলার লোকেরা এই আদালতের বিচারপতিদের ৩ বৎসরের জন্য নির্বাচিত করেন। জনগণের আদালতের বিচারপতিগণ দুইজন এ্যাসেসর (assessor) অথবা নাগরিক বিচারপতির (citizen judges) সহযোগিতায় নিজেদের কাজ পরিচালনা করেন। স্থানীয় সোভিয়েটগণই এই এ্যাসেসরদের একটি প্যানেল হইতে নির্বাচিত করে। এই আদালতগুলি ছোট ছোট দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার করে। অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলি আঞ্চলিক আদালতে পাঠান হয়। এই আদালতগুলি ছাড়াও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে কতিপয় বিশেষ (Special Courts) আছে; এই বিশেষ আদালতের বিচারপতিগণকে সুপ্রীম সোভিয়েট ইহার উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত করে।

তাহা, ছাড়া, সুপ্রীম সোভিয়েট ৭ বৎসরের জন্য একজন প্রোকিউরেটর জেনারেল নিযুক্ত করে। সরকারী কর্মচারীগণ যাহাতে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় আইনগুলি পালন করিয়া চলে তাহা তত্ত্বাবধান করিবার সর্বোচ্চ ক্ষমতা ("supreme supervisory power to ensure the strict observance of law by all state personnel") প্রোকিউরেটর জেনারেলকে দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়াও প্রোকিউরেটর জেনারেলের আর একটি বিশেষ ক্ষমতা আছে; তাহা হইতেছে তিনি কোনও বে-আইনী সিদ্ধান্ত অথবা বে-আইনী কাজের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রশক্তির নিকট অভিযোগ আনয়ন করিতে পারেন, কোন ফৌজদারী অপরাধের কারণ অনুসন্ধান করিতে পারেন এবং অপরাধ প্রমাণ করিবার জন্য সাক্ষী সংগ্রহ করিতে পারেন। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের কতিপয় মূল ক্ষমতা (original powers) এবং আপীল বিচার

করিবার ক্ষমতা আছে। ইহা রিপাবলিকগুলির সুপ্রীম কোর্ট হইতে আগত আপীলগুলি বিচার বিবেচনা করিয়া দেখে। তাহা ছাড়া বিভিন্ন রিপাবলিকের মধ্যে মতবিরোধ, অথবা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কোন সদস্যের বিরুদ্ধে কোন মামলা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেগুলির সহিত সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ জড়িত, সেইগুলি সম্বন্ধে বিচার করিবার মূল ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের আছে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউনিয়ন রিপাবলিকগুলির সমুদয় আদালতগুলির তত্ত্বাবধান করিবার ভারও যুক্তরাষ্ট্রীয় সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত।

সোভিয়েট বিচার-ব্যবস্থার কতিপয় বিশেষ বৈশিষ্ট্য (Some special features of the Soviet Judicial System):

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের ১১২ নম্বর ধারায় বলা হইয়াছে যে সোভিয়েট বিচারালয়সমূহের বিচারপতিগণ স্বাধীন এবং একমাত্র আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সোভিয়েট বিচারালয়গুলির উদ্দেশ্য হইল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ও আইনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা অন্যান্য দেশে দেখা যায় না। তাহা হইতেছে, সুপ্রীমকোর্ট হইতে জনগণের আদালত পর্যন্ত সমুদয় আদালতের বিচারপতিগণ আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হন। তাহা ছাড়া, নাগরিকদের প্যানেল হইতে এ্যাসেসর বা নাগরিক-বিচারপতি নির্বাচিত হন। এই ব্যবস্থায় প্রকৃত সৎ এবং বিভিন্ন গুণ সম্পন্ন নাগরিকগণ বিচার-ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ পাইয়া থাকেন। ভোটাধিকার আছে এই রকম যে কোন নাগরিকই নাগরিক-বিচারপতি হইতে পারেন। এই ব্যবস্থার একটি প্রধান সুফল হইল বাদী ও বিবাদী কোন পক্ষই বিচারকদের উপর আস্থা হারাইতে পারে না; কেননা, বিচারকগণ তাহাদেরই নির্বাচিত প্রতিনিধি। জনগণের পছন্দ অনুযায়ীই জনগণের আদালতের বিচারকগণ নিযুক্ত হন। এই ব্যবস্থায় দ্রুত বিচার কাজ সমাধা করাও সম্ভবপর হয়। ন্যায়ের দিক হইতে চিন্তা করিলে সোভিয়েট বিচার ব্যবস্থা অন্যান্য দেশের বিচার ব্যবস্থা হইতে উন্নত। বিচারকগণ যথেষ্ট পরিমাণে জনমত কর্তৃক প্রভাবিত হন। কিন্তু সোভিয়েট বিচার ব্যবস্থার অন্যতম ত্রুটি হইল আদালতগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনের ব্যাখ্যা করিতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনের ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতা হইল কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়ামের। অথচ বিচারপতিগণ রাষ্ট্রীয় আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনের ব্যাখ্যা যখন প্রেসিডিয়াম প্রদান করে, তখন প্রেসিডিয়াম প্রকৃতপক্ষে কমিউনিস্ট দল কর্তৃক পরিচালিত হয়। সুতরাং সোভিয়েট বিচারালয়গুলির বিচারপতিগণ আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন, কথার অর্থ হইতেছে তাঁহারা

প্রকৃতপক্ষে প্রেসিডিয়াম তথা কমিউনিস্টদলের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক প্রদত্ত আইনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হন।

রাজনৈতিক অভিযোগে অভিযুক্ত অর্থাৎ, দেশদ্রোহিতা, বিদেশীদের গুপ্তচর হিসাবে কাজ করা, রাজ্যের স্বার্থের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করা অথবা সংঘ গঠন করা, ইত্যাদি অভিযোগে অভিযুক্ত আসামীগণের বিচার করিবার সময় নাগরিক-বিচারপতিদের সাহায্য লওয়া হয় না। ইহাতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় এবং একমাত্র রাজনৈতিক দলটি নিজের স্বার্থকে নাগরিক স্বার্থের উপর স্থান দেয়।

কিন্তু, তবুও একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে সোভিয়েট বিচারব্যবস্থা যথেষ্ট পরিমাণে গণতান্ত্রিক। সোভিয়েট বিচারালয়ের অধিকর্তাগণ কখনই জনমতকে উপেক্ষা করিতে পারেন না। তাহাছাড়া, নাগরিক-বিচারপতিগণ জনমতেরই প্রতিনিধিত্ব করেন। অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশগুলির আদালতে বিচার পদ্ধতির যে আনুষ্ঠানিক জটিলতা আমরা দেখিতে পাই, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের আদালতগুলিতে তাহা দেখা যায় না। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিচার পদ্ধতি বিশেষ সরল ও জনসাধারণের বোধগম্য। এই বিচার পদ্ধতি বিভিন্ন অপরাধের সামাজিক কারণ অনুসন্ধান করে এবং ইহার সামাজিক প্রতিবিধানের চেষ্টা করে।

সংক্ষিপ্তসার

১। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে আমরা একটি রাষ্ট্রপতিমণ্ডলী দেখিতে পাই; ইহাকে প্রেসিডিয়াম বলে। প্রেসিডিয়ামের সদস্য সংখ্যা হইতেছে তেত্রিশ তাহারা সুপ্রীম সোভিয়েটের উভ কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে চারি বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন।

প্রেসিডিয়াম বৎসরে দুইবার সুপ্রীম সোভিয়েটের অধিবেশন আহ্বান করে এবং সুপ্রীম সোভিয়েটের উভয় কক্ষের মধ্যে মতভেদ হইলে ইহা ভাংগিয়া দিতে পারে। প্রেসিডিয়াম সমগ্র সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের আইনের ব্যাখ্যা করিতে পারে। এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী আদেশ (decree) জারী করিতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীপরিষদ অথবা ইউনিয়ন রিপাবলিকগুলির মন্ত্রীপরিষদের কোনও সিদ্ধান্ত যদি সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের কোনও আইনের পরিপন্থী হয় তবে তাহা বাতিল করিয়া দিবার অধিকার প্রেসিডিয়ামের আছে।

২। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রীপরিষদই হইল শাসন পরিচালনার প্রকৃত সংস্থা। ইহা সুপ্রীম সোভিয়েট কর্তৃক নিযুক্ত হয় এবং সুপ্রীম সোভিয়েটের নিকট ও ইহার অধিবেশন মুলতুবী থাকাকালে প্রেসিডিয়ামের নিকট কাজের

জন্য দায়ী থাকে। মন্ত্রীপরিষদ কর্তৃক অবলম্বিত নীতি এবং ইহার আদেশ প্রচলিত আইনের ভিত্তি হিসাবে পরিগণিত হয়। শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে দুই জাতীয় মন্ত্রীপরিষদের দপ্তর দেখা যায়: যথা, (১) সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের দপ্তরসমূহ ও (২) ইউনিয়ন রিপাবলিকের মন্ত্রী দপ্তরসমূহ।

৩। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সংস্থা হইতেছে সুপ্রীম সোভিয়েট। ইহার দুইটি কক্ষ আছে, একটির নাম যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েট ও অপরটির নাম জাতিসমূহের সোভিয়েট। সুপ্রীম সোভিয়েটের কার্যকাল চারি বৎসরের জন্য; তবে উভর কক্ষের মধ্যে মতবিরোধ হওয়ার ফলে চারি বৎসরের পূর্বেই প্রেসিডিয়াম উহা ভাংগিয়া দিতে পারে। সুপ্রীম সোভিয়েটের উভয় কক্ষকেই আইন প্রণয়নের সমান ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। সুপ্রীম সোভিয়েটেরই একমাত্র অধিকার আছে শাসনতন্ত্র সংশোধন করিবার। কিন্তু, সুপ্রীম সোভিয়েটের অধিবেশন ঘন ঘন হয় না।

৪। সোভিয়েট বিচার বিভাগের উদ্দেশ্য হইল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ও আইনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা। সুপ্রীম কোর্ট হইতে জনগণের আদালত পর্যন্ত সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সমুদয় আদালতের বিচারপতিগণ আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হন। বিচারকগণ যথেষ্ট পরিমাণে জনমত কর্তৃক প্রভাবিত হন। সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রধান আদালত হইল সুপ্রীম কোর্ট। ইহার নীচে হইল আঞ্চলিক আদালত। আঞ্চলিক আদালতের নীচে আছে জনগণের আদালত। তাহাদের সাহায্য করিবার জন্য দুইজন এ্যাসেসর থাকেন।

Exercises

1. Discuss the position and functions of the Presidium in the constitutional system of the U. S. S. R. Is it an executive or a legislative body? Give reasons for your answer.

(১৩ —৩২ পৃষ্ঠা)

2. Give in brief the composition and functions of the Council of ministers of the U. S. S. R. What is the distinction between the all-union ministers and the Union Republican ministers of the U. S. S. R.? (১৩২—৩৭ পৃষ্ঠা)

3. Discuss in brief the composition and functions of the Supreme Soviet of the U. S. S R. (১২৭—৩০ পৃষ্ঠা)

4. Give a brief account of the constitution and functions of the Council of ministers in the Soviet Constitution.

(C. U. B. A. Part. I. 1962)

(১৩২—৩৪ পৃষ্ঠা)

5. Give an outline of the Soviet Judicial System.

(১৩৮—৩৯ পৃষ্ঠা)

চতুর্দশ অধ্যায়

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে দলব্যবস্থা
(Party System in the U. S. S. R.)

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের একদলীয় শাসনব্যবস্থা (One party rule in the U. S. S. R.)

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের ১২৬ নম্বর ধারায় কমিউনিস্ট দল শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে; কমিউনিস্ট দল নিজেকে মেহনতী জনগণের বিশেষতঃ, শোষিত শ্রমিকশ্রেণীর (Proletariat) দল বলিয়া মনে করে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে অন্য কোন রাজনৈতিক দল নাই। নাগরিকগণেরও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অন্য কোন রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার নাই। রাষ্ট্রের স্বার্থ অনুযায়ী, শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী একটিমাত্র রাজনৈতিক দল আছে; তাহা হইতেছে কমিউনিস্ট দল।

কোনও রাষ্ট্রে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকিলে গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য কখনই সিদ্ধ হয় না। গণতন্ত্রে প্রত্যেকেরই নিজস্ব মতামত প্রকাশ করিবার এবং একমতাবলম্বীদের রাজনৈতিক দল সংগঠন করিবার অধিকার থাকে। ইংলণ্ড, আমেরিকা, ভারত, প্রভৃতি গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে আমরা সরকারবিরোধী দল দেখিতে পাই। কিন্তু, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে আমরা কমিউনিস্ট সরকারের কোন বিরোধী দল দেখিতে পাই না। অর্থাৎ, কমিউনিস্ট দলই সেখানে নিজের খেয়াল খুশীমত সরকার পরিচালনা করে; জনগণের কোন ক্ষমতা নাই দলের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করিবার। ইহা গণতন্ত্রসম্মত নয়, প্রকৃত দলীয় ব্যবস্থাও নয়। প্রকৃত দলীয় ব্যবস্থায় একদল সরকার গঠন করে এবং অন্যান্য দলগুলি প্রয়োজন হইলে সরকারী দলের সমালোচনা করে অথবা ইহার সহিত সহযোগিতা করে। কেননা, জাতীয় প্রগতি সাধন করাই সবগুলি রাজনৈতিক দলের প্রথম উদ্দেশ্য। বিরোধী দলগুলির সমালোচনা গঠনমূলক হইলে সরকারেরই উপকার হয়। কেননা, জনমতের মর্যাদা রাখিবার জন্য সরকার নিজের নীতির যথোপযুক্ত সংশোধন করিতে পারে। বিরোধীদলগুলিও সর্বদাই বিকল্প সরকার গঠন করিবার জন্য প্রস্তুত থাকে। দলীয় শাসন ব্যবস্থার ইহাই বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে আমরা মাত্র একটি রাজনৈতিক দল দেখিতে পাই যাহা সমুদয়

শাসনব্যবস্থার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। প্রকৃত গণতন্ত্র এই জাতীয় শাসনব্যবস্থায় থাকে কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে কমিউনিস্ট দলের সংগঠন (Organisation of the Communist Party in the U. S. S. R.) :

কমিউনিস্ট দলের সর্বোচ্চ সংস্থা হইতেছে পার্টি কংগ্রেস (Party Congress) ; প্রতি চারি বৎসরে ইহার অন্ততঃ একবার অধিবেশন হয়। দলের কর্মসূচী প্রণয়ন করিয়া অথবা কর্মসূচীর প্রয়োজনীয় সংশোধন করিয়া পার্টিকংগ্রেস কেন্দ্রীয় কমিটি (Central Committee) ও পলিটব্যুরো (Politbureau) নির্বাচিত করে। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যসংখ্যা ৭০ জন এবং পলিটব্যুরোর সদস্যসংখ্যা ১০ হইতে ১৫ জন। দলের সংগঠন কাজ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি ১০ জন সদস্য লইয়া আরও একটি সংস্থা গঠন করে। ইহাকে অর্গব্যুরো (Orgbureau or organisation bureau) বলে। তাহা ছাড়া, চারিজন কর্মসচিবের (Secretaries) একটি দপ্তরখানা আছে। প্রধান কর্মসচিবই (First Secretary) দলের নেতা। কমিউনিস্ট দল প্রতিটি অঞ্চল শহর ও জেলায় সংগঠিত। সর্বত্রই দলীয় কনফারেন্স, কমিটি প্রভৃতি সংগঠিত হইয়াছে। কিন্তু, এই দলের মূল ভিত্তি হইতেছে প্রাথমিক দলীয় সংস্থাগুলি (Primary party organisations)।

সোভিয়েট শাসনব্যবস্থায় একদলীয় কর্তৃত্ব অথবা কমিউনিস্ট দলের ভূমিকা (One Party rule or the role of the Communist Party in the Soviet Constitutional System) :

সমাজতন্ত্রের মূল কথাই হইতেছে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব (Dictatorship of the working-class) প্রতিষ্ঠা করা। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে কমিউনিস্ট দল শ্রমিকশ্রেণীরই দল বলিয়া বিবেচিত হয়। সুতরাং কমিউনিস্ট দলের একনায়কত্ব বলিতে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিকশ্রেণীকেরই একনায়কত্ব বুঝায়। সরকার পরিচালনার এবং দলের কর্মসূচীকে সরকার কর্তৃক রূপায়িত করিবার যাবতীয় সিদ্ধান্ত কমিউনিস্ট দলের পলিটব্যুরো কর্তৃক গৃহীত হয়। সুপ্রীম সোভিয়েট এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কাজ হইল সেই সিদ্ধান্তগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করা। প্রেসিডিয়াম আইনের ব্যাখ্যা করে অথবা সুপ্রীম সোভিয়েটের অধিবেশন বন্ধ থাকাকালীন অবস্থায় আদেশ (decree) জারী করে বটে, কিন্তু এই কাজগুলি প্রকৃতপক্ষে দলের পলিটব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সুপ্রীম সোভিয়েটের অনুকরণে দলের অভ্যন্তরেও কেন্দ্রীয় কমিটি আছে, প্রেসিডিয়ামের অনুকরণে দলের অভ্যন্তরেও পলিটব্যুরো

আছে এবং মন্ত্রীপরিষদের অনুকরণে দলের অভ্যন্তরেও অর্গব্যুরো (Orgbureau) আছে। সুতরাং সরকার যেভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, রাজনৈতিক দলটিও সেইভাবেই নিয়ন্ত্রিত হয়, অথচ রাজনৈতিক দলটিই সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে। যখন দলের প্রধান কর্মসচিব যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন (যেমন পূর্বে স্ট্যালিন হইয়াছিলেন এবং বর্তমানে ক্রুশ্চেভ হইয়াছেন), তখন সমগ্র শাসনব্যবস্থা রাজনৈতিক দল কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এবং রিপাবলিক অথবা আঞ্চলিক সরকারগুলি কমিউনিস্ট দলের হাতে পুতুলমাত্র। সুপ্রীম সোভয়েটের যাহা কিছু ক্ষমতা তাহাও একমাত্র রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটি নিয়ন্ত্রিত করে। শুধু তাহাই নহে, দেশদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচারের সময় রাজনৈতিক দলটি বিচারবিভাগকেও নিয়ন্ত্রিত করে। "দেশদ্রোহিতা"র সংজ্ঞা হইল কমিউনিস্ট দলের স্বার্থ-বিরুদ্ধ কাজ করা। কেননা, কমিউনিস্ট দলই হইল শাসনতন্ত্র অনুযায়ী মেহনতী জনতা ও শ্রমিক শ্রেণীর একমাত্র রাজনৈতিক দল। কমিউনিস্ট দলের এবং সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার সমর্থকগণের মতে কমিউনিস্ট দলের গঠন গণতন্ত্রসম্মত; কেনন', গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীয়করণই (democratic centralization) হইল কমিউনিস্ট দল গঠনের ভিত্তি। তাঁহাদের মতে পার্টি কংগ্রেসে দলের সদস্যদের অধিকার আছে স্বাধীনভাবে দলীয় নীতিগুলির আলোচনা করার, তাহা ছাড়া কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচন করেন দলের সদস্যগণ। কমিউনিস্ট দলের কাজ খুব গুরুত্বপূর্ণ বলিয়াই কেহ যদি দলীয় সদস্য হইতে চাহে, তবে তাহাকে প্রার্থী সদস্য হিসাবে কাজ করিতে হয়।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে গণতন্ত্রের উপাদান (Elements of democracy in the U. S. S. R.): সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে আমরা একদলীয় শাসনব্যবস্থা দেখিতে পাই। একদলীয় শাসনব্যবস্থায় সরকারকে সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয় না এবং ইহা যাহা কিছু করে, জনসাধারণকে তাহাই নির্বিবাদে মানিয়া চলিতে হয়। সুতরাং এই প্রকার শাসনব্যবস্থাকে আমরা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বলিতে পারি না। কিন্তু, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার এবং কমিউনিস্ট দলের সমর্থকগণের মতে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে কিছু পরিমাণে গণতন্ত্রের উপাদান দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, তাঁহাদের মতে, কমিউনিস্ট দলের সংগঠন গণতান্ত্রিক। কেমনা, দলের নিম্নতম সংস্থা হইতে উচ্চতম সংস্থা পর্যন্ত সর্বত্রই সদস্য নির্বাচনের অনুষ্ঠান করা হয় এবং সেই নির্বাচন গোপন ভোটের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়। তাহা ছাড়া, দলীয় নীতি সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে আলোচনা করিবার অধিকার দলীয় সদস্যদের আছে এবং অধিকসংখ্যক সদস্য

একদলীয় শাসনব্যবস্থায় গণতন্ত্রের অভাব:

যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাহাই সকলকে মানিয়া চলিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, সুপ্রীম সোভিয়েটের নির্বাচনে ১৮ বৎসর বয়স্ক যে কোন নাগরিক ভোট প্রদান করিতে পারে এবং ২৩ বৎসর বয়স্ক যে কোন নাগরিক সুপ্রীম সোভিয়েটের নির্বাচনে নির্বাচন-প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াইতে পারে। তৃতীয়তঃ, সুপ্রীম সোভিয়েটের জাতিসমূহের সোভিয়েটে (The Soviet of the Nationalities) যুক্তরাষ্ট্রের সব জায়গা হইতেই প্রতিনিধি থাকে। প্রত্যেক ইউনিয়ন রিপাবলিক হইতে ২৫ জন, প্রত্যেক স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন রিপাবলিক হইতে ১১ জন, প্রত্যেক স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন অঞ্চল হইতে ৫ জন এবং প্রত্যেক জাতীয় এলাকা হইতে ১ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবার ব্যবস্থা আছে বলিয়া সুপ্রীম সোভিয়েটের নাগরিকদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব সমানভাবে হয়। চতুর্থতঃ, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে বিচারব্যবস্থা খুবই গণতান্ত্রিক। যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট হইতে আরম্ভ করিয়া জনগণের আদালত পর্যন্ত সব বিচারপতিগণই আইনসভা কর্তৃক অথবা নিম্নস্তরের জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। শুধু তাহাই নহে, জনগণের আদালতে বিচারপতিগণ দুইজন এ্যাসেসর অথবা নাগরিক বিচারপতির সাহায্য লাভ করেন। নাগরিক-বিচারপতিগণ জনগণের আস্থাভাজন নাগরিকদের প্যানেল হইতে নির্বাচিত হন। এই ব্যবস্থা খুবই গণতান্ত্রিক সন্দেহ নাই। কেননা, এই ব্যবস্থায় নাগরিক বিচারপতিগণ জনমত কর্তৃক পরিচালিত হন।

কিন্তু, পরিশেষে আমাদের স্বীকার করিতে হইবে যে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে

বিচার ব্যবস্থা আংশিকভাবে গণতন্ত্রসম্মত

শুধু বিচারব্যবস্থাই আংশিকভাবে গণতান্ত্রিক। সরকারের অন্যান্য বিভাগে গণতন্ত্রের মর্যাদা খুব কমই রক্ষিত হইয়াছে। কেননা, যেখানে শুধু একটিমাত্র রাজনৈতিক দল, সেখানে দলের কাঠামো যতই গণতান্ত্রিক হউক না কেন, সামগ্রিকভাবে গণতন্ত্রের মর্যাদা একদলীয় শাসনব্যবস্থায় রক্ষিত হয় না। যুক্তরাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থা আংশিকভাবে গণতান্ত্রিক সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাও সম্পূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক নয়। কেননা, রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অপরাধীগণের বিচারের সময় নাগরিক-বিচারপতিগণের কোন ভূমিকা নাই। রাষ্ট্রদ্রোহিতার সংজ্ঞা কি হইবে, তাহা শুধু রাজনৈতিক দলই স্থির করে ; কেননা, কোন, নাগরিকের কোন কাজ যদি কমিউনিস্ট দলের তথা সরকারের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়, তবে তাহাই রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলিয়া বিবেচিত হয়। সেক্ষেত্রে বিচার-ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক থাকে না ; কেননা, ইহা তখন রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলিয়া আসে। তাহা ছাড়া, নাগরিক-বিচারপতিগণ কখনও আইনের ব্যাখ্যা করিতে পারেন না, প্রেসিডিয়াম কর্তৃক প্রদত্ত আইনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আদালতগুলিকে বিচার-বিভাগীয় কাজ নির্বাহ করিতে হয়। প্রেসিডিয়াম

কর্তৃক প্রদত্ত আইনের ব্যাখ্যা মূলতঃ কমিউনিস্ট দলের পলিটব্যুরো কর্তৃক প্রদত্ত আইনের ব্যাখ্যা। সুতরাং, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে গণতন্ত্র কতটা কার্যকরী হইয়াছে, সেই বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

Exercises

1. Discuss the role of the Communist Party in the Soviet System of Government. (C. U. B. A. Part. I 1962.)
(১৪১—৪২ পৃষ্ঠা)

2. "The One Party System (in the U. S. S. R.) is not strictly speaking a type of party government at all."
Examine the Statement.
(১৪০—৪২ পৃষ্ঠা)

3. Do you find any element of democracy in Soviet Constitutional System ? (১৪২--৪৩ পৃষ্ঠা)

4. Give a brief estimate of the Communist Party in the Soviet Constitutional System. Is there any place of democracy in the U. S. S. R. ? (১৪২—৪৪ পৃষ্ঠা)

চতুর্থ খণ্ড ঃ সুইজারল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থা
(The Constitutional System of Switzerland)

পঞ্চদশ অধ্যায় | সুইজারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য
Features of Swiss Constitution

সুইজারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র ইহার প্রকৃত গণতান্ত্রিক রূপের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জাতিগত, ধর্মগত ও ভাষাগত বিভেদ থাকা সত্ত্বেও সুইজারল্যাণ্ডে একই ঐতিহ্যে জনসাধারণ অনুপ্রাণিত হওয়ায় জাতীয় চেতনা খুবই উন্নত। সুইজারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রে এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলি অন্যান্য শাসনতন্ত্রে আমরা দেখিতে পাই না। নিম্নে সুইজারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচিত হইতেছে :—

শাসনতন্ত্রের দিক হইতে রাষ্ট্র সমবায়; কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে ইহা যুক্তরাষ্ট্র

প্রথমতঃ, শাসনতন্ত্রের দিক হইতে সুইজারল্যাণ্ড একটি রাষ্ট্র-সমবায় (Confederation)। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি যুক্তরাষ্ট্র। অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রগুলির ন্যায় মূলরাষ্ট্রগুলির কোন বিশেষ সভা (Convention) অথবা কোন গণরিষদ সুইজারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র রচনা করে নাই। দীর্ঘদিনের বিবর্তনের ফলে সুইজারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র বর্তমান রূপ ধারণ করিয়াছে। পরস্পর বিরোধী স্বার্থ থাকিলেও যুক্তরাষ্ট্র যে জাতীয় ঐক্য এবং রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের মধ্যে মিলন ঘটাইবার একটি প্রয়াস ("Federalism is a political contrivance for a reconciliation between national unity and state sovereignty"), তাহা সুইজারল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে প্রমাণিত হইয়াছে। সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে ২২টি ক্যাণ্টন (cantons) লইয়া; এই ক্যাণ্টনগুলির মধ্যে ১৯টি সম্পূর্ণ ক্যাণ্টন এবং ৬টি অর্ধ-ক্যাণ্টন (half-cantons)। প্রত্যেকটি ক্যাণ্টনের আলাদা শাসনতন্ত্র আছে। তবে এই শাসনতন্ত্রগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের অধীন।

দ্বিতীয়তঃ, শাসনতন্ত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে যতটুকু ক্ষমতা দেওয়া

হইয়াছে, ইহা ততটুকু ক্ষমতাই ভোগ করে। বাকী ক্ষমতাগুলি (residuary powers) ক্যান্টনগুলি ভোগ করিয়া থাকে। ক্যান্টনগুলির জন্য তিনটি বিশেষ বিধান আছে। যথা, (১) ক্যান্টনগুলির আলাদা প্রজাতন্ত্রী সরকার থাকিবে, (২) ক্যান্টনগুলি কর্তৃক প্রণীত নিজেদের শাসনতন্ত্রের সংশোধন করিতে হইলে তাহা গণভোটের সাহায্যে করিতে হইবে; এবং (৩) যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যায় এইরূপ কোন বিধান উক্ত শাসনতন্ত্রে থাকিবে না। আমেরিকার শাসনতন্ত্রের ন্যায় সুইস্ শাসনতন্ত্র শুধু সরকারকে ক্ষমতা প্রদান করে নাই, ইহা যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং ক্যান্টন-সরকারগুলির উপর কতিপয় নিষেধাজ্ঞাও আরোপ করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সরকার নাগরিকদের ধর্মের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ, অথবা ধর্মের ভিত্তিতে বিবাহের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না।

ক্যান্টনগুলির আলাদা শাসনতন্ত্র

তৃতীয়তঃ, সুইজারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রে ক্ষমতা বণ্টনেরও একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। এমন অনেক বিষয় আছে, যেমন কৃষি, ক্যান্টনগুলির সন্ধি ও মৈত্রী, বিবাহ, মোটর, বাইসাইকেল ইত্যাদি, যেগুলির এক অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে এবং অপর অংশ ক্যান্টনগুলির হাতে অর্পিত হইয়াছে। সুইজারল্যাণ্ডে আমরা দেখিতে পাই আইন প্রণয়ন ক্ষমতার কেন্দ্রিকতা এবং শাসন ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের এক অপূর্ব সমাবেশ।

আইন প্রণয়ন ক্ষমতার কেন্দ্রিকতা এবং শাসনক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ

চতুর্থতঃ, সুইজারল্যাণ্ডে শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য স্বীকার করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, শাসনতন্ত্রটিও অনমনীয়। কিন্তু শাসনতন্ত্রের প্রধান্য স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনপরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইনের বৈধতা লইয়া প্রশ্ন তুলিতে পারে না; কেননা, উক্ত আদালত শাসনতন্ত্রের চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকর্তা অথবা রক্ষক নহে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত ক্যান্টনগুলির আইনের বৈধতা বিচার করিতে পারে যদি ত্রিশ হাজার নির্বাচক অথবা অন্ততঃ ৮টি ক্যান্টন দাবী করে, তবে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনকে জনসাধারণের অনুমোদনের জন্য পেশ করিতে হয়। শাসনতন্ত্র সংশোধন করিতে হইলে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা অথবা পঞ্চাশ হাজার নির্বাচক সংশোধনের প্রস্তাব করিতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই যদি সংশোধন প্রস্তাব আইন গৃহীত হইতে হইলে গণভোট কর্তৃক ইহা ভোট প্রদানকারীদের কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হয় অথবা অধিকসংখ্যক ক্যান্টনগুলি কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হয়। দেখা যাইতেছে, শাসনতন্ত্র সংশোধনের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় আইনসভা, ক্যান্টন এবং জনসাধারণ প্রত্যেকেরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য

পঞ্চমতঃ মার্কিন সিনেটের অনুকরণে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার উচ্চকক্ষে

প্রত্যেক ক্যান্টন হইতে দুইজন এবং প্রত্যেক অর্ধ-ক্যান্টন হইতে একজন করিয়া প্রতিনিধি পাঠাইবার ব্যবস্থা আছে। সুতরাং উচ্চতম আইনপরিষদ গঠনে ক্যান্টনগুলির স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু ক্যান্টনগুলি কোন্ পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচিত করিয়া পাঠাইবেন, সেই বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসৃত হয় না।

উচ্চকক্ষে ক্যান্টনগুলির সমপ্রতিনিধিত্ব

ষষ্ঠতঃ, সুইজারল্যাণ্ডেও শাসনতন্ত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন বিভাগ। রাষ্ট্রের শাসন বিভাগের সাতজন সদস্য মিলিতভাবে দেশের শাসনকর্তা। তাঁহাদের মধ্য হইতে এক বৎসরের জন্য একজন রাষ্ট্রপতি এবং একজন উপ-রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হন। রাষ্ট্রপতির নামে সরকার যাহা কিছু করে, তাহা এই সাতজনের সম্মিলিতভাবে মতামতের উপর নির্ভর করে। বহু শাসনকর্তার (plural executive) নীতিতেই সরকারের শাসন বিভাগ পরিচালিত হয়। মূলতঃ সুইজারল্যাণ্ডের শাসন বিভাগে আমরা রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থা এবং পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থার বিচিত্র সংমিশ্রণ দেখিতে পাই। অধ্যাপক গার্ণারের ভাষায় "A system of Government which falls in a class by itself, which differs fundamentally from the Presidential and the Cabinet types, but which combines the features of both, is that of Switzerland."

বহুশাসনকর্তা

সপ্তমতঃ, সুইজারল্যাণ্ডে সরকারের ক্ষমতাগুলির স্বাতন্ত্র্যবিধান (Separation of Powers) করা হয় নাই। সাতজন শাসনকর্তা যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনপরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হন। বিচার বিভাগও স্বাধীন হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের বিচারপতিগণ যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হন।

ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান হয় নাই

অষ্টমতঃ, যদিও সুইজারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রের 'নাগরিকতার' কোন সাধারণ সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই, তবুও সুইজারল্যাণ্ডে একটি ক্যান্টনের নাগরিক সুইস্ প্রজাতন্ত্রেরও নাগরিকদের ব্যক্তিগত অধিকারগুলি শাসনতন্ত্রে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। শাসনতন্ত্র অনুযায়ী নাগরিকগণ সকলেই আইনের চোখে সমান, সকলেরই ধর্ম, চিন্তা এবং বাক্ স্বাধীনতা আছে।

সর্বশেষে, সুইজারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ইহার প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের (Direct Democracy) ব্যবস্থা। ক্যান্টনগুলিকে যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল করা হইয়াছে,—অপরদিকে ক্যান্টনগুলিকে শক্তিশালী রাখিবার জন্য নাগরিকদের গণ-উদ্যোগ (Initiative), গণভোট (Referendum) এবং প্রতিনিধি প্রত্যাগমনের (Recall) অধিকার দেওয়া

হইয়াছে। জনসাধারণ গণ-উদ্যোগের মাধ্যমে নূতন আইন প্রণয়নের প্রস্তাব অথবা শাসনতন্ত্র সংশোধনের প্রস্তাব করিতে পারে। যেমন, ত্রিশ হাজার নির্বাচক শাসনতন্ত্র সংশোধনের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারে। তাহা ছাড়া, শাসনতন্ত্র সংশোধনের ক্ষেত্রে অথবা গণ-উদ্যোগ উত্থাপিত আইন-প্রণয়ণের প্রস্তাবে জনসাধারণের মতামত স্পষ্ট জানিবার জন্য গণভোটের অনুষ্ঠান হয়। শুধু তাহাই নহে, যদি আইনপরিষদে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ নির্বাচনকালে জনসাধারণের নিকট প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ না করিতে পারে, তাহাদের আইনপরিষদের সদস্যপদ হইতে ফিরাইয়া আনার বা অপসারণ করিবার (recall) অধিকার জনসাধারণের আছে। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের সুফলগুলি পাইবার জন্য এই রকম ব্যবস্থা পৃথিবীর অন্য কোন শাসনতন্ত্রে ব্যাপকভাবে নাই।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র

সংক্ষিপ্তসার

শাসনতন্ত্রের দিক হইতে সুইজারল্যাণ্ড একটি রাষ্ট্র সমবায়; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা একটি যুক্তরাষ্ট্র। দ্বিতীয়তঃ, সুইজারল্যাণ্ডের প্রতিটি ক্যাণ্টনের আলাদা শাসনতন্ত্র আছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রে লিখিত নাই এই রকম ক্ষমতাগুলি ক্যাণ্টনগুলি ভোগ করিয়া থাকে। তৃতীয়তঃ, সুইজারল্যাণ্ডে আমরা আইন প্রণয়ন ক্ষমতার কেন্দ্রীকতা, শাসন ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য দেখিতে পাই। চতুর্থতঃ, সুইজারল্যাণ্ডে আইনসভার উচ্চকক্ষে ক্যাণ্টনগুলির সম প্রতিনিধিত্ব থাকে। পঞ্চমতঃ, সুইজারল্যাণ্ডে আমরা বহু-শাসন-কর্তা বা Plural executive দেখিতে পাই। ষষ্ঠতঃ, সুইজারল্যাণ্ডে সরকারের ক্ষমতাগুলির স্বাতন্ত্র্যবিধান করা হয় হয় নাই। সর্বশেষে সুইজারল্যণ্ডের শাসনতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ইহার প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের ব্যবস্থা। নাগরিকদের গণউদ্যোগ, গণভোট ও প্রতিনিধি প্রত্যাগমনের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। সুইজারল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ইহা একক এবং অনন্য; অন্যান্য দেশের শাসনতন্ত্রের সহিত ইহার মূলগত পার্থক্য আছে।

Exercises

1. Discuss the peculiar features of the Swiss Constitution. (১৪৫—৪৮ পৃষ্ঠা)

2. State the main features of the Swiss System of Government. (১৪৫—৪৮ পৃষ্ঠা)

3. "The *Swiss* Constitution is unique."—Discuss the statement. (১৪৫—৪৮ পৃষ্ঠা)

ষোড়শ অধ্যায়

সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগ (Different Organs of the Federal Government of Switzerland)

সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনপরিষদ (Federal Council of Switzerland.)

সুইজারল্যাণ্ডের শাসন বিভাগের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে এই বিভাগের সমুদয় ক্ষমতা একজন রাষ্ট্র-প্রধানের হাতে ন্যস্ত না করিয়া সাতজন শাসনকর্তার হাতে ন্যস্ত করা হইয়াছে। এই সাতজন শাসনকর্তা চারি বৎসরের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার দুইকক্ষ কর্তৃক নির্বাচিত হন। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার সদস্যগণও শাসনকর্তার নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াইতে পারেন। কিন্তু, তিনি যদি অন্যতম শাসনকর্তা নির্বাচিত হন, তবে তাঁহাকে আইনসভার সদস্যপদ ছাড়িতে হয়। শাসন-পরিষদের সদস্যগণকে শাসনতন্ত্র লংঘন করা অথবা কোন অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত চারি বৎসরের মধ্যে পদচ্যুত করা যায় না। সুইজারল্যাণ্ডের শাসন পরিষদের সদস্যগণ পুনর্নির্বাচনের জন্য প্রার্থী হইতে পারেন এবং তাঁহারা সাধারণতঃ পুনর্নির্বাচিত হন। শাসনতন্ত্র অনুযায়ী জাতীয় সভার (National Assembly) বা যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার যে কোন কক্ষের সদস্য হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন যে কোন নাগরিকই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পরিষদের সদস্য নির্বাচনে প্রার্থী হইতে পারেন। কিন্তু, সুইজারল্যাণ্ডে ইহা প্রায় একটি প্রথাগত বিধান দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে সাধারণতঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার সদস্যদের মধ্য হইতেই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পরিষদের সদস্যগণ নিজেদের পদে অধিষ্ঠিত হইবার পর আর আইনসভার সদস্য থাকিতে পারেন না।

শাসনকর্তাগণ যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পরিষদের সাতজন সদস্য হইতে প্রত্যেক বৎসর একজন সভাপতি এবং একজন সহ-সভাপতি যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা কর্তৃক নিযুক্ত হন।

সাধারণতঃ একবৎসর যিনি সহ-সভাপতিথাকেন, পরবর্তী বৎসরের জন্য তিনিই সভাপতি নিযুক্ত হন। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পরিষদের সভাপতি রাষ্ট্রপতির মর্যাদা ভোগ করেন, কিন্তু তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি অথবা ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর ন্যায় শাসনক্ষমতা ভোগ করেন না। তিনি জাতির প্রধান কার্যবাহক নহেন,—জাতির প্রধান কার্যবাহক হইতেছেন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনপরিষদের সাতজন শাসনকর্তা সম্মিলিতভাবে। সভাপতি যাহা কিছু ক্ষমতা ভোগ করেন তাহা শাসন পরিষদের সদস্য হিসাবেই ভোগ করেন। তিনি শুধু শাসন পরিষদের সভাপতিত্ব করেন এবং যদি কখনও প্রয়োজন হয় তবে কোন ব্যাপারে তাঁহার নির্ণায়ক-ভোট (casting vote) প্রদান করেন। কিন্তু, শাসন পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের উপর সভাপতি কোন প্রকার কর্তৃত্ব করিতে পারেন না।

শাসন পরিষদের সাতজন সদস্য

সুইজারল্যাণ্ডের শাসন পরিষদের প্রথম ও প্রধান কাজ হইল, দেশের শান্তি, আইন ও শৃংখলা ইত্যাদি বজায় রাখা। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করা, ক্যাণ্টনগুলির শাসনতন্ত্র সংরক্ষণ করা, ক্যাণ্টনগুলির বিভিন্ন চুক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখা, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা ও বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করা, আইনসভার নিকট আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থা সম্পর্কে বিবরণী প্রদান করা এবং সর্বোপরি দেশের নিরপেক্ষতা বজায় রাখাই শাসন পরিষদের কাজ।

শাসনপরিষদের কিছুটা আইনপ্রণয়নসংক্রান্ত ক্ষমতাও (legislative powers) আছে। শাসনপরিষদের সদস্যগণ যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার সদস্য না হইলেও আইনসভার অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতে পারেন, ইহার বিতর্কে অংশগ্রহণ করিতে পারেন এবং আইন প্রণয়নের জন্য বিল উত্থাপন করিতে পারেন। ইহা ব্যতীত যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন আইন কার্যকরী করিতে যাইয়া শাসন পরিষদ বিভিন্ন ধরণের নিয়মকানুনেরও (Regulations) প্রবর্তন করিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে, সুইজারল্যাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা কর্তৃক প্রণীত অধিকাংশ আইনের খসড়া শাসনপরিষদই তৈয়ারী করিয়া থাকে।

আইন প্রণয়নসংক্রান্ত ক্ষমতা

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনপরিষদের কতিপয় বিচারবিভাগীয় ক্ষমতাও (Judicial powers) আছে। যুক্তরাষ্ট্রের শাসনবিভাগের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জনসাধারণ শাসনপরিষদের নিকট আপীল করিতে পারে। তাহাছাড়া, ক্যাণ্টনগুলির নির্বাচন, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্যমূলক আচরণ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে যদি কোন ক্যাণ্টন সরকার নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্যমূলক আলোচনা করে, তবে

বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা

নাগরিকগণ ক্যাণ্টনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শাসনপরিষদের নিকট আপীল করিতে পারে।

বর্তমানে সুইজারল্যাণ্ডে শাসনপরিষদের ক্ষমতা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। যুদ্ধোত্তর কালে দেশের নানাবিধ সমস্যার সমাধানের জন্যই যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা ক্রমেই শাসনপরিষদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিতেছে। সুইজারল্যাণ্ডের শাসনপরিষদের বৈশিষ্ট্যগুলি এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার সহিত ইহার সম্পর্ক আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, সুইজারল্যাণ্ডে রাষ্ট্রপরিচালিত শাসনব্যবস্থা ও পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থার একটি বিচিত্র সমাবেশ ঘটিয়াছে।

সুইজারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রের শাসনবিভাগের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করিলে আমরা এমন কতিপয় জিনিষ দেখিতে পাই; যাহা অন্য কোন শাসনতন্ত্রে নাই। সাতজন শাসনকর্তা লইয়া সম্মিলিতভাবে উচ্চতম শাসন পরিষদ গঠন অন্যান্য দেশে আমরা দেখিতে পাই না। সুইজারল্যাণ্ডের কেন্দ্রীয় সরকার আমরা রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার এবং পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থার বিচিত্র সমাবেশ দেখিতে পাই। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের নিয়ম অনুযায়ী সুইজারল্যাণ্ডের শাসনবিভাগের প্রধান হইতেছেন রাষ্ট্রপতি মণ্ডলী। লক্ষ্য করিবার বিষয়, ভারত, মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি প্রজাতন্ত্রের ন্যায় সুইজারল্যাণ্ডে শুধু একজন রাষ্ট্রপতি নাই। সুইজারল্যণ্ড একটি রাষ্ট্রপতি শাসিত রাষ্ট্র হইলেও সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ দেখিতে পাই না। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে সাধারণতঃ শাসন বিভাগ ও আইন-প্রণয়ন বিভাগের মধ্যে স্বতন্ত্রীকরণ করা হয়, এবং রাষ্ট্রপতি আইন সভার সদস্য হন না অথবা আইন সভার নিকট নিজের কাজের জন্য দায়ী থাকেন না কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রে এই দুইটি বিধান আমরা সম্পূর্ণভাবে দেখিতে পাই না। আবার যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা থাকে; কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডের বিচার-বিভাগ আইনসভার উপর নির্ভরশীল। কাঠামোর দিক হইতে সুইজারল্যাণ্ডে রাষ্ট্রপতিচালিত যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠিত হইলেও, একজন নির্দিষ্ট রাষ্ট্রপতি নিজের দেশের শাসনকাজ পরিচালনা করেন না; সাতজন শাসনকর্তা সম্মিলিতভাবে দেশের শাসনকাজ পরিচালনা করেন। আবার রাষ্ট্রপতি চালিত সরকারের (Presidential Government) নিয়মানুযায়ী ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণও করা হয় নাই। শাসন বিভাগীয় পরিষদের আইন প্রণয়নের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সভায় বিল উত্থাপনের অধিকার আছে। শাসনকর্তাগণ কোন বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলী (electoral college) কর্তৃক নির্বাচিত হন না। তাঁহারা নির্বাচিত হন যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা কর্তৃক অথচ তাঁহারা আইনসভার সদস্য নহেন।

মূলতঃ সুইজারল্যাণ্ডে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার নাই। বিশেষতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কর্তৃক প্রণীত আইনের বৈধতা লইয়া প্রশ্ন করিবার অধিকার সম্মিলিতিভাবে ত্রিশ হাজার নির্বাচক অথবা ৮টি ক্যাণ্টনের আছে। রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসনে বিচার বিভাগই শাসনতন্ত্রের রক্ষক এবং চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকারের ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডের সেই ব্যবস্থা নাই। বিচারপতিগণকে নিযুক্ত করার অধিকারও শাসনকর্তাদের নাই। বিচারপতিগণ নিযুক্ত হন যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা কর্তৃক।

আবার, সম্পূর্ণভাবে পার্লামেণ্টারী শাসনও সুইজারল্যাণ্ডে নাই। পার্লামেণ্টারী সরকারের ন্যায় কোন মন্ত্রীসভা ইংলণ্ডে নাই। মন্ত্রীসভা চালিত সরকারের অথবা পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায় সাধারণতঃ আইনসভা সার্বভৌম আইন প্রণেতা (Sovereign Law-making Body) রূপে পরিচালিত হয়। কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডের আইনসভার ক্ষমতা জনগণের চূড়ান্ত ক্ষমতার দ্বারা সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত। আইনসভার সদস্যগণেরও শাসনকর্তা নির্বাচনে প্রার্থী হইবার অধিকার আছে। অপরপক্ষে সুইজারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রে আমরা এমন কতিপয় বিধান দেখিতে পাই যেগুলি শুধু পার্লামেণ্টারী সরকারেই দেখা যায়। শাসন পরিষদের সদস্যগণ দেশের আভ্যন্তরীণ ও বহিরাবস্থা সম্বন্ধে আইনসভায় রিপোর্ট পেশ করিতে পারে। পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায় আমরা এই জিনিষ দেখিতে পাই। তাহা ছাড়া, পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায় শাসন বিভাগের পরিচালকগণ (সাধারণতঃ মন্ত্রীসভা) নিজেদের কাজের জন্য আইন-সভার নিকট দায়ী থাকেন এবং তাঁহারা আইন সভার সদস্য থাকেন। পার্লামেণ্টারী শাসন ব্যবস্থার কিছু কিছু উপাদান আমরা সুইজারল্যাণ্ডে দেখিতে পাই। পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থার মন্ত্রীগণের ন্যায় সুইজারল্যাণ্ডের শাসনকর্তাগণ আইনসভার অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতে পারেন, বিতর্কে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন এবং আইন-প্রণয়নের জন্য বিল উত্থাপন করিতে পারেন। এইদিক হইতে বিচার করিলে সুইজারল্যাণ্ডে পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থার আংশিক পরিচয় দেখিতে পাওয়া যায়। আবার শাসনকর্তাগণ আইনসভার সদস্য নহেন এবং তাঁহারা আইনসভা কর্তৃক চার বৎসরের মধ্যে পদচ্যুত হইতে পারেন না এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত থাকেন, এইদিক হইতে বিচার করিলে সুইজারল্যাণ্ডে রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসনব্যবস্থার আংশিক পরিচয় পাওয়া যায়। যদি শাসকর্তাদের অনুসৃত নীতি যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা কর্তৃক সমর্থিত না হয়, তবুও শাসনকর্তাগণ নিজেদের চাকুরীর নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত পদত্যাগ করেন না। এইজন্যই বলা হয়, সুইজারল্যাণ্ডে রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসন ব্যবস্থার ও

রাষ্ট্রপতি চালিত শাসন ব্যবস্থা ও পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থার সংমিশ্রণ

পার্লামেণ্টারী শাসন ব্যবস্থার একটি অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ হইয়াছে। এই সংমিশ্রণের ফলে উভয় ধরণের শাসন ব্যবস্থারই গুণগুলি গৃহীত হইয়াছে ও দোষক্রটিগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে। আইনসভা শাসনকর্তাগণকে পদচ্যুত করিতে পারেন না বলিয়া সরকারের স্থায়িত্ব (stability) রক্ষিত হয়। অপরদিকে, যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভাকেও শাসন-কাজে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে, শাসন বিভাগের সহিত আইনসভার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনপরিষদ অথবা জাতীয় সভা (Federal Legislature of the National Assembly)—যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনপরিষদ দুইটি কক্ষ লইয়া গঠিত এবং এই দুইটিকে একত্রে জাতীয় সভা (The National Assembly) বলা হয়। জাতীয় সভার নিম্নকক্ষের নাম জাতীয় পরিষদ (The National Council) এবং উচ্চতর কক্ষের নাম রাজ্য পরিষদ (The Council of States। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের ন্যায় সুইজারল্যাণ্ডের রাজ্যপরিষদের মূলরাষ্ট্র বা ক্যাণ্টনগুলির সমান প্রতিনিধিত্বের

রাজ্যপরিষদের বৈশিষ্ট্য

ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ১৯টি ক্যাণ্টন হইতে ৩৮ জন প্রতিনিধি এবং ৬টি অর্ধ-ক্যাণ্টন হইতে ৬ জন প্রতিনিধি, মোট ৪৪ জন সভ্য লইয়া রাজ্যপরিষদ গঠিত। রাজ্যপরিষদে প্রতিনিধি মনোনয়ন করার পদ্ধতি সব ক্যাণ্টনগুলিতে একপ্রকার নহে। কোন ক্যাণ্টনের প্রতিনিধি কার্যকলাপের মেয়াদ হয়ত ৪ বৎসর, আবার কোন ক্যাণ্টনের জন্য ইহা ৩ বৎসর অথবা ১ বৎসর।

জাতীয় পরিষদ জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। প্রতি চব্বিশ হাজার ভোটারের জন্য একজন করিয়া সদস্য থাকেন এবং সমানুপাতিক ভোট পদ্ধতির (Proportional voting system) মাধ্যমে জনসাধারণ

জাতীয় পরিষদের বৈশিষ্ট্য

জাতীয় পরিষদের সদস্যদের নির্বাচিত করেন। প্রত্যেকটি ক্যাণ্টন হইতে অন্ততঃ একজন প্রতিনিধি আইনপরিষদের নিম্নকক্ষে থাকিবেনই। সুইজারল্যাণ্ডে স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার নাই। ২০ বৎসর বয়স্ক যে কোন নাগরিকই যদি ক্যাণ্টনের কোন আইন অনুযায়ী নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত না হন, তবে তিনি ভোটপ্রদানের অধিকার লাভ করেন। যাজকগণ কখনও জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইতে পারেন না।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন পরিষদের প্রত্যেক কক্ষেই সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন সভাপতি এবং একজন সহ-সভাপতি নির্বাচিত করেন। বিতর্ক কালে যদি কোন প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে সমানসংখ্যক ভোট প্রদত্ত হয়, তবে

সংশ্লিষ্ট কক্ষের সভাপতি তাঁহার নির্ণায়ক ভোট (casting vote) প্রদান করিতে পারেন।

স্থায়ী নির্দেশ কর্তৃক নির্দিষ্ট দিনে প্রতি বৎসর আইনপরিষদের দুই কক্ষ সাধারণ অধিবেশনে মিলিত হয়। তাহা ছাড়া, জাতীয় পরিষদের এক-চতুর্থাংশ সদস্যের অনুরোধ অথবা অন্ততঃ পাঁচটি ক্যান্টন কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনপরিষদ আইনপরিষদের অতিরিক্ত অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন। প্রত্যেক কক্ষের অধিবেশনেই বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের জন্য মোট সভ্যসংখ্যার অধিকাংশ সদস্যের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজনীয়। আইনপরিষদের মেয়াদ চার বৎসরের জন্য। সুইজারল্যাণ্ডের আইনপরিষদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইল, ক্যান্টনগুলির সরকারী কর্মচারীগণও নিম্নকক্ষের সদস্য হইতে পারেন।

যদিও উভয় কক্ষই শাসনসংক্রান্ত এবং বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা সমানভাবে ভোগ করে, তবুও কার্যক্ষেত্রে নিম্নকক্ষ উচ্চকক্ষ হইতে অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন। যদি কখনও উভয়কক্ষের মতে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয় তবে দুইকক্ষ হইতেই সমানসংখ্যক সদস্য লইয়া গঠিত একটি মীমাংসা কমিটির (Arbitration Committee) সাহায্যে ইহার মীমাংসার চেষ্টা করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনপরিষদের সভাপতি ও সহ-সভাপতি মনোনয়ন, যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের বিচারক নির্বাচন, অপরাধীদের প্রতি ক্ষমা দর্শন ইত্যাদি কাজের সময় উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশন হয়। অন্যান্য সময় দুইকক্ষের অধিবেশন আলাদাভাবে হয়।

সুইজারল্যাণ্ডে সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা হয় নাই বলিয়া আইনপরিষদ শাসন-বিভাগ ও বিচার-বিভাগ, উভয় বিভাগেরই কিছু না কিছু ক্ষমতা ভোগ করে। আইনপরিষদ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয়ে আইনপ্রণয়ন করিবার ক্ষমতা ভোগ করে। কিন্তু, ইহার ক্ষমতার দুইটি সীমা আছে। প্রথমতঃ, ইহা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনপরিষদকে (Federal Council) বিতাড়িত করিতে পারে না এবং দ্বিতীয়তঃ, ইহা জনগণের চূড়ান্ত ক্ষমতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষগুলির নির্বাচন, পররাষ্ট্রের সহিত সন্ধি অথবা চুক্তি সম্পাদন, ক্যান্টনগুলির পরস্পরের মধ্যে অথবা কোনও বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত সম্পাদিত চুক্তির অনুমোদন, রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা বজায় রাখা, যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী ও আয়ব্যয় সম্পর্কিত সমস্ত বিষয় যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনপরিষদের আয়ত্তাধীন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনপরিষদের সদস্যগণ কতিপয় অধিকার (Privileges) ভোগ করিয়া থাকেন। যেমন, আইনপরিষদের সদস্যদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা

করা, কোন অভিযোগের প্রতিকার দাবী করা, কোন বিষয়ে বিবেচনা করিবার অনুরোধ (Postulate) জানান অথবা কোন বিষয়ে কোন কার্যকরী উপায় অবলম্বনের জন্য দাবী (motion) জানান, ইত্যাদি।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত (Federal Tribunal)

যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত ১১ হইতে ১৩ জন পর্যন্ত অতিরিক্ত বিচারপতিসহ মোট ২৪ জন বিচারপতি লইয়া গঠিত। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনপরিষদ দুইকক্ষের যুক্ত অধিবেশনে বিচারপতিগণকে ছয় বৎসরের জন্য নির্বাচিত করেন। কার্যক্ষেত্রে বিচারপতিগণ পুনর্নির্বাচিত হইতে পারেন এবং যতদিন ইচ্ছা করেন, ততদিন স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন। জার্মাণ, ইটালিয়ান ও ফ্রেঞ্চ এই তিনটি সরকারী ভাষার প্রতিনিধি যাহাতে বিচারকমণ্ডলীর মধ্যে থাকেন, বিচারপতি নিযুক্ত করার সময় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়। জাতীয় পরিষদে সদস্য হইবার যোগ্যতা থাকিলে যে কোন নাগরিকই বিচারপদে নিযুক্ত হইতে পারেন। বিচারকগণ নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকেন বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা সম্ভবপর হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিচারালয় হইলেও দেশের বিভিন্ন ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্যাণ্টনগুলি কর্তৃক প্রণীত হয়। সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের শাসনতন্ত্রের চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকারী অথবা সংরক্ষক নহে। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের মূল (original) এবং আপীল (appellate) ক্ষমতা আছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যাণ্টনের মধ্যে অথবা ক্যাণ্টনগুলির নিজেদের মধ্যে যে কোন দেওয়ানী মামলা বিচার করিবার মূল ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের আছে। আবার, ক্যাণ্টনগুলির আদালত হইতে যদি কোন আপীল আসে সেইগুলি বিচার বিবেচনা করিবার ক্ষমতাও ইহার আছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন নাগরিক অথবা প্রতিষ্ঠানের কোন প্রকার বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ অথবা শাসনতন্ত্র লংঘনের অভিযোগ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত বিচার করিয়া থাকে। আবার, ক্যাণ্টনের কোন আইন যদি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র অথবা যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনের বিপক্ষে যায়, তবে ক্যাণ্টনের আইন বাতিল করিয়া দিবার অধিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের আছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনপরিষদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইন বাতিল করিয়া দিবার অধিকার ইহার নাই। যদি যুক্তরাষ্ট্র অথবা ক্যাণ্টন এবং কোন যৌথ-প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যক্তির মধ্যে বিবাদ দেখা দেয় সেখানেও যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের বিচার করিবার মূল ক্ষমতা আছে। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে মামলার বিষয়বস্তুর মূল্য অন্ততঃ চার হাজার ফ্রাংক হওয়া প্রয়োজন। ১৯২৮ সাল হইতে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত নাগরিকগণ এবং সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে

নানাবিধ বিবাদের মীমাংসা করিয়া শাসনসংক্রান্ত আদালত (administrative court) হিসাবে কাজ করিয়া আসিতেছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনপরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইনের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনপরিষদের প্রণীত আইনের কার্যকারিতা অথবা বৈধবা লইয়া প্রশ্ন তুলিতে পারে ত্রিশহাজার নির্বাচক অথবা ৮টি ক্যাণ্টন।

সুইজারল্যাণ্ডের প্রকৃত গণতন্ত্রের পরিমাণ—(Extent of real democracy in Switzerland)

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বর্তমানে আমরা দেখিতে পাই না। প্রাচীন গ্রীসের শহর রাষ্ট্রগুলিতে (City States) প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রের এমন কতিপয় বিধান আছে যেগুলির ফলে সেই গণতন্ত্রের প্রকৃত রূপ অনেক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। গণতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে জনগণেরই সরকার,—জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা ও সরকারের কাজে সক্রিয় ভূমিকা না থাকিলে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় না; জনগণের সক্রিয় ভূমিকার ফলে সরকারও জনগণেরই স্বার্থ ও তাহাদের আশা-আকাংখা বাস্তবে রূপায়িত করিতে চেষ্টা করে। জনগণ যদি মনে করে রাষ্ট্রের কোন আইন জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাইতেছে, তবে প্রকৃত গণতন্ত্রের জনগণের সেই আইনের বৈধতা অস্বীকার করিবার ক্ষমতা থাকে। সুইজারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রে আমরা জনগণের হাতে বিস্তর ক্ষমতা দেখিতে পাই। তাহাদের ক্ষমতার তিনটি বিশেষ রূপ আছে—যথা, গণ-উদ্যোগ (Initiative), গণভোট (Referendum), নির্বাচিত প্রতিনিধিকে প্রত্যাগমনের নির্দেশে অপসারণের অধিকার (Right to recall)।

গণউদ্যোগ

আইনসভা কর্তৃক প্রণীত কোন আইন অথবা আইনসভার উত্থাপিত আইনপ্রণয়নের জন্য কোন প্রস্তাব অনুমোদন অথবা প্রত্যাখ্যানের জন্য যখন জনসাধারণের নিকট উপস্থিত হয় এবং সব ভোটারগণ সেই বিষয়ে ভোট প্রদান করে, তখন ইহাকে গণভোট (Referendum) বলে। গণভোটে যদি কোন প্রস্তাব গৃহীত হয় অথবা বর্জিত হয়, তবে তাহা আইনপরিষদ কর্তৃকও গৃহীত অথবা বর্জিত হইবে।

গণভোট

গণভোট আবশ্যিক (compulsory) অথবা ঐচ্ছিক (optional) হইতে পারে। সুইজারল্যাণ্ডে শাসনতন্ত্র সংশোধনের ব্যাপারে যে গণভোটের ব্যবস্থা আছে, তাহা আবশ্যিক। কিন্তু অন্যান্য সাধারণ আইন অনুমোদন অথবা আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুমোদনের জন্য যে গণভোটের ব্যবস্থা আছে তাহা ঐচ্ছিক। ত্রিশ হাজার নাগরিক অথবা ৮টি ক্যাণ্টনের দাবীতে ইহা অনুষ্ঠিত

হইতে পারে। যে সকল যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সাধারণভাবে প্রযোজ্য নহে অথচ যেগুলি জরুরী প্রকৃতির আইন বলিয়া পরিগণিত হয়, সেইগুলি সম্পর্কে সর্বদা গণভোটের অনুষ্ঠান করা হয় না। সেইগুলি জরুরী কিনা সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন পরিষদ। নাগরিকদের যথেষ্ট পরিমাণে গণভোটের স্বাধীনতা প্রদান করিয়া গণতন্ত্রের প্রকৃতরূপ বজায় রাখার চেষ্টা করা হইলেও অনেক ক্ষেত্রেই যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনপরিষদ এই ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছে এবং ইহাতে জনস্বার্থ ব্যাহত হইয়াছে। ক্যান্টনগুলির শাসনতন্ত্র সংশোধন করার ব্যাপারে বাধ্যতামূলক গণভোটের অনুষ্ঠান করার ব্যবস্থা আছে।

প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনসাধারণ যে শুধু আইন অনুমোদন অথবা প্রত্যাখ্যান করিবারই ক্ষমতা ভোগ করে, তাহা নহে। জনসাধারণের হাতেও

শাসনতন্ত্রের সংশোধন

শাসনতন্ত্রের সংশোধনের জন্য নূতন আইন প্রণয়ন করিবার কিছু ক্ষমতা দেওয়া হয়, এবং সুইজারল্যাণ্ডের জনগণকে তাহা দেওয়া হইয়াছে। সুইজারল্যাণ্ডের ৫০,০০০ হাজার নির্বাচক আইনপরিষদে শাসনতন্ত্রের সংশোধন করিবার জন্য কোন বিশেষ প্রস্তাব প্রেরণ করিতে পারে। ইহাকেই গণ-উদ্যোগ (Initiative) বলে। গণ-উদ্যোগের ফলে শাসনতন্ত্র সংশোধনের কোন প্রস্তাব আইনপরিষদে উত্থাপিত হইলে ইহা গণভোটের জন্য প্রেরিত হয়। সুইজারল্যাণ্ডে গণ-উদ্যোগের ব্যবস্থা হইয়াছে যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র সংশোধনের ক্ষেত্রে; কিন্তু সাধারণ আইন প্রণয়ন ব্যাপারে গণ উদ্যোগের প্রবর্তন করা হয় নাই। ক্যান্টনগুলির মধ্যে একটি ছাড়া অন্যগুলিতে শাসনতান্ত্রিক আইনের ব্যাপারে গণ-উদ্যোগের ব্যবস্থা আছে। তবে সাধারণ আইনের ব্যাপারেও ১৯টি ক্যান্টনে গণ-উদ্যোগের ব্যবস্থা আছে।

আইনসভার দোষত্রুটি এবং ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা প্রতিরোধে গণ-উদ্যোগ ও গণভোটের অবদান অসামান্য। অবশ্য বড বড় রাষ্ট্রের পক্ষে এই ব্যবস্থাগুলি খুব জটিল বলিয়া সহজে এইগুলির প্রবর্তন করা যায় না। কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডের মত ছোট যুক্তরাষ্ট্রে এইগুলির প্রবর্তন ব্যয়বহুল হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃত গণতন্ত্রের পরিচায়ক হইয়াছে। সুইজারল্যাণ্ডের জনসাধারণের আর একটি গণতান্ত্রিক অধিকার আছে। তাহা হইতেছে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের

শাসনতান্ত্রিক শাসন-বিভাগ

স্বপদ হইতে ফিরাইয়া আনা। যদি কোন নির্বাচিত প্রতিনিধি নির্বাচকমণ্ডলীর স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করে অথবা প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনে অক্ষম হয়, তবে নির্বাচকগণ তাহাকে পদচ্যুত করিতে পারে। ইহা গণতন্ত্রের সাফল্যের সর্ত হিসাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এই ব্যবস্থায় নির্বাচিত প্রতিনিধি সর্বদাই

তাঁহার নির্বাচকদের স্বার্থ বজায় রাখার জন্ত সচেষ্ট থাকেন। ইহাতে গণতন্ত্র সার্থক হয়। সুইজারল্যাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনবিভাগের (Federal Executive) কাজও গণতান্ত্রিক। যুক্তরাষ্ট্রে একজন মাত্র শাসনকর্তা নাই; সাতজন শাসনকর্তা মিলিতভাবে শাসনবিভাগের পরিচালনা করেন। তাঁহারা সবাই যে একই রাজনৈতিক দলের সদস্য তাহাও নহে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনপরিষদে (Federal Council) রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রকার স্বার্থের ও বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেন। একজন মাত্র শাসনকর্তা জনগণের আশা-আকাংখা বাস্তবে রূপায়িত করার পক্ষে যতখানি উপযুক্ত, সাতজন শাসনকর্তা মিলিতভাবে সেই ব্যাপারে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী উপযুক্ত। আইন-পরিষদের উচ্চকক্ষে বিভিন্ন ক্যাণ্টনের (ইহা যত ক্ষুদ্রই হউক না কেন) অন্ততঃ একজন প্রতিনিধি থাকিবেই। কিন্তু, একটি বিশেষ ক্ষেত্রে সুইজারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র একটু অ-গণতান্ত্রিক হইয়াছে। তাহা হইতেছে স্ত্রীলোকদের নাগরিক অধিকার সম্পর্কে। সুইজারল্যাণ্ডে স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার নাই। সুইজারল্যাণ্ডের মত গণতান্ত্রিক দেশে এই ব্যবস্থা একটু অ-গণতান্ত্রিক হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, সুইজারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রে অনেক পরিমাণেই প্রকৃত গণতন্ত্র দেখা যায়। তবে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে সুইজারল্যাণ্ডেও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনপরিষদ (Federal Council) ক্রমেই অধিকতর ক্ষমতাশালী হইতেছে।

Exercises

1. "A System of Government which falls in a class by itself' which differs fundamentally from the Presidential and Cabinet types, but which combines certain features of both, is that of Switzerland."—Discuss. (১৪৯—৫৩ পৃষ্ঠা)

2. How far do you agree with the view that the Swiss System of Government Combines both the Parliamentary and non-Parliamentary executive system ?" (১৪৯—৫৩ পৃষ্ঠা)

3. What are the features of the Swiss Federal Executive which makes it unique ? (C. U. B. A. Part I 1962)
(১৪৯—৫৩ পৃষ্ঠা)

.4 Discuss the composition and functions of the National Assembly (or the Federal Legislative) of Switzerland. What

is the reation between the Executive and Legislature in Switzerland ? (১৫৩—৫৫ পৃষ্ঠা)

5. Give a brief outline of the Federal Tribunal. (১৫৫—৫৬ পৃষ্ঠা)

6. "Real democracy in operation." How far is the characteristics true of the Swiss Constitution ? (১৫৬—৫৮ পৃষ্ঠা)

7. Explain how the Swiss Constitution provides for direct popular lagislation. (১৫৬—৫৮ পৃষ্ঠা)

8. Discuss the nature of popular democracy in Switzerland. (১৫৬—৫৮ পৃষ্ঠা)

9. Discuss the method of amendment of the Swiss Constitution. (১৫৭ পৃষ্ঠা) (C. U. B. A. Part I 1962)